মুসলিম উম্মাহর বিচ্ছেদ ও ঐক্য

মওলানা আব্দুল হাই ফারুকী

মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও ঐক্য

(إفتراق الامة الاسلامية واتحادها)

মওলানা আব্দুল হাই ফারুকী

الشيخ عبدالحی فاروقی

www.pathagar.com

মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও ঐক্য

লেখক ঃ মওলানা আব্দুল হাই ফারুকী।

স্বত্ব ঃ কোরআন মজলিশ, দুবাই।

প্রকাশক ঃ কোরআন মজলিশ, দুবাই।

প্রকাশকাল ঃ ২৭শে রমজান ১৪২১হিজরী,
২২শে ডিসেম্বর, ২০০০খৃষ্টাব্দ।

প্রচ্ছদ ঃ কোরআন মজলিশ, দুবাই।

কম্পোজ ঃ আনোয়ারুল হাসান,
আসমা আনোয়ার এবং
হাফেজ আবু দাউদ (আরবী কম্পোজ)।

মুদ্রন ঃ কোরআন মজলিশ, দুবাই।

হাদিয়া ঃ ১৫০ টাকা,
১৫ দিরহাম (এ,ই, ডি),
৫ ডলার (ইউ, এস)।

The division and unity by Abdul Hai Farooqui, Published by , Price. BTk. 150, 15 AED, 5 US Dollar.

www.pathagar.com

সুচিপত্র

প্রথম পর্ব

উম্মার পরিচিতি ও প্রকৃতি	... ...	১
বিভেদ একটা বাস্তবতা - ঐক্য অপরিহার্য।	... ...	৩
বিভেদের স্বরূপঃ	... ...	৩
বিভেদের অবকাশ ও আল্লাহ্র হিকমত।	... ...	৩
ঐক্যের অপরিহার্যতা	... ...	৫
হাদিসের আলোকে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য	... ...	৯
মুসলিম উম্মাহ্র বিভেদের স্বরূপ	... ...	১০
ঐক্যের পথে আসল বিপদ,	... ...	১৪
বিভেদের কারণ সমুহঃ	... ...	১৮
ইসলামের জ্ঞান বা ইলমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট	... ...	২০
ইলমের সংজ্ঞা	... ...	২৬
ইল্মের বৈশিষ্ট।	... ...	২১
ইসলামী ইলমের দ্বিতীয় বিশিষ্ট।	... ...	২২
ইসলামী ইল্মের উৎস	... ...	২৩
ইল্ম আমল, তাযকিয়া ও হিকমত	... ...	২৪
আল্লাহ্র আয়াত বা তার নিদর্শন	... ...	২৬
কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা	... ...	২৭
তায্কিয়া বা পরিশুদ্ধি	... ...	২৭
তায্কিয়ার চুড়ান্ত পর্যায়	... ...	২৯
মানুষের জ্ঞান যে সব বিষয়ের সমাধান করতে অপারগ, সেই সব বিষয়কে গবেষণার বা চিন্তার বিষয় বস্তুতে পরিণত করা	... ...	৩২
কোরআনে মজিদের আয়াত সমুহের শ্রেণীবিন্যাস	... ...	৩৫
ইহুদীদের চিরন্তন পরিণতিও বর্তমান অবস্থা	... ...	৩৯
বিভেদের তৃতীয় কারণঃ	... ...	৪২
নফসের গোলামী বা মনোবৃত্তির দাসত্ব	... ...	৪২
বিভেদের চতুর্থ কারণঃ	... ...	৪৯
অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজের গোলামী।	... ...	৪৯
বিভেদের পঞ্চম কারণঃ পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ।	... ...	৫১
বিভেদ থেকে মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থাঃ	... ...	৫১
মূলনীতি বাস্তবায়নে সাহাবাদের ভূমিকা	... ...	৫৫

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরাম কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখায় মানদন্ড	... ...	৫৭
বিদয়াতের সংগা ও স্বরূপ	... ...	৫৯
সাহাবায়ে কেরামদেরকে মানদন্ড করার হিকমত	... ...	৬৪
একটি সন্দেহের অপনোদন	... ...	৬৭
মুজাদ্দিদে দ্বীনের ভূমিকা	... ...	৬৯

দ্বিতীয় পর্ব

ইতিহাসের পর্যালোচনাঃ	... ...	৭০
মুসলিম উম্মাহঃ সাহাবায়ে কেরামদের যুগ	... ...	৭০
রাসুলেপাকের তিরোধান সম্পর্কে মত পার্থক্য	... ...	৭৪
রাসুলেপাকের দাফন সম্পর্কে মতবিরোধ	... ...	৭৫
প্রথম খলিফা নির্বাচনে মতবিরোধ	... ...	৭৫
যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করার প্রশ্নে বিরোধ।	... ...	৭৯
শরীয়তের বিষয়াদিতে সাহাবাদের মত পার্থক্য	... ...	৮২
সাহাবায়ে কেরামদের মত পার্থক্যের ধরণ।	... ...	৮৩
সাহাবাদের মত পার্থক্য তাদের আত্মসম্মানের কারণ হতো না	... ...	৮৩
খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামদের দৃষ্টিভঙ্গি	... ...	৮৬
কয়েকটি অভূতপূর্ব ঘটনাঃ	... ...	৮৭
উটের যুদ্ধ	... ...	৮৮
সাহাবাদের মত পার্থক্য একটি রহমত	... ...	৯১
খারেজী সম্প্রদায়ের ফিতনা	... ...	৯২
সাহাবাদের যুগে আরো কিছু আদর্শিক বিরোধ	... ...	৯৪
শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি	... ...	৯৫
মুরজিয়া সম্প্রদায়	... ...	৯৫
মোতাজিলা সম্প্রদায়	... ...	৯৬
ইসলামী ইলমের উৎস সমুহের সংরক্ষণ	... ...	৯৮
কোরআনের সংরক্ষণ	... ...	৯৯
হাদিস বা সুন্নাহর সংরক্ষণ	... ...	১০২
ফিকাহ্ শাস্ত্রের সংকলন ও ফিকাহর মত পার্থক্য	... ...	১০৪
তাবেয়ীদের যুগ	... ...	১০৬
তাবেয়ীদের পরবর্তীযুগ	... ...	১০৮
বিভিন্ন ফিকাহর অনুসরণ বিভেদ নয়	... ...	১১০
তাকলিদের মূলনীতি	... ...	১১২
ফিকাহর তাকলীদ কি অবৈধ?	... ...	১১৩

www.pathagar.com

ভারতীয় উপমহাদেশে ফিকহার তাকলিদের উপর একটি সমীক্ষা	... ...	১১৫
আকিদা ও বিশ্বাস উম্মতের আসল সম্পদ	... ...	১১৯
দার্শনিক চিন্তাধারার বিষাক্ত ছোবল	... ...	১২১
ইখওয়ানুছ সাফা আন্দোলন	... ...	১২৪
বাতেনী মতবাদ	... ...	১২৪
কাদীয়ানী ও বাহাই ফিরকাহ	... ...	১২৭
দশর্ন শাস্ত্র ও পৌত্তলিকতা	... ...	১২৯
জ্যোতিষবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা	... ...	১৩১
কবিতা কাব্যের সাধনা	... ...	১৩৫
শীয়াবাদ- একটি ব্যাপকতর বিভেদ ঃ	... ...	১৩৯
(১) ইলমের উৎস	... ...	১৪০
(২) খিলাফতঃ	... ...	১৪০
(৩) ইমামতঃ	... ...	১৪০
(৪) বাতেনী কোরআনঃ	... ...	১৪১
(৫) শীয়া ফিকাহঃ	... ...	১৪১
সুন্নতের অভিনব উৎস	... ...	১৪১
খলিফা নির্বাচনে শীয়াবাদ	... ...	১৪৩
কোরআনের আয়াতে খেলাফতে রাশেদার প্রমাণ	... ...	১৪৬
ইমামত ও বেলায়েতে ফকীহ	... ...	১৫০
১) ফাতেমী শীয়া	... ...	১৫১
২) ইসমাইলী শীয়া	... ...	১৫১
৩) ইসনা আশারিয়া বা ১২ ইমামে বিশ্বাসী শীয়া	... ...	১৫২
শীয়াদের মতে ইমামদের মর্যাদা	... ...	১৫৩
ইমামের আত্মগোপনঃ ছোট ও বড় নিরুদ্দেশ	... ...	১৫৮
ইমাম মেহদীর ভূমিকা	... ...	১৫৯
শীয়া মযহাবের দুইটি মূলনীতি	... ...	১৬০
ইসলামের কষ্ঠিপাথরে ইমামতের দর্শন	... ...	১৬২
শীয়াদের বেলায়েতে ফকীহ মতবাদ ও রাজনৈতিক দর্শন	... ...	১৬৩
শীয়া মযহাবের ফিকাহ	... ...	১৬৫
নেকাহ মোতা বা ভোগের উদ্দেশ্যে বিবাহ	... ...	১৬৬
শীয়া মযহাবে মাশহাদ ও মাযারের ভূমিকা	... ...	১৬৮
আধ্যাত্মবাদ ও বাতেনী চিন্তাধারায় শীয়াবাদ	... ...	১৭০
রসম রেওয়াজ, রীতি-নীতি সর্বস্ব শীয়াবাদ	... ...	১৭১

www.pathagar.com

ইসলামী তাওহীদের কোরআনী দৃষ্টিভঙ্গি	... ...	১৭১
প্রতিপালনের তাওহীদ	... ...	১৭২
ইবাদত বন্দেগীতে তাওহীদ	... ...	১৭৩
সিফাতের তাওহীদ	... ...	১৭৪
কেন এই পীড়াদায়ক বিরোধের উপাখ্যান	... ...	১৭৪
ইলমে মারেফত বা সূফীতত্ত্ব	... ...	১৭৬
ইলমে মারেফতের উৎপত্তি	... ...	১৭৭
ইলমে মারেফতের স্বরূপ	... ...	১৮২
ইলমে মারেফতের লক্ষ্য	... ...	১৮৩
ইলমে তাসাউফের গ্রন্থাবলী	... ...	১৮৪
অলী কাকে বলে?	... ...	১৮৫
ইলমে মারেফতের ইতিহাস	... ...	১৮৭
ইলমে মারেফতের বুনিয়াদ	... ...	১৯০
শরীয়ত ও মারেফতের সম্পর্ক	... ...	১৯৫
সোহবতের বিকল্প	... ...	১৯৮
ইলমে মারেফত ও সমালোচনা	... ...	১৯৯
ইলমে মারেফতের নামে বিভ্রান্তি	... ...	২০১
বিভ্রান্তির প্রথম বীজ	... ...	২০২
তাসাউফের ইতিহাস সন্ধানে ভ্রান্তি	... ...	২০৪
সূফীদের শ্রেণী বিন্যাস	... ...	২০৪
কলন্দর	... ...	২০৭
অলীদের মাযার নিয়ে বাড়াবাড়ি	... ...	২০৮
নযর- নিয়াজ ও মানত।	... ...	২১০
পীরের আস্তানায় বা মাজারে নাচগান	... ...	২১৩
সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ফিতনাঃ	... ...	২১৬
আদর্শিক অধঃপতন ও আকবরের স্বেচ্ছাচারিতা	... ...	২১৬
দ্বীনে ইলাহীর ঐতিহাসিক পটভূমি।	... ...	২১৯
দ্বীনে ইলাহীর আকিদা বিশ্বাস ও মূলনীতি	... ...	২২০
দ্বীনে ইলাহীর সুদূর প্রসারী ফলাফল।	... ...	২২২
মোজাদ্দিদ আলফে সানীর রেঁনেসা আন্দোলন	... ...	২২৪
ধর্মনিরপেক্ষতার উত্তরাধিকার	... ...	২২৫

www.pathagar.com

বিভেদের আর একটি অধ্যায়- বেরলভী ওহাবী ও দেওবন্দী	... ...	২২৫
ভারতীয় উপমহাদেশে রেঁনেসা আন্দোলন	... ...	২২৬
ইসলামের জীবন ব্যবস্থায় দ্বিমুখী ধারা	... ...	২২৭
বিরোধের মূল কারণ	... ...	২২৮
উপমহাদেশের আলেম সমাজের বিশেষ দুর্বলতা	... ...	২৩২
আকিদাগত বিরোধের আর একটি অধ্যায়।	... ...	২৩৬
নবী শুধু মহামানব নন - অতি মানব।	... ...	২৩৭
বান্দা ও খলিফার মর্যাদা	... ...	২৩৮
নবুয়তী নূরের তাৎপর্য	... ...	২৪৪
গায়েবী ইলম ও নবীপাক	... ...	২৪৬
ইসলামে রাসুলে আযমের মর্যাদা ও আনুগত্য।	... ...	২৫০
কয়েকটি পরিত্যক্ত মূলনীতি	... ...	২৫৬
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঐক্যের পথে		
ইসলামী ঐক্য ও ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন।	... ...	২৬১
ইকামতে দ্বীন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।	... ...	২৬৯
ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন ও উম্মাহর ইতিহাস।	... ...	২৮০
খেলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য	... ...	২৮৭
খিলাফত ও ইমামতের অর্থ	... ...	২৯০
জনশক্তির মূল্যায়ন এবং উলেমাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব	... ...	২৯৪
মায়ারুফ ও মনকার	... ...	২৯৭
ইকামতে দ্বীন তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্ম পদ্ধতি।	... ...	৩০৩
ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীদের যোগ্যতা,	... ...	৩০৮
সম্প্রতিককালের ইসলামী সংগঠন সমূহের পর্যালোচনা।	... ...	৩১৬
অতঃপর ঐকের পথে	... ...	৩২২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মুসলমানদের পারস্পরিক কথাবার্তায়, চালচলনে, সভা-সমিতির বক্তৃতায়, ওয়াজ মাহফিল সমূহের ওয়াজে, বিভিন্ন বই, পুস্তক, ইস্তেহারে, প্রকাশনায় ও প্রচার মাধ্যমের মধ্যে প্রতি নিয়ত যে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে সেই অনুপাতে ঐক্যের প্রচেষ্টা ও প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল। অথচ এই ঐক্যই হলো মুসলিম উম্মাহর শক্তির উৎস বা অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। শুধু বাংলাভাষাতেই নয়, বরং উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাতেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর দারুন অভাব রয়েছে। মতপার্থক্য ও মতোভেদের মধ্যে ঐক্যের সুত্র খুঁজে বের করা ও ঐক্যের আবেদন সৃষ্টি করা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এই বিষয়ে লিখার জন্যে কোরআন, হাদীস ও আনুসাঙ্গিক বিষয় সমূহের উপর গভীর জ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ব ও অপরাপর সমাজবিজ্ঞান সমূহের উপর জ্ঞান থাকা মৌলিক শর্ত। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মওলানা আব্দুল হাই ফারুকী একাধারে আধুনিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কোরআন, হাদীস ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উপর গবেষণা কর্মের মাধ্যমে পান্ডিত্য অর্জন করেছেন। তিনি একজন আরবী ভাষারও পন্ডিত। তাঁর লিখিত মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও ঐক্য গ্রন্থটির পাতায় পাতায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। আমরা এই গ্রন্থটিকে মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে উলেমা সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে মনে করি। উলেমা ও বুদ্ধিজীবি সমাজ এ পথে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশা রাখি।

দুবাই অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষিত সমাজের বিরাট একটি অংশ তথাস্ত বাংলাদেশ স্কুলে অনুষ্ঠিত নিয়মিত তফসীরে কোরআন ও ইসলামী বিষয় সমূহের উপর আলোচনা সভাসমূহে শরীক হন। তারা মওলানা ফারুকীর আহবানে কোরআন মজলিশ নামে সংগঠিত হয়েছেন। তাদেরই ঐকান্তিক প্রয়াসে বইটি প্রকাশিত হলো।

কোরআন মজলিশ একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বক্তৃতা, লিখনী, প্রকাশনা ও প্রচারণের মাধ্যমে কোরআনের জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালানো এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই গ্রন্থটির প্রকাশনা এই লক্ষ্যেই একটি পদক্ষেপ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কোরআনের খিদমতে সর্বস্ব নিয়োজিত করার তৌফিক দান করুন।

দুবাই, ইউ, এ, ই
তাং- ০১/১২/২০০০ইং

কোরআন মজলিশ, দুবাই
এর পক্ষে-

(মাহবুবুল আলম)
প্রকাশনী সম্পাদক

www.pathagar.com

লেখকের কথা

ইসলাম ঐক্যের আদর্শ। মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী সকল বিরোধ ও বিভেদের সমাপ্তি ঘটিয়ে অটুট ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই এই মহান আদর্শের আগমন। মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়ে এই ঐক্য সুনিশ্চিত করেছেন। মানব সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উদ্ভূত বিরোধ বা চিন্তা ও মানসে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলেই আল্লাহপাক নবী-রাসুলের মাধ্যমে ঐশী ব্যবস্থার ভিত্তিতে কাংখিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সকল চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইসলামী আদর্শকে জয়যুক্ত করেছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বিশ্ব মানবতার অস্তিত্ব বহাল রয়েছে যুগ যুগ ধরে।

শেষনবী সরোয়ারে কায়েনাত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পর যতো বিরোধ ও বিভেদই মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক না কেন, তার নিষ্পত্তির জন্যে কোন নবী বা রাসুলের আগমন হবে না। কিন্তু উদ্ভূত বিরোধ ও বিভেদের পথে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই উম্মতের স্থায়ীত্ব সর্বাঙ্গীনভাবে নির্ভরশীল। তাই উম্মতের ইতিহাসে যুগে যুগে বিভিন্ন মহান ব্যক্তি বা সংগঠনের অক্লান্ত প্রয়াসের মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। যারা যুগে যুগে কোরআন ও হাদিসের কষ্টিপাথরে ইসলামের অবিকৃত আদর্শ সমুন্নত করে গেছেন। বাতিল শক্তির দাপট স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এই অমোঘ ব্যবস্থার মাধ্যমেই আজও আমাদের মাঝে অবিকৃত ইসলামী আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে।

আজ থেকে প্রায় দেড়-সহস্র বছর পূর্বে আরবের ধুসর মরু অঞ্চলে আরব বেদুইনদের পরিবেশে উম্মতে মোহাম্মদীর যাত্রা শুরু হয়। সমাজের দূর্বল শ্রেণীর গুটি কয়েক ব্যক্তিই এই উম্মতের প্রথম সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও অপ্রতিকূল পরিবেশের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে রাসূলেপাকের জীবনেই লক্ষাধিক আদম সন্তান ইসলামী উম্মাহর আবহনকালের ঐক্য স্রোতের সাথে একাত্ম হয়ে পড়েন। আদর্শের অকৃত্রিম মূল শক্তি, এই আদর্শের ধারক ও বাহকদের সুদৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস এবং তাদের পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এই মহান আদর্শ বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হয়নি, অল্প দিনের মধ্যেই বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠী এই উম্মাহর ঐক্য সূত্রে গ্রোথিত হয়ে যান। সেই যাত্রা আজও অব্যাহত রয়েছে।

আজকের বিশ্বের প্রায় ৫০০ কোটি জনসমষ্টির মধ্যে প্রায় ১৫০ কোটি মানব সন্তান ইসলামী উম্মাহর সদস্য। ৪০ বছর পূর্বে অবিভক্ত ভারতের সরকারী আদম শুমারীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬ কোটি, আর আজ এই উপমহাদেশের তিনটি স্বাধীন দেশে বিভক্ত হয়ে এর মুসলিম সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ কোটিতে। সারা বিশ্বের মুসলমান, বিশেষ করে উপমহাদেশের মুসলমানগণ সংখ্যার দিক দিয়ে এই বিশালতার অধিকারী হওয়া সত্বেও অপরিহার্য আদর্শিক ঐক্যের অভাবে নিতান্ত হীনশক্তি বলে অনুভূত হয়।

ইসলামী উম্মাহর ঐক্য আজ শতধাবিচ্ছিন্ন, আকিদা-বিশ্বাসের দৈন্যতা ও নৈরাজ্য সর্বত্র পরিলক্ষিত। বিভিন্ন দল, উপদল, শ্রেণী ও গ্রুপের প্রাচীর খাড়া করা হয়েছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে অনাস্থা, বিদ্বেষ, দলাদলি, দাংগা-লড়াই ও ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে। বিরোধ ও বিভেদের ব্যপকতার অনুপাতে ঐক্য প্রয়াস একেবারেই অপ্রতুল বা ঐক্যের সঠিক প্রয়াস নিতান্ত গৌন। অথচ এই প্রয়াসই উম্মাহর রক্ষাকবজ।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে যে আদর্শিক ঐক্যই ইসলামের বুনিয়াদ। ঐক্যের অভাবেই মুসলিম উম্মাহ আজ জরাগ্রস্থ। ঐক্যের রাজপথ সহজ ও সরল, সেখানে কোন জটিলতা নেই। জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন বিভেদের চোরাপথে। অনৈক্য ও বিভেদের চোরাপথ ত্যাগ করে ঐক্যের রাজপথে ফিরে আসার উপরই উম্মাহর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। হকপন্থী লোকদের প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় এই পথ সহজতর হয়ে উঠে। তাই বিভেদের ব্যাপকতায় ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই। বিভেদ কোন ভয়ের বিষয় নয়, বরং বিভেদের স্বরূপ না বুঝাই আসল ভয়ের কারণ। কোটি কোটি মানুষ যে আদর্শ মেনে চলে, শুধু আত্মিকভাবে নয়, বিশ্বাসে, কর্মে ও বাস্তব জীবনে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামজিক, জাতিগত ও সামষ্টিক জীবনের বিশাল ব্যপকতায়, আবার এই বিশাল মানব-গোষ্ঠী ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের মাঝে ও অসংখ্য ভৌগোলিক এলাকায়। তাই মন ও মানস, বিদ্যা-বুদ্ধি, লোকাচার, পরিবেশ ও বিভিন্ন অনস্বীকার্য দেখা-অদেখা স্বার্থের টানা-পোড়নে বিভেদ ও বিরোধ একটা বাস্তবতা। কিন্তু ইসলামের সার্বিক মূল্যবোধ ও মূলনীতি ও তার স্বীকৃত ব্যাখ্যা ইতিহাসের পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। এই আদর্শের সঠিক উপলব্ধি ও ইতিহাসের শিক্ষা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের রাজপথে টেনে আনতে সক্ষম।

উম্মতের বিভেদ ও ঐক্যের বিস্তারিত তথ্য ইসলামী ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস বলে পরিচিত যে ঐতিহাসিক দস্তাবেদ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পড়ানো হয় তা যেহেতু ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের দ্বারা লিখিত, তাই ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম নিরপেক্ষ মুসলিম রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসকে তারা ইসলামের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এসব বিষয়গুলোই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ও গবেষণার বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং ইতিহাসের পন্ডিত ও চিন্তাবিদদের জ্ঞান-ভান্ডার স্ফীত হয়ে উঠে। কিন্তু এসব জ্ঞান মুসলিম উম্মাহর উৎকর্ষ সাধনে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়ক হয় না।

ইসলামের অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদগণ ইসলামী ইতিহাসের যে বিস্তারিত তথ্য রেখে গেছেন, তার মধ্যে ইবনে খলদুনের ভূমিকা ও ইতিহাস, ইবনে জরীর তাবারীর (تاريخ الامم والملوك) ইবনে কাসীরের (البداية والنهاية) ইবনে হাযম আন্দুলুসীর (الفصل فى الملل والنحل) আল্লামা শহরাস্তানীর (الملل و النحل) ও অপরাপর মুসলিম ইতিহাসবিদদের লিখিত ইতিহাসের মাধ্যমে লেখকদের যুগ পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসের একটা সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। আরব ইতিহাসবিদদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তারা ইসলামী ইতিহাসের সূচনা কাল থেকে তাদের সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিস্তারিত ঐতিহাসিক দস্তাবেদ লিখে গেছেন। কিন্তু অতঃপর মুসলিম সমাজের এই সনাতন ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর ইসলামের ইতিহাস ইউরোপের পন্ডিতদের লিখিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উপর্যুপরি উপরোক্ত আরব ও বিশিষ্ঠ ইসলামী পন্ডিতদের লিখিত ঐতিহাসিক দস্তাবিদ সমূহের উপমহাদেশীয় ভাষায় অনুবাদ না হওয়ার ফলে উপমহাদেশের মুসলমানগণ ইসলামী ইতিহাসের সকল পর্যায়ে ইউরোপের উপর একেবারেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের ইতিহাস শাস্ত্র প্রথমতঃ এ্যারিষ্টটলের ইতিহাস দর্শনের পথ ধরে এগুতে থাকে। এ্যারিষ্টটলের মতে ইতিহাস হলো বিভিন্ন ঘটনার সমাহার মাত্র। যার মধ্যে আর্দশবাদীতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভালমন্দ ও মনস্তত্বের কোন অবকাশ ছিলোনা। এ জন্যে তার মতে ইতিহাসের চাইতে কবিতা শ্রেয় ছিলো। কেননা কবিতার মধ্যে সত্য মিথ্যা ও বুদ্ধির অবস্থান সুস্পষ্ট ছিলো।

অতঃপর ইউরোপের নিজস্ব ইতিহাস দর্শনের আবির্ভাব ঘঠে, যার ফলে ইতিহাস শুধু ঘটনার স্তুপই রইলো না, বরং ইতিহাসবিদদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসের ব্যাখ্যা করার ধারা প্রচলিত হলো। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাস তার লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটায় মাত্র। দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতায় ইতিহাসের ধারাও বিভিন্ন হয়ে যায়। আজও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ জন্যেই দেখা যায় ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে একই বিষয়ের ইতিহাস ভিন্নরূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। ইসলামের ইতিহাস সাধারণভাবে এবং ভারতের মুসলিম ইতিহাস বিশেষ করে এই বিকৃতির শিকার। আমাদের সমসাময়িককালের ইতিহাসও এই ধারার ফলে আজ ভিন্নতর অবয়বে উপস্থাপিত। ইসলামী আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহকদের হাতে ঐতিহাসিক দস্তাবেদ সংকলিত না হওয়ার ফলে আজ সত্যিকার ইসলামের ইতিহাস খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ ব্যাপার।

এই ঐতিহাসিক কারণে প্রচলিত ইসলামের ইতিহাস থেকে মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও ঐক্যের সঠিক ইতিহাস পাওয়া সুকঠিন।

ইতিহাসের এই সাধারণ ধারাটি ছাড়া আর একটি ধারা রয়েছে- ধর্ম সংরক্ষণের বা ধর্ম সংস্কারের ধারা, যা প্রতিটি যুগের সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্বিক, মনস্তাত্বিক তথা সামগ্রিক জাতীয় অবস্থার সাম্যক প্রতিফলন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ধারায় মৌলিক ধর্মীয় মূলনীতি সমূহের বিকাশের তথ্য ও বর্ণনা ঠিকই পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলনের বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কেননা ধর্মীয় মূলনীতি সংরক্ষনের পরম্পরাই ইতিহাসের মূল ধারা নয়।

উপরে বর্ণিত দুইটি ধারার ধারাবাহিক সমন্বয় ও পর্যালোচনার মাধ্যমেই সত্যিকার ইসলামের ইতিহাস সংকলিত হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর এই বিরাট অভাব পুরণে আজও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এ দায়িত্ব কোন ব্যক্তির পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ কাজ কার্যকরী হতে পারে না।

ইসলামী ইতিহাসের এই দূর্গতির কারণেই মুসলিম উম্মাহর বিভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। এক ধারণা মতে উম্মতের এই বিভেদ ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। এই চিন্তার ধারকগণ উম্মতের এই বিভেদকে অলংঘনীয় সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্যকথায় তারা পরিস্থিতির সামনে আত্ম-সমর্পন করেছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যারা বিভেদকে চরম সত্য বলে মেনে না নিলেও বিভেদ সম্পর্কে কোন মতামত ব্যক্ত করতে ভীত হয়ে পড়েন। উলেমা সমাজের মাঝেই এই ধারণা পরিলক্ষিত হয় বেশী। তারা এই বিভেদ নিয়েই বেঁচে থাকতে চান, বিভেদের আলোচনাতেই তারা সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন। তৃতীয় এক শ্রেণীর লোক ইতিহাসের এই বিরোধ ও বিভেদকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান, তারা এই বিরোধ দেখেও না দেখার ভান করেন। এই তিন ধারণাই যথাযথ

www.pathagar.com

চিন্তাধারা নয়, বিভেদের আসল স্বরূপ ও পটভূমি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই এই ধারনা সমুহের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে উম্মাহর এই বিভেদ কোন অবধারিত সত্য নয় বা এটাও সত্য নয় যে এর সাথে আপোষ করে বেঁচে থাকার দৃষ্টিভঙ্গির বা একে পাশ কাটিয়ে চলার পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। বরং ইতিহাস ও আদর্শবাদীতার প্রেক্ষাপটে এর পর্যালোচনা অপরিহার্য।

উম্মাহর ব্যাপকতর অনৈক্য, বিরোধ ও বিভেদের অবসানকল্পে ঐক্য প্রয়াসের লক্ষ্যে বিভেদের ধরন ও স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অপরিহার্য শর্ত। ইতিহাসের পর্যালোচনায় মতপার্থক্যের বুনিয়াদ ও কারণ সমুহ সুনির্দিষ্ট করা নিতান্ত প্রয়োজন, অতঃপর হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পর্য্যায়ক্রমে বিভেদ বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এ পথে সহায়ক বই-পুস্তকের অভাব রয়েছে, কেননা অধিকাংশ বই-পুস্তকই লিখা হয় বিভিন্ন দল-উপদল বা তাদের চিন্তাধারার পক্ষে বা বিপক্ষে, ফলে নিরপেক্ষ সঠিক পথ প্রদর্শক বই সমুহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ইসলামী গ্রন্থাবলীর কোন অভাব নেই, ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর পর্যাপ্ত বই রয়েছে, কিন্তু ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ও বিভেদের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য বই-পুস্তক নেই বললেই চলে।

দীর্ঘদিন যাবত মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভূখন্ডে অবস্থান করার ফলে বিভিন্ন দেশের উলেমা, পীর, মাশায়েখ, চিন্তাশীল ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি, সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষদের অনুভূতি জানার চেষ্টা করেছি; এ সব চিন্তার আদান-প্রদানে আমার মনে এই বিষয়ে লিখতে উৎসাহ জাগায়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে একসূত্রে গাঁথা এবং চিন্তার গ্রন্থিগুলোর পেছনে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা ও উপকরণসমূহের সংযোজনা অনেক শ্রম ও সময়ের দাবী করে, যা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠ ছিলো না। বিষয় বস্তুর ব্যাপকতার কারণে সকল বিষয়ের উপর সম-গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয়নি। কোন কোন বিষয়ের উপর অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আবার কোথাও আলোচনা হয়েছে সংক্ষিপ্ত। তবে মুল বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা সামনে রাখা হয়েছে।

বইটিকে মোটামুটিভাবে দুই অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ে বিষয় বস্তুর মৌলিক দিকগুলোর ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে, বস্তুতঃ এই অধ্যায়টিই হলো বিষয় বস্তুর মুল শক্তিকেন্দ্র। বিভেদের মুল কারণগুলো কোরআন ও হাদিসের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনাই হলো প্রথম অধ্যায়ের মুল কথা, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিহাসের পরম্পরায় এসব বিরোধ ও বিভেদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনার সময় ঐতিহাসিক পরম্পরার দিকটাকেই বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে যে তাত্ত্বিক আলোচনা বা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে যে সমস্ত কোরআন-হাদিসের উল্লেখ করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। অধিকাংশ ধারাবাহিক আলোচনার সময়ই এভাবে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তাই পুরো বইটার প্রতিটি অংশ অন্য অংশের সাথে সংযুক্ত। এক অংশকে বাদ দিয়ে আরেক অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। তাই যদি কোন পাঠক বইয়ের একটা অধ্যায় বা একটা অংশ অধ্যয়ন করেন তবে তা তাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। এই বইটি আগাগোড়া একই বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা। তাই বইটি এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যায়ন করার পরই কোন মত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

www.pathagar.com

উলেমা সমাজ ও ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই বইটি লিখিত হয়েছে, তাই ইসলামের আরবী পরিভাষাগুলো আরবীতেই উল্লেখ করেছি। ঐ পরিভাষার প্রথম ব্যবহারের সময় তার অনুবাদও লিখা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে অনুবাদ লিখা হয়নি। সাধারণ পাঠকদেরও এ সবের মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কোরআন ও হাদিসের আরবী ভাষ্য লিখার সাথে সাথে তার অনুবাদও লিখা হয়েছে পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে।

বইটির মধ্যে অসংখ্যবার রাসূলে পাকের নাম এসেছে, সে সব স্থানে সংক্ষিপ্ত (সঃ) লিখা হয়েছে, পাঠকবৃন্দ পুরো সালাম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (صلى الله عليه و سلم) পড়ে নেবেন। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীনে এযাম, আয়েম্মা মোজতাহেদীন, পীর মাশায়েখ ও আউলিয়া কেরামদের নাম এসেছে, তাদের নামের পর সংক্ষিপ্ত (রঃ) লিখেছি। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোথাও কোথাও হয়তো বা বিস্মৃতি হয়েছি, পাঠকগণ তাদের নামের পর 'রাদি আল্লাহু আনহু' (رضى الله عنه) বা 'রাহমাতুল্লাহি আলাইহি' (رحمة الله عليه) পড়ে নিবেন। ইচ্ছাকৃতভাবে আমি কোথাও ছেড়ে দেইনি।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন মত ও চিন্তাধারার উপর যুক্তিভিত্তিক আলোচনা হয়েছে, কোন দল বা গ্রুপের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করা হয়নি, আমার অনিচ্ছাকৃত কোন মন্তব্যে কেউ আহত বোধ করলে আমায় ক্ষমা করে দেবেন।

ইসলামী ঐক্যের প্রয়াসে বইটি একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, উলেমা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ব্যাপক প্রয়াস ঐক্যের বুনিয়াদকে মজবুত ও দৃঢ়তর করে দেবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে বইটি লিখা ও প্রকাশ করা সম্ভব হলো। দুবাইস্থ কোরআন মজলিশের সাথীদের উদ্যোগ ও আন্তরিকতা না থাকলে বইটি মুদ্রিত আকারে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হতো কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। একাজে নৈতিক ও আর্থিক সহযোগীতা তারাই প্রদান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের দরবারে দোয়া করি যেনো তিনি তাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নেন এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের উছিলা বানিয়ে দেন।

আল্লাহ্পাকের দরবারে আমি মোনাজাত করি যেন তিনি আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তার বান্দাহদের হিদায়াতের মাধ্যম করে দেন এবং পরকালে আমার নাযাতের পাথেয় করে দেন।

আমিন . . .।।

اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه – و صلىّ الله على سيدنا محمد وعلى اله و اصحابه و سلم .

দুবাই
সংযুক্ত আরব আমিরাত

আব্দুল হাই ফারুকী

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বইটি আমার পরলোকগত আব্বাজান আলহাজ্ব হযরত মওলানা এবাদতুল্লাহ ও মহরুমা আম্মাজানের পবিত্র রুহের মাগফিরাত ও আখেরাতের জীবনের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে উৎসর্গকৃত।

-- লেখক

www.pathagar.com

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوات والسلام على رسوله الكريم و علـــى الـــه وصحبه اجمعين .

উম্মার পরিচিতি ও প্রকৃতি

কোরআনের পরিভাষায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উম্মাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কতকগুলো মূলনীতির ভিত্তিতে যে জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদেরকে বলা হয় উম্মাহ।

মানব সমাজের উপর আল্লাহর প্রভূত্বের শৃংখল চাপিয়ে মানুষের বিচিত্র গোলামী থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আল্লাহর নবীরা প্রেরীত হয়েছেন, তারা তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। সেই ঐক্যবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে কোরআনের ভাষায় উম্মাহ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সমস্ত নবীদের অনুসারীদের সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত করা যায়। অর্থাৎ বিশ্বের আদিকাল হতে অন্তকাল পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষেরা তাওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে বা করবে তারা সবাই এই উম্মাহর সদস্য। কিন্তু যেহেতু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাবের পর পূর্বতন সকল শরীয়ত পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, তাই আজকের মুসলিম উম্মাহ বলতে আমরা শেষ নবীর অনুসারীদের বুঝবো।

আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যক্তি সত্বায়, তাঁর মিশনে ও সাফল্যে, তার উপস্থাপিত আদর্শের ব্যাপকতায় ও কার্যকারিতায় এবং তার নবুয়তি জীবনের সকল দিক ও বিভাগে সর্বশ্রেষ্ট, তাই তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন। পক্ষান্তরে তিনি মানবিতিহাসের সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তার উপস্থাপিত দ্বীন ও শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তাই তাঁর অনুসারীগণ বা আজকের মুসলিম উম্মাহ মর্যাদায় ও দায়ীত্বে শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ। এই শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ হলো মূলনীতি ভিত্তিক ঐক্যের শ্রেষ্ঠত্ব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে জাতি বলা হয়, উম্মাহ তার সমার্থক নয়। ভাষা, সংস্কৃতি ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে একটা জাতি গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে সুনির্দ্দিষ্ট মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা উম্মাহর প্লাট ফরমে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ও অসংখ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা বা তথাকথিত অভিন্ন স্বার্থের টানা-পোড়নে ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী অভিন্ন আদর্শে একাকার হয়ে যায়।

অনেকগুলো ইউনিটের সমন্বয়ে সমষ্টি গঠিত। ইউনিটগুলোর শুধু সংখ্যাধিক্যে নয় বরং সতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ইউনিটের গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্বেই শ্রেষ্ঠতর সমষ্টি গড়ে উঠে। যেমনি মূলনীতি ভিত্তিক ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধন ছাড়া সতন্ত্রভাবে ইউনিটগুলো কোন সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে না, যদিও

www.pathagar.com

তারা সতন্ত্রভাবে গুণগত মানদন্ডে উন্নত হয়। তেমনি গুণগত মানদন্ডে অনুন্নত ইউনিট গুলোর ঐক্যবদ্ধ সমষ্টি কাংখিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংখ্যার স্বল্পতা ও গুণগত মানের শ্রেষ্ঠত্বে মহীয়ান হয়ে যায়। কিন্তু গুণগত মানের অবনতির কোন বিকল্প নেই। তাই ব্যক্তির মানেই সমষ্টির মানোন্নয়ন। সামষ্টিক মূল্যবোধের নিরিখেই ব্যক্তিমান উন্নত হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির এই সমন্বিত উন্নয়নই হলো ইসলামী ঐক্যের ফসল। কোরআনে এই সমন্বিত চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মুসলিম উম্মাহর বিন্যাসে।

আরবের শতধাবিচ্ছিন্ন বেদুঈন সমাজে যখন নুন্যতম মানবীয় মূল্যবোধও চরমভাবে পদদলিত ছিলো। ব্যক্তি চরিত্রের চরম অবনতি ঘটেছিলো। ঐক্যবদ্ধ মানবীয় মূল্যবোধের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যেত না। তখন আল্লাহর নবী সমাজের ঐ সমস্ত লোকদের নিয়েই গড়ে তুলেছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ। মূলনীতির প্রতি অটল বিশ্বাসে, ব্যক্তি চরিত্রের চরম বিকাশে, পারস্পারিক আস্থা প্রতিষ্ঠা করে পারস্পারিক সহানুভূতি ও সহযোগীতায়, আত্মসম্মান ও ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামষ্টিক স্বার্থের লক্ষ্যে ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জনের অনুভূতি সৃষ্টিতে, কাংখিত মানবীয় গুণাবলীর চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধনে তথা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে মানবেতিহাসের চরম ও পরম গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়।

ইতিহাসের অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চৌদ্দশত বছর পরেও ইসলামী ঐক্যের মূলনীতি অবিকৃত রয়েছে। মহানবীর শিক্ষাভান্ডার ফলে-ফুলে বিকশিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর পথ নির্দেশে ভাস্কর হয়ে আছে। কিন্তু আজকের মুসলিম উম্মার বাস্তব অবস্থা ভিন্ন রূপই তুলে ধরে।

আজ সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর সদস্য সংখ্যা ১৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। পাক-বাংলা-ভারতীয় উপমহাদেশেই মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি। এই বিপুল সংখ্যা উম্মাহর শক্তিতে সহায়ক হতে পারছে না। এর মূল কারণ হলো পরম কাংখিত ঐক্যের অভাব। আকিদা-বিশ্বাসে ও কর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তারা বিভিন্ন দলে ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে। এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে, রাসুলের রিসালতে ও আখিরাতের বিশ্বাস ও এক কাবাকে কিবলাহ মানার ঐক্য থাকা সত্বেও মুসলিম উম্মাহ শতধাবিচ্ছিন্ন। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত। দলাদলী, সংঘর্ষ, মারামারি, কুৎসা, ফতোয়াবাজী ও দলীয় কোন্দল মুসলিম মানসে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই বিভেদের বিষক্রিয়া হিসেবে অনেকে ইসলামী অনুশাসন থেকে দূরে সরে গেছেন, আবার অনেকে এই বিভেদের ব্যাপকতায় হতাশ হয়ে বিভেদকেই চরম বাস্তবতা বলে মেনে নিয়ে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পন করেছেন। এ'দুটোই নেতিবাচক চিন্তা ও মূলতঃ সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অভাবেরই ফসল।

www.pathagar.com

বিভেদ একটা বাস্তবতা - ঐক্য অপরিহার্য।

বিভেদের স্বরূপঃ

মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধরনের বিভেদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) ইসলামের মূল আকিদা ও বিশ্বাসে বিভেদ।

এই ধরনের বিভেদ ঈমানের পরিপন্থি। যারা এই বিভেদের অপরাধে অপরাধী তারা মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(২) ইসলামের মূল আকিদার শাখা-প্রশাখায় বিভেদ। এই ধরনের বিভেদ প্রথমতঃ ঈমানের পরিপন্থি বলে মনে না হলেও পর্যায়ক্রমে মূল আকিদা ও বিশ্বাসকে দূর্বল করে ফেলে। ফলে ইসলামী ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) আকিদা-বিশ্বাসে নয়, বরং শরীয়তের প্রয়োগ পদ্ধতিতে বিভেদ। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগে কিংবা নীতিমালার প্রয়োগ পদ্ধতির স্বরূপ নির্ণয়ে বিরোধ। ফিকাহ্র বিভিন্ন মতামতও এই পর্যায়ের বিভেদ। এই মত পার্থক্য বিভেদ পর্যায়ভূক্ত নয়। এটা শুধু নির্দোষই নয় বরং কল্যাণকর ও অপরিহার্য।

(৪) আচার অনুষ্ঠান ও রসম-রেওয়াজের বিভেদ। এই বিরোধ মুলতঃ ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে সৃষ্টি হয়। ইসলামের সঠিক জ্ঞান বা কোরআন-হাদিসের জ্ঞানের সম্প্রসারণই এই ধরনের বিরোধের নিরসন করতে পারে।

(৫) ইসলামের সীমার লংঘন না করে কিছু নবতর সংযোজন, যা প্রথমতঃ আদৌ বিভেদ মুলক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে জাহেল ও স্বার্থপর লোকদের দ্বারা বিভেদের রূপ ধারণ করেছে।

এই বিরোধ নিরসনে সংস্কার মুলক সাহসিক আন্দোলন অপরিহার্য।

মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই শ্রেনীবিন্যাসের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাস ও উপরোক্ত শ্রেনীবিন্যাসের বিস্তারিত আলোচনা পরিবর্তী পর্যায়ে আসবে।

বিভেদের অবকাশ ও আল্লাহর হিকমত।

ইসলামের সঠিক পথ নির্ধারণে বিভেদের অবকাশ রয়েছে নিঃসন্দেহে। যদি আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করতেন তবে সমস্ত মানব সমাজকে ইসলামী জীবন যাপনে বাধ্য করতে পারতেন, সে অবস্থায় পৃথিবীতে কেবল আল্লাহরই বন্দেগী থাকতো।

www.pathagar.com

যেমন, প্রকৃতির অপরাপর সৃষ্টিকূল স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই আল্লাহর আইন মেনে চলে।
কোরআনে যেমন এরশাদ হয়েছে:-

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الآ له الخلق والامر تبـــارك الله رب العلمـــين – (اعراف)

(চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাজী আল্লাহর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত, তিনি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নির্দেশও অবশ্য পালনীয়, বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভূরই সব অনুগ্রহ।)

و له من فى السموات والارض كل له قانتون –(البقرة)

(আসমান ও যমিনের সব কিছুর মালিকানা তারই, সবকিছুই তার কাছে অবনত।)

و لوشاء الله لـــهدا كم أجمعين – (النحل ٩)

(যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দিতেন)

অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহর এই সৃষ্টি স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তার নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারো নেই।

হযরত আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহর ফিরিস্তারাও এই কথাই বলেছিলেন, কিন্তু বনী-আদম সম্পর্কে ফিরিস্তাদের ধারণা খন্ডন করে আল্লাহ বলেছিলেন, আমি যা চাই, তোমরা তা জানো না। আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানুষকেই হক ও বাতিলের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে, তাদেরকেই জীবন পথ নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ এ'ভাবে মানুষের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চান;

انا هديناه السبيل اما شاكرا و امّا كفورا – (الدهر)

(আমি তাদের পথ নির্দেশ করেছি, অতঃপর (তাদের স্বাধীনতা রয়েছে) তারা হিদায়াতের পথ গ্রহন করবে বা কুফুরির পথ বেছে নেবে)

তাদের এই স্বাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের উপরই তাদেব বিচার করা হবে। কাজের স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের বিচার করা আল্লাহর নিকট ইনসাফের পরিপন্থি।

و على الله قصد السبيل و منها جائر – (النحل ٩)

(আল্লাহ সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন, (পক্ষান্তরে) আবার অনেক বক্র পথও রয়েছে)

এই সোজা পথ প্রাপ্তি মানুষের সুকৃতি ও আল্লাহর অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির জন্যে কোরআনে মজিদে দোয়া ও শিখিয়েছেন সুরা ফাতিহায়।

إهدنا الصراط المستقيم – (الفاتحة)

(হে আল্লাহ, আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করুন)

www.pathagar.com

সুরা হুদের নিচের আয়াতে বিষয় বস্তুকে আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছে;

و لوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و لايزالون مختلفين – الاّ من رحم ربك لذلك خلقهم – (هود)

(যদি তোমাদের রব ইচ্ছা করতেন, তবে সমস্ত মানব সন্তানকে এক অখন্ডিত উম্মাহয় পরিণত করতেন। (কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়, তাই) তোমরা বিভেদে লিপ্ত থাকবে। (অর্থাৎ তোমাদের স্বাধীন চিন্তার ফয়সালা এই বিভেদের কারণ হবে। এই বিভেদের বিষফল থেকে বেঁচে থাকবে তারাই) যারা তাদের কর্ম প্রচেষ্টায় আল্লাহর অনুগ্রহের যোগ্য হবে। (অতঃপর মানব গোষ্ঠীকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করে বিভেদের অবকাশ রেখেই) তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামে বিভেদের অবকাশ রয়েছে। এই অবকাশ কোন বৈধতার সনদ নয়, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের ঈমানী শক্তির পরীক্ষা করেন। আল্লাহর কাছে মানুষের ঐক্যই কাম্য। অবাঞ্ছিত বিভেদে না গিয়ে ঐক্যের পথে সমবেত হতে আদম সন্তানদের প্রতি কোরআনে মজিদ ও নবী মোস্তফা (সঃ) উদ্দত আহবান জানিয়েছেন এবং বিভেদের পথ থেকে সরে থাকার জন্য সর্তক করে দিয়েছেন বার বার।

ঐক্যের অপরিহার্যতা

কোরআন মজিদে বার বার ঐক্যের প্রতি আহবান জানান হয়েছে, বিভেদের বিষাক্ত ছোবল থেকে বাঁচার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ঐক্যের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তোষ লাভ হয়। আর বিভেদে তার অভিসম্পাত আসে। আল্লাহর নবী (সঃ) বিভিন্নভাবে মূসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন ও বিভেদের পথ পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নিচে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হলো;

কোরআনে এরশাদ হয়েছে;

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاّ و انتم مسلمون ، و اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا و اذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا و كنتم على شفاحفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم أيته لعلكم تهتدون – (آل عمران ١٠٢)

(হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাকে ভয় করা উচিৎ, তোমরা মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই মূসলমান হয়ে যাও। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। অতঃপর বিভেদে লিপ্ত হয়ো না। আল্লাহর ঐ অনুগ্রহের

www.pathagar.com

কথা স্বরন করো যা তোমাদের উপর অবতরণ করেছেন। যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। তিনিই তোমাদের অন্তরের মিলন ঘটালেন এবং তারই অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে- তোমরা আগুনে ভরা একটা কুন্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহই তোমাদের নিস্কৃতি দিলেন। এভাবেই আল্লাহই তোমাদের সামনে তার নিদর্শন সমুহ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন যেনো তোমরা সত্যের পথ দেখতে পাও।)

এই আয়াতে আল্লাহর রজ্জু থেকে আল্লাহর দ্বীন বা কোরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন বা কোরআনের ভিত্তিতেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

و لتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكـــر و أولئـــك هـــم المفلحون ، و لاتكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينت و أولئك لهم عذاب عظيم • (آل عمران)

(তোমাদের মাঝে এমন একটা দল অবশ্যই থাকতে হবে। যারা ভাল কাজের প্রতি আহবান করবে, কল্যাণময় কাজের নির্দেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তারাই সাফল্য লাভ করবে, এবং তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের মতো হয়োনা যারা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তির পর ও বিভেদে লিপ্ত হয়েছে, তারা কঠিন শাস্তি পাবে।)

وان طائفتان من المومنين إقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا الـــتى تبغى حتى تفئ الى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقســطين – (الحجرات ٩)

(যদি মুমিনদের দুইটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে একদল অপর দলের প্রতি বাড়াবাড়ি করে তবে সীমা লংঘনকারীদের সাথে লড়াই করো, যেনো তারা আল্লাহর হুকুমের প্রতি ফিরে আসে, অতঃপর যখন তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসবে, তখন তাদের মাঝে সমঝোতা করে দাও ইনসাফের ভিত্তিতে। তোমরা ইনসাফ করবে। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন)

إن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله – (الانعام)

(এটাই আমার সোজা পথ, তোমরা এরই অনুসরণ করো। ঐ সমস্ত পথের অনুসরণ করো না যা তোমাদেরকে সোজা পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে)

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتـــاب بـــالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه – (البقرة)

www.pathagar.com

(প্রথমতঃ মানব সমাজ অভিন্ন গোষ্ঠি ছিলো, অতঃপর আল্লাহ পাক অনেক নবী ও ভীতি প্রদর্শনকারী পাঠালেন। তাদের উপর কিতাব নাযিল করলেন সত্য আদর্শের সাথে, এরই সাহায্যে নবী-রাসুলগণ মানুষের মধ্যে তাদের বিভেদ সম্পর্কে (ঐক্যের পথে) ফয়সালা দিলেন)

و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم - (الانفال)

(তোমরা পরস্পরে কলহে লিপ্ত হয়ো না। তাতে তোমরা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি-সমর্থ চলে যাবে (অযথা অপব্যয় হবে)

شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا و الذي اوحينا اليك وما وصينابه ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين و لاتتفرقوا فيه (الشوري)

তোমাদের জন্য তিনি ঐ দ্বীন নির্ধারণ করেছেন যা নূহের উপর আরোপিত হ'য়েছে। তিনি তোমার উপর তাই নাযিল করেছেন এবং এই দ্বীন সম্পর্কেই তিনি ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করবে, তার মধ্যে বিভেদ করবে না)

ولقد أتينا موسى الكتب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم، وإنهم لفى شك منه مريب- (هود ١١٠)

(আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি, তার কিতাবে বিভেদ করা হয়েছে, যদি আল্লাহ পাক পূর্বসিদ্ধান্ত না নিতেন তবে তাদের ব্যাপারে কবেই ফয়সালা হ'য়ে যেতো, কিন্তু তারা ঐ কিতাব সম্পর্কে সন্দিহান)

ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فى شئى - (الانعام)

(যারা তাদের দ্বীন নিয়ে বিভেদ করেছে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলো, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই)

من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون - (الروم)

(যারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে বিভেদ করেছে, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিলো। প্রত্যেক দলই তাদের স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই মত্ত)

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم و ان تنازعتم فى شئى فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و أحسن تأويلا - (النساء)

(হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। রাসুলের আনুগত্য করো ও (আল্লাহ ও রাসুলেব অনুগত) নেতৃত্বের আনুগত্য করো। যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে পড়ো তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যদি তোমরা

www.pathagar.com

সত্যি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিনামের দিক দিয়ে ভাল)

فبعث الله النبين مبشرين و منذرين ...... فهد الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه – (البقرة)

(আল্লাহপাক নবীগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছেন, যারা ঈমান নিয়েছে তাদেরকে তারই নির্দেশে বিভেদের বিষয়ে সত্যের পথে হিদায়াত দান করেছেন)

تعاونوا على البر و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان – (المائدة)

(তোমরা আল্লাহ ভীতি ও সৎকাজের ব্যাপারে পরস্পরে সহযোগিতা করো, গোনাহ ও শত্রুতার পথে সহায়তা করো না)

ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ،فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بمالديهم فرحون – (المومنون)

(তোমাদের এই উম্মাহ একই উম্মাহ (অবিভক্ত মানব গোষ্ঠী) আমি তোমাদের রব, আমাকে ভয় করো (কিন্তু তারা) তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সব দলই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই উল্লসিত)

و المومنون و المومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر – (التوبة)

(সমস্ত মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের বিশ্বস্ত বন্ধু, তারা কল্যাণ ধর্মী কাজে নির্দেশ দান করে ও গর্হিত কাজে নিষেধ করে)

لاكراه فى الدين قدتبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت و يومن بالله فقداستمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها و الله سميع عليم – (البقرة)

(দ্বীনের ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা নেই। সত্য বিভ্রান্তির মধ্য থেকে ভাস্কর হয়ে গেছে, যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তারা এমন একটি শক্তিশালী অবলম্বন আকড়ে ধরবে যা কখন ও ছিড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সবই জানেন ও শুনেন)

এই শক্তিশালী অবলম্বন হ'লো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের উৎস।

www.pathagar.com

হাদিসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

قال النبي صلىّ الله عليه و سلم " المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه - (البخارى)

মুমিন (সমষ্টিগতভাবে) একটা ইমারতের মত, যার একাংশ অপর অংশের সাথে মিলে আছে, অতঃপর আল্লাহর নবী তাঁর আঙ্গুলগুলো পরস্পরে মিলিত করলেন।

অর্থাৎ পরস্পরে আঙ্গুলগুলো যেমন মিলেমিশে আছে, তেমনি মুমিনরাও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ্। এটাই মুমিনের আসল পরিচয়।

ترى المومنين فى تراحمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى- (البخارى)

(তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পারিক সহানুভূতিতে, সম্প্রীতিতে ও ভালবাসায় এক দেহবৎ দেখতে পাবে। যদি একটা অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ হ'য়ে পড়ে তবে অপরাপর অঙ্গ-প্রতঙ্গও বিনিদ্রায়, জ্বরে উক্ত অঙ্গের সাথে সমমর্মিতা প্রকাশ করে)

المسلم اخوالمسلم لايخوفه ولايكذبه و لايخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه و ماله و دمه – التقوى ههنا – يحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم – (ترمذى)

(একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই, তাকে ভীতি প্রদর্শন করবেনা, না মিথ্যা বলবে, না তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। একজন মুসলমানের সম্মান, ধনসম্পদ-জীবন সবই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। আল্লাহর ভয় এখানে অবস্থিত (অন্তরে অবস্থিত) একজন মানুষের জন্য মন্দ হবার এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে সে তার ভাইকে অপমানিত করে)

اذاهم أحسنوا فاحسن معهم و ان هم أساؤ فاجتنب اساءهم

(যদি তারা সৎ-ব্যবহার করে তবে তাদের সাথে সৎ-ভাব রাখো, আর যদি ক্ষতি করে তবে তাদের দুর্ব্যবহার থেকে সরে থাকো।)

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য তথা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নে কোরআনে মজিদের অসংখ্য আয়াতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরে যে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরেছি তাতে এর একটা নমুনা ফুটে উঠেছে। তেমনি আল্লাহর নবী (সাঃ) অসংখ্য হাদীসে এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। উপরিল্লিখিত হাদীসগুলো তারই একটা চিত্র তুলে ধরেছে মাত্র। এই সব আয়াত ও হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যই আল্লাহর একান্ত কাম্য। অপরিহার্য মত পার্থক্য ও বাস্তব বিভেদের মাঝেও এই ঐক্যের বন্ধন শিথিল করা যাবে না। প্রতিটি মুসলমানকে এই সম্পর্কের কথা সদা স্মরণ রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেও মুসলমানদের এই হক হরণ করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যাদেরকে

www.pathagar.com

আমরা মূসলিম উম্মাহর সদস্য বলে জানি, তাদের সাথে কোন বিরোধে ও বিভেদেও এই কথা গুলো সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। সাধারনভাবে প্রতিটি মুসলমানকে আল্লাহ যে ভ্রাতৃত্বের হক দিয়েছেন, তা আমরা মুলতঃ মেনে নিলেও এর বাস্তবায়ন নিজস্ব দল বা ফিরকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে সাধারনভাবে সকল মূসলমানদেরকে মুসলিম বলে মেনে নিলে ও ভ্রাতৃত্বের অধিকার দিতে রাজী নই। এই দৃষ্টিভঙ্গি মিল্লাতের ঐক্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূসলিম উম্মাহর বিভেদের স্বরূপ

স্থান-কাল, বর্ণ, গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষ এই আদর্শের অনুসারী। সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসের বিবর্তনে, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই দ্বীন আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। ইতিহাসে প্রতিটি অধ্যায়ে সকল স্তরের অনুসারীরা তাদের চিন্তা, মেধা ও বুদ্ধির সাহায্যে এই আদর্শকে বুঝবার ও বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এ আদর্শ কোন সীমিত আদর্শ নয়। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য এক বিপ্লবাত্মক সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা। বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর জনিত সমস্যাও একটি বাস্তবতা।

যারা এই জটিল বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন তারা মুসলিম উম্মাহর বিভেদের ইতিহাসে ভীত হয়ে পড়েন এবং এই বিরোধকে অনিরাময়যোগ্য রোগ বলে মেনে নিয়ে ইতিহাসের সামগ্রিক বিভেদকে নিতান্ত বাস্তবতা বলে মেনে নেন এবং অসহায়ভাবে আত্মসমর্পন করেন। কিন্তু বিভেদের এই ইতিহাসে ভীত হয়ে আত্মসমর্পনের পথ কোরআন ও হাদিসের প্রদত্ত দায়ীত্ব থেকে এড়িয়ে চলারই পথ। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে যে সমস্ত বিভেদ ও অবৈধ বিরোধের উদ্ভব হয়েছে তা প্রধানতঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সে সমস্ত কারণে আমাদের পূর্বের ঐ দুই উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলির উৎপত্তি হয়, আমাদের উম্মতের মধ্যে সেই রোগ সমুহ নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুকরণের ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ) বার বার সাবধান করে দিয়েছেন।

বোখারী শরীফের হাদিসে বলা হয়েছে,

قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا فى جحر ضب لاتبعتموه و قلنا يا رسول الله اليهود و النصارى قال لمن ؟

(আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের পূর্বতন উম্মতদের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে- প্রতি পদক্ষেপে- প্রতি বিষয়ে। এমন কি তারা যদি (পূর্বতন লোকেরা) কোন গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করেছে, তবে তোমরা তারও অনুকরণ করবে (অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিটি কর্মের অন্ধ

www.pathagar.com

অনুকরণ করবে) অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, পূর্বতন লোকদের অর্থ কি- ইহুদী ও খৃষ্টান সমাজ? আল্লাহর নবী জবাবে বললেন, তারা ছাড়া আর কারা?)

আল্লাহর নবী যত বেশী সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, সাহাবায়ে কেরামদের পরবর্তীযুগে উম্মতে মুহম্মদীর অনুসারীরা ততো বেশী ঐ সর্বনাশা অনুকরণে লিপ্ত হয়েছে এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতেও কোন্দল করতে নিরস্ত হয়নি। এই ধারা আজ ও অব্যাহত রয়েছে।

তিরমিজির হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تفرقت اليهود علـــــى احدى و سبعين و اثنين و سبعين فرقة و النصارى مثل ذلك وتفرق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة و فى رواية أخرى كلها فى النار الا واحدة ما انا عليه و اصحابى – الجماعة – الســواد الأعظم – (الترمذى)

(হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন। ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো, খৃষ্টানদের অবস্থাও অনুরূপ ছিলো, এবং আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এসব ফিরকা সমুহের মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামী হবে (ঐ একটি দলের পরিচিতি দিতে গিয়ে বললেন) তারা ঐ পথে চলবে যে পথে আমি ও আমার সাহাবারা চলেছি। তারা হলো নাজাতপ্রাপ্ত দল- মহান দল।)

এই হাদিসের রেওয়ায়েতের মান সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সে সব চুল চেরা আলোচনায় না গিয়ে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই রেওয়ায়েতটিকে হাদিসে রাসুল হিসেবে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ইমাম তিরমিজির মত ব্যক্তি চারজন বিশিষ্ট সাহাবীদের রেওয়ায়েতে হাদিসটি সংকলন করেছেন। হাদিসের কিতাব সমুহে এই হাদিসটির বর্ণনায় আরো ১১ জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। সর্বোপরি কোন মোহাদ্দিসই হাদিসটিকে বানানো হাদীস বলে উল্লেখ করেন নি। রেওয়াতের মানদন্ডের ভিত্তিতে কোন হাদিসের মৌলিকত্বকে ৬অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে উপরের বোখারী শরীফের হাদিসটির উপস্থিতিতে এই হাদিসটি তারই পরিপূরক বলে প্রতীয়মান হয়। ৭১, ৭২ বা ৭৩ সংখ্যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে বেশী, কিন্তু ইহুদী বা খৃষ্টানদের মধ্যে ৭১ বা ৭২ ফিরকার সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কথা এতে বুঝানো হয়নি। তেমনি উম্মতে মুহম্মদীর মধ্যে ও পথভ্রষ্ট লোকদের ফেরকার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা এর অর্থ নয়। কোরআন ও হাদিসে সংখ্যা বর্ণনা সম্পর্কে যে রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার আলোকে হাদিসটির মর্ম হলো; আল্লাহর নবী তার উম্মতকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ সম্পর্কে সর্তক করতে গিয়ে বলেছেন যে নবীদের শিক্ষাকে অবিকৃতভাবে অনুসরণ না

www.pathagar.com

করার ফলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যত দল ও উপদলের উদ্ভব হয়েছিল, এই উম্মতের মধ্যে তাদের চেয়েও বেশী দল বা উপদলের উৎপত্তি হবে। হাদীসের শেষাংশের মর্ম সামনে রাখলে এই সতর্কবাণীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ হক পন্থি দল একটি, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত। কোরআনের আয়াতে যাদেরকে (امــة واحــدة) (অভিন্ন জনগোষ্ঠী) ও (الامن رحم ربك) (আল্লাহর অনুগহ প্রাপ্ত দলই মাত্র) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হক পন্থি দলের পথ একটি। যাকে কোরআনের আয়াতে (صراطى مستقيما) (আমার সোজা পথ) বলা হয়েছে। যারা ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরণ করে না বা বিভেদে লিপ্ত হয় না। হাদীসের শেষ অংশে এই সিরাতূল মুস্তাকিমের ব্যাখা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নবীর ভাষায় তিনি ও তাঁর সাহাবাদের পথই সিরাতূল মুস্তাকিম। যা বিরোধের পথ রোধ করে। অসংখ্য বিভেদের মাঝে ঐক্যের রাজপথ একটিই। সেই পথের পথিকরাই নাজাত প্রাপ্ত দল। ভিন্ন পথের পথিকরা বিভেদপন্থী বা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত। কোরআনের ভাষায় (لاتتبعوا السبل) 'বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না' বলে যাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে ঐ হক পন্থী দলের বা সিরাতূল মুস্তাকিমের পূর্ণ চিত্র তূলে ধরা হয়েছে। তারা ছাড়া অপরাপর সকল দলই বা অপরাপর সকল পথই বিভ্রান্তির পথ। অন্য কথায় তারা সবাই জাহান্নামী। ঐ একটি মাত্র দলের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরাই হাদিসের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য একটি রাজপথের সঠিক চিত্র চিত্রিত হ'লে ভিন পথের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

কোরআনের উপস্থাপিত পথ একটিই, সে পথে চলতে বারে বারে ডাক দেয়া হয়েছে। কোরআনের প্রথম সুরা ফাতেহায় ও আমাদেরকে দোয়া শেখানো হয়েছে ঐ এক পথে চলার জন্যে।

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم و لاالضالين –

(হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল ও সোজা পথ প্রদর্শন করুন। যে পথে আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকেরা চলেছে, ঐ বক্রপথে নয় যে পথে অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত লোকেরা চলেছে।)

অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত পথ বলতে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে। ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের অনুসরণ যুগে যুগে বিচিত্র রূপে ভিন পথে মোহ সৃষ্টি করেছে। কোথাও ধর্মের মোহ সৃষ্টি করে কোরআনের উপস্থাপিত সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। আবার কোথাও আধুনিকতা ও যুগের চাহিদার নামে উম্মতে মুহম্মদীকে দ্বীনের আনুগত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের অনুসরণ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিচিত্র। ইসলামী ইতিহাসের

www.pathagar.com

ব্যাপকতর বিভেদের ইতিহাসের সুক্ষ বিশ্লেষণ এই সত্যকেই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

অনুকরণের বিচিত্র রূপরেখা হৃদয়ংগম করানোর নিমিত্তে আল্লাহতায়ালা কোরআনে মজিদে আগের উম্মতদের ইতিহাস কাহিনী আকারে উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র কাহিনী হিসাবে পড়ার জন্য এসব ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি, বরং ঐ সব কাহিনীর মাধ্যমে আগের উম্মতদের মধ্যে সে সমস্ত রোগ সৃষ্টি হয়েছিল বা যে সমস্ত কারণে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছিলো সেগুলো ভাল করে বুঝে নেবার জন্যেই এ সবের অবতারণা। উদ্দেশ্য হ'লো ঐ সব রোগ বা কারণগুলো থেকে সরে থাকার সতর্কবাণী।

কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون – (الاعراف)

(পূর্বতন (উম্মতদের) কাহিনী সমুহ বর্ণনা করো যেনো তারা চিন্তার খোরাক পায়)

إن فى ذلك لأية لقوم يتفكرون – (النحل)

(এ সব কাহিনীতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে)

إن فى ذلك لأية لقوم يعقلون – (النحل)

(এ সব কাহিনীতে বুদ্ধিমান জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে)

كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون – (الروم)

(এ ভাবেই আমি বুদ্ধিমান জাতির জন্যে নিদর্শন সমুহ সবিস্তারে বর্ণনা করি)

قل هل يستوى الاعمى و البصير افلا تتفكرون – (الانعام)

(বলো, দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ও অন্ধব্যক্তি কি সমপর্যায়ের, তারা কি চিন্তা করে দেখবে না?)

এমন ধরণের আয়াতসমুহে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মিল্লাতকে চিন্তার পথে ডাক দিয়েছেন।

কোরআনে মজিদে পূর্বতন উম্মতদের মধ্যে ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলদের ইতিহাস যতো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অন্যান্য উম্মতদের ব্যাপারে ততো বেশী বলা হয়নি, কেননা, অনুকরণের সর্বনাশা প্রতিযোগিতায় এদের ইতিহাসই আমাদের উম্মতদের মূল চারন ক্ষেত্র।

কোরআনে এরসাদ হয়েছে।

قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا – (البقرة)

(তারা দাবী করে বলতো যদি তোমরা ইহুদী বা খৃষ্টানদের আদর্শ গ্রহণ করো তবেই সঠিক পথের দিশা পাবে। তুমি তাদেরকে বলো, (তোমাদের দাবী ঠিক নয়) বরং ইব্রাহিমের মিল্লাতই সঠিক)

www.pathagar.com

ما كان ابراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما - (ال عمران)

(ইব্রাহিম ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সঠিক মুসলমান)

হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ইসা (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর বংশধর ও পরবর্তী যুগের নবী। তাদের উপর যে কিতাব- তাওরাত বা ইনজিল নাজিল হয়েছিলো, তাতে তাদের উম্মতকে মুসলিম উম্মত বলেই চিত্রিত করা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাদের মিল্লাতের নাম পালটিয়ে নেয়। ইহুদীরা তাদের নাম ইহুদী বা ইসরাইলী করে ফেলে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা তাদের নাম মসিহি বা নাসারা করে ফেলে। ইসলামী মিল্লাতের ঐক্য হযরত ইব্রাহিম (আঃ) থেকে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ইসা (আঃ) তথা হযরত ইসমাইল (আঃ) ও আমাদের নবী পর্যন্ত একই সুত্রে গ্রথিত। এই ঐক্য অভিন্ন জীবনাদর্শের দিক নির্দেশ করে। ইহুদী বা নাসারাবাদ হলো বিভেদ ও বিরোধের পথ, যা মুসলিম ঐক্যের পরিপন্থি। এই বিরোধের ইতি করে ইসলামী ঐক্যের প্রতিষ্ঠাই হ'লো কোরআন ও হাদিসের লক্ষ্য।

ঐক্যের পথে আসল বিপদ,

কোরআন মজিদে এরসাদ হয়েছে,

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون - (المائده)

(আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে নিরাশ হ'য়ে পড়েছে, অতঃপর তাদের ভয়ে ভীত হয়ো না। এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করো।)

এই আয়াত ১০ম হিজরীর বিদায় হজ্বের পর নাযিল হয়েছে। এর মূল কথা হ'লো, ইসলামের বিজয়ের পর কাফিরদের সামরিক শক্তির চরম পরাজয় হয়ে গেছে। তাদেরকে ভয় করার কোন কারণ নেই, তারা আর সামরিক ভাবে তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না। তবে তোমাদের ঐক্যের পথে আসল বিপদ হলো, তোমাদের চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি। কোরআনের আয়াতে (একমাত্র আমাকেই ভয় করো) শব্দের দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে। একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তোমাদের পরিশুদ্ধির রক্ষাকবজ। ইসলামী চিন্তাধারার পরিশুদ্ধিই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সাফল্যের রক্ষা কবজ। অন্য ভাষায় বলতে হয় যে বাইরের সামরিক শক্তির ভয় আসল বিপদ নয়, বরং আসল বিপদ হ'লো ইসলামী আকিদার বিকৃতি।

হাদিস শরীফেও একই কথা বলা হয়েছে,

و ان الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب

(শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে আরব উপদ্বীপে আবার তার উপাসনা করা হবে)

www.pathagar.com

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, আরব উপদ্বীপ থেকে পৌত্তলিকতার বিলোপ ঘটেছে। তাদের তরফ থেকে আর কোন ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানদের তরফ থেকে ভয়ের কারণ বিদ্যমান ছিলো ও আছে। রাজনৈতিক সংকটের চাইতে সাংস্কৃতিক সংকটের পথই বেশী বিপদের কারণ। রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী তার জীবনের শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন এভাবে;

اخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب

(ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিস্কার করে দাও)

রাসূলেপাকের তিরোধানের পূর্বে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যে সর্বশেষ কথাটি উচ্চারিত হয়েছিলো, তা হলো;

قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد لايبقى دينان على أرض العرب –

(আল্লাহ্পাক ইহুদী ও খৃষ্টানদের সর্বনাশ করুন, তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে (অর্থাৎ নবীকে তারা উপাস্যের স্থানে সমাসীন করেছে) আরব ভূখন্ডে দুইটি দ্বীনের অবস্থান থাকবে না।)

উপরোল্লিখিত কয়েকটি হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় আরবের ভূখন্ড থেকে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটলেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের চিন্তাধারার আগ্রাসন সংকট উম্মতে মুহম্মদীর ঐক্যের পথে বিরাট বাধা হয়ে বিদ্যমান। এ জন্যেই রাসুলুল্লাহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইসলামী ইতিহাসের সমস্ত বিভেদ, তা অতীতের হোক বা বর্তমানের, সবই ইহুদী, খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেরই ফল, কোথাও এই আগ্রাসন সুস্পষ্ট আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে দূরে সরে থাকার জন্যেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। নিচের কয়েকটি আয়াত থেকে আরো স্পষ্টতর হ'য়ে যায় যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিকতার ও নির্ভরশীলতার সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে না।
এরসাদ হয়েছে;

يا أيها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم ، لايألونكم خبـــالا ودوا مـــاعنتم قدبـــدت البغضاء من أفواههم وماتخفى صدورهم أكبر، قدبينا لكـــم الأيـــت إن كنـــتم تعقلـــون –
(ال عمران – ١١٨)

(হে ঈমানদার লোকেরা, মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে নির্ভরযোগ্য সাথী বানাবে না, তারা তোমাদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপূর্ণ বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে উঠেছে। আর যা তাদের মনের

www.pathagar.com

মধ্যে লুকায়িত তা আরো জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে তুলে ধরেছি- যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।)

لايتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من الله فى شئ الا ان تتقوا منهم تقة ويحذركم الله نفسه و الى الله المصير – (ال عمران ٢٨)

(ঈমানদার লোকেরা যেনো কাফিরদের বন্ধু না বানায় মুসলমানদের ব্যতিরেকে, যারা এমনটি করে তাদের আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে যদি তোমরা তাদের কোন অনিষ্টের আশংকা করো, তবে সাবধানতার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আল্লাহ তার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তোমাদের সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।)

يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا – (النساء – ١٤٣)

(হে ঈমানদারগণ তোমরা মুমিন ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু বানিও না, তোমরা কি এমনটি করে তোমাদের নিজেদের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলিল কায়েম করবে?)

يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لايهدى القوم الظالمين– (المائدة ٥٠)

(হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরে বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না)

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولياء و اتقوا الله ان كنتم مومنين – (المائدة ٥٦)

(হে ঈমানদারগণ, যারা তোমাদের দ্বীন নিয়ে উপহাস ও খেলা করে, তারা তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও কাফিরদের মধ্য থেকে হবে। আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও।)

উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহে ও হাদিসে রাসুলে কয়েকটি বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট রায় পাওয়া যায়, তা হলো,

(১) আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বহিষ্কার করা হয়েছে রাসুলের নির্দেশে, তাই ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্য ঐ এলাকায় প্রবেশ চিরদিনের জন্য নিষেধ। কোন অবস্থাতেই তাদের প্রবেশাধিকার ও অবস্থান বৈধ হতে পারে না।

(২) ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের উপর আস্থা স্থাপন করে তাদের তরফ থেকে কল্যাণ কামনা করা অবৈধ। অন্য কথায় তারা কখনও মুমিনদের বন্ধু হতে পারে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা বন্ধু

www.pathagar.com

বলে মনে হলেও তারা হলো আসল শত্রু। ইসলামী ইতিহাসের যে কোন পাঠক এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য।

(৩) মুসলমানদের পারস্পরিক কোন্দলে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যস্থতা গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে ইহুদী ও খৃষ্টান শক্তি বলতে গোটা পাশ্চাত্য জগতই বুঝায়। তাদের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিকভাবে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা নিষেধ।

(৪) দেশ, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে সকল কাফিরদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। ইসলাম বিরোধী শিবির, তারা ইহুদী, খৃষ্টানই হোক কিংবা সাধারন কাফির সবাই একে অপরের বন্ধু ও সাধারনভাবে মুসলমানদের শত্রু। তাদের শত্রুতার রোষানলে পড়ার জন্য শুধুমাত্র মুসলমান নামই যথেষ্ট, তারা আকিদা ও আমলের দিক দিয়ে সত্যিকারভাবে মুসলিম হোক বা না হোক।

(৫) তাদের তরফ থেকে অনিষ্ঠতার সম্ভাবনা থাকলে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। বর্তমান বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সার্বিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করতে হবে। সহ অবস্থানের স্বার্থে পারস্পরিক সম্পর্ক, বৈষয়িক, ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা, শান্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি, মৈত্রী ও সম্পর্ক ও এই কষ্ঠিপাথরে যাচাই করতে হবে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের পরিপন্থি ব্যক্তি স্বার্থের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক অবশ্যি পরিতাজ্য। অন্য মুসলিম ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির ন্যায় সংগত অধিকারের যুপকাষ্টে কোন অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেন-দেনেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ময়দানে সহযোগিতা কোরআন নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকেই করতে হবে। এই সীমা লংঘনের ফলেই আজ ইসলামী ঐক্য অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

স্থান, ভাষা, অভিন্ন বৈষয়িক স্বার্থ ও অপরাপর পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন দেশ বা জাতির অস্বিত্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বৃহত্তর ইসলামী ঐক্যের স্বার্থে তাদের অভিন্ন স্বার্থের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

কোরআনে বর্নিত এই মূলনীতি বিস্মৃতির ফলেই ইহুদী-খৃষ্টান বা বনী ইসরাইলের অনুকরণের রোগ মহামারি রূপ ধারণ করেছে। আজ মুসলিম উম্মাহর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই রোগ সংক্রমিত। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি হিসাবে মুসলমানগণ নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে এই সর্বনাশা অনুকরণের ফলে।

www.pathagar.com

বিভেদের কারণ সমূহ

যে সমস্ত মৌলিক কারণগুলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য-বন্ধনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে- ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত সার এখানে উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে এই সব কারণগুলোই মূলতঃ আমাদের পূর্বতন দুইটি জাতির মধ্যেও বিভেদের মূল কারণ ছিলো; সেগুলো হলো;

(১) ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব।

(২) মানুষের জ্ঞান যে সব অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয়ের সমাধান করতে ব্যর্থ। সেই সব বিষয়কে গবেষনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা।

(৩) মনোবৃত্তির দাসত্ব।

(৪) রীতি-নীতির গোলামী ও অন্ধ অনুকরণ।

(৫) পারস্পারিক অনাস্থা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দাসত্ব।

(৬) চিন্তা ও কর্মের বিরোধ।

উপরিল্লিখিত মূল মূল কারণগুলোর পাশাপাশি আরো কিছু আনুসাঙ্গিক কারণ সমূহ আলোচনায় আসবে যথা সময়ে। এই সব কারণগুলোর তাত্বিক আলোচনার পর ইসলামের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের পর্যায়ক্রমিক আলোচনার মাধ্যমে বিভেদের সূত্রগুলো খুঁজে বের করার প্রয়াস পাবো।

ইসলামে জ্ঞান বা ইলমের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট

কোরআনে মজিদের সর্বপ্রথম যে আয়াতটি আমাদের প্রিয় নবীর উপর নাযিল হ'য়েছিলো, তা হলো;

إقرأ بأسم ربك الذى خلق – خلق الانسان من علق – إقرأ وربك الاكرم – الذى علّـــم بالقلم – علّم الانسان مالم يعلم – (العلق)

(পাঠ কর তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ কর, এবং তোমার রব পরম দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা তারা জানতো না)

এখানে জ্ঞান অর্জনের আহবান জানানো হয়েছে, অজানাকে জানতে উদ্ধৃত করা হয়েছে পড়া ও লিখার মাধ্যমে। হাদিসে এরসাদ হয়েছে,

اطلب العلم من المهد الى اللحد

(জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো)

من خرج فى العلم فهو فى سبيل الله

(যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়)

www.pathagar.com

من سلك طريقايلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الىا الجنة

(যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ধাবমান হয়, আল্লাহ তার জন্যে বেহেশতের পথ সুগম করে দেন)

فضل العلم على العابد كفضلي على ادناكم –

ان الله و ملئكته و اهل السموات و الارض حق النملة فى جحرها و حق الحوت ليصلــــون على معلمى الناس الخير – (الترمذى)

(আবেদের উপর আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি যেমন তোমাদের সাধারণ মানুষদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব।

নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফিরাস্তারা, আসমান, যমিনের অধিবাসীরা, পিপড়া তার গর্ত থেকেও মাছ পর্যন্ত মানুষের শিক্ষকদের প্রতি কল্যাণ কামনা করে)

এমনি ধরনের অসংখ্য আয়াতে ও হাদিসে জ্ঞানের মহিমা তুলে ধরা হয়েছে। এই ইলমের কারণেই ফিরিস্তাদের উপর হযরত আদমকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

অপর একটি হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مرّ بمجلسين فى مسجده فقال كلاهمــــا علــى الخــير و احدهما افضل من صاحبه – اما هولاء فيدعون الله و يرغبون اليه ، فان شاء اعطــــاهم وان شاء منعهم و اما هولاءفيتعلمون العلم و يعلمون الجاهل فهم أفضل و انمــــا بعثـــت معلمـــا فجلس فيهم –

(একদা আল্লাহর নবী তাঁর মসজিদে তশরিফ আনলেন, তখন মসজিদে দুইটি দল বসেছিলো, একটি দল জিকির-আযকারে লিপ্ত ছিলো, অন্য দলটি জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানদানে ব্যস্ত ছিলো। আল্লাহর নবী বললেন, দুইটি দলই ভাল কাজে লিপ্ত রয়েছে, তবে একটি দল অপর দলটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যে দলটি জিকির-আযকারে লিপ্ত, আল্লাহ মর্জি হলে তাদের প্রতিদান দেবেন। ইচ্ছা না হলে দেবেন না। পক্ষান্তরে অপর দলটি দ্বীনের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানদানে ব্যস্ত। তারা মূর্খদেরকে জ্ঞানদান করছে। তারাই শ্রেষ্ঠ। আমিও শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, অতঃপর তিনি তাদের সাথে বসে পড়লেন)

ইসলামের জ্ঞানকেই আসলে জ্ঞান বলা হয়, এ জন্যে ইসলাম পূর্বযুগ কে (ايام الجاهليــــة) মূর্খতার যুগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামে জ্ঞানার্জনকে প্রতিটি নর-নারীর উপর ফরজ করা হয়েছে। দ্বীনের ইলম ছাড়া এই দ্বীনের সত্যিকার অনুসরণ সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ইলমের সংজ্ঞা

কোরআন ও হাদিসের জ্ঞানকে ইসলামে ইল্ম বলা হয়। জাহেলিয়াতের মূল্যবোধের প্রতি গোঁড়া রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে স্বেচ্ছায় ইসলামের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকার করে নিলেই কোন ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাতের সদস্য হয়ে যায়। এমনি স্বেচ্ছাকৃত স্বীকৃতি ছাড়া গতানুগতিক ও বংশ পরম্পরায় মুসলিম বলে পরিচিত হবার কোন দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামে নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাহেলী চিন্তাধারারই ফসল। কাজেই ইসলামী জীবনাদর্শকে না বুঝে কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীকৃতির ঘোষণার কোন অর্থ হয় না। এই দিক দিয়ে ইসলাম জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার আদর্শ। কোরআন ও হাদিসের ভিত্তি ছাড়া কোন জ্ঞানের মূল্য নেই। এই ভিত্তি ছাড়া মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তার ফসলকে ইসলাম জ্ঞান বলে স্বীকার করে না। বরং তা হলো চরম মূর্খতা। ইহুদীবাদ বা খৃষ্টবাদ যার আধুনিক পরিভাষা হলো পাশ্চাত্যবাদ, যে সব চিন্তাধারাকে আধুনিক চিন্তাধারা বলে চালু করেছে, ইসলাম অনেক পূর্বেই তাকে মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করেছে। কোরআনে মজিদে ঐ জাহেলী চিন্তাধারাকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

إن هى الا حياتنا الدنيا و ما يهلكنا الا الدهر –(الجاثية ٢٤)

(জীবন তো শুধু এই জগতের (আমরা জীবিত হই ও মৃত্যু বরণ করি), মহাকাল ছাড়া আমাদের কেউ মৃত্যু দেয় না।)

এখানে প্রকৃতি (Nature) বা জড়বাদী চিন্তাধারার মূল দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। আজকের আধুনিক খোদাহীন বস্তুবাদী জীবন দর্শন মূলতঃ কোন নতুন জীবন দর্শন নয়। বরং জাহেলী যুগের ঐ প্রাচীন চিন্তাধারারই নব্য সংস্করণ। যাকে কোরআন মজিদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাহেলী চিন্তাধারা বলে আখ্যায়িত করেছে।

তাই ইসলাম যাকে জ্ঞান বলে স্বীকার করে তার একটা স্বতন্ত্র রূপ ও বৈশিষ্ট আছে। হাদিস শরিফে এরসাদ হয়েছে;

عن الحسن رضى الله عنه قال العلم علمان ، فعلم فى القلب فذاك علم نافع و علـــم علـــى اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن أدم –

হযরত হাসান বলেছেন, ইল্ম দু'ধরনের, এক ধরণের ইল্ম যা মানুষের অন্তরে অবস্থান করে যা হ'লো উপকারী ইল্ম (পৃথিবীতে হকের উপর টিকে থাকতে ও আখেরাতে কাজে আসবে) আর অপর একটি ইল্ম রয়েছে যা মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় মাত্র। এই ইল্ম বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ এই বলে পাকড়াও করা হবে যে তুমি তো বুঝতে, তুমি তো জানতে, তবু কেন হকের পথে চলোনি?

www.pathagar.com

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

عن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهـه فى الدين – (متفق عليه)

আল্লাহ্‌পাক যাকে উত্তম কিছু দান করতে চান তাকে দ্বীনকে বুঝবার ক্ষমতা দান করেন। সত্যিকার জ্ঞান শুধুমাত্র জ্ঞানের ধারকের জন্যেই নয় বরং মুসলিম উম্মাহ তথা সমগ্র মানুষের জন্য কল্যাণের উৎস। এই জ্ঞান যতদিন বিদ্যমান থাকবে হকপন্থী মানুষও পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

ইল্‌মের বৈশিষ্ট।

কোরআন ও হাদিসের সঠিক জ্ঞান, অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা ছাড়া সত্যিকার জ্ঞানার্জন হয় না। সাহাবায়ে কেরামদের যামানায় তারা কোরআনের অর্থ ও মর্ম আল্লাহর নবীর কাছেই শুনতেন। আরবী ভাষার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের তরফ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন না। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে হযরত ইবনে আব্বাসের মত আরবী ভাষার পন্ডিত ও বিশিষ্ট সাহাবীও শুধুমাত্র সুরা বাকারাহ ও আল ইমরান অধ্যয়ন করতে দীর্ঘ ৮টি বছর লাগিয়েছিলেন। অতঃপর তারেয়ী যামানায় তারা ঐ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতেন যা সাহাবাদের দ্বারা বর্ণিত। পরবর্তীকালে ইমামদের জীবনে ও আমরা একই দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই। তারাও সাহাবাদের ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিতেন, অর্থাৎ তারা সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাখ্যাকেই নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা বলে মনে করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে;

لايزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل اكابرهم فاذا اتاهم من اصاغرهم هلكوا –

যতদিন পর্যন্ত মানুষের কাছে বড় বড় উলামাদের ইল্‌ম থাকবে তারা দ্বীনের ব্যাপারে হকের উপর থাকবে। আর যখন অজ্ঞ ও নিম্নমানের (আলেম নামধারী) লোকদের তরফ থেকে ইল্‌ম আসা শুরু হবে, তখন তারা ধ্বংশ হয়ে যাবে। 'বড় বড় আলেম ও নিচুমানের লোক' কথাটি সুস্পষ্ট। সর্বযুগে ও সর্বকালের জন্যই কথাটি প্রযোজ্য। হযরত ইবনে মোবারক ও আবু উবায়দা উঁচুমানের আলেম থেকে সাহাবা ও নিচুমানের লোকের অর্থ পরবর্তীকালের আলেম বলে বুঝেছেন। নিচুমানের লোকদের তরফ থেকে ইল্‌ম আসার অর্থ হলো, সাহাবায়ে কেরামদের ইল্‌মের তুলনায় পরবর্তীযুগের উলেমাদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া। এই বিশেষ ব্যাখ্যাটিও সাধারণ অর্থের পটভূমির অন্তর্ভূক্ত।

মুহম্মদ বিন সিরিন একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। তাঁকে হজ্ব সম্পর্কে একটা মসলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেই বিষয়ে সাহাবাদের মতামতকে গ্রহণ করে মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

كرهها عمرو عثمان فان يكن علما فهما أعلم مني و ان يكن رايا فرايهما أفضل –

(হযরত উমর ও উসমান এটাকে মাকরুহ মনে করতেন, তারা যদি হাদিসের ভিত্তিতে বলে থাকেন তবে তারা আমার চাইতে বেশী জ্ঞানী, আর যদি নিজেদের চিন্তা থেকে বলে থাকেন, তবু তাদের চিন্তা আমার চিন্তার চাইতে উন্নত।)

অর্থাৎ সাহাবাদের মতামত অপরাপর জ্ঞানীদের মতামতের তুলনায় অগ্রগন্য, দ্বীনের অবিকৃত জ্ঞানের উৎস সন্ধানে সাহাবীদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেখানে সাহাবাদের মতামত অনুপস্থিত সেখানে কোরআন ও সুন্নাতভিত্তিক ফয়সালা করার হক পরবর্তি উলেমাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামী ইল্ম ও আমলের কষ্ঠিপাথর হচ্ছে রাসুলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কেরামদের ইল্ম ও আমল।

ইসলামী ইলমের দ্বিতীয় বিশিষ্ট।

ইল্ম অবশ্যি আমলের পথে উদ্বুদ্ধ করবে। আমল ছাড়া ইল্মকে ইসলামে নূরহীন ইলম বলা হয়েছে। বে আমল আলেমকে 'আলেমে সু' বা মন্দ আলেম বলা হয়েছে। সে ইলম মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে তা ইসলামের শত্রুদের উপকারে আসে। ইসলামের ইতিহাসে যত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলেও রয়েছে এই ধরনের ইলম। এই ধরনের ইলম সংখ্যাগত দিক দিয়ে অনেক বেশী কিন্তু গুণগত মানের দিক দিয়ে মূল্যহীন। এই ইলম সম্পর্কেই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে হাদিস শরীফে।

لايقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حق اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا – (متفق عليه)

(আল্লাহপাক আকস্মিকভাবে ইসলামের ইল্ম পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং একে একে সত্যিকার আলেমদের উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর যখন সত্যিকার আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন লোকেরা জাহেল লোকদেরকে আলেম বলে মেনে নেবে। তারা দ্বীনের ব্যাপারে মতামত দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে। অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে)

সঠিক ইল্মের অধিকারী ব্যক্তি গোমরাহ হতে পারে না। তার ইল্ম তাকে আমলের পথে নিয়ে আসবেই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলেম বলে মনে হলেও যারা সত্যিকার অর্থে আলেম নয়, তারাই বিভেদের উৎস।

www.pathagar.com

ইসলামী ইল্‌মের উৎস

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোরআন ও হাদিস থেকে সরাসরিভাবে অর্জিত জ্ঞানই সত্যিকার ইল্‌ম।'অন্যান্য বই পুস্তক সহায়ক শক্তি মাত্র। কিন্তু সত্যিকার শক্তি সরাসরি কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান থেকেই আসবে। এ জন্যে কোরআনের ভাষা আরবী সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমানে দখলও থাকতে হবে। আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া কোরআন হাদিসের সত্যিকার অর্থ বোঝা অনেকটা অসম্ভব। এই ভাষার জ্ঞান ছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিপুল জ্ঞান ভান্ডার নাগালের বাইরে থেকে যায়। দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হবার জন্যে ঐ সব জ্ঞান অপরিহার্য।

অর্থাৎ বস্তুগত ও মানগত দিক দিয়ে সত্যিকার আলেম হতে হবে। এই ধরনের ইলম কখনও ফিতনার উৎস হয় না। কিন্তু যখনই তার একটা বাহু হারিয়ে ফেলে, সেই ইলম উম্মাহর জন্য রহমত না হয়ে অভিশাপ ডেকে আনে।

এই কথাগুলোর অর্থ এই নয় যে ইলমের মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হলে ইসলাম বুঝবার বা আমল করার উপায় নেই। বরং আমি যা বলতে চেয়েছি তা হলো এই পর্যায়ের ইলম অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। যার সাহায্যে উম্মতে মুহম্মদী সিরাতুল মুস্তাকিমের লক্ষ্যে নির্দেশনা পাবে।

ইমাম মালেক বলেছেন;

ليس العلم بكثرة الرواية و لكنه نور يجعله الله فى القلوب –

(বেশী পরিমানে জানার নাম ইল্‌ম নয়, বরং ইল্‌ম হলো একটা নূর যা আল্লাহপাক অন্তরে সৃষ্টি করেন)

এই ইল্‌মের নিদর্শন তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন;

و لكن عليه علامة ظاهرة و هو التجافى عن دار الغرور وا لانابة الى دار الخلود –

(ইলমের প্রকাশ্য নিদর্শন এই যে সত্যিকার ইল্‌মের ধারকরা পার্থিব দুনিয়ার স্বার্থকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতের জীবনের প্রতি মনযোগী হয়ে পড়ে)

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন;

"হে উলামা সমাজ তোমরা ইল্‌মের উপর আমল করবে, তারাই সত্যিকার আলেম যারা ইল্‌ম হাসিল করার পর সেই মোতাবেক আমল করে, তার ইলম ও আমল সমন্বিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে এমন ধরনের আলেম তৈরী হবে যারা ইল্‌ম লাভ করবে, কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর বাইরের বিরোধী হবে। তাদের ইল্‌ম তাদের আমলের পরিপন্থি হবে। তারা দলবল নিয়ে জমিয়ে বসবে এবং এক অপরের উপর গর্ব করবে। এমন কি তারা তাদের সাগরেদদের মধ্যে কারো কারো প্রতি এ জন্যে নারাজ হবে যে তারা তার মাদ্রাসা

www.pathagar.com

ছেড়ে অন্যের কাছে গিয়ে ইল্‌ম হাসেল করেছে। এরাই তারা যাদের তওবা কবুল হবে না।''

হযরত সুফিয়ান সাউরী বলেছেন;

''যখন সত্যিকার ইলম আসে, তা আমলের প্রতি আহবান জানায়, যদি আমলও আসে তখন ইলম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অন্যথায় বিদায় নিয়ে যায়।'' হযরত হাসান বলেছেন, যিনি ইলমে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেন, তাকে আমলেও শ্রেষ্ঠ হতে হবে।

ইলমের সাথে আমলের এই সম্পর্ক ব্যাপকতর। ইল্‌মের সকল দিক ও বিভাগই আমলের দাবিদার। কোন কোন ইল্‌ম আমলের মধ্যে আনা ও কোন কোন ইল্‌মকে আমলের বাইরে রাখার কোন অবকাশ নেই। এ জন্যে বরেণ্য মনিষীদের জীবনে আমরা আপোষহীন চরিত্রের সন্ধান পাই। তারা ইল্‌মের দাবী অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, কিন্তু ইলমকে আমলের উর্দ্ধে রাখেননি।

মানব জীবনের কোন কোন দিক ও বিভাগের ইল্‌মকে আমলে রূপান্তরিত না করলে একাধারে দুইটা অপরাধ সংগঠিত হয়। একদিকে সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হয়। অপরদিকে ইলমের সাথে আমলের স্ববিরোধিতার অপরাধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি কোন আলেম নামাজ, রোজা বা অন্যান্য জিকির আজকার সংক্রান্ত তার ইল্‌মের হক আদায় করলেন কিন্তু মানুষের, সমাজের, রাষ্ট্রের ব্যাপকতর হক আদায়ে তৎপর না হন তবে উপরোক্ত দুইটি অপরাধের অপরাধী হবেন। সামাজিক, আর্থিক বা রাজনৈতিক ইলমকে গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবেন। সত্যিকার ইসলামী ইলম সেটাই যা সার্বিকভাবে আমলে রূপান্তরিত হয়। কোন দিকই আত্মগোপন করে থাকে না। সাহাবায়ে কেরামগণ বা পরবর্তীকালের বিশিষ্ট আলেমদের জীবনে ইল্‌মের এই বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট।

ইল্‌ম আমল, তাযকিয়া ও হিকমত

'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। আল্লাহর নবীর এই বাণীর দ্বারা তিনি ইল্‌মের উৎসে পরিণত হয়েছেন। কোরআনে মজিদে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে তার ভূমিকাকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ربنا و ابعث فيهم رسولامنهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم - (البقرة ١٢٨)

(হে রব, তাদের মধ্যে এমন একজন রাসুল পাঠান যিনি তাদের উপর আপনার আয়াত পড়বেন। তাদেরকে কিতাব, হিকমত শিক্ষা দেবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।)

www.pathagar.com

এই বিষয়টি কোরআনে মজিদে আরো তিন জায়গায় সামান্য কিছু শাব্দিক তারতম্যে বলা হয়েছে।

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم أياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمة و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون – (البقرة ١٥١)

(যেমনভাবে আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছি যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়েন এবং তোমাদের পরিশুদ্ধি করেন এবং কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান দান করেন যা তোমরা জানতে না।)

لقد منّ الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم ايته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين – (ال عمران)

(আল্লাহপাক মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের উপর তার আয়াত পড়েন এবং পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। যদিও তারা এর পূর্বে নিরেট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো।)

هو الذى بعث فى الاميّين رسولا منهم يتلوا عليهم أ ياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين – (الجمعة ٢)

(মহান আল্লাহ যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে রাসুল হিসেবে তাদের মাঝে পাঠিয়েছেন যিনি তাদের কাছে তার আয়াত বলবেন ও তাদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে বিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবেন। যদিও তারা এর পূর্বে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো।)

একজন বান্দার প্রতি তার রবের সব চাইতে বড় অনুগ্রহ হলো তাকে হেদায়াত দান করা। ইল্‌ম দানের নবূয়তী পদ্ধতিতে আল্লাহর হিদায়াত প্রাপ্তি ছিলো অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যে সর্বযুগে মুসলমানদের জন্যে এই ব্যবস্থাই ছিলো সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। আল্লাহর নবী মানুষের মধ্যে তিন পর্যায়ের কার্যক্রমের মাঝে তাদেরকে ইল্‌ম ও আমল শিখাতেন। যার লক্ষ্য ছিলো তাদের হিদায়াতপ্রাপ্তি।

<u>প্রথমতঃ</u> আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন তুলে ধরে তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি অনড় ঈমান সৃষ্টি করতেন।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিতেন।

<u>তৃতীয়তঃ</u> তায্‌কিয়া বা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন গড়ে তুলতেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর আয়াত বা তার নিদর্শন

এর প্রকাশ্য অর্থ হলো কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা। এখানে একথাটি মনে রাখতে হবে যে 'তিলাওয়াত' শব্দটি শুধুমাত্র কোরআনের জন্যেই নির্দিষ্ট, অন্য কোন বই বা গ্রন্থ পড়ার জন্য কখনও তিলাওয়াত শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। যাদের মাঝে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো তারা যে অর্থে আমরা 'পড়া' কথাটি ব্যবহার করি, তার অর্থ ভাল করেই জানতেন। তাদের উদ্দেশ্যে পড়ার কাজকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। কোরআন যেভাবে এই নবুয়তি মিশনের কাজটিকে চার বার ঘোষণা করেছে, এর থেকে আয়াতে বর্ণিত তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

<u>প্রথমতঃ</u> কোরআনের শব্দ ও অর্থের সমন্বয়েই এর তিলাওয়াত। শব্দ শুদ্ধ না হলে অর্থও শুদ্ধ হয় না। এই কথাটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। তিলাওয়াতের কাজটি তখনই হবে যখন প্রতিধ্বনিত শব্দের দ্বারা কোরআনের অর্থ প্রকাশ করবে। এ জন্যে কোরআনকে শুদ্ধ করে পড়া ও এর অর্থ বুঝবার চেষ্টা করা অপরিহার্য। পাঠককে এই পর্যায়ে উন্নিত করার লক্ষ্যেই অর্থ না বুঝে পড়াতেও সোয়াব পাওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে উৎসাহিত করার জন্যে।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> নবুয়তী শিক্ষাদানের মধ্যে তিলাওয়াতের যে দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো, আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনগুলো কোরআনের সাবলিল ভাষায় তুলে ধরে মানুষকে তাওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের প্রতি যুক্তির পথে ডাক দেয়া হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানুষকে মহাসত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান দানই হলো তিলাওয়াতের তাৎপর্য। এই সব নিদর্শনের মধ্যে মানুষের সৃষ্টি রহস্যের নিদর্শন থেকে শুরু করে অপরাপর বিশাল সৃষ্টি জগতের নিদর্শনাবলী তথা নবী জীবনের নিদর্শনাবলী সবই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ সমস্ত আয়াত সমুহের উপস্থাপনে তিলাওয়াতকারীর মনে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাস চাক্ষুস দেখে বিশ্বাস করার মতই সুদৃঢ় হয়ে যায়। ঈমানের এই দৃঢ়তা ছাড়া ইসলামের সত্যিকার ইলম অর্জিত হ'তে পারে না। এই সব নিদর্শনের মাধ্যমেই তাওহিদের ধারণা পরিপক্কতা লাভ করে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। মানুষ একমাত্র তাঁকেই খালেক, মালেক, রিজিকদাতা, হায়াত ও মৃত্যুর মালিক, সম্মান ও সম্ভ্রমের উৎস, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মানুষের আবেদন নিবেদন শ্রবণকারী ও কবুলকারী, অসহায়ের সহায় ও নিতান্ত আপন ও নিকটবর্তী স্বত্বা বলে স্বীকার করে নেয়। আর কোন শক্তিকে তার অংশিদার হিসেবে মানতে অস্বীকার করে। তাওহীদের এই শিক্ষাই ইসলামী উম্মাহর মূল সম্পদ।

www.pathagar.com

কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা

আল-কোরআন যে দ্বীন পেশ করেছে, আল্লাহর নবী তার শিক্ষা দিতেন। মানুষের জীবনের সকল জিজ্ঞাসা, চাওয়া-পাওয়া ও সকল সমস্যার সমাধানে কোরআন সাবলীলভাবে জবাব দিয়েছে। আল্লাহর নবীই এই কোরআনের আসল মর্মের জ্ঞান রাখতেন, আল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'য়ে মানব সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। এটাই ছিলো তাঁর নবুয়তি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাহাবায়ে কেরামদের অবিচল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরা তাদের আরবী ভাষার পান্ডিত্য থাকা সত্বেও রাসুলের কাছ থেকেই কোরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে নিতেন। কোরআনে মজিদ যে আল্লাহর সব চেয়ে বড় মোজেজা- তা এর সঠিক ইল্‌ম ছাড়া বোধগম্য হবার কথা নয়। কোরআনের ইল্‌ম ছাড়া আল্লাহ্ ভীতি ও আল্লাহ্-প্রেম সৃষ্টি হ'তে পারে না। কোরআনের ভাষায় যা বলা হয়েছে এভাবে।

انما يخشى الله من عباده العلماء – (فاطر ٢٨)

(আল্লাহর কোরআনকে যারা জানে, তারাই আল্লাহকে ভয় করে।)

আল-কোরআন শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে হিকমতের শিক্ষা দেয়াও নবুয়তী কাজের অংশ ছিলো। হিকমতের অর্থ হ'লো অন্তর্নিহিত মর্ম-তত্বের তথ্যগত বিশ্লেষণ, বাস্তবতার আলোকে এর প্রয়োগ পদ্ধতি। দ্বীন বা আল-কোরআনের বাস্তব প্রতিফলনকেই হিকমত বলা হয়েছে। এ জন্যেই অনেক মুফাসসির হিকমতের অর্থ রাসুলের সুন্নাহ বা হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা হাদিসের মাধ্যমেই দ্বীন ও শরীয়তকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ হাদিসই হলো কোরআনের প্রয়োগ পদ্ধতি। এ জন্যেই আল-কোরআনকে প্রকাশ্য ও হাদিসকে গোপন কোরআন বলা হয়েছে। কোরআন ও হিকমতের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই নবী মোস্তফা (সাঃ) মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের মূল সুত্র উপহার দিয়ে গেছেন।

তায্‌কিয়া বা পরিশুদ্ধি

আল্লাহর নবী উপরিল্লিখিত ত্রিবিধ উপায়ে ইল্‌ম দানের পর তায্‌কিয়ার কাজ করতেন। 'তায্‌কিয়া' শব্দের মূল অর্থ হ'লো, পবিত্র করা, পরিচ্ছন্ন করা। যার মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুইটা দিকও রয়েছে।

<u>প্রথমতঃ</u> অবাঞ্ছিত উপাদান সমূহ থেকে পবিত্র করা।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> পরিচ্ছন্ন হবার পর বাঞ্ছিত উপাদানে বিকশিত করা বা উন্নতমানে পৌঁছানোর গতি সৃষ্টি। আল-কোরআনের এই তায্‌কিয়ার অর্থও এই উভয় দিক সম্বলিত। একাধারে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি বা পবিত্রতা। ইসলামী

www.pathagar.com

চরিত্রের পরিপন্থি সকল প্রকার চিন্তাধারা, মানসিকতা, আচার, লৌকিকতা ও বদ্ধমূল সংস্কার থেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী হবার পরই মূল কাজ শুরু করতে হ'বে। আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) তুলে ধরে মন-মগজ তৈরী করার কাজ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইসলামী ইলমের ভিত্তিতে তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে বিন্যাসিত করতে হয়। এক কথায় ইলমের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর কাজকে তাযকিয়ার কাজ বলা যেতে পারে। মানুষ গড়ার এই কাজ কোন আংশিক কাজ নয়। মানব জীবনের কোন দিকই এই বিন্যাস কর্মের বাইরে নয় এবং এই কাজটি বস্তুতঃ প্রথম দুই পর্যায়ের কাজের চাইতে বেশী কষ্টসাধ্য। আল্লাহ ছাড়া অপরাপর সকল জড়বাদী ও আত্মিকশক্তির উৎসকে অস্বীকার করা থেকে এই তাযকিয়ার কাজ শুরু হয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই সকল শক্তির উৎস হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করার সার্বিক বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর কাজ করার মাঝ দিয়ে এর পূর্ণতা লাভ হয়। এই চরম ও পরম কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছার পথে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও প্রকারভেদ অনস্বীকার্য। এই প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে তাযকিয়ার পরিমাপ করা যায়। বস্তুতঃ এই পরিমাপের মানদন্ডও একমাত্র আল্লাহরই হাতে কেন্দ্রীভূত। তাই তারই প্রতি পূর্ণাংগভাবে আত্ম-সমর্পন দ্বারাই তাযকিয়ার বিভিন্ন পর্য্যায় অতিক্রম করতে হয়। এর এক পর্যায়কে হাদিসে জিব্রিলে ইহসান বলা হয়েছে। এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে;

أن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك –

(তুমি তার বন্দেগী এমন মনোভাব নিয়ে করবে যেন তুমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছো, যদি তা না হয় তবে এই বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে তিনি তোমাকে দেখছেন।)

চূড়ান্ত পর্যায়ের তাযকিয়ার পর মানুষ আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও তার ক্ষমতা চাক্ষুস দেখার মতই অনুধাবন করে, সে ব্যক্তি কখনও বিভ্রান্ত হয় না। তার সমস্ত অস্তিত্ব আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তাদের সম্পর্কেই হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول من عاد لى وليا فقد اذنته بالحرب و ما تقرب الى عبدى بشى أحب الىّ مما افترضه عليه و لايزال عبدى يتقرب الىّ بالنوافل حتى أحبه – فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه و يده الذى يبطش به و رجله الذى يمشى بها و لئن سألنى لاعطينه و لئن استعاذنى لأعذينه –

(আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার অলীকে শত্রু মনে করে, তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দাহ আমার নৈকট্য লাভের জন্য আমার ফরজকে আদায় করতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি নফল এবাদতের মধ্যে বরাবর আমার নৈকট্য

www.pathagar.com

লাভের পথে অগ্রসর হতে থাকে, শেষে আমি তকে ভালবেসে ফেলি। আর যখন তাকে ভালবেসে ফেলি আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শ্রবণ করে, তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখতে পায়, তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে কোন জিনিষ ধারণ করে, তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলাফেরা করে। সেই বান্দাহ যখন আমার কাছে কিছু চায়, আমি তা প্রদান করি, আর যদি সে আমার আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দেই।)

অর্থাৎ তার সমগ্র অস্তিত্ব-চেতনা আল্লাহর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তার সব কাজই আল্লাহর কাঙ্খিত পথে হতে থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর হেদায়াতের মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়।

কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে,

ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بأ ن لهم الجنة – (التوبه)

(আল্লাহপাক মুমিনদের জান-মাল আখেরাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন)

উপরের হাদীসে উন্নত মানের মুমিনকে অলী নামে অভিহিত করেছেন, কোরআনে মজিদে সমস্ত মুমীনদের অলী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোরআনে এরসাদ হয়েছে,

(الله ولى المومنين)*(আল্লাহ মুমিনদের অলী)* অন্যত্র বলা হয়েছে,

(الله ولى الذين امنوا)*(আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের অলী যারা ইমান এনেছে)* এই পর্যায়ে ও ইমানের বিভিন্ন পর্যায় ও মানের পার্থক্য প্রনিধানযোগ্য।

তায্‌কিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়

তায্‌কিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় একজন মুমেনের লক্ষ্য বা মঞ্জিলে মাকসুদ। এই পর্যায়ের তাযকিয়া ইলমের পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। ঐ মানের মুমিনগণ তাদের ইলমের কোন একটা অংশকে ও আমলের বাইরে রাখেন না। প্রতিকুল পরিবেশ, বৈষয়িক স্বার্থ, পার্থিব লিপ্সা বা মোহ কোন কিছুই তাকে হকের পথ থেকে দূরে রাখতে পারেনা। এই পরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাকে যতো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বা নির্যাতন বরদাশত করতে হয়। তা সে হাসিমুখে বরণ করে নেন এবং আত্নিকভাবে পরম প্রশান্তি লাভ করেন। তার মন পরিতৃপ্ত থাকে। আত্মীয়স্বজন, আপনজন ও পার্থিব শক্তির উৎসগুলোর কেউ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। এদেরকেই কোরআনে মজিদে (حزب الله) (আল্লাহর দল) বা (صالحين) (সৎলোকদের দল) বলে চিত্রিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন,

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون الذين امنوا و كانوا يتقون – (يونس ٦١)

(নিশ্চয়ই আমার অলীদেরকে ভীতি পেয়ে বসতে পারে না বা তারা অনুশোচনায়ও পড়বে না, বস্তুতঃ তারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়েছে।)

অর্থাৎ কোন পার্থিব শক্তির ভয়ে হকের পথ থেকে বিরত হয় না, বা পার্থিব ক্ষয়ক্ষতি বা জুলুম নির্যাতনে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে না।

সাহাবায়ে কেরামগণ তায্কিয়া বা পরিশুদ্ধির এই চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। সাহাবা পরিবর্তীকালে প্রতি যুগে যুগে এমনি মানের মুমিনদের অস্তিত্ব রয়েছে ও আগামীতেও থাকবে। তাদের আপোষহীন চরিত্রই মুসলিম উম্মাহর পথ প্রদর্শক। রাসুলেপাকের তায্কিয়ার পদ্ধতিই একমাত্র নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, এই পদ্ধতিই মুমিনদের জীবনে কাংখিত চরম ও পরম আত্মিক বিকাশ সৃষ্টি করতে পারে।

তায্কিয়ার চুড়ান্ত রূপকে কোরআনে মজিদে (شرح صدر) বা বক্ষ উম্মোচন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরসাদ হয়েছে,

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء – (الانعام)

(আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষকে উম্মুক্ত করে দেন, আর যাকে গুমরাহীতে নিক্ষেপ করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন একেবারেই সংকীর্ণ, যেন স্ব-জোরে আকাশের দিকে চড়তে থাকে)

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه –(الزمر)

(অতঃপর আল্লাহ যার বক্ষখুলে দেন ইসলামের জন্য সে তার রবের তরফ থেকে নূরে নুরান্বিত হয়)

তায্কিয়ার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করলে আল্লাহপাক তার বান্দাহর বক্ষ খুলে দেন, তখন সে সুস্পষ্ট ভাবে হিদায়াত, গোমরাহী, হক, না হক, ভাল মন্দ দেখতে পায়। কোন ছদ্মাবরনে ও গোমরাহী তার কাছ ঘেষতে সক্ষম হয়না। এই (شرح صدر - বক্ষ উম্মোচন) আল্লাহর বিশেষ দান, যা শুধু চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। হিদায়াতপ্রাপ্তির জন্যে আল্লাহর এই দানের চাইতে বড় আর কিছু নেই।

এই বক্ষ উম্মোচনের পরিমাণ ও পর্যায় ভিন্নতর ও বিভিন্ন পর্যায়ের। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ঈমানের ভিত্তিতে তায্কিয়ার আমল যতো গভীর ও ব্যাপকতর হবে তার বক্ষ উম্মোচনের স্তরও উন্নততর হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে

www.pathagar.com

আম্বিয়ায়ে কেরামদের বক্ষ উম্মোচন, আমাদের নবীর বক্ষ উম্মোচন, সাহাবায়ে কেরামদের বক্ষ উম্মোচন, খোলাফায়ে রাশেদীনদের বক্ষ উম্মোচন, তাবেয়ীদের বক্ষ উম্মোচন, ইমাম ও মোজতাহিদদের বক্ষ উম্মোচন তথা সাধারন মুমিনদের বক্ষ উম্মোচনের পরিমাণ এক পর্যায়ের নয়। আল্লাহপাক প্রত্যেক মুমিনের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও তার দায়িত্বের অনুপাতে তাকে এই মহারত্ন দান করেন। এর ফলে তার মন-মগজ ও চিন্তাধারা থেকে সকল প্রকার সন্দেহ সংকোচ, দ্বিধা-দ্বন্দ দূরীভূত হয়ে যায় এবং সন্তুষ্টি লাভই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে যায়। কোন রকম কুটিল চিন্তা, দার্শনিক ধুম্রজাল, শয়তানী ওস্ওসা তার অটল ঈমানের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। ইলম ও আমলের সমন্বয়ে গড়ে উঠা তায্কিয়ার এই উন্নত পর্যায়ে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ঠভাবে এই বক্ষ উম্মোচনের অস্বিত্ব বুঝতে পারে। বক্ষ উম্মোচনের এই নূরের অংশীদারত্ব ছাড়া যে ইলম তা যে কোন ও মুহুর্তে বিপদ টেনে আনতে পারে। আর এই ধরনের ইল্মই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অনভিপ্রেত বিভেদ টেনে এনেছে। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রাঃ) তার প্রসিদ্ধগ্রন্থ (زاداالمعاد)-এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ গুণাগুণ ও যোগ্যতার উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা মানুষের বক্ষ উম্মোচিত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তার অন্তরে একটা নূর পয়দা করেন, যা তার অন্তরকে সদা প্রশান্ত ও সজীব করে রাখে। যখন এই নূর বিদায় নিয়ে যায়, তার অন্তর অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বন্দীদশা অবস্থায় অবস্থান করতে থাকে।

আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

اذا دخل النور القلب انفسح و أنشرح قالوا و ما علامة ذلك يارسول الله قال الانابـــة الى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزوله –

(যখন এই নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন তার অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়, সাহাবারা আরজ করলেন, এর নিদর্শন কি? তিনি জবাবে বললেন, এই নূরের ফলে চীরস্থায়ী জীবনের প্রতি তার সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে অস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুতি নিতে যত্নবান হয়ে পড়ে।)

যে ব্যক্তি পৃথিবীর জীবনে এই নূরের অধিকারী হবে তার কবরেও এর প্রতিফলন ঘটবে। এখানে যদি তার অন্তর প্রশস্ত ও প্রাণবন্ত হয় তবে তার কবরও অনুরূপ হবে।

এমনি অন্তরের ধারক আলেমদের ইল্মকে উপকারী ইলম বলা হয়েছে। তার ইলম থেকে মানব সমাজ উপকৃত হ'বে। হাফেজ ইবনে কাইয়েমের মতে এই ইলম বা এই নিয়ামতের উপস্থিতির জন্য বিশেষ বিশেষ মৌলিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটা অপরিহার্য। তিনি যে সব গুণাবলীর সমাবেশ অপরিহার্য মনে করেছেন সেগুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে বিনয়, নম্রতা, বদান্যতা, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, পার্থিব বিষয় সম্পদের প্রতি অনিহা, ধৈর্য্য, ভালবাসা ও সুন্নতের অনুসরণকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। সাথে যে সব দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হবার অপরিহার্য্যতার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, পর-চর্চা, অহংকার, বড়াই ও দম্ভ, পৃথিবীর প্রতি লালসাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমনি উপরোক্ত গুণাবলীর অনুপস্থিতিতে মানুষের বক্ষ উম্মোচিত হয় না, তেমনি উল্লেখিত দোষ-ক্রটিগুলোর উপস্থিতিতেও এই নিয়ামত দূরে সরে যায়। যখন এই সম্পদ অর্জিত হয়, তখন পার্থিব দৈন্যতা ও বিপদ-আপদ তার আত্মিক প্রশান্তির পথে একটুও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই আত্মিক প্রশান্তিকে জান্নাত সম-আনন্দদায়ক অনুভূতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে জ্ঞানের সাথে এই নিয়ামত নেই, সেই জ্ঞানকে হিদায়াতের উৎস বলা যায় না, বরং তা যে কোন সময় ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্বে বলতে হয় যে ইসলামী জ্ঞানে পরিমাণগত যোগ্যতার চাইতে গুণগত যোগ্যতার গুরুত্ব অধিক। গুণগত মানে উত্তীর্ণ না হ'লে পরিমাণের দিক দিয়ে যত বেশী হোক না কেন, তাকে সত্যিকার ইসলামী ইলম বলা যায়না, পক্ষান্তরে পরিমাণমত যোগ্যতার দিকটাও অবহেলা করা যায় না। পরিমাণগত যোগ্যতা না থাকলে তার মানগত যোগ্যতা সে ব্যক্তির জন্যে হেদায়াতের উৎস হতে পারে সত্যি, কিন্তু মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ বহন করতে পারে না। তাই পরিমাণগত ও মানগত যোগ্যতার সমন্বয়েই ইসলামী জ্ঞান সৃষ্টি হয়। কোন একটা দিকের অনুপস্থিতিতে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ঐক্যের সহায়ক হতে পারে না।

(২) মানুষের জ্ঞান যে সব বিষয়ের সমাধান করতে অপারগ, সেই সব বিষয়কে গবেষণার বা চিন্তার বিষয় বস্তুতে পরিণত করা

না দেখে ঈমান আনাই হলো ইসলামের বুনিয়াদ। মানুষের ইন্দ্রীয় বা অংগ-প্রতংগ অত্যন্ত সংকীর্ণ গন্ডি বা আওতার মধ্যে ক্রিয়াশীল, এই গন্ডির বাইরে এ সবের কোন ক্ষমতাই নেই। এই বস্তুবাদী জগতে মানুষকে তার প্রয়োজনের মাপকাঠিতেই আল্লাহ পাক ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তার জ্ঞান, মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এই জড় জগতের সীমা লংঘন করতে পারে না। এই জড় জগতের প্রতিটি জিনিষই একটা জড় আইনের বা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে। আল্লাহপাক এই জড় জগতের সব কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রনে দিয়েছেন। হযরত আদমকে সৃষ্টি করার সময়ই আল্লাহ্পাক এই জড় জগতের সীমানা নির্ধারন করে দিয়েছেন। এই বিশ্বে বিচরনের জন্য, এখানের সব কিছু ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজনীয় সার্বিক যোগ্যতা প্রদান করেই আল্লাহ মানুষকে

www.pathagar.com

পয়দা করেছেন। কিন্তু জড় জগতই সবকিছু নয়। এই জড়জগত আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টির একটা ছোট অংশ মাত্র। অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই জড় জগতের জড় পর্দার অন্তরালে যে বিশাল সাম্রাজ্য বা সৃষ্টিলোক সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জ্ঞান তা ব্যপ্ত করতে অক্ষম। এই মহাসৃষ্টির ব্যাপকতা ও মানুষ বুঝতে ব্যর্থ। স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য কোন সৃষ্টির পক্ষে ব্যপ্ত করা আদৌ সম্ভব কি? আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে সৃষ্টির বিশালতা সম্পর্কে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা মহাসৃষ্টি সম্পর্কে এই অনুমানের কোন অন্ত নেই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা কোন দিনই সম্ভব হবে না, তাই মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মেনে না নিয়ে কোন উপায় নেই। এই মহাসৃষ্টি বা সৃষ্টি রহস্যের উর্দ্ধে স্রষ্টা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি আরো সীমাবদ্ধ। মানুষ যতোই চেষ্টা করুক না কেন তার জ্ঞান সীমার বইরে কখনও যেতে পারবে না। যারা এই মহাসত্য মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে তারা সীমাহীন হতাশা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। এখানেই গায়েবী ঈমানের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই জড় জগতের জড় পর্দার অন্তরালে যে বিশাল ও সীমাহীন সৃষ্টি রয়েছে, আল্লাহপাক তার কিয়দাংশ তার নবীদেরকে দেখিয়েছেন। তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দাহর জন্য কখনও কখনও এই জড় পর্দা উম্মোচিত করেন, তখন তারা স্বচক্ষে এসব দেখতে পান। এর উদ্দেশ্য হলো তাদের মনে চাক্ষুস অবলোকনের মতোই দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা।

কোরআনে মজিদে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সম্পর্কে এরসাদ হয়েছে,

و اذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تومن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك سعيا و أعلم ان الله عزيز حكيم – (البقرة)

(যখন ইব্রাহিম বললেন, হে রব আপনি কিভাবে মৃত্যুকে জীবন দান করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না, তিনি বললেন, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি, তবে অন্তরের প্রশান্তির নিমিত্তে (জিজ্ঞাসা করছি) আল্লাহ বললেন, ৪টি পাখি ধর, তাদের টুকরো টুকরো করো এবং এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের উপর রেখে দাও। অতঃপর তাদের ডাক দাও। তারা তোমার কাছে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত হ'বে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।)

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে;

قال رب أرني انظر اليك قال لن تراني و لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خرّ موسى صعقا – فلما أفاق قال سبحنك تبت اليك و انا اول المومنين – (اعراف ١٤٣)

www.pathagar.com

(হযরত মূসা বললেন, হে রব আমি আপনাকে দেখতে চাই, আল্লাহ বললেন, তুমি আমায় দেখতে পারবে না (তোমার চক্ষু আমার দর্শন সহ্য করতে পারবে না) হাঁ তুমি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দাও (সেখানে আমার জ্যোতি অর্পন করবো) যদি পাহাড় তার জায়গায় অবস্থান করতে পারে তবে (বুঝবে) তুমি আমায় দেখতে পাবে। অতঃপর যখন পাহাড়ের উপর তার রব তার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন পাহাড় ভস্মীভূত হয়ে গেলো এবং মূসা বেহুস হয়ে গেলেন, যখন হুস ফিরে পেলেন, বললেন, আপনি এর উর্দ্ধে যে আপনার দর্শন পওয়া যায়। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পন করছি, বস্তুতঃ আমি পূর্বেই আত্মসমর্পন করেছি।)

অনত্র এরসাদ হয়েছে,

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات و الارض و ليكون من الموقنين – (الانعام ৭৫)

(এবং এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান-যমিনের (গোপন) সাম্রাজ্য দেখিয়েছি যেন আমার (মহাসৃষ্টির) উপর তার বিশ্বাস জন্মে।)

আমাদের নবী করিম (সঃ) সম্পর্কে সুরা -- النجم এ এরসাদ হয়েছে-

و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى أفتمرونه على ما يرى و لقد رأه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى – اذيغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى– (النجم)

(সেই ফিরিস্তা সুউচ্চু দৃষ্টি সীমানায় ছিলেন, অতঃপর নিকটতর হতে থাকলেন, অতঃপর দুই তীর বা তার চাইতেও কম দূরত্বের ব্যবধানে নিকটতর হ'লেন। অতঃপর তাঁর বান্দার কাছে তার বাণী যা নাযিল করার ছিলো, করলেন, যা কিছু তিনি অবলোকন করলেন, তাতে তার অন্তকরণ সন্দেহ করলো না। তোমরা কি সন্দেহ করছো যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন? এবং তিনি সেই ফিরিস্তাকে দ্বিতীয়বার নাযিল হতে দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। যার সন্নিকটে আল মাওয়া জান্নাত অবস্থিত। (আমি) আমার অবর্ণনীয় কুদরতে সিদরাতুল মুনতাহাকে ঢেঁকে রেখেছি। (যা দেখে তার) চক্ষু বিস্ফোরিতও হলো না, এবং তিনি তার রবের বড় বড় নিদর্শন গুলোর মধ্যে কিছু নিদশর্ন অবলোকন করলেন)

আম্বিয়া কেরামদের জন্য প্রদত্ত মোজেজা সমূহও এই পর্যায়ের ঘটনা। এ সবের অর্থ হলো তার বিশাল সৃষ্টি ও কুদরত মানুষের চিন্তা-পরিধির বাইরের। তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী ঐ রহস্যময় কুদরতের কিয়দাংশ তার নির্বাচিত বান্দাহদের জন্য উম্মোচন করেছেন। মানুষের বুদ্ধি বা চিন্তা এই রহস্যের কোন মিমাংসা করতে পারবে না।

www.pathagar.com

কোরআনে মজিদের আয়াত সমূহের শ্রেণীবিন্যাস

কোরআনে মজিদে মানুষের প্রয়োজনে যে সমস্ত আদেশ নিষেধ, চিন্তার পরিশুদ্ধি, সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, ঈমান ও আকিদার বুনিয়াদ সম্পর্কিত যে সব বিষয় সুস্পষ্ট অর্থবোধক ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার বাস্তব ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি মহানবী আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সে সব বিষয়েরই উপর আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে। আর ঐ সব বিষয় যা মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির আওতার বর্হিভূত ও মানুষের অজানা অদেখা এক রহস্যময় জগতের বিষয়, যা জড়-জগতের বোধগম্য উপমাদির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হ'বে এবং প্রকাশ্য অর্থেই তৃপ্ত থেকে অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মর্মে অনুপ্রবেশ করে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের চোরা পথ খুলে দেবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

هوالذى أنزل عليك الكتاب منه أيت محكمات هن أم الكتب و أخرمتشابهات فامـــاالذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و مـــا يعلـــم تأويلـــه الاّ الله و الراسخون فى العلم يقولون امناً به كل من عند ربنا و ما يذّكّر الا أولـــو الالبـــاب – (أل عمران)

(তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, যার মধ্যে (দুই ধরনের আয়াত রয়েছে) (محكمات) (সুদৃঢ় বা সুস্পষ্ট) আয়াত রয়েছে, যেগুলো হলো কোরআনের মূল (আর দ্বিতীয় ধরনের আয়াত হলো) (متشابهات - প্রচ্ছন্ন বা রূপক, যার মধ্যে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা রূপক আয়াত সমুহের পেছনে পড়ে থাকে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এ সব আয়াতের অর্থ বের করার চেষ্টা করে, কিন্তু এর সত্যিকার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। (এ জন্যে) যারা সুগভীর পান্ডিত্যের অধিকারী তারা বলে, আমরা এগুলোর উপর বিশ্বাস করি। এ সব আমাদের রবের তরফ থেকেই এসেছে এবং ব্যুতপন্ন সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।)

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতে দুই ধরনের আয়াত প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কোরআনে মজিদে এই দু' ধরনের আয়াত ছাড়াও আরো বিভিন্ন শ্রেণীর আয়াত রয়েছে যেমন আগের উম্মতদের ইতিহাস বা কাহিনী (قصص), উপমা ও উদাহরণের আয়াতসমূহ (أمثـــال) ও সুক্ষ্ম ইংগীত সম্বলিত আয়াতসমূহ (كناية) এই তিন ধরনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর মতো সুস্পষ্ট অর্থ বাহক ও নয় আবার

www.pathagar.com

রূপক আয়াতগুলোর মতো অস্পষ্ট ও মানুষের জ্ঞান বহির্ভূতও নয়। এগুলোকে মানুষের জন্য চিন্তা ও গবেষনার বিষয় বস্তুতে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়নি।

সুদৃঢ় বা সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে মূল বা মুখ্য বলে পরিস্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে কোরআনে উপস্থাপিত সকল বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো এসব আয়াতগুলো। এগুলোকে ভিত্তি করেই কোরআনের আর সকল ধরনের আয়াতের অর্থ বুঝতে হবে। যদি কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তবে তার ফয়সালাও ঐগুলোর আলোকেই করতে হবে। অর্থাৎ আকিদা বিশ্বাস ও আমলের জন্যে এই আয়াতগুলোই আসল। এগুলো থেকেই সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুরায়ে ফাতিহাকে মূখ্য বা মূল কোরআন বলা হয়েছে ঐ একই অর্থে। এই সুরায় কোরআনের মূল কথাগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্যে সুরা ফতিহা ছাড়া কোন নামাজই হয় না। বস্তুত দ্বীনের বুনিয়াদ হলো এই মূখ্য আয়াতগুলো। রূপক আয়াতগুলোতে মানুষের বোধগম্য হবার মতো একটা সুস্পষ্ট ধারণা মিলে। একজন মুমিনের জন্য এটাই যথেষ্ট। এর বেশী তথ্যানুসন্ধানে এসব আয়াতের নিগুড় তত্ত্ব উদঘাটন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যার ফলে অসংখ্য বিভ্রান্তি ও সংশয়ের ধুম্রজাল সৃষ্টি হতে পারে, যা আস্তে আস্তে ঈমানের জন্য বিপদ ও উম্মতের বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু কোরআনের আয়াতে নয়। বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আল্লাহ এই সৃষ্টিতে মানুষের জীবন-রহস্যেই হোক বা বিশ্ব-চরাচর, সৌর-জগত বা অতল-সমুদ্রের রহস্যে; সবকিছুর মধ্যেই এই দুই পর্যায় রেখেছেন। কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট ও বোধগম্য আবার কিছু কিছু জিনিষ অস্পষ্টতার আবরণে ঢাকা। এমন কি মানব জীবনের ঘটনাবলীর মাঝেও এই দুয়ের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। নবী জীবনের বদরের যুদ্ধ সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়, আবার ওহোদের যুদ্ধ ও হোদায়বিয়ার সন্ধি এই প্রচ্ছন্ন পর্যায়ে পড়ে। ওহোদের যুদ্ধে আপাতঃ পরাজয় কিন্তু সার্বিক দিকদিয়ে বিজয় এই পর্যায়েরই ঘটনা। হোদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ মহাবিজয় বলেছেন, কিন্তু বাহ্যতঃ তা সুস্পষ্ট নয়। সত্যপথের পথিককে পার্থিব অপ্রতিকূলতা, আর্থিক দৈন্যতা বা নির্যাতন ও নিপীড়নের মাঝেও মুমিনের মনের প্রশান্তি ও আনন্দানুভূতিও এই রূপক পর্যায়ের। কিন্তু একটা কথা সুস্পষ্ট যে মানুষের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়কে আল্লাহ অস্পষ্ট রাখেননি। যে সমস্ত বিষয়কে অস্পষ্টতার আবরণে রেখেছেন সেগুলোর সাথে মানুষের কর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার পর কোরআনী ইলম মানুষের মনে ঈমানের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলে, তখন রূপক আয়াতগুলোর নিগুঢ় তত্ব উদঘাটন করার প্রতি তার মোটেই উৎসাহ সৃষ্টি হয় না, বরং ঐসব আয়াতগুলো তার ঈমানকে আরো মজবুত করে দেয়। কিন্তু যাদের মনে ঈমানের নুর পয়দা হয় না তারা রূপক বিষয়গুলোর তত্ব জানার জন্য এমনি চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত ঈমানের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। এদের সম্পর্কেই কোরআনে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه و لمّا يأتهم تأويله – (يونس ٣٩)

(বরং তারা এজন্যেই অস্বীকার করেছে যে তাদের জ্ঞান তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষাবধি এসব বিষয়ের তত্ব বোধগম্য হয়নি।)

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোরআনের ভাষায় কোন অস্পষ্টতা নেই, যা কিছু অস্পষ্টতা তা হলো অর্থের অন্তর্নিহিত তত্বে। যার চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। কোরআনের ভাষায় যদি কোন অস্পষ্টতার প্রশ্ন উঠে তবে তা আরবী-ভাষার দক্ষতার অভাবে সৃষ্ট। নবীর মোজেজা সমূহকে অস্বীকার করতে গিয়ে অনারব ও আরবী-ভাষায় অদক্ষ ব্যাক্তিরা কোরআনের ভাষায় অস্পষ্টতা আবিস্কার করেছেন। সেই সব তফসিরকে কোরআনের তফসির বা কোরআনের ইল্‌ম বলা যায় না।

কোরআন মজিদে যে সমস্ত বিষয়কে অস্পষ্টতার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে তার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বরূপ, তার অবস্থান, আরশ-কুরসী, বেহেশত, দোজখ, ফিরিস্তা, আল্লাহর আমানত, তকদীর, তদবীর ও অপরাপর মানুষের অবোধগম্য বিষয়াদির নিগুঢ় তত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। এই সব বিষয়গুলোর উপর ঈমান এনে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করাই হলো সুষ্ঠুজ্ঞানের দাবী। এসব ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা কোন কল্যাণকর কাজ নয়, বরং তা মারাত্মক সংশয়ের পথ খুলে দেয়। যার পরিণতি হলো বিভ্রান্তি ও গোমরাহী। কোরআন মজিদে সুস্পষ্ট নিষেধ থাকা সত্বেও এবং শেষ নবীর কঠোর সতর্ক বাণী থাকা সত্বেও পরবর্তীযুগে তথাকথিত পন্ডিতগণ এ সব বিষয়কে তাদের গবেষনা কাজের মূল বিষয়ে পরিণত করেছেন। সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণা বাদ দিয়ে রূপক বিষয়াদি নিয়ে চরম বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে যায়। আকিদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহর বিভেদে এই মনোভাবই সবচেয়ে বেশী দায়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোরআন মজিদ বক্রচিন্তা (زيغ) বলে অভিহিত করেছে। কোরআনের এই শব্দের অর্থ বক্রতা বা পতন যা সুদৃঢ় (راسخ) এর বিপরিত। বক্রচিন্তার লোকদের পতন এভাবেই হয়েছে। উম্মতে মুহম্মদীর মধ্যে বক্রচিন্তার লোকেরা এপথেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। এই অবৈধ গবেষণা কর্ম ইসলামের ইতিহাসে বিভেদের বীজ বপন করেছে, এর শাখা-প্রশাখা উম্মতে মুহম্মদীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, সহজ সরল দ্বীনকে বিজাতীয় দর্শন ও আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে ফেলেছে, ফলে সুষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত জীবন ব্যবস্থা লক্ষ আবরনে ঢাকা পড়েছে।

রূপকভাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-প্রয়াস শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্যেই বিভেদ সৃষ্টি করেনি, বরং আমাদের পূর্বতন উম্মতদের ক্ষেত্রেও একথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের উম্মতের লোকেরা এই অবাঞ্ছিত বিরোধ সৃষ্টি করেছে

www.pathagar.com

আল্লাহর নবীর তিরোধানের প্রায় ৩০০ বছর পর, পক্ষান্তরে হযরত মুসার উম্মত তাঁর জীবদ্দশাতেই এই বক্রচিন্তার শিকার হয়েছিলো।
কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে,

و اذ قال موسى لقومه يا قوم لماتوذوننى و قد تعلمون انّى رسول الله اليكم فلما زاغــو ازاغ الله قلوبهم و الله لايهدى القوم الفاسقين – (الصف ٥)

(স্মরন করো, যখন মুসা তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম, তোমরা আমায় কেন কষ্ট দিচ্ছো, তোমরা ভাল করেই জানো যে আমি তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর যখন তারা বক্রচিন্তার আশ্রয় নিলো, আল্লাহ তাদের অন্তরে বক্রতা দিলেন। আল্লাহ অসৎ লোকদের হিদায়াত প্রদান করেন না।)

ইতিহাসের তথ্যে জানা যায় যে হযরত মুসার কওম তার জীবদ্দশাতেই বিভিন্ন বক্রচিন্তার আশ্রয় নেয়। দার্শনিক কূটিল চিন্তায় তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। আল্লাহর কোন শিক্ষাকেই তারা প্রকাশ্য অর্থে সরাসরি কবুল না করে অসংখ্য প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে থাকে। আল্লাহর কালাম (كلمة الله) এর ব্যাখ্যায়, গাভী যবেহ্ করার ঘটনায়, মান ও সালওয়ার নিয়ামতে, দ্বীনি শিক্ষাকে তাদের সনাতন পৌত্তলিক ধারণার সাথে সমন্বিত করার লক্ষ্যে, গরুর বাছুরের পূঁজা করার ঘটনায়, তাদের বক্র চিন্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মূসার ইন্তেকালের সাথে সাথেই উম্মাহর পরিচিতি 'ইসলাম' কে ইহুদীবাদে রূপান্তরিত করে ফেলে এবং ইহুদীবাদকেই হকের মানদন্ডে পরিণত করে বসে। কোরআনের ভাষায় তারা দাবী করে;

قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا – (البقرة ١٣٥)

(তারা বলতো, তোমরা ইহুদী বা নাসারা হয়ে যাও, তবেই সত্যের পথ পাবে, বলো, ইব্রাহিমের মিল্লাত (মূলতঃ) ইসলামই ছিলো।)

ইহুদীদের অনুকরণে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতও একই কূটিল পথের আশ্রয় নেয়। হযরত ঈসার সৃষ্টি প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বাইরে আল্লাহর কালাম বা তার হুকুমের (كن - হয়ে যাও) মাধ্যমে হয়েছিলো। তারা জানতো যে সারা সৃষ্টিকূল আল্লাহরই নির্দেশেই বাস্তব রূপ নেয়, আল্লাহ কোন নিয়মের অধীন নন। তিনি সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ভিত্তিতেই সবকিছু আঞ্জাম দেন। কিন্তু নিয়মের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তারা এই সহজ কথাটিকে কূটিল দার্শনিক তত্বে জড়িয়ে ফেললো।
কোরআনে মজিদে হযরত ঈসার জন্ম সংক্রান্ত বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে-

ان مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون – (ال عمران)

www.pathagar.com

(আল্লাহর কাছে ঈসার সৃষ্টি আদমের সৃষ্টির মতোই। আদমকে যেমন মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বললেন, হয়ে যাও, অতঃপর তার সৃষ্টি হয়ে গেলো।)

হযরত আদম যেমন আল্লাহর হুকুমে সৃষ্টি তেমনি হযরত ঈসাও তারই হুকুমে সৃষ্ট। যাকে রূহুল্লাহ বা আমরুল্লাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারা হযরত ঈসাকে আল্লাহর সন্তান বা অবতার বানিয়ে নিলো। এটা তাদের বক্রচিন্তারই ফসল।

বিভ্রান্ত চিন্তার প্রকাশ্য নিদর্শন হলো তারা অত্যন্ত জোরে সোরে দাবী করে যে তারাই একমাত্র হকপন্থী, তারা ছাড়া আর সবাই বিভ্রান্ত বা বাতিলপন্থী। ইহুদী-নাসারাদের ব্যাপারে কথাটি স্পষ্টতঃ প্রমাণিত। তারা দাবী করতো যে ইহুদী ও নাসারাই একমাত্র হকপন্থী। আল্লাহর কাছে মুক্তির জন্য ইহুদী বা নাসারা হওয়া পূর্ব শর্ত। উম্মতে মুহম্মদীর বাতিলপন্থী লোকদের বেলায় এই চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একই ভঙ্গিতে।

আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত এই বক্রতার ফলে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইহুদীদেরকে আখ্যায়িত করা হয়েছে (مغضوب عليهم –অভিশপ্ত) হিসেবে, অন্যদিকে খৃষ্টানদের জন্যে বলা হয়েছে (الضالين –পথভ্রষ্ট)।

ইহুদীদের সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে,

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الاّ بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله – (ال عمران ١١١)

(তারা যেখানেই বসবাস করুক না কেন তাদের উপর চরম ধিক্কার অর্পন করা হয়েছে (তারা চির-ধিকৃত জাতি) হাঁ তারা আল্লাহ বা মানুষের আশ্রয়কে অবলম্বন করে (জাতি হিসেবে) টিকে থাকবে। আল্লাহর তরফ থেকে তারা অভিশপ্ততা ও পর মুখাপেক্ষিতার শাস্তি প্রাপ্ত। তাদের এই পরিণতি এজন্যে যে তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে। (লাঞ্ছনা, ধিক্কার ও পরমুখাপেক্ষিতার মধ্যে দিয়েই তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে)

ইহুদীদের চিরন্তন পরিণতিও বর্তমান অবস্থা।

আজকের ইহুদীদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সত্যি তারা ধিকৃত জাতি। পরমুখাপেক্ষিতা তাদের অস্তিত্বের রক্ষা কবচ। আত্মসম্মানে বলিয়ান কোন জাতির সংজ্ঞায় তারা পড়ে না। পৃথিবীর প্রতিটিই জাতির, তা আকারে ছোট হোক বা বড় হোক, জাতি হিসেবে টিকে থাকার একটা নৈতিক ভিত্তি থাকে। কিন্তু ইহুদী বা ইসরাইলী জাতির তা নেই। লাঞ্ছিত জাতি হিসেবে তাদের ইতিহাস দীর্ঘ। হিটলারের ইহুদী নিধন, রাশিয়ায় স্থানান্তর, শেষে পরাশক্তির ষড়যন্ত্রে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সবই লাঞ্ছনা ও অন্য জাতিগুলোর উপর নির্ভরশীলতার ইতিহাস।

www.pathagar.com

আজকের ইসরাইল পরাশক্তির আশ্রয়ে টিকে আছে। আপাতঃ শক্তিধর মনে হলেও তারা অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী। তাদের ব্যবহার, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক, দেশের আদি বাসিন্দাদের সাথে তাদের বৈরী সম্পর্ক এমনি এক পর্যায়ের যে যদি পরাশক্তির অবলম্বন উঠে যায়, তবে কোটি কোটি মানুষের রোষানলের শিকার হ'বে। নুন্যতম মানবীয় সহানুভূতির যোগ্যতাও তারা হারিয়েছে। এমনকি যে সব পরাশক্তি বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাদের দেশের প্রভাবশালী ধনীক ইহুদীদের সমর্থন লাভের জন্যে কুটনৈতিক চাল হিসেবে ইসরাইলকে সমর্থন বা অবলম্বন প্রদান করে। সত্যিকার অর্থে সেখানের জনসাধারনের শ্রদ্ধা অর্জন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র ইহুদী ছাড়া আর কারও শ্রদ্ধা তারা পায়নি। জাতিসংঘের সাধারন পরিসদে ইসরাইল প্রসংগে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বিশ্ব সমাজে তাদের অবস্থান প্রমাণিত হয়। আল্লাহর আশ্রয় হিসেবে তাদের বালক, বালিকা, মহিলা ও বয়োবৃদ্ধ লোকেরা নিরাপত্তা পেয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষের আশ্রয় হিসেবে পরাশক্তির সমর্থন ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ গুলোর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আশ্রয়কে তাদের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ বলা যায়। এতো কিছুর পরও তাদের ধিকৃত ও লাঞ্ছিত পরিচয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য।

আজকের ইহুদী বা ইসরাইলী জাতির সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ঠতই প্রমানিত হয় যে আল্লাহর ভবিষ্যতবানী অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যকরী হয়েছে। যেহেতু উম্মতে মুহম্মদীর উপর প্রকাশ্য ধবংশের আজাব নাযিল হবেনা, কারন এই উম্মত হ'লো শেষ উম্মত, একে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে, তাই বক্রচিন্তার ফলে যতো বিভেদই সৃষ্টি হোক না কেন, এই উম্মত ধ্বংশ হয়ে যাবে না।

হাদিসে পাওয়া যায় যে আল্লাহর নবী এই উম্মতের বক্রচিন্তার জন্যে আল্লাহ প্রস্তাবিত দুইটা শাস্তির মধ্যে একটাকে বেছে নিয়েছিলেন। দুইটা শাস্তির একটি হলো পূর্বতন উম্মদের মতো প্রকাশ্য ধংসের আযাব, এবং অপরটি হলো উম্মাহর ঐক্যে বিভেদের আযাব, আল্লাহর নবী পরিবর্তী পর্যায়ের আযাবকেই কবুল করে নিয়েছিলেন। এজন্যে আমরা বিভেদ সৃষ্টিতে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বতন উম্মতদের চাইতে অনেক বেশী তৎপর বলে মনে হয়। রূপক বিষয় গুলোর ব্যাখা প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও এই ময়দান আমাদের উলেমাদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্র থেকেই অধিকাংশ বিভেদের ভিত্তি তৈরী হয়েছে।

আল্লাহর নবী এসব বিষয়ের নিগুঢ় তত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত করতেন। হাদিসে এ ধরনের ঘটনা পাওয়া যায় যে কখনও কখনও সাহাবারা এই সব বিষয় নিয়ে বির্তকে লিপ্ত হতেন, তা দেখে আল্লাহর নবী রাগান্বিত হতেন এবং বলতেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ বিভক্ত হয়েছে এই কারণে এবং পরিণতিতে ধবংশ প্রাপ্ত হয়েছে।”

www.pathagar.com

একদা হযরত উমর (রাঃ) জানতে পারলেন যে হযরত উবাই বিন কাব ও হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এসব বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত রয়েছেন, তখন তিনি মসজিদে উপস্থিত হয়ে খোৎবা দিতে গিয়ে বললেন, যদি এ সব বিষয়ে আবার যদি কোন বিতর্কের কথা শুনি তবে আমি কঠোর ব্যবস্থা নিব। হযরত আলী (রাঃ) সরকারীভাবে জনগণকে এসব বিষয়ে বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ জারী করতেন।

এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামদের ভূমিকা ছিলো সুস্পষ্ট। কিন্তু পরিবর্তীকালে শীয়া ও অপরাপর কিছু লোকেরা এসব বিষয়ে গবেষণা করার পথ বেছে নেয় এবং কোরআনের আয়াত থেকেই তাদের ভূমিকার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তরজমায় আমরা উল্লেখ করেছি যে "এ সবের সত্যিকার অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না এবং ব্যুতপত্তি সম্পন্ন লোকেরা বলে আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।" কিন্তু তারা তরজমা করতেন এভাবে "এ সবের সত্যিকার অর্থ আল্লাহ ও ব্যুতপত্তি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানে না, তারা বলেন আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান এনেছি।" এই অর্থ সাহাবাদের মাধ্যম হয়ে আসেনি, তদুপরি অর্থ সুস্পষ্ট নয়। কেননা, মুমেনদের মধ্যে আল্লাহও শামিল হয়ে যান, যার কোন অর্থ হয় না। তাদের এই ব্যাখ্যার মূলে ছিলো তাদের এই বিশ্বাস যে তাদের ঈমামগণ গায়েবের ইলম রাখেন। কাজেই তারাও এসবের অর্থ জানেন। প্রথমতঃ তাদের যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে আমাদের উলেমারা এই নিষিদ্ধ ময়দানে প্রবেশ করেন এবং আস্তে আস্তে এ পথে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং অবাঞ্ছিত বিভেদের পথ খুলে যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই জাতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হতো, বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন মনে করা হতো না, কিন্তু উপরোক্ত পটভূমিতে যখন এসব বিষয়ের উপর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়ে গেলো, ইসলামের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ এর পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপক চর্চা শুরু করলেন। হকপন্থী আলেমরা এ ময়দানে ব্যপক গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন তফসীরে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখতে হয়েছে, আকায়েদের উপর গ্রন্থ লিখতে হয়েছে। ফলে রূপক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়াস অতঃপর অবৈধ রলো না। উলেমারা রূপক বিষয়গুলোর শ্রেণীবিন্যাস শুরু করলেন। বলা হলো, রূপক দু'ধরনের (১) আসল রূপক (الحقيقي) (২) আনুপাতিক রূপক (الإضافي) গবেষণা অবৈধ হলো শুধু আসল রূপকে। আনুপাতিক রূপকের ময়দানকে গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা হলো। ইল্‌ম বা যোগ্যতাকে রূপক বিষয়গুলোর গবেষণার জন্য মানদন্ড করা হলো। পরিশেষে দেখা গেলো কোরআনে মজিদে আসল রূপকের অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। তাই এ পথে গবেষণার দ্বার অবারিত হয়ে গেলো। কিন্তু এ পথে চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের কোন ইতি নেই। এই বিপদ সংকুল পরিবেশেও হকপথের সন্ধানীরা কোরআনের মর্মকথা খুঁজে নিতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছেন। কিন্তু যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা সীমাহীন বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়েছেন ও মুসলিম উম্মতের জন্য বিভেদের সুত্রগুলো উপহার দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর জন্য কতই না ভাল হতো যদি এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালেও বহাল থাকতো, তা হলে এই উম্মাহর ঐক্যে ফাটলের সংখ্যা অনেক কমে আসতো।

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب – أمين

(হে আমাদের রব, আমাদের অন্তরে বক্রতা দিবেন না-হিদায়াত প্রাপ্তির পর। আপনার নিকট থেকে রহমত দান করুন। আপনিই রহমত দানকারী। আমিন।)

(৩)বিভেদের তৃতীয় কারণঃ

নফসের গোলামী বা মনোবৃত্তির দাসত্ব

মানুষের নফস বা তার মনোবৃত্তি তার অস্তিত্বের সাথে মিলে মিশে আছে, যাকে বিচ্ছিন্ন করা মোটেই সম্ভব নয়। বস্তুতঃ একজন মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এই মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী। এই মনোবৃত্তির স্বাধীনতা দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটাই মানুষের স্বাধীন সত্তা। এটা আছে বলেই মানুষের সৃষ্টিগত প্রাধান্য। এরই কল্যাণে মানুষ একাধারে সৃষ্টির সেরা, আবার নিকৃষ্টতমও। এই মনোবৃত্তিই মানুষের মনে কর্মস্পৃহা জাগায়, তাকে কর্ম চঞ্চল করে তুলে। প্রত্যেকটি মানুষের মন স্বাতন্ত্রের অধিকারী। এই মনোবৃত্তির সত্যিকার রূপ আজও মানুষের নাগালের বাইরে।

মনই একটা ধারনার জন্ম দেয়, এই ধারনাই তার বুদ্ধিতে রূপ নেয়। বাইরের কোন তথ্য তার মনে একটা প্রভাব সৃষ্টি করে, সেই তথ্যভিত্তিক ধারণা পরবর্তী পর্যায়ে তার জ্ঞানের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত পক্ষে মানুষের মনের কোন ধারণা বা তার জ্ঞান ও বুদ্ধি বাইরের প্রভাবমুক্ত নয়। মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীন চিন্তার কথাটি অর্থহীন। মানুষের ধারণা, চিন্তা ও জ্ঞান বা বুদ্ধি অসংখ্য তথ্য ও প্রভাবের নিয়ন্ত্রনাধীন। যে মানের তথ্য তার জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে তার জ্ঞান বা বুদ্ধি ও সেই মানেরই হবে। তাই মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি বা চিন্তা সত্যিকার অর্থে কখনও স্বাধীন হ'তে পারে না। মুক্তবুদ্ধির যারা দাবী করেন, তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিও সুনির্দিষ্ট প্রভাব ও ধারনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন যা স্বাধীন চিন্তার নামে তাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে জ্ঞান গড়ে উঠে তাকেই সত্যিকার জ্ঞান বা ইল্‌ম বলা হয়। এ বিশ্বাস ছাড়া তথাকথিত জ্ঞানকে ইসলাম নিছক ধারণা বা অনুমান বলে মনে করে। কেননা ঐ সব জ্ঞানে কোন চুড়ান্ত সত্য নেই। এ ধরনের জ্ঞান আজ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি পেলেও কাল

www.pathagar.com

সেই ব্যক্তির কাছেই তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। একজনের জ্ঞান অন্যের কাছে জ্ঞান বলে স্বীকৃতি নাও পেতে পারে। কোন দার্শনিকের দর্শন, কোন চিন্তাবিদের চিন্তা, কোন বিজ্ঞানীর ফরমুলা, কোন তাত্বিকের তত্বই চুড়ান্ত পর্যায়ের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। বিশেষতঃ বস্তুগত জীবনের গন্ডি বহির্ভূত কোন বিষয়ের জ্ঞানকে একটা অনুমান ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।

কোরআনের ভাষায় একে বলা হয়েছে নিছক অনুমান, ধারণা বা (ظن) মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই তার মনোবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে পড়ে। মনোবৃত্তি মানুষকে যে পথে উদ্বুদ্ধ করে মানুষ সে পথেই ধাবিত হয়।

পৃথিবীর সকল ফিতনা-ফাসাদ ও নৈতিক অধঃপতনের পেছনে মনোবৃত্তির দাসত্বের ভূমিকাই মুখ্য। এ কারণেই অনেক ধর্মে ও তত্বে মনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই বৃহত্তর সংগ্রাম বলা হয়েছে। আবার মনোবৃত্তিকে দমন করতে গিয়ে মানুষের দৈহিক প্রয়োজন সহ মানুষের সামাজিক জীবনের সকল অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটাও এক ধরনের মনোবৃত্তিরই দাসত্ব।

মনের সার্বভৌমত্বের ধারনা যেমন নৈরাজ্যের হাতিয়ার, তেমনি মনোবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করার সন্যাসবাদী ধারণা মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে। এই দুই চরম পন্থি ধারণার মাঝামাঝি ধারণা হলো ইসলাম। ইসলাম মনের শক্তিকে অস্বীকার করে না, বরং মনকে নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ ভাবে ইসলামী তাযকিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত মনোবৃত্তি থেকে বিবেকের জন্ম নেয়, যা প্রতিনিয়ত মানুষকে হকের পথে উৎসাহিত করে ও অন্যায়ের পথ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, মনের অন্যায় বৃত্তির ভর্ৎসনা করে। একেই ইসলামে (نفس لوامة) বা ভর্ৎসনা কারী মন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মানুষের মনে যখন ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটে, নূর সৃষ্টি হয় বা বক্ষ উম্মেচিত হয়, তখন সে মনে এক পরম প্রশান্তি নেমে আসে। মনোবৃত্তি তার দাসে পরিণত হয়ে যায়। তার আত্মার শক্তির কাছে মনোবৃত্তি আত্মসমর্পন করে। এই পর্যায়ের মনকে কোরআনে মজিদে (نفس مطمئنة) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে মনকে নিয়ন্ত্রিত করার এটাই চুড়ান্ত পর্যায়।

অনিয়ন্ত্রিত মনোবৃত্তির দাসত্বই দ্বীন কবুল করে নিতে বাধা দেয়। ইহুদী ও খৃষ্টানদের অধঃপতনের মূলে ও মনোবৃত্তির দাসত্বই বেশী দায়ী ছিলো। ইসলামী উম্মাহর গোমরাহী ও বিভেদের পশ্চাতে ও এটাই ক্রিয়াশীল। মানুষের জ্ঞান তার ধারনা বা অনুমানেরই পরিপক্করূপ। এই জ্ঞানই ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার অভ্যাস এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে একটা Custom বা Tradition গড়ে তুলে। অনুমান-জ্ঞান ও

www.pathagar.com

অভ্যাসের ত্রিবিধ উপাদান মানুষকে হকের পথে উত্তরনে বাধা দেয়। কোরআনে মজিদে এর বিরুদ্ধে কঠোর সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

أ فريت من اتخذ الهه هواه و أضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلاتذكرون - (الجاثية)

(চিন্তা করে দেখো, যে ব্যক্তি তার মনোবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তার জ্ঞান থাকা সত্বেও তাকে হকের পথ থেকে ফিরিয়ে দিলেন। (মনোবৃত্তির গোলামীর ফল হিসেবে) এবং তার শ্রবন শক্তি ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিলেন, তার দৃষ্টিশক্তিতে পর্দা লাগিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কে হেদায়াতের পথ দেখাতে পারেন? তোমরা কি চিন্তা করে দেখবে না?)

এ প্রসঙ্গে আরোও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি, এরসাদ হয়েছে;

يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - (ص)

(হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, তাই হকের পথে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে। মনোবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।)

و ما ينطق عن الهوى ان هو الاّ وحى يوحى - (النجم)

(তিনি নিজের মন থেকে কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন সবই আল্লাহর ওহীর ভিত্তিতে বলেন।)

ثم جعلنك على شريعة من الامر فا تبعها و لاتتبع أهوا الذين لا يعلمون - (الجاثية)

(অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের পথে রেখেছি, তাই দ্বীনের পথই অনুসরণ করো এবং ঐ সমস্ত লোকদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করোনা যারা জানে না।)

لو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات و الارض - (المومنون ٧١)

(যদি সত্য তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করে তবে সারা বিশ্বজগত ও সৌর-জগতে বিশৃংখলা দেখা দিতো।)

اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و أتبعوا أهوائهم - (النحل ١٠٨)

(তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, ফলে তারা তাদের মনের দাসত্ব করেছে।)

أ فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا اهوائهم - (محمد ١٤)

(ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের রবের তরফ থেকে প্রকাশ্য যুক্তির (হেদায়াত) উপর রয়েছে তারা কি এমন লোকদের সমকক্ষ হতে পারে, যাদের মন্দকাজ গুলো তাদের কাছে চাকচিক্যময় মনে হয় এবং তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করে।)

www.pathagar.com

و قالوا انا وجدنا أباءنا على أمة و انّا على اثارهم مقتدون - (الزخرف ٢٢)

(তারা বলতো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ পথের অনুসারী হিসেবেই পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাংকেরই অনুসরণ করি।)

أو لو كان أبائهم لايعقلون شيئا ولايهتدون - (البقرة ٧٠)

(যদি ও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞানের পথে ছিলো না এবং তারা হিদায়াতার পথে ও ছিলো না।)

قل أولو جئتكم باهدى مّا وجدتم عليه أبائكم قالوا انّا بما أرسلتم به كافرون - (الزخرف ٢٤)

(আপনি বলে দিন, যদিও আমি তোমাদের কাছে এমন আদর্শ নিয়ে এসেছি যা ঐ সমস্ত পথ থেকে অনেক সরল যা তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার তরফ থেকে পেয়েছো, (তোমরা তা মানবে না) তারা জবাবে বলবে, আমরা তো ঐ আদর্শ অস্বীকার করছি, যে আদর্শ নিয়ে আপনি প্রেরিত হয়েছেন।)

ان يتبعون الاّ الظن و ما تهوي الانفس - (النجم٢٣)

(তারা অনুসরণ করে একমাত্র তাদের ধারনাকে এবং ঐ সব কিছুকে যা তাদের মনোবৃত্তি চায়।)

فان لم يستجيبوا لك فاعلم انّما يتبعون أهوائهم - (القصص ٥٠)

(তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয় তবে আপনি জেনে নিন যে তাদের সাড়া না দেয়ার কারণ হ'লো তারা তাদের মনোবৃত্তিরই অনুসরণ করছে।)

واعلم ان فيكم رسول الله لويطيعكم فى كثير من الامر لعنتم - (الحجرات ٧)

(জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান রয়েছেন, যদি তিনি অনেক ব্যাপারে তোমাদের মতামতের অনুসরণ করেন তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।)

ان الظن لايغنى من الحق شيئا - (الحجرات ٢٨)

(নিশ্চয়ই ধারনা সত্য উদঘাটনে উপকারী হয় না।)

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية - (ال عمران ١٥٤)

(তারা জাহিলী ধারনায় আল্লাহ সম্পর্কে ভিত্তিহীন ধারণায় অনুমান করে।)

ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ماهم به من علم الاّ اتباع الظن - (النساء ١٥٧)

(যারা তার সম্পর্কে বিভেদে লিপ্ত তারা আসলে সন্দেহে নিপতিত, তারা আসলে কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে নেই, বরং ধারণার আনুগত্য করে।)

و قالوا ما هى الاّ حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الاّ الدهر و ما هم بذلك من علم ان هم الاّ يظنون - (الجاثية ٢٤)

www.pathagar.com

(তারা বলতো, এটা আমাদের পৃথিবীর জীবন, এখানে আমরা জীবিত থাকি বা মৃত্যবরণ করি, একমাত্র যুগের বিবর্তনেই আমরা মৃত্যবরণ করি। এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা অনুমান করে মাত্র।)

ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الاّ الظن – (الانعام١١٦)

(যদি বিশ্বের অধিকাংশ লোকদের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে, তারা শুধু ধারনারই অনুসরণ করে।)

و اتل عليهم نبا الذى أتيناه ايتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين – و لو شئنا لرفعناه بها و لكنه اخلد الى الارض و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايتنا – فاقصص القصص لعلهم يتفكرون – (الاعراف)

(আপনি তাদেরকে ঐ ব্যক্তির ঘটনা বলুন, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে এর অনুসরণ থেকে দূরে সরে গেলো, অতঃপর শয়তান তার পেছনে লাগলো, অতঃপর সে বিভ্রান্ত লোকদের মধ্যে পরিগণিত হলো। আমি যদি চাইতাম তবে ঐ নিদর্শনের আনুগত্যের ভিত্তিতে তাকে উন্নত মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে অধঃপতনকেই আকড়ে ধরলো এবং মনোবৃত্তির দাসত্ব করলো। অতঃপর অবস্থা ঐ কুকুরের সাদৃশ্য হয়ে গেলো, তাকে যদি তুমি আক্রমন করো তবু সে লালসায় জিহ্বা বের করে থাকে। আর যদি তাকে ত্যাগ করো তবুও সে জিহ্বা বের করে থাকে, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ এমনিই। তাদেরকে এই ঘটনা বলুন, এতে হয়তো তারা চিন্তা করে দেখবে।)

সত্যকে অস্বীকার করে মনোবৃত্তির দাসত্বেরই এই চরম অধঃপতন। আসলে মনোবৃত্তির গোলামী বা নফসের দাসত্ব মানুষের চরিত্রে কুকুরের মতো লোভ ও নির্লজ্জতা সৃষ্টি করে। তার লালসার পরিতৃপ্তিই তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ায়।

আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

وانه سيخرج فى امتى أقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لايبقى منه عرق و لامفصل الا دخله – (ابو داود)

(ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যাদের মধ্যে মনোবৃত্তির ও নফসের দাসত্ব এমন ভাবে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে, যেমন পাগল কুকুরের কামড়ের বিষক্রিয়া তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে এমনভাবে যে শরীরের কোন অংশ এই বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকে না।)

www.pathagar.com

এই বিষক্রিয়া শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ায় আরোগ্যলাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আবার কোন সুস্থ ব্যক্তিকে যদি কোন বিষক্রিয়া গ্রস্থ ব্যক্তি দংশন করে। তবে সেও ঐ পাগল কুকুরের মতোই ভয়ানক হয়ে দাড়ায়। তার অস্বিত্বই মানব সমাজের জন্য বিপদের উৎস হয়ে দাড়ায়।

এ ভাবে যখন কোন ব্যক্তি মনোবৃত্তির বা নফসের দাসে পরিনত হয়ে যায় তখন তার সমগ্র অস্বিত্বই মানবতার জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। মুলতঃ এই গোমরাহী জ্ঞানের নামে সৃষ্টি হয় তাই মুর্খ্যতার ছায়ায় যে গোমরাহী সৃষ্টি হয় তার চেয়ে এটা বেশী মারাত্মক। এমনি ধরনের মানুষ যখন তার মনকেই খোদার স্থানে সমাসীন করে, তখন তার নফসের দাসত্ব তার কাছে আল্লাহর দাসত্ব বলেই প্রতীয়মান হয়। মানুষ যখন হিদায়াত প্রাপ্ত হয় তখন তার সমগ্র শক্তি-চেতনা আল্লাহর সন্তোষের জন্য উৎসর্গ করে। তেমনি যখন কোন ব্যক্তি নফসের দাসে পরিণত হয়ে যায়; তার সারা প্রচেষ্টা মনোবৃত্তির সন্তোষের জন্যই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে।

এই বিষয়টি সার্বিক ভাবে হৃদয়ংগম করার জন্য নিচের কথাগুলো মনে রাখতে হবে।

<u>প্রথমতঃ</u> কোরআনে মজিদে বা হাদিসে যেখানেই মনোবৃত্তি বা নফসের আনুগত্যের কথা আলোচিত হয়েছে। সেখানেই এর কুফলের কথাই বলা হয়েছে। কোথাও এর প্রশংসা করা হয়নি। তাই মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তার ধারণা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি। মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনচিন্তা মানুষকে প্রকৃতপক্ষে মনোবৃত্তির দাসে পরিণত করে, যা সত্যিকার প্রত্যয় সৃষ্টিকরে মানুষের কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা বা মুক্তবুদ্ধির ইতিহাসই একথার সত্যতা প্রমাণ করে।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> আল্লাহপাক মনোবৃত্তির দাসত্ব ও হিদায়াতকে দুইটা পরস্পর বিরোধী উপাদান বলে উল্লেখ করেছেন। মনোবৃত্তির দাসত্ব ও হিদায়াত একই সাথে চলতে পারে না। মনোবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে স্বার্থপর, লোভী ও নির্লজ্জ করে তুলে যা হিদায়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। হিদায়াতের নিয়ন্ত্রন ছাড়া মনোবৃত্তির বা নফসের শাসন মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করে। মানুষের গোলামী থেকে মানব সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়ে আল্লাহর দাসে পরিণত করার জন্যেই হিদায়াত এসেছে। আবার যখন তথাকথিত ধার্মিক লোকদের উপর মনোবৃত্তির দাসত্বের নেশা চেপে বসে, তখন তারা খোদার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর গোলামীর নামে মানুষকে তাদের গোলামে পরিণত করে বসে। এই সব লোকদের সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী বলেছেন, তারা গোমরাহীর এমনি এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তাদের জন্যে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কেননা তারা নিশ্চিন্তভাবে ধারনা করতে থাকে যে তারা আল্লাহরই বন্দেগী করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের মনোবৃত্তিরই দাসত্ব করছে। যখন কোন ব্যক্তি

www.pathagar.com

তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারার ভিত্তিতে কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে তখন সে ইসলামের ঐসব জ্ঞানগুলোকে মেনে নেয়, যেগুলো তার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংগতিশীল, আবার যখন কোন জ্ঞান তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে তখন কোরআন ও হাদিসের সেই শিক্ষাকে নিজের মর্জি মতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এভাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে তার মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে, এটা হলো মনোবৃত্তির বা নফসের জঘন্যতম দাসত্ব।

হিদায়াত প্রাপ্তির জন্যে মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রন অপরিহার্য। প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রন ছাড়া হিদায়াতের পথ উম্মুক্ত হয় না। মনোবৃত্তির নিয়ন্ত্রনের সীমা ও ইসলাম সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

মনোবৃত্তি বা নফসের নিয়ন্ত্রন বলতে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে ব্যবহার না করা বুঝায় না। বরং ইসলাম মানুষকে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও সুষ্ঠুবুদ্ধির প্রয়োগের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতেই মানুষ তার কর্মক্ষেত্র ও তার সীমা নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

এই জ্ঞানের ভিত্তি হতে হবে ইসলামী আকিদার মূলনীতি গুলো, তা হলেই সে জ্ঞান সত্যিকার আত্ম পরিচিতির উৎস হ'তে পারে।

আল্লাহ মানুষকে তার খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন। এই প্রতিনিধিত্বের সঠিক উপায়-উপাদান সংগ্রহ করাই হলো জ্ঞানের কাজ। মনোবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করার পরিবর্তে তাকে বিদ্রোহী করে তুলে যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর নয়।

<u>তৃতীয়তঃ</u> মনোবৃত্তির দাসত্ব ও অহীর জ্ঞান পরস্পর বিরোধী। মনোবৃত্তির দাসত্বকে উৎখাত করাই হলো ওহীর লক্ষ্য। মনের অনুসরণ ত্যাগ করেই নবীরা ওহীর জ্ঞানে বলীয়ান হয়েছিলেন। এই ওহীর জ্ঞানই হিদায়াতের উৎস। ওহীর জ্ঞান মানুষকে বিশ্বাসের দাবী জানায়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তার জ্ঞান সুসংহত হয়, যাকে ঈমান বলা হয়। ওহী স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ওহীর জ্ঞান ঈমানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। মানুষের মনোবৃত্তি তাকে এই জ্ঞানের পথে বাধা দান করে এবং জ্ঞানের সঠিক উৎস থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মনোবৃত্তির দাসত্বের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা আপাতঃ দৃষ্টিতে জ্ঞান বলে প্রতীয়মান হলেও তা তার মনোবৃত্তির ধারণা মাত্র। যা তাকে কোরআন হাদিসের অনুসরণ করতে বাধা দিয়ে ওহীর জ্ঞানের অপ-ব্যাখ্যা করতে উৎসাহ দেয়। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে,

الذين يقيسون الامور برائهم فيحلون الحرام ويحرمون الحرام –

www.pathagar.com

(যারা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের ইচ্ছা মতো কিয়াস করে এবং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলে ঘোষণা করে।)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এদের থেকে দূরে সরে থাকার জন্য মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

من أحب ان يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان و مجالسة اصحاب الاهوأ فـــان مجالســتهم الصق من الجرب –

(যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে মর্যাদা দেয় তাকে শয়তানী সহবত ও নফসের পূঁজারীদের সংস্রব থেকে দূকে থাকতে হবে, কেননা তাদের বিষাক্ত চিন্তা সংক্রমিত হয়।)

শয়তানী সহবত ও আত্মপূঁজারীদের সংস্রবই দ্বীনের ব্যাপারে ভিন্ন মতের পথ খুলে দেয়।

বিভেদের চতুর্থ কারণঃ
অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজের গোলামী।

নফস বা মনোবৃত্তি যেমন মানুষের সত্ত্বার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে আছে, তেমনি তাদের রীতিনীতি, অভ্যাস ও রসম রেওয়াজ ও তাদের অস্তিত্বের অংশ হ'য়ে যায়। এগুলো মানুষের অভ্যন্তরে গভীর প্রভাবশালী উপাদান। মানুষের অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম রেওয়াজ, তা ব্যাক্তিগত হোক বা সামষ্টিক, তাদের পরিচিতির বাহন হয়ে পড়ে, যাকে অস্বীকার করা বা অবহেলা করা অত্যন্ত সুকঠিন ব্যাপার। আবার যদি এই সব অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজের পশ্চাতে ধর্মের প্রভাব থাকে, তবে তাদের প্রভাব আরো গভীর হয়। পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এই সব রীতিনীতি, অভ্যাস বা রসম-রেওয়াজের ব্যাপকতা ও বিশালতা এতো বেশী যে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এসব রীতিনীতির অধিকাংশ আবার ধর্মের খোলসে বিদ্যমান। সভ্যতা ও শিক্ষার বিকাশে এই সব অভ্যাস ও রীতিনীতির ব্যাপকতা ও কঠোরতা অনেকাংশে হ্রাস পেলেও এর মূল অনেক গভীরে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এসবের ক্রিয়াশীলতা কমে যায় বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এ সবের রূপ পালটে যায় মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এসব অভ্যাস ও রীতিনীতির ধারক ও বাহকরা এসব কিছুর অসারতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া সত্বেও বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কারণে অস্বীকার করতে পারে না, বরং সযত্নে এসব কিছুর লালন করতে থাকে। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন রীতিনীতি ও অভ্যাস অত্যন্ত বর্ব্বর ও অশালীন ধরণের। কিন্তু সেখানের জনগণ ঐ সবগুলোর সযত্নে লালন করে যাচ্ছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্বই অভ্যাস ও রীতিনীতির উপরই টিকে রয়েছে, এমন কি সভ্যতার দাবীদার ইউরোপ ও আমেরিকাতেও অসংখ্য অযৌক্তিক রীতিনীতি রয়েছে। যার

www.pathagar.com

প্রতি সেখানের জনগণের মমত্ববোধের অভাব নেই। মানুষ তার স্বভাবজাত দূর্বলতার রোগে আক্রান্ত। এগুলো দেখে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় এগুলো মানুষের সহজাত।

এসব রীতিনীতি তাদের স্বকীয়তার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে ঐ সব অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজকে Custom কিংবা Culture বা Heritage বলে চিহ্নিত করা হয় এবং ঐ সমস্ত জনগোষ্ঠির জন্য মূল্যবান সম্পদ বলে উল্লেখ করে এর সংরক্ষনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়। এই অনুভূতিও মানুষের সহজাত। পক্ষান্তরে মানুষের যে সব অভ্যাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ ধর্মভিত্তিক গড়ে উঠে, আস্তে আস্তে সেগুলোই মূখ্য ধর্মীয় কাজ বলে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ঐগুলোকে ত্যাগ করা তাদের কাছে প্রকারন্তরে ধর্মকেই ত্যাগ করা বলে মনে হয়। এই সব অভ্যাস, রীতিনীতি বা রসম-রেওয়াজই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভেদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে।

মানব সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস, রীতিনীতির উম্মেষ ঘটেছে। ইসলামের দীর্ঘ ১৪ শত বছরের ব্যবধানে বিভিন্ন ভৌগিলিক বা আঞ্চলিক প্রভাবে অনেক রীতিনীতি মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে। আবার কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান অন্যান্য জাতির রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান থেকে এসেছে। অবিভক্ত ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই ইসলাম সম্প্রসারিত হয়েছিলো। বিশাল ভূখন্ডের কোটি কোটি মানুষ নিজেদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামের ঝান্ডাতলে সমবেত হয়। তাদের পূর্বতন অভ্যাস, রীতিনীতি, আচার ইত্যাদি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের ইসলামী জীবনেও এসব তাদের স্বকীয়তার পরিচায়ক হ'য়ে টিকে থাকে। এ সবগুলো তাদের নতুন ধর্মবিশ্বাসের সাথে মিলে মিশে আরো নতুন নতুন রসম-রেওয়াজের জন্ম দেয়। এ সবগুলো তাদের জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। তদুপরি এই উপমহাদেশে যে সমস্ত দেশের লোকেরা শাসন করেছে, বিশেষতঃ ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের অনেক রীতিনীতি, অভ্যাস ও আচার আমাদের রীতিনীতি অভ্যাস ও আচারের সাথে মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। অতঃপর দীর্ঘদিনের অনুসরণ করার ফলে এগুলো আমাদের রীতিনীতি, অভ্যাস, সস্কৃতি বা Heritage এর অংগ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমাদের এমন অসংখ্য অভ্যাস, রীতি বা আচার রয়েছে যা ধর্মীয় কাজ বলে পরিগণিত বা অন্যকথায় অপরিত্যাজ্য। এসব রসম-রেওয়াজের যুপকাষ্টে ইসলামের সঠিক মূল্যবোধের বিকাশ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এসব নিয়ম নীতি, অভ্যাস, আচার বা রসম-রেওয়াজ বিভেদের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিভেদের পঞ্চম কারণঃ পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ।

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ টিকে থাকলে এবং ভিন্ন মত প্রকাশের নিয়ম নীতি মেনে চললে মতপার্থক্য বিরোধে বা বিভেদে পর্যবসিত হয় না। কেননা সেখানে অনাস্থা ও বিদ্বেষ দেখা দেয় না। সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও মত পার্থক্য ছিলো। তারা ভিন্ন মত প্রকাশের নিয়ম নীতি মেনে চলতেন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ভুলে যেতেন না। তাই তাদের মত পার্থক্যকে বিরোধ বা বিভেদ বলা হতো না। কিন্তু পরবর্তিকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অভাব দেখা দেয় ও সংগত মত পার্থক্য প্রকাশ করতে গিয়েও পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেতে থাকে, ফলে তা বিভেদের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, অতঃপর অবাঞ্ছিত বিরোধ দেখা দিলে তা চরম শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। একই ধরনের মত পার্থক্য যা সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছে, তাকে ইতিহাসে কোন দিনই বিরোধ বা বিভেদ বলা হয়নি, বা তা কোন বিভেদই ছিলো না, কেননা তাদের মধ্যে অনাস্থা ও বিদ্বেষের সম্পর্ক ছিলো না। পক্ষান্তরে সেই একই ধরনের মত পার্থক্য পরবর্তি পর্যায়ের মুসলমানদের মধ্যে চরম অনাস্থা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বিভেদের পথ খুলে দিয়েছে। আসলে মত পার্থক্য বিভেদের কারণ নয়, বরং পরস্পরে অনাস্থা-বিদ্বেষের মনোভাব এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অভাবই মূলতঃ বিরোধ ও বিভেদের কারণ। পারস্পারিক অনাস্থা ও বিদ্বেষ ইসলামী ঐক্যের পথে বিরাট বাধা ও বিষাক্ত উপাদানের কাজ করে। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেলেই অনাস্থা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এজন্যে ইসলাম ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সমুন্নত রাখার উপর সদা গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনকে পর্যুদস্ত করতে যে সমস্ত মানবীয় রোগ সর্বাধিক কার্যকরী, ইসলাম সেই সমস্ত রোগকে উৎখাত করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। পারস্পারিক আস্থা ও সৌহার্দতা বজায় রাখার জন্যে সর্বতোভাবে যত্নবান হতে হবে।

বিভেদ থেকে মুক্তির স্থায়ী ব্যবস্থা।

বিভেদ মানবেতিহাসের প্রাচীনতম সংক্রামক রোগ। প্রতিযুগে নবী রাসুলদের আগমনের ফলে এই রোগ কখনো মানব জাতির উপর চুড়ান্ত আঘাত হানতে পারেনি। যখনই মানব সমাজ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়ে বিভেদে লিপ্ত হতো, নবীরা আগমন করে খিলাফতের দায়িত্বানুভূতি নবতর উপায়ে সৃষ্টি করে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করেন। নবীদের শিক্ষাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি। মানবেতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এই ব্যবস্থার পুনারাবৃত্তি হয়েছে বারে বারে। এ জন্যে পূর্বজন উম্মতদের মধ্যে বিভেদ দূর করার জন্য কোন চিরস্থায়ী ব্যবস্থার তেমন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু যেহেতু আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত শেষ নবীর শিক্ষাকে জীবন্ত রাখার

www.pathagar.com

অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য্য। তাই মুসলিম উম্মাহর বিভেদে এর মূল অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়ে পড়ে, সেজন্যে বিভেদ থেকে মুক্তির জন্যে স্থায়ী ব্যবস্থা রাখা খুবই যুক্তি সংগত। আল্লাহপাক তার শেষ নবীকে এমনি এক সুদৃঢ় ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, যা ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরমুলা। এরই মাধ্যমে এই উম্মাহ বিভেদের মাঝে ঐক্যের রাজপথে উত্তরণ করতে পারে। যারা পূর্বতন উম্মতদের বিভেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবে না ও শেষ নবীর ঐক্যের ফরমুলা গ্রহণ করবে না, তারাই বিভেদের শিকার হবে। কোরআনে মজিদে এই সুস্পষ্ট মূলনীতি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে;

يا ايها الذين أمنوا أطيعوا الله و أطيعو الرسول و اولى الامر منكم ، فان تنازعتم فى شىئ فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر ، ذلك خير و أحسن تأويلا – (النساء)

(হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহর এবং আনুগত্য করবে রাসুলের এবং তাদের যারা নির্দেশ দেবার ক্ষমতা রাখে। যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি প্রত্যার্পন করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখো। এটাই উত্তম ও পরিনামের দিক দিয়ে ভাল।)

এই আয়াতে আল্লাহপাক তিনটি আনুগত্যের কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে দুইটি হলো মূল আনুগত্যের কেন্দ্র আর তৃতীয়টি হলো প্রথম মূল দুটি আনুগত্যেরই অধীন। কোরআনের আয়াতে (اطيعوا) 'আনুগত্য করো' শব্দটি দুইবার দুইটি কেন্দ্রের সাথে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় আনুগত্যের কেন্দ্রটির আগে এই শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যই মূল আনুগত্য। উলিল আমর (নির্দেশের অধিকারী) এর আনুগত্য কোন মৌলিক আনুগত্য নয়। এ জন্যে আয়াতে এর পূর্বে 'আনুগত্য করো' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তাদের আনুগত্য আসলে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের অধীন। এর অর্থ এই যে তাদের নির্দেশ যদি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের গন্ডির মধ্যে হয় তবেই তাদের আনুগত্য করতে হবে। অন্যথায় তাদের আনুগত্য বৈধ নয়। বস্তুতঃ আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহরই। কিন্তু নবীর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব নয়। নবীর আনুগত্যকে অস্বীকার করলে আল্লাহর আনুগত্যকেই অস্বীকার করা হয়। আল্লাহ এরসাদ করেছেন,

من يطع الرسول فقد اطاع الله –

(যারা রাসুলের অনুসরণ করলো তারা আল্লাহরই অনুসরণ করলো)

এজন্যে রাসুলের আনুগত্যকে মূল আনুগত্যের কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'উলিল আমর' এর মধ্যে ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি অন্তর্ভূক্ত যারা কোন না

www.pathagar.com

কোন পর্যায়ে দায়িত্বশীল। সরকার, নেতা, পীর, সেনাপতি, বিচারপতি, উলেমা সহ সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলরা শামিল রয়েছেন। মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সামষ্ঠিক জীবন ব্যাহত হতে না পারে এই লক্ষ্যে এই আনুগত্য অপরিহার্য। আনুগত্যের এই অধিকারীদেরকে অবশ্যই মুমিন হতে হবে। অমুসলিমদের জন্যে কোন আনুগত্য নেই। কোরআনের আয়াতে (منكم - তোমাদের মধ্য থেকে) শব্দের ছাড়া একথাটি সুস্পষ্ট।

হাঁদিসে বলা হয়েছে;

لاطاعة فى معصية انما الطاعة فى المعروف – (متفق عليه)

(আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমানীর মধ্যে আনুগত্য নেই, বরং সৎকাজের মধ্যেই আনুগত্য।)

لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق –

(স্রষ্টার অবাধ্যতার মাধ্যমে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।)

যখনই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন দেখা দেবে তা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি প্রত্যার্পন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যই মুখ্য হতে হবে। আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের পরিপন্থি কোন ফয়সালা দেবার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের পরিপন্থি যে কোন ধরনের ফয়সালা, তা যাদের তরফ থেকেই হোক না কেন, তার আনুগত্য বৈধ নয়। এই মূলনীতি থেকে সুস্পষ্ট হ'য়ে যায় যে ইসলামে কোন পোপবাদ বা ধার্মিকদের শাসন বলে কিছু নেই, যাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Theocracy বলা হয়েছে। শাসক বা অন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ধার্মিক হলেই তাদের নিঃশর্ত আনুগত্য পাবার অধিকার নেই। বরং প্রতিটি বিষয়ের আনুগত্য স্বতন্ত ভাবে আল্লাহ রাসুলের আনুগত্যের নিক্তিতেই পরিমাপ করতে হবে।

কোরআন হলো আনুগত্যের মুলকেন্দ্র আর কুরআনের ব্যাখা হলো সুন্নাহ। সুন্নাহর অর্থ হলো, রাসুলের আদেশ ও নিষেধ, (কথা) তার আমল এবং কারো কোন কথা বা কাজের প্রতি সমর্থন দান। কোরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন তৃতীয় পক্ষের নিজস্ব কোন আনুগত্য নেই। উলুল আমরের আনুগত্য তথা ইযমা বা কিয়াস বস্তুতঃ কোরআন ও হাদিসেরই অনুসরণ। ইসলামী আনুগত্যের এই দুই উৎস সম্পর্কে কোরআনে মজিদে ও হাদিসে বার বার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরসাদ হয়েছে,

فلا وربك لايومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما – (النساء)

(আপনার রবের শপথ, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিস্পত্তিতে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে না নিবে তারা মুমিন হতে পারবেনা। অতঃপর

www.pathagar.com

তারা আপনার ফয়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা পাবেনা ও মনে প্রাণে আত্মসমর্পন করবে।)

ماكان لمومن و لامومنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلا لا مبينا – (الاحزاب)

(কোন ইমানদার নর কিংবা নারীর জন্যে কোন স্বাধীনতাই থাকবেনা যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল ফয়সালা দিয়ে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসুলের ফয়সালার উপরে নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেবার কোন অবকাশ নেই।)

ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله –

(যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ করো, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।)

ان الذين يبايعونك انما يباعون الله يد الله فوق ايديهم –

(যারা আপনার কাছে বাইয়াত করে তারা আল্লাহরই কাছে বাইয়াত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে।)

و ما أتا كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا – (الحشر)

(আল্লাহর রাসুল যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ করো, আর যে সব কিছু থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো।)

فامنوا بالله و رسوله و النور الذى انزلنا و الله بماتعملون خبير – (التغابن)

(অতঃপর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান নাও এবং ঐ নূরের উপর বিশ্বাস করো যা আমি অবতীর্ণ করেছি। তোমরা যা কিছু করছো, আল্লাহ তা ওয়াকিফহাল।)

وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله – (النساء)

(আমি যতো রাসুল পাঠিয়েছি সবাইকে আল্লাহর নির্দেশে আনুগত্য করার জন্যেই পাঠিয়েছি।)

হাদিসে বলা হয়েছে,

تركت فيكم امرين لن تضلــــوا مــــا ان تمســـكتم بهمـــا كتـــاب الله و ســـنة رســـوله – (المشكوة)

(আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত। তোমরা যতদিন এ দু'টাকে অবলম্বন করে রাখবে, কখনো বিপথগামী হবেনা।)

ان الله فرّض فرائض فلاتضيعوها و حرّم حرمات فلاتنتهكوها وحدّ حـــدودًا فلاتعتدوهـــا و سكت عن اشياء من غير نسيان فلاتبحثوا عنها – (المشكوة)

www.pathagar.com

(আল্লাহ ফরজ সমুহ নির্ধারন করেছেন, সে সব ছেড়ে দিওনা, এবং হারাম সমুহকে অবৈধ করে দিয়েছেন, সে সব লংঘন করোনা, এবং দ্বীনের সীমা নির্ধারন করে দিয়েছেন, সে সীমা অতিক্রম করো না, এবং কিছু বিষয়ে জেনে শুনে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা সে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করোনা।)

মূলনীতি বাস্তবায়নে সাহাবাদের ভূমিকা

সাহাবায়ে কেরামদের যামানা পর্যন্ত এই মূলনীতিকে সত্যিকার অর্থে মূল্যয়ান করা হতো। তারা সকল বিষয়ে আল্লাহর নবীর উপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করতেন। তারা রাসুলের মতামতকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। কোন ব্যাপারে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রমান চাইতেন না। তারা জানতেন ও বিশ্বাস করতেন যে রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। তৃতীয় কেন্দ্রের আনুগত্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ছিলো। হযরত উমর বলেছেন,

أيها الناس انما كان رسول الله صلىّ الله عليه و سلم مصيبا لان الله كان يريه و انما هو منـــا الظن و التكلف –

(হে জনগণ, আল্লাহর নবীর রায় সঠিক হতো, এ জন্যে যে তা আল্লাহর তরফ থেকে আসত, আল্লাহর সিদ্ধান্তই নবীর রায় হতো। পক্ষান্তরে আমাদের রায় হলো অনুমান ও ধারনা সর্বস্ব।)

একদা হযরত উমরের সেক্রেটারী তার এক সিদ্ধান্তের ভূমিকায় লিখেছিলেন;

(هذا ما ارای الله امير المومنين عمر)

"এই সিদ্ধান্তটি তাই যা আল্লাহ পাক আমেরুল মুমেনীন উমরের ধারনায় অর্পণ করেছেন", হযরত উমর এতে আপত্তি করে নিচের কথাটি লিখতে বললেন,

(هذا ما رای أمير المومنين عمر)

(এই সিদ্ধান্ত আমিরুল মুমেনীন উমরের ধারনা মতে দেয়া হয়েছে)

তারা আমেরুল মুমেনীনের আনুগত্যকে সতন্ত্রভাবে আনুগত্যের কেন্দ্র মনে করতেন না, বরং তারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যকেই আনুগত্যের মূল সুত্র মনে করতেন।

সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা, কেননা তারা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন করেছিলেন। সাহাবাদের পরবর্তিকালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কোরআন ও সুন্নাহকে আনুগত্যের মূলকেন্দ্র হিসেবে মেনে নেয়া সত্বেও এর মর্ম নির্ধারনে ভিন্নমতের উদ্ভব ঘটে। এ জন্যে পরবর্তিকালের লোকদের জন্যে সাহাবায়ে কেরামদের মতামতকে মানদন্ড করা হয়েছে। উম্মাহর ঐক্যে যতো বিভেদেই হয়েছে, বা যারাই কোন স্বতন্ত্র মত বা পথ বের করেছেন,

www.pathagar.com

সবাই দাবী করেছেন যে তাদেরই মতামতই কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখা। সকল বিভেদের উদ্যোক্তারাই তাদের ভিন্নমতের জন্যে কোরআনকেই বুনিয়াদ বানিয়েছেন। অন্যকথায় তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে কোরআনের ব্যাখা দিয়েছেন। এ জন্যে আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদের মতামতকে সত্যের মানদন্ড বানিয়েছেন। কেননা নবীর পর দ্বীন বা শরীয়তের সঠিক ব্যাখা দেবার যোগ্যতা সাহাবাদেরই বেশী। যারা সুদীর্ঘ সময় ধরে রাসুলের সাহচর্য্যে ইসলামের শিক্ষা লাভ করেছেন। কোরআন হাদিসের সঠিক অর্থ ও অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করেছেন। তাদের চেয়ে বেশী আর কেউ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেনা। অর্থাৎ নবী জীবনের আদর্শে যেমন কোরআনের সঠিক ব্যাখা ও প্রয়োগ সুস্পষ্ট, তেমনি বৃহত্তর প্রয়োগে ও ব্যাখায় নবী পরবর্তিকালে সাহাবারা উম্মতের জন্যে নমুনা। এ পথেই উম্মত ব্যাপকতর বিরোধের পথ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণের তাগিদ উম্মাহর জন্যে বিশেষ রহমত স্বরূপ। আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন

فانه من يعش منكم فيرى اختلافا كثيرا – فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو عليها بالنواجذ واياكم و محدثات الامور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار –

(তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক বিভেদ দেখতে পাবে, সে অবস্থায় তোমাদের করনীয় হবে আমার সুন্নাত মেনে চলা ও মেনে চলা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে, যারা নিজেরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন। তাদের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং দ্বীনের মধ্যে নবতর সংযোজন থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা দ্বীনের মধ্যে নবতর সংযোজন অবাঞ্ছিত নতুনত্ব, প্রত্যেকটি নবতর সংযোজন হলো বিভ্রান্তি বা গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামে যাবে।)

এই হাদীসে আল্লাহর রাসুলের সুন্নতের অনুসরণের সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে ও অনুসরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, সুন্নতে রাসুল বুঝতে অসুবিধে হলে খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাখ্যা মেনে নিতে হবে। রাসুলের পর দ্বীন ইসলামের পথে ঐক্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো ৩০ বছরের জন্য আরো একটি মজবুত ভিত্তি দিয়ে দেয়া হলো, যা বিভেদের বিপদ থেকে উম্মতকে রক্ষা করবে। রাসুলের ভাষায় এই খিলাফত সম্পর্কে স্পষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে,

الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا –

(আমার পর ৩০ বছর খিলাফত টিকে থাকবে অতঃপর আসবে রাজতন্ত্র)

www.pathagar.com

হযরত আলীর সাহাদাতের মধ্যে দিয়ে খিলাফতের যুগ শেষ হয়ে যায়। এখানে ঈমামগণ উল্লেখ করেছেন যে যদি খিলাফতে রাশেদার যুগের আদর্শিক চরিত্র পরবর্তী কোন নেতৃত্বে প্রকাশ পায় তবে তাকে ও খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। এ কারণেই পরবর্তীযুগের উমর বিন আবদুল আযিয-কে খলিফায়ে রাশেদের সম্মান দেয়া হয়েছে, বা তার যুগকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বলা হয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের খিলাফত ৩০ বছরেই শেষ হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কেরাম কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখায় মানদন্ড

আল্লাহর নবী (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের উপর খুবই আস্থা রাখতেন, তাদের সার্বিক চরিত্র গড়ে উঠেছিলো আল্লাহর নবীর সহচার্যে। তারা কোরআনের মর্মে, এর প্রয়োগে ও নবীর সুন্নতের হিকমত সম্পর্কে যতো ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান রাখতেন। সে পর্যায়ের জ্ঞান অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আল্লাহর নবী তার নবুয়তী জ্ঞানে জানতেন যে পরবর্তীযুগে মুসলমানদের মাঝে বিভেদের সুত্রপাত হবে। ইসলামের সঠিক পথের অন্বেষায় বিভেদের বুনিয়াদ পড়বে। এ জন্যে তিনি তার সর্বাধিক বিশ্বস্থ সহচরদের কাছ থেকে সঠিক ব্যাখ্যা নেবার জন্যে অসিয়ত করে গেলেন। সাহাবাদের ঈমান, জ্ঞান ইসলামী চরিত্রের প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। এরসাদ হয়েছে,

صحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم –

(আমাদের সাহাবারা তারকা সাদৃশ্য, তাদের মধ্যে তোমরা যাকেই অনুকরণ করো না কেন, তোমরা সঠিক পথের দিশা পাবে।)

এখানে আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাহাবাদের প্রশংসা করা নয়, বরং এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে সাহাবাদের জামাত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র, নিষ্ঠা ও দ্বীনি জ্ঞানে পরবর্তীযুগের মুসলমানদের জন্যে অনুসরণীয়। সাহাবাদের সামষ্ঠিক জীবনে ইসলামের যে চিত্র ও রূপ ফুটে উঠেছে, সেটাই ইসলামী ব্যবস্থার আসল মডেল। যে কোন ধরনের মত-পার্থক্যে ও বিভেদে এবং দ্বীনি সমস্যার সমাধানে সাহাবাদের জীবনকে মানদন্ড হিসেবে মেনে নিতে হবে। ইবাদাত-বন্দিগীতে, রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতিতে, দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে, পারস্পারিক বিরোধ নিস্পত্তিতে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও অপরাপর সকল প্রয়োজনে সাহাবায়ে কেরামদের মডেলকে সামনে রাখতে হবে। ইসলামের যে চিত্র সেখানে পাওয়া যায় সেটাই ইসলামের আসল চিত্র। সাহাবায়ে কেরামদের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ পদ্ধতির চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি আর কারো কাছে আশা করা যায় না। কাজেই এ কথা বলার কারো দুঃসাহস করা উচিত নয় যে দ্বীনের কোন কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামদের চাইতে পরবর্তীযুগে কোন কোন ব্যক্তি বেশী বুঝতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছেন। হ্যাঁ, ইসলামের মূল শিক্ষা বা সাহাবায়ে কেরামদের প্রয়োগের মাঝে যেখানে বিভিন্ন মতামতের সুযোগ রয়েছে বা উম্মতের সার্বিক স্বার্থে যেখানে চিন্তা গবেষণা ও বিভিন্ন পথ ও মতের সন্ধান করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, সেখানে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়নি। বরং ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ খোলা রাখা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণও সে সব ক্ষেত্রে এ অধিকার খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করে পরবর্তিযুগের লোকদের জন্যে আদর্শ রেখে গেছেন। আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত যেখানে ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ খোলা রেখেছে, সেখানে ভিন্নমত বা রায় কোন বিভেদ নয়। একে অভিশাপ না বলে রহমত বলা হয়েছে। ইসলামের মত একটি আদর্শ যা হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অসংখ্য ভাষাভাষী ও ভৌগলিক এলাকার লোকেরা মানবে তাদের সমস্যার ধরণ ও বিভিন্নতাকে ইসলামের ঐক্য- সুত্রে অভিন্ন উম্মাহ হিসেবে টিকিয়ে রাখবে। সেখানে ইজতিহাদ বা গবেষণার পথ রূদ্ধ হয়ে গেলে একটা গতিশীল আদর্শ চলতে পারেনা। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে ইজতিহাদের নিয়ম-পদ্ধতি গুলো সাহাবাদের আমল থেকে নিতে হবে। যদি সাহাবা পরবর্তীকালে যদি সার্বিকভাবে আন্তরিকতার সাথে এই মূলনীতিকে কার্যকরী করা হতো। তবে এই মুসলিম উম্মাহ অধিকাংশ অবাঞ্ছিত বিভেদের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারতো। আবার যদি আজকের মুসলিম উম্মাহ এই মূলনীতিকে সকল বিভেদের মিমাংসায় মূলনীতি হিসেবে মেনে নেয় তবে অধিকাংশ বিভেদের অবসান ঘটতে পারে।

সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ করার হিকমত এটাও যে কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন পটভূমিতে। সাহাবায়ে কেরামগণ আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অনেকের পান্ডিত্য ছিলো সর্বস্বীকৃত। তারা আয়াতগুলোর অবতীর্ণ হবার পটভূমি সহ সার্বিক অর্থ সাথে সাথে বুঝতে পারতেন, যদি কোথাও ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করতেন, সাথে সাথে রাসুলের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। তাই কোরআনের শাব্দিক ও অভ্যন্তরীণ সব অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যেতো, কোন বিশেষ তাৎপর্যই গোপন থাকতো না। বস্তুতঃ কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা কোন দার্শনিক তত্ব নয়, বরং সুস্পষ্ঠ হিদায়াত, কোরআন ও সুন্নাহর সমগ্র শিক্ষা এই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরেই অবতীর্ণ। এর মধ্যে নিত্য নতুন অর্থ খুঁজে বের করার কোন অবকাশ নেই। সাহাবায়ে কেরামগণই এর শব্দ ও অর্থের রক্ষক। রক্ষকদের ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ে এই ইলমের শাব্দিক ও অর্ন্তনিহিত মর্মার্থ খুঁজে বের করতে অনেক সুড়ঙ্গ পথ বের করে বিভেদের পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। তা সবই এই মূলনীতিকে অবহেলা করার বিষফল।

বস্তুতঃ কোন রাসুলকেই তার সহচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও নবুয়তী মিশনে তার সাফল্য তার সহচরদের মাঝে প্রতিফলিত হয়। মহানবীর সহচরদের মতো এমন বলিষ্ঠ ও অনাবিল চরিত্রের অধিকারী সহচর আর কোন নবী-রাসুল পাননি। অনেক ইহুদী পন্ডিতও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন,

www.pathagar.com

অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এভাবে যে যদি তাদের নবীর সাথে এমনি অনাবিল চরিত্রের অধিকারী একদল সাথী থাকতেন, তবে তাদের ধর্ম দীর্ঘদিন ধরে অজানা হয়ে থাকতো না। এমনি চরিত্রের সাহাবাদেরকেই এই উম্মতের জন্য অনুসরণীয় করা হয়েছে।

এই মূলনীতিতে ইসলামের শিক্ষাকে তার মৌলিকত্বের উপর স্থায়ীত্ব প্রদান করার পর দ্বীনের বিষয়ে পরবর্তীযুগে কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করার প্রয়াসকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কোন নতুনত্ব সৃষ্টির কোনও প্রয়াসকেই ইসলামী পরিভাষায় বিদয়াত বলা হয়েছে।

বিদয়াতের সংগা ও স্বরূপ

বিদয়াত আরবী শব্দ (بدع) থেকে এসেছে, এর শাব্দিক অর্থ হলো, 'নতুন সৃষ্টি' 'নিজের বানানো' বা 'ভিত্তিহীন কোন কথা বা কাজ'।
কোরআনের আয়াতে এই শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:-
(بديــــع الســـموات والارض) আল্লাহ্ আসমান জমিনকে নতুনভাবে সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ আসমান-জমিন সৃষ্টিতে আল্লাহ্ কোন নমুনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেন নি, বরং সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে,

(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علـيـــهم) এবং সন্যাসবাদকে তারা নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছে, যা আমি তাদের উপর ফরজ করিনি।
এমনিভাবে অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

(قل ما كنت بدعامن الرسـل) -বলুন আমি কোন উদ্ভট (নতুন) নবী নই। অর্থাৎ নবুয়তের চিরন্তন ধারারই আমি একজন নবী, নবতর কোন কিছু নই। প্রথম আয়াতে 'নবতর সৃষ্টির' অর্থে, দ্বিতীয় আয়াতে 'নিজেদের বানানা বা ভিত্তিহীন' অর্থে ও তৃতীয় আয়াতে 'উদ্ভট বা নবতর সংযোজনার' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু শরীয়তে বিদয়াতের অর্থ একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, কিন্তু সার্বিকভাবে উপরের অর্থগুলো অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে বিদয়াত বলা হয় দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোন বিষয়ের সংযোজন করা, যার অস্তিত্ব কোরআনে মজিদে বা রাসুলের সুন্নাহ্ বা সাহাবায়ে কেরামদের যুগে ছিলো না, বা প্রসিদ্ধ ঈমামদের ইজতিহাদে অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে যা দ্বীনের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। যাকে দ্বীনের কাজ মনে করে এর অংশে পরিণত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যে সব হাদিসে বিদয়াতের সমালোচনা করে উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো;

ایاکم و محدثات الامور فان کل محدثة بدعة و کل بدعةضلالة و کل ضلالة فی النار.

(তোমরা দ্বীনের মধ্যে নবতর সংযোজন করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা দ্বীনের ব্যাপারে নবতর সংযোজন হলো অবাঞ্ছিত নতুনত্ব। প্রত্যেক অবাঞ্ছিত নতুনত্ব গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে যাবে)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে;

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد – (رواه البخاری والمسلم)

(যে ব্যাক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে যা এর মধ্যে ছিলো না। তবে তা পরিত্যক্ত হবে)

ماأحدث قوم بدعة الاّ رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خیر من احداث بدعة –

(যখন কোন কওম বেদয়াত সৃষ্টি করে, সেই বিদয়াতের পরিমাণে সুন্নাত উঠিয়ে নেয়া হয়। তাই ঐ (উঠিযে নেয়া) সুন্নতের অনুসরণই তাদের জন্যে বিদয়াত সৃষ্টির চাইতে উত্তম।)

ما ابتدع قوم بدعة فی دینهم الاّ نزع الله من سنتهم مثلها ثم لایعیدها الیهم الی یوم القیامة –

(যখন কোন কওম তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদয়াত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহপাক তাদের ঐ সব সুন্নত থেকে যার উপর তারা আমল করতো, কিছু অংশ ছিনিয়ে নেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত সেই সব ছিনিয়ে নেয়া সুন্নত আর ফেরত দেয়া হবে না।)

من وقّر صاحب بدعة فقداعان علی هدم الاسلام –

(যে ব্যক্তি কোন বিদয়াতপন্থী লোককে সম্মান দেবে, সে ইসলামকেই ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।)

لایقبل الله لصاحب بدعة صومًا و لاصلوة و لاحجاً ولاعمرةً و لاجهادا ولا صرفًا ولاعدلاً– یخرج عن الاسلام کما یخرج الشعر من العجین –

(আল্লাহপাক বেদয়াতপন্থী ব্যক্তির কোন রোজা, নামাজ, হজ্ব, উমরাহ, জিহাদ, ফরজ বা নফল, কবুল করবেন না, তারা দ্বীন ইসলাম থেকে এমনি বেরিয়ে যাবে যেমন আটা থেকে চুল বেরিয়ে আসে।)

ان الله حجب التوبة عن کل صاحب بدعة حتی یدع بدعته –

(আল্লাহপাক বিদয়াতপন্থী লোকদের জন্য তওবার দরজা বন্ধ রেখেছেন, যতক্ষণ না তারা বিদয়াতের পথ ছেড়ে না দেয়।)

خیر الهدی هدی محمد و شرالامور محدثاتها و کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة –

www.pathagar.com

(সকল রাস্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাস্তা হলো হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এবং সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হলো নতুনত্ব, দ্বীনের প্রত্যেক নতুনত্বই গোমরাহী।)

এই হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিদয়াত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এজন্যেই আল্লাহর নবী এই অভিশাপ থেকে দুরে সরে থাকার জন্যে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোন আমলকে তখনই বিদয়াত বলা যাবে, যখন তার মধ্যে নিচের কয়েকটি শর্ত পাওয়া যাবে।

প্রথমতঃ দ্বীনের মধ্যে কোন নবতর সংযোজন। মানুষের জীবনের ব্যবহারিক বা বস্তুগত কোন বিষয়ে নবতর সংযোজনাকে বিদয়াত বলা হয় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও অর্থনৈতিক প্রগতির নবতর কাঠামো ও এই পর্যায়ের নতুনত্ব, যা বিদয়াতের মধ্যে পড়ে না। শুধুমাত্র দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন নতুনত্ব সৃষ্টি করাকেই বিদয়াত বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ রাসুলের কিংবা সাহাবাদের যামানায় যে সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের অবকাশ থাকা সত্বেও সে সবের অনুপস্থিতি। কিন্তু পরের যামানায় সে সব বিষয় সংযোজন করা। যেমন ইবাদাত-বন্দেগীর কোন ও আমল যা রাসুল বা সাহাবাদের যামানায় খুঁজে পাওয়া না যায়। কিন্তু পরবর্তি যামানায় তার সংযোজন। কেন না নবী বা সাহাবাদের চেয়ে আর কেউ ইবাদাত বন্দেগীতে বেশী তৎপর, তা চিন্তা করা যায় না। যতো ধরনের আমলের মাধ্যমে ইবাদাত বান্দেগী করা যায়, বা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়, তার কোনটাই তারা ছেড়ে দেননি, তাই নবী ও সাহাবারা যে সমস্ত আমলকে ইবাদাত হিসেবে গ্রহণ করেন নি, সেগুলো আসলে ইবাদাত নয়। তেমনি আমলের সংযোজনকেই বিদয়াত বলা হবে।

তৃতীয়ত: দ্বীনের মধ্যে এমন কাজের সংযোজন যাকে সওয়াবের কাজ মনে করা হবে। সেই কাজ যারা করবে তাদেরকে ভাল এবং যারা করবেনা তাদেরকে মন্দ বলা হবে।

চতুর্থত: যে নবতর সংযোজিত কাজকে অপরিহার্য কাজ মনে করা। সেই কাজ করা বা না করাকে ভাল বা মন্দের মানদন্ড করা। সে গুলো করলে শুধু সোয়াবই হয়না, বরং যারা করেনা তারা গোনাহগার হবে। অর্থাৎ কাজটিকে দ্বীনের জন্য অপরিহার্য কাজ বলে বিবেচনা করা।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে তাকে বিদয়াত বলা হবে। এমনি বিদয়াতের কাজকে ইসলাম অবৈধ ঘোষনা করেছে এবং পরবর্তীযুগে এ ধরনের কাজই বিভেদ ও বিরোধের পথ খুলে দিয়েছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে।

ইসলামে এই বিদয়াতকে অবৈধ করা হয়েছে যে সমস্ত কারণে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

১. আল্লাহ পাক এরসাদ করেছেন,

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا -

(আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্যে আমি ইসলামকেই পছন্দ করেছি।)

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে জানিয়েছেন যে তিনি তার মনোনীত দ্বীন হিসেবে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগ,মূল বিষয় গুলো তথা এর শাখা প্রশাখাকে পুর্ণ অব্যয়বে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, এর মধ্যে নতুন কোন সংযোজনের প্রয়োজন নেই। তাই বিদয়াতের প্রয়াস কোরআন বিরোধী ও পরিতাজ্য। ইমান মালেক এর কি সুন্দর ব্যাখা দিয়েছেন এভাবে,

من ابتدع فى الاسلام بدعة يراها حسنة فقدزعم أن محمد صلىّ الله عليه و سلم خان الرسالة فان الله سبحانه يقول اليوم اكملت لكم دينكم ، فما لم يكن يومئذ دينا فلايكون اليوم دينا

(যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদয়াত সৃষ্টি করে এবং তাকে নেকীর কাজ মনে করে, সে পক্ষান্তরে এ কথাই ঘোষনা করে যে আল্লাহর নবী তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন (نعوذ بالله) কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, আমি তোমাদের জন্যে দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি। তাই যে কাজ রাসুলের যামানায় দ্বীন হিসাবে পরিগণিত ছিলো না, তা আজ ও দ্বীন হতে পারে না।)

ইসলাম পুনাংগ দ্বীন দিয়েছে, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছে। এ সব কিছুর নিয়ম নীতি পেশ করেছে। কোন বিষয়েই নতুন কিছু সৃষ্টি করার কোন অবকাশ রাখা হয়নি।

মুসলমানদের সমাজে প্রচলিত যে কোন নব্য দ্বীনি কাজ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এর দ্বারা মিল্লাতের কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ হয়েছে বেশী। যদি ঐ নতুন কাজটির প্রচলন করা না হতো তবে ইসলামের কি ক্ষতি হতো? পক্ষান্তরে ঐ নব্য কাজটির প্রচলনে ইসলামের ক্ষতির কোন হিসাব নেই।

২. ইসলাম- সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ। বিদয়াতের প্রয়াস এই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে অসংখ্য বিভেদের পথ খুলে যায়।

www.pathagar.com

৩. বিদয়াতের পথে চলা দ্বীনকে ধ্বংশ করার কাজ।

৪. বিদয়াতের আমলে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে এই গোনাহতে লিপ্ত হবার ফলে তওয়াব পথে ফিরে না আসার কারণে গোমরাহী বাড়তেই থাকে।

মোহাদ্দেসীন, ফোকাহা ও উলেমারা এই বিদয়াত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন এবং এ সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তরিকতের মাশায়েখগণ ও মুসলিম উম্মাহকে বিদয়াতের সর্বনাশা অভিশাপ থেকে দূরে সরে থাকার আহবান জানিয়েছেন। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাঃ) দ্বীন ও শরীয়তের সুবিশাল দূর্গ ছিলেন। তার শিক্ষার মূল কথা ছিলো- সুন্নত ও শরীয়তের অনুসরণ। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ (غنية الطالبين) এর মূল বিষয় বস্তুই রেখেছেন শরীয়তের অনুসরণ। তার মতে শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া তরিকতের কথা চিন্তাও করা যায় না। তিনি তরিকতকে শরীয়তের অধিনস্ত দাস বানিয়েছেন। তার উপদেশ (فتوح الغيب)-এর দ্বিতীয় খোতবায় তিনি বিদয়াতের কুফল সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শিরোনামাতে লিখেছেন (اتبعوا ولاتبتدعوا) সুন্নতের বা শরীয়তের অনুসরণ করো, বিদয়াতের পথ পরিহার করো) তিনি তার কিতাবে ফরজ, সুন্নত ও নফলের সীমা নির্ধারিন করে শরীয়তের মূল শিক্ষাকে সমুন্নত রেখেছেন।

ইলমে তাসাউফের প্রসিদ্ধ কিতাব (عوارف المعارف)-এর লেখক শেইখ শেহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দী (রঃ) তার কিতাবে বিদয়াতের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তরীকতপন্থীদের এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যেন তারা শরীয়ত বহির্ভূত কোন বিদয়াতী কাজকে তরীকতের জন্য উপকারী বলে মনে না করেন। মোজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) তাঁর সারা জীবন ধরে বিদয়াতের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি তার লিখনীতে বিদয়াতকে 'ভাল ও মন্দ' দু'ভাগে ভাগ করার বিরূদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ প্রদত্ত এই পুর্ণাঙ্গ দ্বীনের মধ্যে কোন নব্য সংযোজনকে (بدعة حسنة) 'ভাল বিদয়াত' বলে আখ্যায়িত করা মোটেই সমিচীন নয়। বিদয়াত বিদয়াতই, তা কখনও ভাল ও কল্যাণকর হতে পারে না।

বিদয়াতকে দু'ভাগে বিভক্ত করে নিজেদের ইচ্ছামতো আমল করে তাকে সোয়াবের কাজ মনে করার ফলে এক নতুন ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমতঃ এই বিভক্তি বিদয়াতের অপরাধকে এর ধারকের মনে লঘু করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ তাকে সাহসী করে তুলে, শেষে কোন বিদয়াতই অপরাধ বলে মনে হয় না। এ জন্যেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইমামগণ এই বিভক্তির বিপক্ষে। কিন্তু আজও এই বিভক্তির

www.pathagar.com

চোরাগলীতে অহরহ বিদয়াত সংঘঠিত হচ্ছে। মোজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) এই ফিতনার বিরূদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তারই পথ ধরে হযরত শাহ্ অলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) ও সাইয়েদ আহমেদ বেরেলভী (রঃ) এই ফিতনার বিরূদ্ধে সর্বেতোভাবে জিহাদ করেন। তারা বিদয়াত মুক্ত সুন্নতের অনুসরনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু বিদয়াত আজও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। বিদয়াতের আকর্ষনই এমন যে তাকে উৎপাটিত করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। তাসাউফের নামেই অধিকাংশ বিদয়াত প্রচলিত। সত্যিকার তরিকতপন্থী কখনও বিদয়াতপন্থী হ'তে পারে না। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূলের দেয়া ফরমুলাকে অবহেলা করার ফলেই এই অভিশাপ আমাদের ঐক্যকে ভূলুন্ঠিত করছে।

আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ে বিদয়াতের সংগা ও স্বরূপই এখানে আলোচ্য। এর বিচিত্র রূপ ও প্রয়োগ পরবর্তী পর্বে আলোচিত হবে।

সাহাবায়ে কেরামদেরকে মানদন্ড করার হিকমত

অনাদিকালের জন্যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে বা বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে উম্মতের জন্য মানদন্ড করার পেছনে আল্লাহর বিশেষ হিকমত রয়েছে।

- শুধু অহীর মাধ্যমে নির্দেশাবলী নাযিল করেই আল্লাহ দ্বীন ও শরীয়ত জারী করেন নি, বরং নবী জীবনের বাস্তব আমল বা অহীর প্রয়োগের মাঝে এ দ্বীন বাস্তবায়িত হয়েছে। ইবাদাত-বন্দেগীতে, পারিবারিক দায়ীত্ব পালনে, সামাজিক জীবন যাত্রায়, পারস্পারিক লেনদেন ও ব্যবসা-বানিজ্যে, দেশ পরিচালনায়, কূটনৈতিক বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়নে, অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনে তথা মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজনে ইসলামী দ্বীন ও শরীয়তের বিধান চালু করার লক্ষ্যে নবী-জীবনের আমলকে মানদন্ড করা হয়েছে। এমন কি মানবীয় দূর্বলতার কারনে সাধারন মানুষের জীবনে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, তাও নবী জীবনের বাস্তব আমলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসংগে যে মূলনীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলো, যে আমল ও কাজ নবুয়তী মর্যাদার পরিপন্থী নয়, তেমনি সকল ধরনের কাজ ও নবী জীবনের আমলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেমন রাসুলেপাকের জীবনে ফজরের নামাজ ক্বাজা হয়েছে, সূর্য্য উঠার পর ঘুম ভাঙ্গার ফলে নামাজ ক্বাজা হয়ে যায়। তাই ক্বাজা নামাজ পড়ার নিয়মও রাসুলের আমলের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত। রাসুলের জন্য নামাজ ক্বাজা হওয়া নবুয়তি মর্যাদার পরিপন্থি নয় এই বিশেষ লক্ষ্যে। আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

انى لا أنسى و لكن أنسَى لأسنّ –

(আমি ভুলে যাইনি, বরং আমাকে ভুলানো হয়েছে, যেনো সুন্নত জারী করতে পারি)

নামাজে ভুল সংশোধনের উপায় হিসাবে 'সুহ্ সিজদা' এর ব্যবস্থা, পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ্ করার বৈধতা, বিধবা বিবাহ্র ব্যবস্থা সহ্ অনেক আমল নবী জীবনের বাস্তব আমলে তুলে ধরা হয়েছে। যেনো তিনি অনুসরণের জন্য বাস্তব নমুনা হতে পারেন। আবার কোন জায়েজ কাজ যাকে শরীয়তে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তাকে ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বাস্তব আমল রাসুলের জীবনে করানো হয়নি। যেমন স্ত্রীকে তালাক দেয়া শরীয়তে যায়েজ। কিন্তু তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃনিত কাজ, তাই এর বাস্তব আমল রাসুলের জীবনে দেয়া হয়নি।

যে সমস্ত গোনাহ্র কাজ শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যদি কখনও সাহাবাদের মধ্যে কারো মানবিক দূর্বলতার কারণে সংগঠিত হয়েছে, তখন আল্লাহ্র নবী শরীয়তের বিধান চালু করেছেন। যা ইম্মতের জন্য স্থায়ী আইন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে পরবর্তীযুগের মানদন্ড হিসেবে।

কিন্তু এমন কিছু গোনাহ্র কাজ যা রাসুলের যামানায় সংগঠিত হওয়া বাস্তবে সম্ভব ছিলো না, যেমন রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে কোন্দল, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের তরফ থেকে কোরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক অর্থ না বুঝবার ফলে ফিতনা বা বিভেদ সৃষ্টি হওয়া। এমনি ধরনের গোনাহ্র কাজ যার পরিবেশ বা পটভূমি রাসুলের যামানায় সৃষ্টি হয়নি। এসব ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে বের করার বাস্তব নমুনা রাখার প্রয়োজনীয়তা ছিলো।

সাহাবায়ে কেরামগণ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ছিলেন। তাদের আমল-আখলাক রাসুলেপাকের সরাসরি তত্ত্বধানে গড়ে উঠেছিলো। তাদের দ্বারাই এমনি ধরনের কঠিন পরীক্ষায় ইসলামী মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবার বা পরবর্তীযুগের লোকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে যাওয়া সম্ভব ছিলো। উল্লেখিত ঘটনাগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যার অস্তিত্ব রাসুলের জীবদ্দশায় সৃষ্টি হয়নি। সে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ রেখে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিলো। তাদের আমলের বাস্তব নমুনা আমাদের জন্য অমুল্য সম্পদ। সাহাবায়ে কেরামগণ এসব ব্যাপারে কি অপূর্ব যোগ্যতা ও ঐকান্তিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে ইতিহাসের পর্যালোচনার অধ্যায়ে পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারবেন।
হাদিসে এরসাদ হয়েছে,

ما انا عليه و اصحابى ، الجماعة السواد الاعظم –

(বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সরল ও সোজা পথ সেটাই, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবারা অবস্থান করছি, তারা হলো আল জামায়াত- তারা মহান গোষ্ঠী।)

www.pathagar.com

এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহর নবী যে হেদায়াত প্রাপ্ত দলের কথা বলেছেন, তাকে 'আল জামায়াত' বা 'আহলে সুন্নাতুল জামায়াত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দলের চূড়ান্ত গঠন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে মানদন্ড করা হয়েছে। পরবর্তীযুগে বিভিন্ন কোন্দল ও ফিতনার মধ্যে সাহাবারা সামষ্টিকভাবে যে মত ও পথে অবিচল থেকেছেন বা তারা দ্বীন ইসলামের ও শরীয়তের যে মর্ম গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন সেটাই হক পথ। ঐ পথে ও মতে সংঘবদ্ধ জামাতকে 'আহলুল সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত' বলে আখ্যায়িত করে মহান গোষ্ঠী বলা হয়েছে। এই মহান দলের রূপরেখা রাসুলেপাকের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামদের জীবনেই গড়ে উঠেছিলো।

যারা পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরামদের এই মর্যাদা অস্বীকার করবে বা তাদেরকে হিদায়াতের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ না করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করবে, তারা বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। "কোরআন ও হাদিসই হেদায়াতের উৎস" শুধু এই কথাটা মেনে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং কোরআন ও হাদিসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করাই হলো আসল কাজ। এই লক্ষ্যেই সাহাবাদের অনুসরণ।

বিশিষ্ট ইমাম মাতরফ বিন শেইখর তার মজলিশে সাহাবায়ে কেরামদের মতামতকে সবার্ধিক গুরুত্ব দিতেন। একজন তাকে শুধু কোরআনের ভিত্তিতে আলোচনা করতে অনুরোধ করলেন, তিনি জবাবে বললেন,

و الله مانريد بالقران بدلا و لكن نريد من هو اعلم بالقران –

(আল্লাহর শপথ, আমরা কোরআনের বদল চাই না, কিন্তু এমন ব্যক্তিদের মতামতকে অবহেলা করতে পারি না। যারা কোরআনকে সবচেয়ে বেশী জানেন)

অর্থাৎ সাহাবাদের মতামত সামনে রেখেই কোরআনের মর্ম বের করতে হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তার কিতাব (منهاج السنة) তে ইমাম শায়াবীর একটা মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, "ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক কারা?" তারা জবাব দিলো, "হযরত মুসার আসহাব" অতঃপর হযরত ইসা (সাঃ) এর উম্মতদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের মিল্লাতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোক করা, তার জবাব দিলো, হযরত ঈসা (আঃ) এর সাথীরা (حواری) সর্বশেষে যখন উম্মতে মুহম্মদীর বিভ্রান্ত লোকদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের উম্মতের সবচেয়ে খারাপ লোক কারা, তারা জবাব দিলো, 'আসহাবে মুহম্মদ' (সাহাবায়ে কেরামগণ) উম্মতে মুহম্মদীকে সাহাবায়ে কেরামদের জন্যে দোয়া করতে নির্দেশ দেয়া হলো, আর তারা করলো ভর্ৎসনা ও গালাগালী।"

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামদেরকে হকের মানদন্ড হিসেবে কবুল না করার ফলেই বিভেদের সুত্রপাত ও পরিণতিতে গোমরাহী। সাহাবায়ে কেরামদের আকিদা ও

www.pathagar.com

আমলের সাথে আমাদের আকিদা ও আমলের মূল্যায়ন করলেই বিভেদের অনেক পথ পরিহার করা যায়।

একটি সন্দেহের অপনোদন

এই মাত্র যে হাদিসটির উপর আলোচনা হলো, সেখানে হিদায়াতপ্রাপ্ত জামাত বা দলকে 'সুন্নাতুল জামায়াত' বা মহান ও বিশাল গোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাধারনভাবে এ থেকে সংখ্যার বিশালতার কথাই বুঝায়, কিন্তু আমরা তরজমা করেছি 'মহান' শব্দ দিয়ে। তাই বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা দাবী করে। বোখারীর হাদিসে এসেছে,

لا تزال هذه الامة قائمة على الحق لايضرهم من خالفهم حتى ياتى أمر الله –

(এই গোষ্ঠী হকের পথে টিকে থাকবে কিয়ামত পর্য্যন্ত, কোন বিরোধকারীদের বিরোধ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না)

এই হাদিসটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে শব্দের কিছু তারতম্য রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে (هذه الامـــة) এর স্থলে (طائفة مــــن امــتى) আবার কোন বর্ণনায় এসেছে (عصابة من امتى) যার অর্থ সংখ্যার বিশালতা নয় (طائفة) কিংবা (عصابة) বলতে বিশাল জনগোষ্ঠী বুঝায় না বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটা ছোট অংশ বুঝায়। সে ক্ষেত্রে এর অর্থ দাড়ায়। একটি সংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষুদ্র, কিন্তু মহান দল কিয়ামত পর্য্যন্ত হকের পথে অবিচল থাকবে, কোন বিরোধ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। ইমাম বোখারী এই দল থেকে ইলমের ধারক ও বাহক বুঝেছেন, আবার ইমাম আহম্মদ এর অর্থ করেছেন হাদিস বা সুন্নাহর ধারক ও বহক রূপে। আসলে এই দুই অর্থে কোন বিরোধ নয়। অর্থাৎ একদল সঠিক ইলমের অধিকারী যারা কোরআন ও সুন্নাহকেই ইলমের মূল উৎস মনে করবে। তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। কোরাআনে মজিদে ঐ দল সর্ম্পকেই বলা হয়েছে,

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر –

(তোমাদের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠী থাকতে হবে যারা কল্যাণের পথে আহবান জানাবে ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করবে। এখানেও সংখ্যার আধিক্যের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে একটা গোষ্ঠী।)

প্রত্যেক যুগে মুসলিম সমাজে উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যি থাকবে, যারা ইসলামের নির্ভুল শিক্ষার ধারক ও বাহক হিসেবে রেঁনেসার খিদমত আঞ্জাম দেবে। তারা কখনো বাতিলের সাথে সমঝোতা করবে না। তাদের নিরলস প্রচেষ্টাতেই দ্বীন ইসলাম আসল ও অকৃত্রিম অবস্থায় টিকে থাকবে, তারাই হবে উম্মতে মুহম্মদীর মূল প্রতিনিধি।

www.pathagar.com

তাদের সংখ্যাগত প্রাধান্যের কথা এখানে বলা হয়নি, বরং গুণগত প্রাধান্যই তুলে ধরা হয়েছে। এজন্যে আমরা السواد الاعظم -এর তরজমা করেছি 'মহান গোষ্ঠী' বলে।

আবার এই গোষ্ঠী হিসেবে যাদের কথা বলা হয়েছে, সর্বত্র তারা সংঘবদ্ধ বা জামাত বদ্ধ হবে একথাও এখানে বলা হয়নি। কেননা হাদিসে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (طائفــــة), হাফিজ উবনে হাযম এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ একাধিক সংখ্যাও হতে পারে;

و الطائفة فى لغة العرب يقع على الواحد فصاعدا –

(طائفــة) শব্দের অর্থ একাধিক সংখ্যা হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি বিক্ষিপ্তভাবে ও বিভিন্ন যায়গায় বা কোন ও এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে এই দায়ীত্ব আঞ্জাম দেবে।

এ বিষয়টি আরো বেশী বোধগম্য হবার জন্য নিচের কথাগুলো সামনে রাখতে হবে।

- কোথাও সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকলে (যেমন খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ বা উমর বিন আব্দুল আযিযের যুগ) সেখানে এই দলের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। কোন হকপন্থী লোক রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে যেতে পারে না। তখন রাষ্ট্রের আনুগত্যের বাইরে যাবার অর্থই হলো আনুগত্যের একটি কেন্দ্রকে অস্বীকার করে মুসলিম উম্মাহর বাইরে চলে যাওয়া। যেমন সাহাবাদের যামানায় খারেজী, রাফেজী বা এই জাতীয় লোকেরা মুসলিম উম্মাহর সদস্য হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সেখানে এই দল হ'লো ইসলামী রাষ্ট্রের তথা ইসলামী আদর্শবাদের রক্ষক দল হিসেবে পরিগণিত হয়। তাদেরকেই আল-জামায়াত বলা হয়েছে।
- সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে পরিবেশ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কিংবা কোথাও জামাতবদ্ধভাবে দ্বীন ও শরীয়তের রক্ষকের দায়ীত্ব আঞ্জাম দেবেন।
- বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিবিধ জামাত সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ সামনে রেখে ইসলামের সামগ্রিক বা ইসলামের কোন কোন দিক ও বিভাগে অবদান রাখবেন। ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এই দলের লোকদের এক জামাতবদ্ধ করার কোন কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকাতে তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে এই দায়ীত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে এই রক্ষক দলের সদস্য বলে পরিগণিত হবেন।

www.pathagar.com

মুজাদ্দিদে দ্বীনের ভূমিকা।

فتح البـــارى গ্রন্থে ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী এই বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দিদে দ্বীনের আগমন সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে তাজদীদে দ্বীন বা ইসলামী রেঁনেসার দায়ীত্ব আঞ্জাম দেবার জন্যে কোন একজন ব্যক্তি হওয়া জরুরী নয়, বরং হতে পারে এই দায়িত্ব কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে একটা দল বা গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় আঞ্জাম পাবে। সে ক্ষেত্রে এই দল বা গোষ্ঠীকে তাজদীদ বা রেঁনেসার বলা যাবে। আবার মুজাদ্দিদ হিসেবে কোন ব্যক্তি বা দলকে ঘোষণা দেয়া বা স্বীকৃতি দেয়াও শর্ত নয়। আসল কথা হলো, এই তাজদীদের কাজ মুসলিম উম্মাহয় চালু থাকবে। এটা কোন পদবী বা দ্বীনি পরিচিতি নয়। কোন কোন ব্যক্তির জন্যে এই স্বীকৃতি প্রসিদ্ধি লাভ করলেও এর অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণই শুধু মুজাদ্দিদ। সব দ্বীনি কাজ পৃথিবীতে স্বীকৃতি পায় না বা এই স্বীকৃতির জন্য কোন ইলাহী ব্যবস্থা নেই। ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী উম্মতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রথম মুজাদ্দিদ হিসাবে হযরত উমর বিন আব্দুল আযিযের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর এই তাজদীদের কাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাধমে আঞ্জাম পেয়েছে এবং এই ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। ভারতীয় উপমহাদেশে হযরত আহমদ সারহন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা ইসলামের দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

- তাযদিদে দ্বীন বা ইসলামে রেঁনেসার এই মহান কাজ ইসলামের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সাথে আঞ্জাম পেয়েছে। একটি উৎসের আকিদা ও আমল যুগে যুগে একই ধারায়ও প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হবে। মুসলিম উম্মাহর রেঁনেসার কাজে এই পরম্পরা পরিলক্ষিত হয়েছে। আজও এই মহান দায়িত্ব যথা নিয়মে আঞ্জাম পাচ্ছে ও ভবিষ্যতেও পাবে।

ইসলামী জীবন ধারার কোনও দিক যখন বিকৃতির শিকার হয়, বা যখন জীবনের প্রতিটি দিকও বিভাগে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই তাযদীদে দ্বীনের কাজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যে বা যারাই এ পথে এগিয়ে আসেন তারা উম্মতের জন্য এই মহান কাজটিই আঞ্জাম দেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

ইতিহাসের পর্যালোচনা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা মুসলিম উম্মাহ্ বা ইসলামী আদর্শবাদের মৌলিক নীতিমালার একটা সমীক্ষা তুলে ধরেছি, সাথে সাথে বিভেদের বুনিয়াদী কারণগুলোরও বিশ্লেষণ করেছি এবং বিভেদমুক্ত ইসলামী উম্মাহ্র চিরস্থায়ী মানদন্ডের স্বরূপ খুঁজে পেয়েছি।

এর পর এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা উম্মতে মুহম্মদীর বিগত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসের একটা জরিপ করবো, যার মধ্যে নিখুঁত দ্বীন ও শরীয়তের পাশাপাশি অনেক অবাঞ্ছিত বিভেদ ও বিভ্রান্ত মতবাদের সাক্ষাৎ পাবো। প্রথম অধ্যায়ের আলোচিত মূলনীতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে পাঠকগণ নিজেরাই অনুমান করতে পারবেন; কারা আদি ও অকৃত্রিম ইসলামী আদর্শবাদের পথে অবিচল রয়েছেন, আর কারা বিভেদের চোরাগলীতে ইসলামের ক্ষতিসাধন করেছে? ইতিহাসের এই জরিপে আমরা বিগত ইতিহাসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হবো। প্রথম পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরামদের যুগ সেখানে সাহাবাদের মত বিরোধের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাবেয়ীদের যুগ ও বিভেদের স্বরূপ, অতঃপর তাবেয়ীদের পরবর্তীযুগ তথা ইমাম ও মোজতাহিদদের যুগ ও তথাকারবিরোধ বিভেদের বিশ্লেষন আলোচনায় আসবে। এভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সামনে রেখেই আমরা মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধ ও বিভেদ সমূহের পর্যালোচনা করবো।

মুসলিম উম্মাহঃ সাহাবায়ে কেরামদের যুগ

সাহাবারা সাধারন মানুষ ছিলেন। তারা মায়াসুম (নিস্পাপ) ছিলেন না। সাধারন মানুষের মতোও তারা ভাল-মন্দ কাজ করার প্রবণতা রাখতেন। তারা অতি মানব ছিলেন না। তারা ছিলেন নবীর সহচর, নবীর তিরোধানের সাথে সাথে আল্লাহ ও মানুষের সরাসরি যোগাযোগ সূত্র অহীর অবতরণও চীরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। দ্বীনের পূর্ণতালাভ হয়েছিল আল্লাহর নবীর হাতেই। আল্লাহর নবী হিদায়াতের উৎস হিসেবে কোরআন ও সুন্নাহ রেখে গিয়েছিলেন। মুসলিম উম্মাহ্র এই শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ আল্লাহর নবীর সান্নিধ্যেই সর্বতোভাবে দ্বীনের সৈনিকে পরিণত হয়ে ছিলেন। যাদের কে আল্লাহর নবী (সাঃ) তাঁর সারা জীবনের মিশনে আস্থাভাজন মনে করেছেন। চরম সংকটময় মুহূর্তেও তারাই ছিলেন রাসুলের চরম বিশ্বস্থ সাথী। পরম পরীক্ষায় ও তাদের ঈমানী শক্তিতে এতোটুকুও দূর্বলতা দেখা দেয়নি। মানবীয় দূর্বলতার কারণে কোন কোন সাহাবাদের জীবনে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধও সংঘটিত হতো। তখনই

www.pathagar.com

তাঁরা পৃথিবীতে শাস্তি ভোগ করে আখেরাতের জীবনকে নিষ্কণ্টক করার জন্য অস্থিরতার সাথে চেষ্টা করতেন।

এই চারিত্রিক দৃঢ়তার কারনেই সাহাবায়ে কেরামদের জামাতকে দ্বীনহকের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মানদন্ড করা হয়েছে। প্রত্যেক সাহাবীকে ব্যক্তিগতভাবে মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়নি, বরং তাদের প্রত্যেকের মন-মেজাজ ও চরিত্রের যে সামষ্টিক নির্যাস, তাকেই মানদন্ড করা হয়েছে। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর শাহাদাত লাভ পর্যন্ত সাহাবারা জামায়াতবদ্ধ ছিলেন। খলিফা রাশেদীনদের নেতৃত্বেই তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গির ঐক্যবদ্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। কোন ব্যাপারে কখনও বিবাদ দেখা দিলেও অতঃপর তারা জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করেছেন। সেখানে তাদের সামষ্টিক জীবনাদর্শ জানতে কোন বেগ পেতে হয় না, তাদের সামষ্টিক জীবনাদর্শ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। তদুপরি তাদের বিবাদ বিসম্বাদের মাঝেও আমাদের জন্য অনুকরনীয় আদর্শ রয়েছে। তাদের জন্যে ভাল ধারণা রাখতে হবে। কোরআনে মজিদ তাদের জন্যে দোয়া শিখিয়েছে। এরসাদ হয়েছে;

و الذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لاتجعـــل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا انك رؤف رحيم -(الحشر)

(যারা তাদের পরে এসেছে, তারা দোয়া করে, হে আমাদের রব আমাদের এবং আমাদের ভাইদের ক্ষমা করুন। যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছেন। আমাদের মনে ঐ সমস্ত ঈমানদের লোকদের সম্পর্কে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না, হে আমাদের রব আপনি অনুগ্রহশীল ও করুণাশীল।)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে;

و الذي جاء بالصدق و صدّق به اؤلئك هم المتقون لهم مايشاؤن عندرهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا و يجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون – (الزمر)

(যে সত্য উপস্থাপন করেছে এবং তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে তারাই খোদাভীরু, তারা তাদের রবের কাছে ঐ সব কিছুই পাবে যা তারা চাইবে। সৎকর্মশীলদের এটাই প্রতিদান, যেন তাদের অসৎকর্মের ক্ষতি-পূরণ করে দেন এবং ঐ সব সৎকাজের প্রতিদান প্রদান করেন যা তারা উত্তম কাজ রূপে সম্পাদন করেছেন।)

তাদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে;

اولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا و نتجاوز عن سيئاقم فى اصحاب الجنـــة وعـــد الصدق الذى كانوا يوعدون -(الاحقاف)

(তারাই ঐ সমস্ত লোক যাদের উত্তম কাজগুলো আমি কবুল করে নেই এবং তাদের গোনাহকে বেহেশতী লোকদের সহ অবস্থানে ক্ষমা করে দেই। এসব কিছু ঐ সব সত্য প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই হবে যা তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।)

www.pathagar.com

তিরমিজির হাদিসে আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন, যার অর্থ হলো; (আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, সাহাবাদের ব্যাপারে। আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার কেন্দ্রে পরিণত করো না। যারা আমার সাহাবাদের আমার ভালবাসার খাতিরেই ভালবাসে। আর যারা সাহাবাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তারা আমার প্রতি তাদের বিদ্বেষের কারণেই তা করে। যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের কষ্ট দেয় সে আল্লাকেই কষ্ট দেয়, অতঃপর সে আল্লাহ গজবকেই ডেকে নেয়।)

উপরিল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে সাহাবাদের বিশেষ মর্যাদা সুস্পষ্ট, তাদের এ বিশেষ মর্যাদা সামনে রেখেই তাদের বিভেদগুলো অনুধাবন করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে ও বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য দিলো, তবে তারা সবাই মতভেদ দূরীকরণের মূলনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ফলে সে সব মত পার্থক্য বিভেদের রূপ নিতো না।

রাসুলেপাকের জীবদ্দশায় প্রচলিত অর্থে সাহাবাদের মাঝে কোন মতপার্থক্য বা বিরোধ ছিলো না। প্রত্যেক সাহাবী প্রতিটি ব্যাপারেই রাসুলের প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। যারা মদীনা থেকে দূরে অবস্থান করতেন, তারা কখনও কখনও প্রয়োজনীয় দ্বীনী বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশের অনুপস্থিতিতে মূলনীতি ভিত্তিক ইজতিহাদ করতেন, অতঃপর যখনই নবীপাকের খিদমতে হাজির হতেন, তখন সেসব ব্যাপারে আল্লাহর নবীর নির্দেশ চাইতেন। কোন কোন ব্যাপারে আল্লাহর নবী তাদের চিন্তার সাথে একমত প্রকাশ করতেন, তখন সে সব কিছু শরীয়তের অংগে পরিণত হয়ে যেতো, আবার কোন কোন বিষয়ে আল্লাহর নবী তাদের চিন্তার সংশোধন করে দিতেন, সেক্ষেত্রে সেসব বিষয়ও শরীয়তের অংশ হয়ে যেতো।

শরীয়তের বিধান মতো সাহাবায়ে কেরামগণও রাসুলকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

أمرهم شورى بينهم (الشورى)

(তাদের কাজগুলো পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম পায়)

وشاورهم فى الامر (ال عمران)

(তাদেরকে পরামর্শ দান করো)

এই আয়াতে এই পরিমর্শের কথাই বলা হয়েছে। নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা এই পরিমর্শের প্রমাণ পাই। অনেক সময়ে আল্লাহর নবী তাদের পরামর্শ মেনে নিতেন। কিন্তু এই পরামর্শ ততোক্ষণ পর্যন্তই বৈধ ছিলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নবী ঐ বিষয় সমুহে স্থির সিদ্ধান্ত না নিতেন। তার স্থির সিদ্ধান্তের পর আর কোন পরামর্শের অবকাশ থাকতো না।

এই মূলনীতি কোরআনে মজিদে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে;

فاذا عزمت فتوكل على الله (ال عمران)

www.pathagar.com

(যখন আপনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন)

রাসুলের আদর্শের অর্থ বুঝতে কখনও কখনও সাহাবারা ভিন্ন মত পোষন করেছেন। তার সমাধান ও নবীপাকের নির্দেশেই হতো। নিম্নের ঘটনাটি এরই একটা প্রমাণ।

আহযাবের যুদ্ধে আল্লাহর নবী সাহাবাদের এক দলকে এক মিশনে পাঠানোর পূর্বে নির্দেশ দিলেন,

لايصلين أحد العصر الاّ فى بنى قريظة

(বনী কোরাইজাদের গ্রামে পৌঁছার আগে কেউ আসরের নামাজ আদায় করবে না)

অতঃপর পথিমধ্যেই যখন আসরের নামাজের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রান্ত হবার উপক্রম হলো তখন সাহাবাদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিলো, একদলের মত ছিলো- যেহেতু আল্লাহর রাসুল বনী কোরাইজা বস্তিতে পৌঁছার আগে আসরের নামাজ পড়তে বারণ করেছেন তাই সেখানে গিয়েই নামাজ আদায় করতে হবে। তাই তারা যাত্রা জারী রাখলেন এবং আসরের নামাজের সময় সীমা অতিক্রান্ত হবার পর ধনী কোরায়জায় পৌঁছেই নামাজ আদায় করলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলটির মত ছিলো এই যে আল্লাহর রাসুলের এই নির্দেশের মর্মছিলো; দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা। কিন্তু পথিমধ্যেই যখন শরীয়ত নির্ধারিত নামাজের সময় এসে গেল এবং সে সময় অতিক্রান্ত হবার উপক্রম হলো, তখন ইসলামের স্থায়ী বিধান মতে সময় সীমার মধ্যেই নামাজ আদায় করা উচিত। এই আদেশের মধ্যে আল্লাহর রাসুল নামাজের সময়ের কোন পরিবর্তন করেন নি। তাই তারা পথিমধ্যেই নামাজ আদায় করলেন, অতঃপর বনি কোরাইজায় গেলেন। মিশন শেষে যখন তারা মদীনায় ফিরে এলেন, তখন তারা বিষয়টি রাসুলের দরবারে উত্থাপন করলেন। তখন তিনি কোন পক্ষকেই তিরস্কার না করে উভয় প্রকার আমলকেই সমর্থন করলেন। এই মতপার্থক্যের মূলনীতি পরবর্তীযুগে ইসলামী ফিকাহ্র একটি সুত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রথম দলটি নবী-নির্দেশের শাব্দিক অর্থের প্রতি আমল করেছেন, যাকে ফিকাহয় বলা হয়েছে (روايـــت) বা (نص) (বর্ণনা বা শব্দ) পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলটি আমল করেছেন মূল বর্ণনা বা শব্দের আসল মর্মের উপর, যাকে ফিকাহ্য় বলা হয়েছে (درايـــت) বা মর্মের জ্ঞান। ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) এই মতের উপস্থাপক। পক্ষান্তরে অপরাপর ইমামগণ প্রথম মতের পক্ষে। ফিকাহর মতামতে এই মূলনীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামদের মত বিরোধের মূল আলোচনার পূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে মত পার্থক্যের উপর প্রথমে আলোচনা করা হবে।

www.pathagar.com

রাসুলেপাকের তিরোধান সম্পর্কে মত পার্থক্য

সরোয়ারে আলম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের ঘটনাটি ছিলো সাহাবাদের কাছে ছিলো অপরিসীম বেদনাদায়ক ও বিয়োগান্ত। তড়িৎ বজ্রপাতের মতো তাদেরকে মুহ্যমান করে দিয়েছিলো, তারা চিন্তা ও কর্মে স্থবীর হয়ে পড়েছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এই ঘটনাটিকে প্রথমতঃ মেনেই নিতে পারেননি। তিনি উম্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে এই খবরকে অস্বীকার করেন এবং এ ঘটনাকে ইসলামের শত্রুদের প্রচারণা বলে প্রতিরোধ করতে থাকেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) অবস্থার নাজুকতা অনুভব করলেন এবং নিচের আয়াতগুলো তেলায়ত করে এই মর্মন্তদ ঘটনার সত্যতা ও স্বাভাবিকতা তুলে ধরলেন। আয়াতগুলো শুনে হযরত উমর (রাঃ)-র হাত থেকে তরবারী খসে পড়লো এবং সব তেজস্বীতা হারিয়ে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে আল্লাহর রাসুল সত্যি বিদায় নিয়েছেন ইহজগত থেকে।

হযরত আবু বকর যে আয়াতগুলো তেলায়ত করেছিলেন তা হলো;

و ما محمد الاّ رسول قد خلت من قبله الرسل ، افان مات او قتل انقلبتم على اعقـابكم ، و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله الشاكرين – (ال عمران)

(মুহম্মদ তো একজন রাসুল, তার পূর্বে ও অনেক রাসুল চলে গেছেন, তবে তিনি যদি ইন্তেকাল করেন বা শাহাদাত লাভ করেন, তোমরা কি (দ্বীনের পথ থেকে) ফিরে যাবে? যারা দ্বীনের পথ থেকে ফিরে যায়, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তার শোকর গোজার বান্দাহদের প্রতিদান দেবেন।)

انك ميت و انهم ميتون – (الزمر)

(নিশ্চয়ই (হে নবী) আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারা ও মৃত্যুবরণ করবে)

নবীজীর ইন্তেকালে অহীর সংযোগ চীরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবার শোকে সাহাবারা এতোই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যে ক্ষণিকের জন্য এই আয়াত গুলো বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন, রাসুলের ইন্তেকালের বাস্তবতা মেনে নিতে বেগ পেতে হয়েছিলো।

পরবর্তীযুগে হযরত উমরের খিলাফতের জামানায় হযরত উমর বিশিষ্ট সাহাবা হযরত ইবনে আব্বাসকে বলেছিলেন; আপনি জানেন কি, কেন আমি নবীজীর তিরোধানের খববকে প্রচারণা বলে অস্বীকার করেছিলাম? হযরত ইবনে আব্বাস নেতিবাচক জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এই আয়াতের অর্থ বুঝতে ভুল করেছিলাম এবং শোকের আতিশয্যায় কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো বিস্মৃতি হয়ে পড়েছিলাম।

و كذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شـــهيدا – (البقرة)

www.pathagar.com

(এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেনো তোমরা জনগণের সামনে সাক্ষী থাকো এবং রাসুলেপাক তোমাদের উপর সাক্ষী থাকেন।)

হযরত উমর ইজতিহাদ করেছিলেন যে আল্লাহর রাসুল উম্মতের মধ্যে অবস্থান করবেন এবং তাদের শেষ কাজের উপর সাক্ষ্য দেবেন। তিনি বললেন, হযরত আবু বকর যখন পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলো তেলায়ত করলেন তখন আমার এমনি অনুভূতি হলো যেনো এই আয়াতগুলো এই মুহূর্তে নাযিল হলো।

ক্ষনিকের এই বিরোধ ক্ষনিকেই শেষ হয়ে গেলো, সব যুক্তি ও তেজস্বীতার ইতি হয়ে গেলো।

সাহাবাদের মতবিরোধ ও তার সমাপ্তির এটাই স্বরূপ।

রাসুলেপাকের দাফন সম্পর্কে মতবিরোধ

রাসুলের ইন্তেকালের পর সাহাবাদের মাঝে এই নিয়ে মতভেদ দেখা দিলো যে তাকে কোথায় দাফন করা হবে। কারো কারো মত ছিলো তাকে মসজিদে নবুবীর পাশে দাফন করা হোক আবার কারো মত ছিলো তাঁকে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে কবরস্থানে দাফর করা হোক। এবারের বিরোধ মিমাংসায়ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-ই এগিয়ে এলেন, তিনি বললেন, আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি,

ما قبض نبي الاّ دفن حيث يقبض

(প্রত্যেক নবীকেই সেই জায়গাতেই দাফন করা হয়েছে, যেখানে তারা ইন্তেকাল করেছেন)

আরো কিছু কিছু সাহাবীও এই হাদিসের সত্যতা স্বীকার করলেন। এই হাদিস শোনার পর সব বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে গেলো। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামগণ হযরত আয়শার ঘরে যেখানে তার ইন্তেকাল হয়েছিলো, তাঁর বিছানা উঠিয়ে নিচে কবর খুঁড়লেন, অতঃপর সেখানেই তাকে সমাহিত করা হলো।

রাসুলেপাকের অন্তিম রোগে তিনি তার অন্যান্য স্ত্রীদের অনুমোদন নিয়ে হযরত আয়েশার ঘরেই অবস্থান নিয়েছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। হাদিসে পাওয়া যায় যে হযরত আয়েশার ঘরে রসুলেপাকের রওজা মোবারক হওয়ার পরও তিনি সেখানেই বসবাস করতেন।

প্রথম খলিফা নির্বাচনে মতবিরোধ

প্রিয়নবীর ইন্তেকালের মুহূর্তের মধ্যেই নতুন মিল্লাতের জীবনে রাসুলেপাকের অনুপস্থিতিতে নবুয়তী আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্য বজায় রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তারা তাদের সর্বাধিক প্রিয়জনের দাফনের কাজ তখনও সম্পন্ন করতে পারেন নি। প্রয়োজন দেখা দিলো মুসলিম উম্মাহর প্রথম খলিফা নির্বাচনের।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামরা ভাল করেই জানতেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া এই মিল্লাতের একটি মুহূর্তও যেতে পারে না।

কিন্তু পূর্বের দুটি বিরোধে যেমন কোরআনের আয়াতও হাদিসে রাসুল থাকাতে ক্ষণিকেই বিরোধের মিমাংসা হয়ে গিয়েছিলো, এখানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলদা ধরনের ছিলো। খলিফা নির্বাচন সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ঠ নির্দেশ না থাকায় সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে ইজতিহাদের মত পার্থক্য দেখা দেয়। এই মাত্র সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রিয়নেতা হারিয়েছেন, যার বর্তমানে তারা তাঁর ইংগিত ছাড়া নিজের অবস্থান থেকে উঠে যাওয়াও বরদাশ্‌ত করতেন না। তাদের ব্যক্তি, পারিপারিক, সামষ্টিক বা অপরাপর যাবতীয় সমস্যার সমাধানে তারই উপর নির্ভর করতেন। শয়নে, স্বপনে, আহারে-বিহারে, চলাফেরায় তারই পদাংক অনুসরণ করতেন। আজ তারা এমনি এক সমস্যায় নিপতিত হয়েছেন যা উম্মতের ভবিষ্যতের জন্য অতীব গুরুত্বের অধিকারী, কিন্তু মিমাংসার কোন শরীয়তী নির্দেশ নেই।

রাসুলেপাকের নূরানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সব সাহাবায়ে কেরামগণই হেদায়াতের নূর পেয়েছেন। তাদের মাঝে কিছু কিছু সাহাবী ঈমানের দৃঢ়তায়, ত্যাগের পরীক্ষায়, ইসলামী জ্ঞ্যানের প্রাধান্যে, তথা সারা জাহানের রহমত শেষনবীর প্রতি নজীরবিহীন ভালবাসা ও আত্বত্যাগে সবার চোখে পড়তেন,যাদের প্রশংসায় আল্লাহর নবীর অসংখ্য মন্তব্য রয়েছে। তাদেরকে সর্বদা নবীজীর সান্নিধ্যে দেখা যেতো।

এ ধরণের প্রশংসামূলক মন্তব্যে হাদিসের পাতা ভরপুর, যেমন,

- আমি যদি কাকে ও খলীল (বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম, কিন্তু আল্লাহই আমার একমাত্র খলিল।
- যদি আমার পর কেউ নবী হতো তবে উমর নবী হতো, কিন্তু আমার পর আর কেউ নবী হবেনা।
- আলীর সাথে আমার সম্পর্ক তেমনি যেমন মুসার সাথে হারুনের, কিন্তু আমার পর আর কোন নবী হবে না।

হযরত উসমানের সাথে পর পর দু'জন নবী দুহিতার বিবাহ হবার ফলে তিনি দুর্লভ (ذی النورین) বা দুই নুরের অধিকারী হবার সম্মান লাভ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) এর সাথে তাঁর আদরের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে বিয়ে দেন।

হিজরতের চরম ও পরম বিপদ সংকুল সফরে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথী হিসেবে বেছে নিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন নবী মোস্তফা (সাঃ) এর প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পিতা। হিজরতের সময়ে হযরত আলী (রাঃ) কে তারই শয্যায় ছেড়ে আসলেন মক্কাবাসীর গচ্ছিত আমানত ফেরত দেবার জন্যে।

www.pathagar.com

- উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বকর, তারপর উমর।
- আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা।

হযরত আবু বকর ও উমরের প্রশংসায় অগণিত হাদিস রয়েছে। তাদের ঈমানকে আল্লাহর নবী অন্যান্যদের সামনে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন কোন মোজেজা বা অসাধারণ ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলতেন, আমি আবু বকর ও উমরের মতো বিশ্বাস করেছি। চতুস্পদ জন্তুদের কথা বলা প্রসংগে নবীজী এই উক্তি করেছিলেন। হযরত আবু বকর ও উমরের ঈমানের সাক্ষ্যদান নবী মোস্তফার পরম নির্ভর যোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে।

দশজন সাহাবীর জীবদ্দশাতেই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তাদের পুরোভাগে রয়েছেন হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)। বদরের যুদ্ধের ও হোদাইবিয়ার সন্ধির সাথে শরীক সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদার কথা কোরআনে মজিদে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমনি ধরনের প্রশংসামূলক হাদিস ছাড়া খলিফা নির্বাচন সম্পর্কে আর কোন সুস্পষ্ট হাদিস ছিলো না। এ কারনেই ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়।

রাসুলে পাকের উপস্থিতিতে মোহাজীর ও আনসার মুসলমানেরা মদীনায় মিলে মিশে একত্রে বসবাস করতেন। রাসুলের খলিফা মোহাজীরদের মধ্য থেকে হবেন না আনসারদের মধ্য থেকে, তা নিয়েও আলোচনা চলছিলো। সকিফায়ে বনী সায়াদায় সাহাবারা জমায়েত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব বা মতামত আসছিলো।

সাহাবায়ে কেরামদের দৃষ্টি হযরত আবু বকর ও উমরের প্রতি নিবৃষ্ট ছিলো। বিশ্বস্থতা, যোগ্যতা, নবী মোস্তফার নৈকট্যে হযরত আবুবকরের পর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত উমর। মক্কা বিজয়ের পর অনেকে ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের জন্যে আল্লাহর রসুল সাধারন ক্ষমা ঘোষণা (وانتم طلقاء) 'তোমরা মুক্ত' বলে তাদের মনে ঈমানের স্থান সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা বেশী দিন নবীজীর সান্নিধ্য পাননি। তাদের শিক্ষা দিক্ষা ও তরবীয়ত তখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। তারা এই মতাবিরোধে তেমন গঠনমূলক ভূমিকা রাখবেন, এমনটি আশা করা যায় না। তদুপরি মদীনার মুনাফিকরা এ সুযোগ হাত ছাড়া করবে কেন?

এসব কিছু মিলে মারাত্মক ধরনের বিভেদ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু উম্মতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের দ্বারা যে মহান ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ফয়সালা করা হয়েছিলো, তাদের দ্বারাই আল্লাহ এই সমস্যার সমাধান করে ছিলেন। তাদের সম্পর্কেই কোরআনে এরশাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

وعد الله الذين أمنوا و عملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذيـــن من قبلهم و ليمكّنَنَّ لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفـــهم امنـــايعبدوننى لايشركون بى شيئا و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (النور)

(যারা তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে ও আমলে সালেহ করেছে, তাদের সাথে আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন যে তাদের হাতে এই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তাদের পূর্বতন লোকদেরকে খেলাফত দিয়েছেন, ফলে তারা তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, সুদৃঢ় ও স্থায়ী করে দেবেন এবং ভীতিও নিরাপত্তাহীনতার পর শান্তি প্রদান করবেন, তারা এর পর আমারই ইবাদত করবে, আর কাউকে আমার সাথে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফুরী করবে তারা অপরাধী।)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) এই আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে সুরা নুর নাযিল হবার সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরীক্ষিত সাহাবারা ছিলেন তাদের মধ্য থেকেই খলিফা নির্বাচিত হয়ে এই আয়াতের মর্ম বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। হযরত আবু বকর অতঃপর হযরত উমরের নাম প্রস্তাব করেন, পক্ষান্তরে হযরত উমর বললেন, আবু বকরের মতো মহান ও বিচক্ষন ব্যক্তি যাকে আল্লাহর নবী তার জীবন সায়াহ্নে মসজিদে নববীর ইমামতির দায়ীত্ব দিয়েছিলেন, তাকেই এই মর্যাদায় সমাসীন করতে হবে। উপস্থিত জমায়েতের সমর্থন পেয়ে তিনি আবু বকরের (রঃ) হাতে বাইয়াত করার জন্যে হাত বাড়ালেন। উম্মতের এই চরম সন্ধিক্ষণে হযরত আবু বকর আবারো এগিয়ে এলেন। সমবেত সাহাবায়ে কেরামগণ সবাই বাইয়াত করলেন। যারা উপস্থিত ছিলেন না তারাও এই নির্বাচন মেনে নিলেন এবং হযরত আবু বকর মুসলিম উম্মাহর প্রথম খলিফা বা উলুল আমর হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। এভাবে এক বিরাট ফিতনার অবসান ঘটলো। উম্মতের ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির কোন অবকাশই রইলো না। শুধু হযরত আবু বকরের খিলাফতের যামানাতেই নয় ৪র্থ খলিফা হযরত আলীর যামানা পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত কোন সাহাবাই, তারা আহলে বাইত থেকেই হোক বা তার বাইরে, কেউ এই নির্বাচনের প্রতিবাদ করেন নি। সমস্ত সাহাবায়ে কেরামগণই এ প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌঁছে ছিলেন যে রাসুলেপাকের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী খলিফায়ে রাশেদীনের যুগ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের যামানা থেকে শুরু হয়ে হযরত আলীর শাহাদাতের দিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এই খলিফা নির্বাচনের মাধ্যমে এমন এক যুগের সুচনা হয়, যাকে শুধু মুসলমানদের ইতিহাসেই নয় বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। ইসলামের কোন চরম শত্রুও এই মহান ব্যক্তিদের জীবনে কালিমা আরোপ করতে পারেনি।

কিন্তু কতই না পরিতাপের বিষয় যে ঐ স্বর্ণযুগের বহুদিনের পর ঐ প্রথম খলিফা নির্বাচনের বিষয়টিকেই মুসলিম উম্মাহর দীর্ঘতর ও ব্যাপকতর বিভেদের

www.pathagar.com

বুনিয়াদ হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে। ঐ বিভেদের বিষবৃক্ষ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে আজ ও দ্বীন ইসলামকে ক্ষত-বিক্ষত করছে।

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করার প্রশ্নে বিরোধ।

রাসুলেপাকের ইন্তেকালের পর মদীনার বাইরে অবস্থানকারী কতকগুলো গোত্র মুসলমান থাকা সত্বেও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞ্যাপন করে, তারা নামাজ আদায়ের অপরিহার্যতা মেনে নেওয়া সত্বেও যাকাতের বাধ্যতামূলকতা অস্বীকার করে বসে। তাদের মতে যাকাত শুধুমাত্র নবীর কাছেই প্রদান করার নির্দেশ রয়েছে। তারা কোরআনের আয়াত থেকেই যুক্তি পেশ করতো;

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها و صل عليهم أن صلوتك سكن لهم و الله سميع عليم – (التوبة)

(হে নবী, তুমি তাদের ধন সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহন করো, যার দ্বার তাদেরকে পরিস্কার ও পবিত্র করো এবং তাদের জন্যে দোয়া করো, তোমার দোয়া তাদের জন্যে প্রশান্তি। আল্লাহ সবই জানেন ও শুনেন।)

এই আয়াতের ভিত্তিতে তারা মনে করতো যে যাকাত আদায় করা, পবিত্রতা ও প্রচ্ছন্নতা দান করা বা দোয়া করার সম্মোধন শুধু নবীকে করা হয়েছে, তাই নবী (সাঃ) নবী ছাড়া অন্য কাকে ও যাকাত দেবার নির্দেশ নেই। তাদের যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির কারন হিসাবে এটাই উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে তাদের অস্বীকৃতিকে হযরত আবুবকরের খেলাফতে প্রতি অনাস্থা প্রকাশ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের এই যুক্তির পেছনে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তারা হযরত আবুবকরকে খলিফা হিসেবে অস্বীকার করে নাই, যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য সাহাবীও ছিলেন না। খেলাফতের বিরোধ যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতির কারণ হয়ে থাকলে বিশেষ বিশেষ সাহাবা, যারা খিলাফত প্রশ্নে বিরোধ করার যোগ্যতা রাখতেন, তাদের করো সমর্থন থাকতো। আমাদের কাছে ইসলামের যে ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে, যার সত্যতা যুক্তির ভিত্তিতে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, তাদের মতামতের সমর্থন করেনা। ইতিহাস যে সত্য তুলে ধরে তার ভিত্তিতে একমাত্র হযরত উমর প্রথমত: তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তিনি উপরিল্লিখিত আয়াতের অর্থে তার নিজস্ব ইজতিহাদ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবুবকর ও অপরাপর সাহাবীদের যুক্তির সামনে তিনি তার চিন্তা ধারাকে সংশোধন করে নেন। তিনি তার ভ্রান্তি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই কারণেই যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার প্রশ্নে বিরোধ প্রকাশ করেন। অতপরঃ এই প্রশ্নে সাহাবায়ে কেরামদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত উমরের পূর্বতন

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে খেলাফতের প্রশ্নটি মোটেই জড়িত ছিলো না। হযরত উমর (রাঃ)-ই হযরত আবুবকর (রাঃ)-র খিলাফতের প্রস্তাবক ছিলেন, হযরত উমর (রাঃ)-এর ভাষায় সিদ্দীকে আকবরের বর্তমানে তাকে খলিফা নির্ধারিত করা তাকে বিনা অপরাধে হত্যা করার নামান্তর।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যাকাত প্রদানে অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনার পক্ষে যে সব যুক্তি পেশ করলেন তা নিম্নরূপঃ

- আল্লাহর রাসুল কোন ব্যক্তিকে ইসলাম কবুল করানোর সময় তার কাছ থেকে নামাজ আদায়ের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের ওয়াদা নিতেন।
- অনেক আয়াতে ইমানের শর্ত হিসেবে নামাজের সাথে সাথে যাকাতের কথাটি সংযুক্ত।
- নামাজ আল্লাহর প্রতি মানুষের দৈহিক হক আর যাকাত হলো তার আর্থিক হক।
- ইসলামে আনুগতের কেন্দ্র হিসেবে কোরআনে আল্লাহ ও রাসুলের পর উলুল আমর বা শাসক স্থান পেয়েছে। তাই মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থায় উলুল আমরের জন্য নামাজ কায়েম করার সাথে সাথে যাকাত ব্যবস্থা চালু রাখা অপরিহার্য। ইসলামে এই দায়িত্ব প্রথমত: নবীপাকের উপর ন্যস্ত ছিলো। অতঃপর এই ব্যবস্থা চালু রাখার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্টের রাষ্ট প্রধানের।

এসব কারনেই হযরত আবু বকর যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনার পক্ষে কঠোর মনোভাব পোষন করেন।

পক্ষান্তরে উমরে ফারুক রাসুলে পাকের এই হাদিসটি প্রমান হিসেবে তুলে ধরতেন।

أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لآ اله الاّ الله — فمن قالها فقد عصم منى ماله و نفسه الاّ بحقها و حسابه على الله تعالى—

(আমি নির্দেশিত হয়েছি যে আমি লোকদের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করবো যতোক্ষণ না তারা কালামায়ে তাইয়েবার ঘোষণা দেয়। যখন তারা ঘোষণা দেবে, তখন তার জান ও মাল আমার নিরাপত্তা পাবে। শুধুমাত্র কালেমার হক অনুযায়ীই তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লজ্ঘন করা যাবে। অত:পর তাদের বিচার আল্লাহর হাতে।)

হযরত উমর মনে করতেন, যখন তারা কালেমায়ে তাইয়েবার ঘোষণা দিয়ে তাদের জান-মাল নিরাপদ করে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে জিহাদ হতে পারে? হযরত উমর হাদিসের শাব্দিক অর্থের উপর সমুহ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার অর্থ হলো কেউ মৌখিক ঘোষনার মাধ্যেমে কালেমার স্বীকৃতি দিলে তার জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর শব্দের অন্তর্নিহিত মর্মের প্রতি অধিক

www.pathagar.com

গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি হাদিসের মধ্যে (الا بحقها) শব্দটির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে নামাজকে অস্বীকার করলে যখন কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায় না, তখন যাকাত অস্বীকার করলে তাকে কিভাবে মুসলমান বলে স্বীকার করে তার জান-মালকে নিরাপত্তা দেয়া হ'তে পারে?

ইতিপূর্ব আমরা এমন ধরনের মত পার্থক্যের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি, যার ভিত্তিতে হযরত উমরের যুক্তি রেওয়ায়েত (روایة) ভিত্তিক আর হযরত আবু বকরের যুক্তি (درایة) দেরায়াত ভিত্তিক।

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুক্তির কাছে হযরত উমর (রাঃ) নতিস্বীকার করলেন এবং তার সব সন্দেহ দুর হয়ে গেলো। সমস্ত সাহাবারা হযরত আবু বকরের মতের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করলেন এবং এই বিভেদের সমাপ্তি ঘটলো। হযরত আবু বকরের এই প্রজ্ঞা ইসলামকে এক বিরাট বিপদ থেকে উদ্ধার করলো। অন্যথায় দ্বীন ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধীদের হাতে বিরাট যুক্তি এসে যেতো, তার প্রজ্ঞা ও সাহস কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য মহান আদর্শ হয়ে থাকবে।

তারই জামানায় মোসাইলিমা সহ কিছু লোক নবুয়তের দাবী করে বসে, তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করেন, সেই বিষয়ে কোন বিভেদ সৃষ্টি হয়নি তাই আমাদের বিষয় বস্তুর সাথে সম্পর্কহীন। ইসলামের বুনিয়াদ (১) তাওহীদ (২) রেসালাত (নবী মোস্তফাকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করা ও তার শরীয়তকে অবশ্য পালনীয় মনে করা) (৩) আখেরাতের কোন একটিকে অস্বীকারকারীকে উম্মতের সদস্য মনে না করার মূলনীতিতে উম্মতের মধ্যে কখন ও মতবিরোধ ছিল না- আজও নেই।

www.pathagar.com

০শরীয়তের বিষয়াদিতে সাহাবাদের মত পার্থক্য

উপরিল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনায় সাহাবাদের মধ্যে মত পার্থক্যের ধরনও স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। সাথে সাথে উদ্ভূত বিরোধের মিমাংসায় তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব মৌলিক বিষয়সমূহের বিভেদ ও বিরোধ ছাড়াও তাদের মধ্যে ফিকাহর বিভিন্ন মসলায় মত পার্থক্য ছিলো, সে সব ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোরআন হাদিসের মূলনীতি সমূহের অনুসরণ করতেন।

সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসে কোন বিভেদ ছিলো না। কখনো কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম বা কোন হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিতো, তখন তারা প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে ঐক্যমতে পৌঁছে যেতেন, কোন বিরোধ বা বিভেদের সৃষ্টি হতো না।

রাসুলেপাকের জীবদ্দশায় তারা প্রশ্ন করতেন খুবই কম, কোরআনে যা কিছু নাযিল হতো বা রাসুলে পাক যা কিছু বলতেন, তারা তা ভাল করে বুঝে নিতেন, মনে রাখতেন ও সেই অনুযায়ী আমল করতেন। তারা রাসুলের নির্দেশ মতো আমল করতেন। কারন জানার চেষ্টা করতেন না। সাহাবাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে কখনও কখনও অহী নাযিল হতো। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) তার কিতাবে (حجة الله البالغة) ১৩টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং অহীর মারফতে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

সাহাবাগণ এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন না যা বাস্তবে ঘটেনি, অবাস্তব ও মনগড়া বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে তারা ঘৃণা করতেন। হযরত উমর (রঃ) বলতেন, তোমরা এমন বিষয়ের প্রশ্ন করো না যা বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। হযরত উমর (রঃ) বলেছেন, ঐ লোকদের উপর আল্লাহর লায়ানত যারা মনগড়া প্রশ্ন করে। সাহাবাগণ বাস্তবতার ভিত্তিতেই শরীয়তের বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনদের যামানায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তাদের জানা মতে হাদীসের ভিত্তিতে জবাব দিতেন। যদি তারা সে বিষয়ে কোন হাদিস না জানতেন তবে অন্যান্য সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তারা কোন হাদিস জানতেন তারই ভিত্তিতেই তারা জবাব দিতেন। হযরত আবু বকর (রঃ) উত্তরাধিকার আইনে দাদীর অংশ সম্পর্কে কোন হাদিস জানতেন না। তিনি উপস্থিত সাহাবাদের কাছে জানতে চাইলেন, কেউ এ বিষয়ে কোন হাদিস জানেন কিনা? বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুগীরা বিন সোওবা বললেন, আমি রাসুলের মুখে শুনেছি দাদীর অংশ ষষ্টাংশ। হযরত আবু বকর অতঃপর উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে আর কেউ এই হাদিসটি শুনেছেন কিনা জানতে চাইলেন, তখন অপর এক সাহাবী মুহাম্মদ বিন মোসলিমা সাক্ষ্য দিলেন যে তিনিও হাদিসটি শুনেছেন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই হাদিস মত রায় প্রদান করলেন। হযরত আবু বকর বিশিষ্ট সাহাবী মুগীরা বিন সোওবাকে বিশ্বস্থ মনে করেননি তা কখনও

www.pathagar.com

নয়, বরং তিনি কোন হাদিস গ্রহণ করার পদ্ধতি দিয়ে যাবার জন্য একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্য নেবার ব্যবস্থা চালু করলেন। তারা হাদিসে রাসুলের সত্যতা প্রমাণের প্রশ্নে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এই ঘটনার মাধ্যমে তার একটা বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাহাবায়ে কেরামদের মত পার্থক্যের ধরণ।

সমস্ত সাহাবারা তাদের সাধ্যমত হাদীসে রাসুল মনে রাখতেন এবং সেই মোতাবেক আমল করতেন ও অন্যদের জন্য রায় দিতেন। তারা যখন মদীনায় বসবাস করতেন তখন তারা পরস্পরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হাদিস জানার চেষ্টা করতেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে রাসুল নির্ধারিত পথ ও মত নির্ধারণ করতেন, কিন্তু যখন তারা মদীনার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেন এবং বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীল হয়ে পড়লেন তখন তারা প্রথমতঃ কোরআনের ভিত্তিতে ফয়সালা করতেন। কোন বিষয়ে কোরআনের রায় পাওয়া না গেলে হাদীসে রাসুলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। যদি হাদীসেও সুস্পষ্ট রায় পাওয়া না যেতো তাহলে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। এ কারনে কোন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দিতো। এমনি পর্যায়ের মত পার্থক্য কয়েক ধরনের ছিলো, যা মূলতঃ ইজতিহাদের বিভিন্নতার কারণেই উদ্ভূত হতো। নিচের কয়েকটি উদাহরণ প্রনিধানযোগ্য।

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -কে জিজ্ঞাসা করা হলো,
একজন মহিলার স্বামী মারা গেছেন, তার জন্যে কোন মোহর নির্দিষ্ট নেই, তার মোহর কি হবে?
তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার কোন হাদিস জানা নেই, কিন্তু দীর্ঘ এক মাস যাবত লোকেরা তাকে জবাব দেবার জন্যে চাপ দিতে থাকে। তখন তিনি ইজতিহাদ করে জবাব দিলেন, ঐ মহিলা তার পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সম-পরিমাণে মোহর পাবে এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

এই জবাব শুনে হযরত মায়কল বিন ইসার বললেন, আমি রাসুলেপাক (সাঃ)-কে এক মহিলার ব্যাপারে এমনি অবস্থায় ঠিক এমনি ফয়সালা দিতে শুনেছিলাম। একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এত উল্লসিত হলেন যে তার মতে ইসলাম কবুল করার পর থেকে এত আনন্দিত কখনও হননি।

(২) হযরত ইবনে হোরাইরাহ ইজতিহাদ করে মত দিয়েছিলেন যে নাপাক অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে গেলে তার রোজা হবে না, কিন্তু যখন তিনি রাসুলেপাকের পত্নীদের কাছ থেকে রাসুলের আমল শুনতে পেলেন, তিনি তার মত পালটে নেন।

(৩) স্বামী তিন তালাক দিলে স্ত্রীর খোরপোশ ও বাসস্থানের হক সম্পর্কে ফাতিমা বিনতে কায়েস বললেন তার স্বামী তাকেও তালাক দিয়েছিলো, তখন রাসুলেপাক তাকে খোরপোশ ও বাসস্থানের ফয়সালা দেননি। তখন হযরত উমর (রাঃ) বললেন,

www.pathagar.com

কোরআনের আয়াতে এই অবস্থাতে স্ত্রীকে খোরপোশ ও বাসস্থানের নির্দেশ রয়েছে। একমাত্র একজন মহিলার বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে তিনি কোরআনের রায় বদলাতে পারেন না। যেহেতু বর্ণিত হাদিসের পক্ষে আর কোন সমর্থন না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করার কোন পথ ছিলো না। তাই অন্য কোন সাক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে হযরত উমর (রাঃ) কোরআনের ভিত্তিতেই রায় দিলেন।

(৪) কখনও ভ্রম বশতঃ সাহাবাদের ইজতিহাদ ভিন্নতর হতো। সাহাবায়ে কেরামগণ রাসুলেপাকের হজ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষন করতেন, কেউ কেউ বলতেন তিনি হজ্বে তামাতু আদায় করেছেন, আবার কেউ বলেছেন, আল্লাহর রাসুল হজ্বে কেরানের নিয়ত করেন, অপর কিছু সাহাবীদের মতে নিনি হজ্বে ইফরাদ করেছেন। বস্তুতঃ দূর থেকে দেখে ধারনা করার ফলেই এই ভ্রম ঘটেছে।

(৫) কখনও কখনও সাহাবারা ভিন্নমত পোষন করতেন মূল কারণ বুঝতে ভ্রান্তির ফলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; হযরত ইবনে উমরের মত ছিলো যে মৃতব্যক্তির পাশে স্বজোরে কাটাকাটি বা বিলাপ করলে মৃতব্যক্তির আজাব হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) মন্তব্য করেছেন যে হযরত ইবনে উমর কার্যকারণ বুঝতে ভুল করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন হাদিসটির পটভূমি হলো, একদা আল্লাহর নবী পথিমধ্যে দেখলেন, একজন ইহুদী নারীর মৃত্যুতে তার স্বজনরা বিলাপ করছে, আল্লাহর রাসুল বললেন, ওরা মৃতের জন্য কাঁদছে আর ঐ মহিলার উপর আজাব হচ্ছে। এই হাদিসে হযরত ইবনে উমর কবরের আজাবের কারণ হিসেবে কাঁন্নাকাটি বা বিলাপকে মনে করে বসেছেন। তার এই মত কোরআনের স্পষ্ট অভিমত "তোমরা একে অপরের বোঝা (গোনাহ) বহন করবে না বা অন্যের গোনাহতে তোমাদের শাস্তি হবে না" এর পরিপন্থি। তাই ইবনে উমরের মত তার ইজতিহাদী ভ্রম।

সাহাবাদের মত পার্থক্য তাদের আত্মসম্মানের কারণ হতো না

হযরত উমর ও হযরত আলীর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য ছিলো, সেসব মত পার্থক্যে তারা সর্বদা ইসলামের মূলনীতির সন্ধানে লিপ্ত থাকতেন। মত পার্থক্য তাদের আত্মসম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়াতো না।

হাদিস শরীফে পাওয়া যায় যে হযরত উমরের খেলাফতের সময় তিনি খবর পেলেন যে একজন মহিলা একাকী বসবাস করে, তার স্বামী নিরুদ্দিষ্ঠ। তার ঘরে বিভিন্ন ধরণের লোক যাতায়াত করে। এ খবর শুনে তিনি ঐ মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। যখন খলিফার দুত তাকে এ খবর জানালেন, সে ভয়ে ভীত হয়ে পড়লো। ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় যাওয়ার পথে এক ঘরে প্রবেশ করে প্রসব করে ফেলে। নব প্রসুত সন্তান এক চিৎকার করেই মৃত্যুবরণ করে, বিষয়টি নিয়ে হযরত উমর সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। সমবেত সাহাবাদের অধিকাংশই বললেন যে এতে খলিফার কোন দায় দায়িত্ব নেই। তিনি

www.pathagar.com

তার খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যেই মহিলাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি কোন অপরাধ করেন নি। পথিমধ্যে যা ঘটেছে তাতে খলিফাকে দায়ী করা যায় না। এই আলোচনার সময় হযরত আলী (রাঃ) চুপ করে বসে ছিলেন, হযরত উমর (রাঃ) আলোচ্য বিষয়ে তার মতামত চাইলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমার মতে আপনিই ঐ শিশুটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আপনার ভয়েই মহিলা প্রসব করে বসেছিলো, তাই আপনাকে রক্তের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হযরত আলী (রাঃ)-র মতামত শুনে হযরত উমর (রাঃ) সাথে সাথে ঐ শিশুটির উত্তরাধিকারীদেরকে শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ প্রদান করলেন।

সাহাবায়ে কেরামদের মত পার্থক্যের এই ছিলো ধরন। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন খলিফা, দন্ডমুন্ডের মালিক। তদুপরি অধিকাংশ সাহাবীদের মত তার পক্ষে ছিলো, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অপেক্ষাকৃত কঠিন সিদ্ধান্তটি অম্লান বদনে মেনে নিলেন। হযরত উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাসের মধ্যেও অনেক মসলা মাসায়েলে মত পার্থক্য ছিলো। ইমাম ইবনে তাইয়েমা তার কিতাব (منهاج السنة) এমনি ১০০টি মসলার উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে হযরত উমর ও ইবনে আব্বাসের মধ্যে মত পার্থক্য ছিলো। তাদের মনে কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি হতো না। তাদের পারস্পরিক আস্থা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় দ্বীনি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাসকে তফসিরের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি যতো দীর্ঘ সময় ধরে রাসুলের খিদমতে ছিলেন, খুব কম সংখ্যক সাহাবীরা তা পেয়েছেন। এ কারণেই হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলতেন, আমরা ইবনে আব্বাসকে নবী পরিবারের সদস্য মনে করতাম। তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর প্রজ্ঞাকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। উভয়ের ইজতিহাদের ধরনও একই ছিলো, একে অপরকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। একদা হযরত উমর (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন, হযরত ইবনে আব্বাস আসলেন, তাকে আসতে দেখে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, ইসলামী জ্ঞান ও পান্ডিত্যের ব্যক্তিত্ব আগমন করছেন। কখনো কখনো বলতেন, তার জ্ঞান ও পান্ডিত্যকে আমি কাদসীয়াবাসীদের চাইতে বেশী প্রাধান্য দেই। অর্থাৎ তিনি একা আমার কাছে বিরাট সংখ্যক লোকদের চাইতে বেশী গুরুত্বের অধিকারী।

হযরত উমর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর একদা তার মজলিশে বসেছিলেন, তথায় দু'জন লোকের আগমন হলো। তাদের কোরআনের শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদের একজন বললেন, আমি হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে কোরআন শিখেছি। অন্য ব্যক্তি অন্য কোন এক সাহাবীর কাছে কোরআন শিখেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস হযরত উমর (রাঃ)-এর নাম শুনেই আবেগে কেঁদে ফেললেন, তিনি বললেন, হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের বিরাট দুর্গ ছিলেন, তার মৃত্যুতে সেই দুর্গ ভেঙ্গে পড়েছে। অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে হযরত উমর (রাঃ)-এর শেখানো কোরআন শুনলেন।

www.pathagar.com

মসলা মাসায়েলে তাদের ইজতেহাদী. মত পার্থক্যের কারণে তাদের সম্পর্কের অবনতি হওয়া দূরের কথা, তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো দৃঢ়তর হতো। ইসলামী চরিত্রের এটাই ছিলো স্বরূপ।

সাহাবায়ে কেরামদের ইজতিহাদী মত পার্থক্যের মধ্যে তাদের অনুকরণীয় আদর্শের অসংখ্য উদাহরন রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবিতের অনেক মাসয়ালায় মত পার্থক্য ছিলো। হযরত যায়েদ ও বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। একদিন হযরত যায়েদকে আসতে দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে তার উটের লাগাম ধরে সাথে সাথে চলতে থাকলেন। হযরত যায়েদ তখন বললেন, হে নবী পরিবারের সদস্য। আপনি লাগাম ছেড়ে দিন। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, বড়দের ও আলেমদের এভাবে সম্মান করাই ইসলাম শিখিয়েছে। হযরত যায়েদও হেরে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাকে বললেন, আপনার হাতখানি বাড়ান দেখি। যেই হযরত ইবনে আব্বাস তার হাতখানি বাড়িয়েছেন। তিনি তার হাত ধারণ করে চুম্বন করে বললেন, নবী পরিবারের সদস্যদের এভাবেই মর্যাদা দান করতে আমাদেরকে শেখানো হয়েছে।

হযরত যায়েদ বিন সাবিতের যখন ইন্তেকাল হলো, হযরত ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন, ইসলামী ইলমের বিরাট অংশ আজ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

ইতিহাসে পাওয়া যায় হযরত ইবনে আব্বাস অনেক মসলায় হযরত যায়েদের ইজতিহাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করতেন, কিন্তু এই মত পার্থক্য বা মত পার্থক্যের কঠোরতা তাদের ঈমানী সম্পর্কের সৌন্দর্যকে ম্লান করতে পারতো না।

খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামদের দৃষ্টিভঙ্গি

রাসুলে আজম যখন হোনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তার সাথে ১২ হাজার সাহাবী মদীনায় অবস্থান করেন। রাসুলেপাকের ইন্তেকালের সময় মদীনায় মাত্র ১০ হাজার সাহাবী বসবাস করতেন, বাকী দুই হাজার সাহাবী অন্যান্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিদায় হজ্বের সময় রাসুলেপাকের সাথে এক লাক চৌদ্দ হাজার থেকে এক লাখ ত্রিশ হাজার সাহাবী ছিলেন, তাই সর্বমোট সাহাবীদের সংখ্যা এর চাইতেও বেশী।

হযরত উমরের খিলাফতের যুগে মদীনায় অবস্থানরত সাহাবাদেরকে মদীনায় থাকতে তাগিদ দিতেন। জিহাদ বা এই জাতীয় প্রয়োজনে মদীনার বাইরে যারার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, সেই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই আবার মদীনাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আহবান জানাতেন। তারাই ছিলেন ইসলামী রাষ্টের রাজধানীর মূল শক্তি। মিল্লাতের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেয়া হতো। হযরত উসমান (রা:) এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেন, তখন সাহাবায়ে কেরামগণ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিষয়ের মত পার্থক্যে সাহাবায়ে কেরামদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ ছিলো;

১. সাধারনভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ মত পার্থক্য থেকে দুরে থাকার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। ঐক্যের বুনিয়াদ পাওয়া গেলে তারা মত পার্থক্যের পথ মাড়াতেন না।

২. কোন বিষয়ে হাদিস না জানার ফলে কোন সাহাবী তার ইজতেহাদ অনুযায়ী মত দেয়ার পর যদি অন্য কোন সাহাবীর কাছ থেকে ঐ বিষয়ে কোন হাদিস পেতেন, তখন প্রাপ্ত হাদিসের ভিত্তিতে তার মত পরিবর্তন করতে এতটুকু ও দেরী হতো না। ইজতিহাদের নির্ধারিত সীমা তারা কখনো লংঘন করতেন না।

৩. ইসলামী ভাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। একা অপরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ইজতিহাদের মূলনীতিকে তারা সদা মনে রাখতেন।

৪. কোন আকিদা ও ঈমান সম্পর্কির্ত কোন বিষয়ে কখনো মতবিরোধ করতেন না। তেমন কোন পরিবেশ সৃষ্টি হলে তারা একে অপরকে নবী চরিত্রের আদর্শের কথা মনে করিয়ে দিতেন। কোন সাহাবীর কোন ভূল বা ত্রুটি দেখানো হলে তিনি সাথে সাথে তা স্বীকার করে নিতেন। এ ধরণের ভূমিকাকে তারা দ্বীনের পথে পারস্পরিক সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতেন।

৫. ইসলামী পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো, সমাজে তাদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, ইলমের ধারকগণও তাদের বিশেষ দায়িত্বের প্রতি সজাগ ছিলেন। তারা একদিকে কোন ইলমকে গোপন রাখা দ্বীনি অপরাধ মনে করতেন অপর দিকে কোন ইলমের জ্ঞান না থাকলে তা অকপটে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করতেন না।

৬. মসলা-মাসালায় মূলনীতি ভিত্তিক ইজতেহাদী মত পার্থক্যকে তারা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও দ্বীনি দায়িত্ব মনে করতেন এবং তাদের নিজস্ব মতামতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না । খলিফারা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন।

৭. চরম ও অবধারিত বিরোধের মুখেও তারা ইসলামী ভাতৃত্বের মূল্যবোধ বিস্মৃত হতেন না। প্রকাশ্য বৈরী পরিবেশে ও ইসলামী দ্বীনি সম্পর্কের কিরণ ছড়িয়ে পড়তো, যা তাদের সমাজেই সম্ভব ছিলো, এবং সেটাই হলো আমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ।

কয়েকটি অভূতপূর্ব ঘটনা

সাহাবায়ে কেরামদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, উদারতা ও খোদা ভীতির অসংখ্য আলেখ্য রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সাহাবাদের জীবনে অনেক বড় বড় অঘটন ঘটেছে বিভেদ ও বিরোধ হয়েছে। সেই বিরোধের মধ্যে ও তাদের যে বিশেষ চরিত্রের দিপ্তী অম্লান রয়েছে, সেগুলোই আমাদের জাতীয় সম্পদ। সাহাবায়ে কেরামদের ঐক্য ও বিরোধ দুটোই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শের পয়গাম

www.pathagar.com

রাখে। চরম অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর মাঝে সাহাবায়ে কেরামদের যে বিশেষ চরিত্র সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, সে গুলোই আমাদের পাথেয়, আমরা শুধু বিবাদ ও বিভেদ নিয়েই ব্যস্ত, ভ্রাতৃত্বের মহান শিক্ষার দিকটা আমরা ভুলে যাই। বস্তুতঃ আমরা সাহাবায়ে কেরামদের ছেড়ে যাওয়া আদর্শকে খন্ডিত রূপে মূল্যায়ন করার অপরাধে অপরাধী। এ কারণে আমরা তাদের বিরোধেই হোচট খাই। সাহাবায়ে কেরামদেরকে বিভেদে, ঐক্যে, শান্তিতে, কলহে এক কথায় মানুষ হিসাবে তাদের জীবনের সকল ঘটনায় তাদেরকে আমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ করার পেছনে আল্লাহর হিকমতের কথা চিন্তা করলে আমাদের দৃষ্টি তাদের বিরোধে ও বিভেদের মাঝে তাদের চারিত্রিক মাধুর্য্যের দিকেই কেন্দ্রীভূত হতো এবং মনে প্রাণে গভীর প্রশান্তি নেমে আসতো এবং মনে হতো যদি এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের যুগে এই অবাঞ্ছিত ঘটনা সমুহ সংঘটিত না হতো, তবে এসব মহান চরিত্রের শিক্ষা কোথায় পেতাম?

উটের যুদ্ধ

এই যুদ্ধ কত ভয়ংকর ছিলো তা এ কথাতেই সহজেই অনুমান করা যায় যে এই যুদ্ধে বিশ হাজার লোক নিহত হন, যুদ্ধের এক পক্ষের সেনাপতি হলেন স্বয়ং খলিফা হযরত আলী আর অপর পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন হযরত আয়েশা (রাঃ)। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মূহুর্তে হযরত আলী (রাঃ) সামনে এগিয়ে গিয়ে অপর পক্ষের হযরত যোবায়েরকে ডাক দিলেন। অতঃপর উভয়েই ঘোড়া থেকে নেমে কোলাকুলি করলেন - কাঁদলেন। হযরত আলী জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারন তোমাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে? হযরত যোবাযের জবাব দিলেন, উসমানের রক্ত। এভাবে তারা অনেক সময় ধরে কথাবার্তায় লিপ্ত থাকলেন।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে হযরত আলী জয়লাভ করলেন। অপর পক্ষের পরাজিত ব্যক্তিরা যুদ্ধবন্দী হিসাবে হযরত আলীর রায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। হযরত আলীর পক্ষের অধিকাংশ লোক যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু হযরত আলী তাদের এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখান করে তাদেরকে আবার আনুগত্যের শপথ নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করলেন। পরাজিত পক্ষের সম্পদকেই মাত্র গনিমত হিসাবে ঘোষণা করলেন কিন্তু বন্দী লোকদেরকে বন্দী হিসাবে রাখতে অস্বীকার করলেন। অনেকে যখন বার বার চাপ দিতে থাকলেন তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে নবী মোস্তফার সহ-ধর্মিনী উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিজের অংশে নিতে? সবাই লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। অতঃপর আর কেউ এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি?

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উট আহত হয়ে পড়ে যায়, এ অবস্থা দেখে হযরত আলী (রাঃ) চিৎকার করে বললেন, তোমরা যাও, দেখো উম্মুল মুমেনীনের কোন চোট তো লাগেনি? হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই মোহাম্মদ ত্বরীতে সেখানে হাজির হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খবরাখবর নিলেন। অতঃপর হযরত আলী

www.pathagar.com

(রাঃ) স্বয়ং গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মা আপনার চোট লাগেনি তো? আল্লাহ্ আপনার গোনাহ্ মাফ করুন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-ও বললেন, আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুন।

পরবর্তীকালে একদিন এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে খুশী করার উদ্দেশ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বসে। হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে কঠোর ভাষায় তাকে বললেন, জঘন্য ব্যক্তি, কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করোনা, তুমি নবী পাকের নিতাম্ত প্রিয়তমা স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছো। তিনি জান্নাতে ও রাসুলেপাকের স্ত্রী থাকবেন। তিনি আমাদের সবার মা। অতঃপর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে যা বললেন সেটা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য, তিনি বললেন,

"আল্লাহ্পাক তাকে দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন এভাবে
যে আমরা আল্লাহ্রই আনুগত্য করি না তাঁর।"

এসব কথা কোন উপন্যাসের উপাখ্যান নয়, ইতিহাসের পরম সত্য ঘটনা। ইসলামের শিক্ষা ও হিকমতে যাদের মন পরিতৃপ্ত একমাত্র তারাই এ সব ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারে।

এ জন্যে আমি শুধু ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি, এর উপর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছি।

হযরত তালহা ঐ যুদ্ধে হযরত আলীর বিরুদ্ধ শিবিরে ছিলেন। তিনি ছিলেন আশারায়ে মোবাশ্শিরা সাহাবীদের একজন। একদা তারই পুত্র ইমরান হযরত আলী (রাঃ)-এর দরবারে হাজির হলেন। হযরত আলী তাকে কাছে বসিয়ে নিতান্ত আন্তরিকতার সাথে বললেন আল্লাহ্ আপনার মহান পিতা ও আমাকে একত্রে জান্নাতে অবস্থানের তওফিক দিন। আল্লাহ্ যেনো আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে শামিল করেন, যাদের সম্পর্কে কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে।

ونزعنا ما فى صدوروهم من غل اخوانا على سرر متقبلين – (الحجر)

(আমি তাদের মনে যে বিদ্বেষ ছিলো দূর করে দিয়েছি। তাই তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা সামনি আসনে উপবিষ্ট থাকবে)

অতঃপর হযরত আলী তার পরিবারের প্রত্যেকের সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন। সেখানে এমন কিছু লোক ছিলেন যারা সাহাবায়ে কেরামদের সত্যিকার মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতেন না, মন্তব্য করে বসলেন; কাল তারা যুদ্ধ করলেন আর আজ একত্রে জান্নাতে ভাই ভাই হয়ে একত্রে থাকার কথা বলছেন। তাদের এ ধরনের কথাবার্তা শুনে হযরত আলী রেগে গিয়ে বললেন, বিদ্বেষী ব্যক্তিরা দূর হয়ে যাও। হযরত তালহার সাথে জান্নাতে থাকবো না তো কার সাথে থাকবো।

হযরত আলীর খেলাফতের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবার সময় একদল লোক শপথ নেয়া থেকে বিরত থাকেন। হযরত আলী তাদেরকে বাধ্য করেননি বা তিরস্কার

www.pathagar.com

করেননি। তিনি উদারতা দেখিয়ে বলতেন; তারা সত্যের পক্ষ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু বাতিলের পক্ষও নেয়নি। তাই তাদের সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন এবং শপথ করে বলতেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রসুত নয়, বরং হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছি। হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি হযরত মুয়াবিয়ার শ্রদ্ধা সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা জানা যায়। যেরার বিন দামারা যিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর সহচর ছিলেন, একদা হযরত মুয়াবিয়ার দরবারে হাজির হলেন। হযরত মুয়াবিয়া তাকে হযরত আলীর (রাঃ) গুণাবলী বলার জন্য অনুরোধ করলেন, প্রথমতঃ তিনি এই অনুরোধ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়ার একান্ত অনুরোধে তিনি বললেন,

"আল্লাহর শপথ তিনি অত্যন্ত গভীর দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ও ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা দিতেন। তাঁর দরবারে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রস্রবন বইতো। লোকচক্ষুর অন্তরালে রাতের আঁধারে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে আকুল হতেন ও গভীর চিন্তায় ডুবে থাকতেন। নিজের হাত উল্টে পালটে দেখতেন আর আত্মসংলাপ করতেন। সাদা-মাটা খাবার ও পোষাক পছন্দ করতেন। তিনি আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। আমরা তার কাছে গেলে তিনি আমাদের সাথে ঘনিষ্টভাবে কথা বলতেন ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। এতো নিকটের মানুষ হওয়া সত্বেও তার ব্যক্তিত্ব এতই বিশাল ছিলো যে তার সাথে কথা বলতে সংকোচ হতো। তিনি যখন হাঁসতেন - মুক্তার মতো দাঁত দেখা যেতো। তিনি খোদাভীরু লোকদের সম্মান করতেন ও গরীবদের ভাল বাসতেন। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি ও তাকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করানোর কথা চিন্তাও করতে পারতো না এবং কোন দূর্বলতম ব্যক্তি ও তার ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হতো না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি নিজের দাঁড়ি ধরে এমনি অস্থিরভাবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন যেন তাকে কিছু দংশন করেছে। কোন বিপদগ্রস্থ ও দূর্দশাগ্রস্থ মানুষের মতো অবিরাম কেঁদে চলেছেন। আমি আজও তার সেই কান্নার আওয়াজ যেনো শুনতে পাচ্ছি; তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন: হে আমার রব, হে আমার প্রভু, হে আমার মালিক। পার্থিব জীবনকে সম্বোধন করে বলছেন, আমাকে প্রতারনা দেয়ার চেষ্টা করো না, অন্য কোথাও যাও। আমি কবেই তোমাকে ত্যাগ করেছি, তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে - তোমার এই জৌলুস অত্যন্ত ঘৃণিত ও মূল্যহীন। ক্ষতিই বেশী উপকার খুবই কম। হায়, সঞ্চয় কত কম - সফর কত দীর্ঘ - আর রাস্তা কতই না ভয়াবহ।"

এই পর্যন্ত শুনে হযরত মুয়াবিয়া কেঁদে আকুল হয়ে পড়লেন, কাপড় দিয়ে চোখ মুছলেন। সমবেত লোকদের মধ্যে কান্নার বন্যা বয়ে গেলো। হযরত মুয়াবিয়া বললেন, আল্লাহর শপথ আবুল হাসান আলী (রাঃ) এমনিই ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।

www.pathagar.com

অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যেরার, তুমি তাকে কতখানি ভালবাসো? তিনি জবাবে বললেন, কারো নিতান্ত আপনজনকে যদি তার ক্রোড়েই হত্যা করা হয়, তার অশ্রু থামবে না - দুঃখ-বেদনা যাবে না - শান্তনা পাবে না। এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন।

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের এই আলেখ্য লিখে শেষ করার নয়। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদাহরণ তুলে ধরাই লক্ষ্য।

সাহাবাদের মত পার্থক্য একটি রহমত

পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ বলে খ্যাত হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয বলেছেন, আমি কখন ও এ কথা কামনা করি না যে সাহাবায়ে কেরামগণ যেনো কোন মত বিরোধ না করতেন। যদি দ্বীনি মসলা- মাসয়েলে মাত্র একটি মত থাকতো তবে তা কখনো মানুষের জন্যে সংকীর্ণতার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। সাহাবায়ে কেরামদের মত পার্থক্যে দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা বেরিয়ে এসেছে। যেহেতু তারা হলেন আমাদের আদর্শ, তাই তাদের মতামতের মধ্যে কোন একটা মতের উপর আমল করলে তা সুন্নতের আমল বলেই বিবেচিত হবে।

পরবর্তীযুগের পরিবর্তনশীল সমাজের নিত্য নতুন সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজন পুরণের জন্য ইজতিহাদের দরজা উম্মুক্ত রাখার জন্যেই সাহাবায়ে কেরামগন এই আদর্শ রেখে গেছেন। যদি তাদের আদর্শ থেকে এই মত প্রর্থক্যের মূলনীতি পাওয়া না যেতো তবে পরবর্তীযুগের মুসলমানদের জন্যে ইজতিহাদের পথে চলা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, মানুষের প্রয়োজন দেখা দেবে কিন্তু তার প্রয়োজনীয় সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অভাবে ইজতিহাদের অপরিহার্যতা রয়েছে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ ছাড়া তা কেমন করে সম্ভব হ'তো?

এই বিষয়টির আরো ব্যাখা দিয়েছেন কাজী ইসমাইল এভাবে;

"সাহাবায়ে কেরামদের মত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে দ্বীনের বিষয়ে যে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়েছে, তা ইজতিহাদ করার প্রশস্ততা। কারণ তাদের মত পার্থক্য এই কথাই প্রমাণ করে যে সব বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেতো না, সে সব বিষয়েই ইজতিহাদ করেছেন, আর ইজতিহাদের পথেই তাদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো। কাজী ইসমাইল আরো বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামদের মত প্রার্থক্য রহমত হবার অর্থ এই নয় যে সাহাবাদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে বিনা প্রমাণে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোন একটা গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মত পার্থক্য এই অর্থে রহমত যে তা পরবর্তীযুগের জন্য ইজতিহাদের রাস্তা খুলে দিয়েছে। সাহাবাদের প্রদর্শিত আদর্শানুযায়ী ইজতিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের অংশিদার হওয়া যাবে।

اختلاف أمتي رحمة। *(আমার উম্মতের মত পার্থক্য একটি রহমত)* একটি দুর্বল সনদের হাদিস, এর মধ্যে এই রহমতের কথাই বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামদের

www.pathagar.com

আদর্শানুযায়ী ইজতিহাদ করাই হলো রহমত। সাহাবায়ে কেরামদের বিভিন্ন মতের মধ্যে বিনা প্রমাণে কোন একটাকে মেনে নেয়ার তকলিদ কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাযম আন্দুলুসী বলেছেন যে বিনা প্রমাণে বিভিন্ন মতের মধ্যে সুবিধাজনক কোন একটা মতকে বেছে নেয়াকে ইমামদের সর্বসম্মতিতে ফাসেকী কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে সাহাবায়ে কেরামগণ আকিদা ও ইমান সম্পর্কিত বিষয়ে কখন ও মতবিরোধ করেন নি বা তারা কোরআনের রূপক আয়াতের ব্যাখায় ও মত পার্থক্য করেননি, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি উম্মতের জন্য অবশ্যি পালনীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্টিত হয়ে গেছে। তেমনি ইসলামের ইবাদাত বন্দেগীর প্রসংগে কোন বিশেষ নিয়ম বা রীতিনীতি সম্পর্কে ও তারা মত পার্থক্য করেন নি। তারা নবীজীর শেখানো ইবাদতের বিভিন্ন পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন, নতুন কোন নিয়ম নীতি চালু করার চেষ্টা করেন নি।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইসলামের জীবনাদর্শ ও তার রূপরেখা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের সামষ্টিক আদর্শই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আল্লাহপাকের বন্দেগী বা রাসুলে আযমের আনুগত্যের বাস্তব নমুনা হিসেবে সাহাবায়ে কেরামদের পথই আমাদের আদর্শ। কোরআন হাদিসের আলোকেই তাদের আদর্শের অনুসরণ করতে হ'বে। অর্থাৎ মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ আর তার বাস্তব প্রতিফলনের নমুনা হ'লো সাহাবাদের আদর্শ। তাই মূল উৎসকে বাদ দিয়ে বাস্তব প্রতি ফলনের অনুসরন করার প্রশ্নই উঠেনা। আবার সাহাবায়ে কেরামদের বাস্তব আনুগত্যের নমুনা পাওয়া গেলে তাকে পাশ কাটিয়ে কোরআন হাদিসের বাস্তব আনুগত্যের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করার প্রয়াস পথ ভ্রষ্ঠতারই নামান্তর। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার কথাটিই রাসুলেপাক তার হাদিসে (ما انا عليه و اصحابى) এর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করেছিলেন, উম্মতে মুহম্মদীর নাযাত প্রাপ্ত দলটি কারা, আল্লাহর নবী জবাবে বলেছিলেন, যারা আমার পথে চলবে এবং বাস্তব নমুনা হিসাবে সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেবে।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামদের অনুসরণ সম্পর্কিত বিষয়টির সঠিক উপলব্ধির অভাবে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ মত পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

খারেজী সম্প্রদায়ের ফিতনা

সাহাবায়ে কেরামদের সামষ্টিক আদর্শ অনুসরণের এই মূলনীতি অস্বীকার করার ফলে সাহাবায়ে কেরামদের যুগেই এই সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) বিজয়ী হবার পর পরাজিত ব্যক্তিদেরকে বন্দী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এই অস্বীকৃতির মধ্যে দ্বীনের যে মহান শিক্ষা ও উম্মতের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আলোচনায় এসে গেছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকল সাহাবারা

www.pathagar.com

আন্তরিকতার সাথে তা মেনে নেন। কিন্তু ইসলামী ইলমের শক্তিতে যারা বলিয়ান ছিলেন না তারা এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হন। যারা ইবাদাত বন্দেগীতে ও আমলে অপরাপর মুসলমানদের মত থাকলেও ইসলামের এই মূলনীতি অস্বীকার করে বসে। তারা হযরত আলী (রাঃ) বা অপরাপর সাহাবীদের মতামতকে অস্বীকার করে এবং বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কেই হাদিসে বলা হয়েছে।

(يقرؤن القرأن ولايجاوز حناجرهم) তারা কোরআন পড়ে কিন্তু তার মর্ম তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না।

ইতিহাসের পাতায় এই সম্প্রদায়ের লোকদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ইমান ইবনে কাসির তার গ্রন্থ (البداية والنهاية) এ তার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। রাত্রি জাগরনে তাদের চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছিলো, অধিক সিজদার ফলে তাদের কপালে কাল দাগ পড়েছিলো। পায়ের হাটু ও হাতের কনুই ইবাদতের চিহ্ন বহন করতো। সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করতো। অর্থাৎ তারা ইবাদত বন্দেগীতে অত্যন্ত অগ্রসর ছিলো, কিন্তু তাদের মধ্যে ইসলামী ইলমের বড় অভাব ছিলো। এই অভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিলো, কারণ তারা রাসুলে পাকের পর ইসলামী জ্ঞানের ধারক ও বাহকদের অনুসরণ বা তাদের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্তির আন্তরিক চেষ্টা কখনো করেনি। পক্ষান্তরে তারা তাদের মন মানসিকতা ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে কোরআনের অপব্যাখ্যা করতো এবং সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শকে অবহেলা করে। পরিণতিতে তাদের মনে অনাস্থা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। তাদের বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগীর অহম তাদেরকে হক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তারা ইসলামের দূর্গ হযরত আলী (রাঃ)-কে মুসলমান বলে স্বীকার করতেই অস্বীকৃতি জানায়। ইতিহাসে তাদের যে সব অভিযোগ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ৩টি অভিযোগ উল্লেখ যোগ্য।

(১) হযরত আলী (রাঃ) উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করা বৈধ মনে করলেন। কিন্তু তাদেরকে যুদ্ধবন্ধী হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারা প্রথমতঃ হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলো এবং তাকে হকপন্থী মনে করতো এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তার সাথীদেরকে বাতিলপন্থী মনে করতো। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) যখন তাদেরকে যুদ্ধবন্ধী হিসেবে মেনে নিলেন না, তখন তাদের ধারনায় হযরত আলী (রাঃ) ও কাফের হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

(২) হযরত মুয়াবিয়ার সাথে সংঘঠিত সিফিফন যুদ্ধের পর যুদ্ধরত উভয় পক্ষ হযরত আমর বিন আলআস ও হযরত আবু মুসা আল আশয়ারীকে খিলাফতের প্রশ্নে ফয়সালা করার জন্য সালিশ নিয়োগ করতে সম্মত হন। খারেজী সম্প্রদায়ের লোকদের মতে আল্লাহ ছাড়া কাকেও সালিশ নিযুক্ত করা হারাম, তারা অবৈধভাবে কোরআনের আয়াত (إن الحكم إلا لله) (ফয়সালা দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই) থেকে এই ধারনা পোষণ করতো। আসলে কোরআনের এই আয়াতে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে সালিশ নিযুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা তাদের ঐ ধারনার ভিত্তিতে যুদ্ধরত উভয় পক্ষকে কাফির মনে করতো। এরই ভিত্তিতে তারা চরমপন্থী বিদ্রোহী দলে পরিণত হয়ে যায়।

(৩) তাদের ধারণায় প্রত্যেক গোনাহগারই কাফের। যেহেতু তাদের মতে উভয় পক্ষের সাহাবায়ে কেরামগণ উপরোল্লিখিত কারণে গোনাহগার, তাই কাফের। তাদেরকে হত্যা করা ফরজ। যারা তাদেরকে মুমিন হিসাবে বা নেতা হিসাবে মেনে নেয় তারাও কাফের।

মোটামুটি এই তিনটি বিষয়ে বিরোধের সাথে সাথে আস্তে আস্তে তারা আরো অনেক বিষয়ে সাধারন সাহাবায়ে কেরামদের চিন্তাধারা থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং একমাত্র নিজেদেরকেই সত্যিকার মুমিন মনে করতে থাকে।

সাহাবাদের যুগে আরো কিছু আদর্শিক বিরোধ

হযরত আয়েশা (রাঃ), তালহা ও যুবায়েরের বিরূদ্ধে সংঘটিত জামাল (উষ্ট্রের) যুদ্ধ, হযরত মুয়াবিয়ার বিরূদ্ধে সিফিফনের যুদ্ধ ও খারেজী সম্প্রদায়ের বিরূদ্ধে পরিচালিত হযরত আলী (রাঃ)-এর নাহরোয়ানের যুদ্ধের সময়ও পরে উম্মতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আদর্শিক কলোহ দেখা দেয়, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়, মত ও পথের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত দলগুলোকে মোটামুটি চারটি দলে ভাগ করা যায়, সেগুলো হলো, খারেজী, (যার আলোচনা করা হয়েছে) শিয়া, মুরজিয়া ও মোতাজিলা। একমাত্র খারেজী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় তাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার ফলে সাহাবায়ে কেরামদের যুগে আলাদা হয়ে যায়নি। সাহাবা পরবর্তীকালে গৃহযুদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিভিন্নতার ফলে অপরাপর দলগুলোর ভিত্তি গড়ে উঠে। হযরত হোসাইনের শাহাদাতের মর্মান্তিদ বিয়োগান্ত ঘটনার পর এসব বিরোধ মাথা চাড়া উঠে। উমাইয়াদের যুগে ও আব্বাসীদের যুগে বিভিন্ন আদর্শিক নৈরাজ্যে এসব সম্প্রদায়গুলো তাদের স্বতন্ত্র চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগঠিত হয়। খারেজীদের আদর্শিক ভিত্তি সাহাবায়ে কেরামদের যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সাহাবায়ে কেরামদের সার্বিক আদর্শবাদ থেকে সরে যাবার কারণেই

www.pathagar.com

তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হযরত ইবনে আব্বাসের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং অপরাপর সাহাবাদের দূরদৃষ্টি এই ফিতনার আদর্শিক ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেয়। কিন্তু এই ফিতনা দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও কলোহের কারন হয়ে থাকে। রাজনৈতিকভাবে এই ফিতনা আব্বাসীদের যুগ পর্যন্ত মুসলিম মানসকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে, অতঃপর ফিতনাটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। কিন্তু আজও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল ও মতের চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের কার্যক্রম দেখে মনে হয় যে খারেজীদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেতাত্মা আবারো প্রকাশ পেয়েছে।

শিয়া দৃষ্টিভঙ্গি

খারেজী আদর্শ হযরত আলী (রাঃ)-কে মুমিন হিসেবে মানতেও রাজী ছিলো না। শিয়া দৃষ্টিভঙ্গির সুচনায় তাকে খলিফা হবার জন্যে যোগ্যতর ব্যক্তি বলে মনে করা হতে থাকে। হযরত উসমানের যামানায় এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুলোক নিজেদেরকে শিয়া বলে আখ্যায়িত করেন তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকে অস্বীকার করতেন না, বা তারা হযরত আলীর পূর্বতন খলিফাদেরকে গাসেব বা হযরত আলীর অধিকার হরণকারী বলে মনে করতেন না। অতঃপর হযরত আলীর শাহাদাত, পরবর্তিকালে হযরত হোসাইনের সাথে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলীর পর তাদের আদর্শিক বিভিন্নতার প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু হযরত আলী কেন্দ্রীক শিয়াদের ইমামতের পূর্ণাংগ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগে যায়। উমাইয়াদের যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গি ফিতনার রূপ নেয়, অতঃপর আব্বাসীদের যুগে এর পূর্ণাংগ আদর্শিক স্বাতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। শিয়াদের বর্তমান আদর্শিক অবস্থানের সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজামদের কোন সম্পর্ক ছিলো না। এজন্যে শিয়া সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সাহাবাদের যুগের বিরোধ ও বিভেদের সাথে করা সমিচীন নয়। ইতিহাসের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে যথাসময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মুরজিয়া সম্প্রদায়

খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের চরমপন্থী দুই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়। প্রথমতঃ তারা নিছক রাজনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র ধারণার বাহক হিসেবে পরিচিত ছিলো। তারা সাহাবাদের গৃহযুদ্ধে কোন পক্ষ নিতে অস্বীকার করেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধরত দুইটি দলের মাঝে একটি হকপন্থী ও অপরটি বাতিলপন্থী, কিন্তু কারা হকের পথে আর কারা বাতিলের পক্ষে তার ফয়সালা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতেন। কারো পক্ষে বা কারো বিরূদ্ধে মতামত দিতে তারা দূরে থাকতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা আদর্শিকভাবে স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব পরিচিতি তুলে ধরেন। তারা ঈমান ও আমলের পারস্পারিক সম্পর্ককে অস্বীকার করে বসেন, তাদের মতে ঈমানই হলো আমল, কোন গোনাহ করলে ঈমানের

www.pathagar.com

কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহর প্রতি কাকেও শরীক না করলে কোন গোনাহ্ই তাদের জন্য ক্ষতি করে না। ঈমানের কারণে তাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কোন ব্যক্তি যতো অপরাধই করুক না কেন তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ্ হতে কোন বাধা নেই।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গোনাহ্ করার সাধারন লাইসেন্স প্রদান করে। তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের ব্যাপার। বাইরের কোন আমলই তাদের ঈমানের কোন পরিপন্থী হতে পারে না।

ভাল কাজের প্রতি আহ্বান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার কোন আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। কোন সরকারের অনৈসলামী কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তাদের কাছে অবৈধ ছিলো। এভাবে ইসলামের শত্রুদেরই হাত মজবুত করেছে মাত্র। ইসলামী আদর্শ ও চরিত্রের বিকাশে তারা বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে বর্তমানকালের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার উৎস। উমাইয়া ও আব্বাসী আমলের ব্যাপক ধর্মহীনতার পথে এই আদর্শ অনেক ইন্ধন যুগিয়েছে।

মোতাজিলা সম্প্রদায়

এই সম্প্রদায়কে মোতাজিলা বা এমন সম্প্রদায় বলা হয় যারা নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছেন। তারা খারেজী ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির মাঝামাঝি দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করতেন। তাদের মতে গোনাহ্গার মুসলমান না মুসলমান আর না কাফির, কুফুরী ও ঈমানের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। তারা সিফফিন যুদ্ধের উভয় পক্ষকে ফাসিক বলতো। তাদের নেতা ওয়াসেল বিন আতা এবং আমর বিন উবায়দা বলতেন যুদ্ধে জড়িত সাহাবারা কেউ সত্যিকার মুমিন নয়, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ভাল কাজের নির্দেশ দান ও গর্হিত কাজ হতে বারণ করার কাজ ফরজ, যে কোন ইনসাফ বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অপরিহার্য্য কাজ। তারা হযরত উসমানকে ভর্ৎসনা করতেন।

তাদের বলগাহীন সমালোচনার ধারায় হাদিসের নির্ভরযোগ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিষয়গুলোকেও তারা অস্বীকার করতেন। তারা নিত্য নতুন বিষয় সমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতেন।

কোরআনে মজিদ, যাকে মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতভাবে শব্দে ও অর্থে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করে, তারা বলতো কোরআন হলো সৃষ্ট কিতাব। ফলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দরজা খুলে যাবে। কোরআনের গুরুত্ব অনেকাংশে লঘু হয়ে যাবে।

আব্বাসী খলিফা মামুনের আমলে এই ফিতনা চরম আকার ধারণ করে মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ ইমাম হযরত আহ্মদ বিন হাম্বল হিমাচলের মতো এই ধারনার বিরোধ করেন এবং খলিফা মামুনের অত্যাচারের শিকার হন। দীর্ঘদিনের কারাবাস হাসি মুখে বরণ করে নেন। জেলে থাকাকালিন অকথ্য শারিরিক নির্যাতন বরাশত করেন। এই বর্বরতার

www.pathagar.com

পরিণতিতে যখন তিনি মুমুর্ষ, তাকে জেল থেকে রেহাই দেয়া হয়, কিন্তু ঐ নির্যাতনের কারনেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার এই ত্যাগ ও কোরবানীর ফলেই এই ফিতনা উম্মতের জন্য বেশী বিপদ টেনে আনতে ব্যর্থ হন। সাহাবায়ে কেরামদের সার্বিক আদর্শ থেকে সরে যাবার ফলেই এই ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

উপরোল্লিখিত সব কটি ফিতনাই সাহাবাদের যামানাতেই প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘদিন যাবত উম্মতের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে থাকে এবং যদিও শিয়া মতবাদ ছাড়া অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তাদের মূল সংঘবদ্ধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তিও দলের চিন্তাধারায় প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, তখনই মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে যায়।

ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সাহাবাদের ব্যাপক সংখ্যাধিক্য ইসলামের মূল শিক্ষার ধারক ও বাহক হয়ে থাকেন। সাহাবাদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগেরও কম সাহাবারা এসব কলহে জড়িত হন। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সাহাবদের সার্বিক আদর্শকে অবহেলা করার ফলেই ঐ সমস্ত দল ও ফিরকার লোকেরা হক পথ থেকে দূরে সরে যায়। এই সমস্ত বাতিল ফিরকাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি আপাতঃ চমক সৃষ্টি করে, সাধারন মানুষেরা এসব চিন্তায় তাদের নফসের বা মনোবৃত্তির খোরাক পায়, কিন্তু ইসলামের মূল জ্ঞানের আলোকে এসবের অন্তঃসার শুন্যতা প্রকাশ পেয়ে যায়। এ কারনেই ইসলামে ইলমের প্রতি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আকিদা ও বিশ্বাসের এই অবাঞ্ছিত বিভেদে ইসলামের সঠিক জ্ঞানই উম্মতকে রক্ষা করেছে বারে বারে।

উপরে আলোচিত কয়েকটি বিভ্রান্ত ফিরকার মধ্যে একমাত্র খারেজী সম্প্রদায়ের ফিতনাই আসলে সাহাবাদের যুগের ফিতনা, কিন্তু অপরাপর ফিতনাগুলোর ও কেন্দ্রবিন্দু হলেন হযরত আলী (রাঃ) বা তার সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা, তদুপরি একটি দৃষ্টিভঙ্গি অপর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছে, তাই সবগুলোরই একটি সংক্ষিপ্ত সার সাহাবাদের যুগের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করা হলো। ইতিহাস পর্যালোচনার যথা সময়ে এসব ফিরকার কুফল ও পরিনতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

কতই না পরিতাপের বিষয় যে শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) হয়েছেন তাদের ভর্ৎসনা কেন্দ্র, যার সম্পর্কে রাসুলে পাকের মুখ নিঃসৃত অসংখ্য প্রশংসামূলক বাণী রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামদের যুগের এসব বিভ্রান্ত মতবাদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে রাসুলে পাকের এই হাদিসটি উল্লেখ করতে চাই। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

فيك مثل من عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه منزلته ليست له ثم قال يهلك فيَّ رجلان محب مفرط يفرطني بما ليس فيَّ و مبغض يحمله شنئاني على أن يبهتني (مسند أحمد، مستدرك حاكم) (مشكواة المصابيح ص-٥٦٥)

(হে আলী, ইসা বিন মরিয়মের সাথে তোমার মিল রয়েছে, ইহুদীরা তাকে বিদ্বেষ করলো, এমনকি তার মা মরিয়মের উপর মিথ্যা আরোপ লাগালো। (পক্ষান্তরে নাসারারা তাকে এত বেশী ভালবাসা দিলো যে তাঁকে এমন এক অবস্থানে পৌছালো,যা তিনি ছিলেন না। (রাসুলে পাকের এই বাণী বলার পর হযরত আলী বললেন) দুই ধরনের লোক আমার সম্পর্কে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, প্রথমতঃ তারা যারা আমাকে ভালবাসার আতিশয্য দেখিয়ে আমার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে এমনি মর্যাদায় নিয়ে যাবে, যা আমি নই, দ্বিতীয়তঃ যারা আমাকে এমনি ঘৃণা করবে ও শত্রুতা করবে যে তারা আমার উপর মিথ্যা আরোপ লাগাবে।)

এই হাদিসটি রাসুলে পাকের একটি ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত আলী যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হাদিসের শেষাংশে। হযরত আলীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত চরমপন্থী প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে তাদের সম্পর্কেই এই হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। শিয়া মতে হযরত আলীকে ভালবাসা দিতে গিয়ে খোদায়ী ক্ষমতায় পৌঁছে দিয়েছে। তাকে নবীদের মত মাসুম বলে শেষ নবীর সম মর্যাদায় বা পূর্বতন সমস্ত নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। তার বিপরীতে খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত আলীকে মুসলমান হিসাবে মেনে নিতেও রাজী হয়নি।

ইসলামী ইলমের উৎস সমুহের সংরক্ষণ

নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শবাদ ইসলামী ইলমের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। ইসলামী ইলমের তিনটি উৎসের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামী ইলমের এই তিন উৎস আমাদের কাছে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। সেই উৎসগুলো হলোঃ

কোরআনে মজিদঃ রাসুলে পাকের নবুয়তি জীবনের ২৩ বছরের ব্যবধানে খন্ডিত খন্ডিত অবস্থায় প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যেমে এই কিতাব নাযিল হয়েছে। যার শব্দ ও অর্থের অভিন্ন রূপকেই কোরআন বলা হয়। কোরআনের শব্দ ও অর্থের মৌলিকত্বের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ইতিহাসের পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কৃত্রিমতার কোন অবকাশ নেই।

হাদিসে রাসুল বা সুন্নাহঃ এটি গোপন অহী যা রাসুলে পাকের কথায় কাজেও সমর্থনে মুর্ত হয়ে উঠেছে। ইলমে হাদিসের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ইতিহাসে কোন সন্দেহের অবকাশই রাখেনি যে অকৃত্রিম হাদীসের বিশাল ভান্ডার আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

www.pathagar.com

ফিকাহ্ বা ইজতিহাদঃ কোরআন ও হাদিসের নির্ভুল অর্থ ও মর্মের বাস্তব প্রতিফলন, মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বাস্তব প্রয়োজনের তাকিদে কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণা। ইসলামের ইতিহাসে এই গবেষণা কর্মের যে বিশাল ভান্ডার সুসংরক্ষিত রয়েছে বিশ্ব ইতিহাসে যার নজীর নেই। উম্মার মহান ইমাম, গবেষক, পন্ডিত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের নিরলস ভূমিকা ঐতিহাসিক পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী ইলমের এই তিনটি উৎসের সংরক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হলোঃ

কোরআনের সংরক্ষণ

আল্লাহপাক কোরআনের সংরক্ষণ নিজ দায়িত্ব নিয়েছেন, কোরআনে এরসাদ হয়েছে,

(ان علينا جمعه وقرانــــه - *কোরআনের সংরক্ষণ ও পঠন আমারই দায়িত্ব*) আল্লাহপাক যে দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন তাতে কোন ত্রুটি হওয়া সম্ভব নয়। রাসুলে পাকের নবুয়তি জীবনে ক্ষণে ক্ষণে, অংশে অংশে কোরআন নাযিল হতো, রাসুলেপাক আল্লাহরই নির্দেশ মতো তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত লেখকদের দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করাতেন। আয়াতের ও সুরা সমুহের ধারাবাহিকতা তারই নির্দেশে রক্ষা করা হতো। সাহাবায়ে কেরামগণ যেভাবেই তেলাওয়াত করতেন বা হেফজ করতেন। এক বিরাট সংখ্যক সাহাবারা পুর্ণাঙ্গ কোরআনের হাফেজ ছিলেন। কোরআনের শেষ আয়াতটি নাযিল হবার পর আল্লাহর নবী কোরআনের যে ধারাবাহিকতা দিয়ে যান তা তারই তত্ত্বাবধানে লিখিত আকারে ও হিফজের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায়। আজ আমাদের হাতে যে কোরআন রয়েছে তা অবিকল তেমনি যেমনটি আল্লাহর নবী রেখে গিয়েছিলেন। কোরআনের বিশুদ্ধতার স্বার্থে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামগণ আল্লাহর নবীরই নির্দেশানুযায়ী রাসুলের বাণী বা হাদিস লিপিবদ্ধ করতেন না।

রাসুলেপাকের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যখন খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি নবীজীর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ কোরআনকে কোরআনের লেখকদের সাহায্যে ও নির্ভরযোগ্য হাফেজদের হিফজের সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষা করান এবং রাসুলেপাকের সংরক্ষিত কোরআনের একটি কপি লিপিবদ্ধ করান এবং হযরত আয়েশাকে তার হিফাজতের দায়িত্ব দেন। এভাবে কোরআনে মজিদ অবিকৃত অবস্থায় একটি কিতাবের রূপ নেয়। লিখিত অবস্থায় কোরআন তার আসল রূপে সংরক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু রাসুলে পাকের অনুমতি সাপেক্ষে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় উচ্চারণ ও পঠন ভঙ্গিতে কোরআন তেলাওয়াত অব্যাহত থাকে। কোরআন পড়া ও মনে রাখার সুবিধের জন্য আল্লাহর নবী বিভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গিতে কোরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীযুগে বিশেষ করে হযরত উমর ফারুকের যুগে যখন মুসলমাদের ব্যাপক বিজয়

www.pathagar.com

অভিযানে বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন উচ্চারণে কোরআন পড়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। হযরত উসমানের খিলাফতের যামানায় এই সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাই হযরত উসমান সংরক্ষিত কোরআনের কপিটি হযরত আয়েশার কাছ থেকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য হাফেজদের তেলায়তের সাথে আবারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন এবং বিশুদ্ধ লিখন ও পঠনের ভিত্তিতে কোরআনে মজিদের বিভিন্ন কপি করে বিজিত মুসলিম এলাকায় কোরআনের সরকারী ভাষ্য হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বিভিন্ন উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতির পরিবর্তে কোরইশদের বিশুদ্ধ পঠন পদ্ধতিতে কোরআন পড়তে নির্দেশ দিলেন। ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কোরআনে মজিদ একই লিখনি ও পঠিতভাবে প্রচলিত হয়ে গেলো। তখন থেকে কোরআনে মজিদ তার আসল অবস্থায় বর্তমান পৃথিবীতে মওজুদ রয়েছে। বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে কিন্তু একই ভাষায় কোরআন তিলাওয়াত করে। ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলামের দুশমনরা বিভিন্ন উপায়ে কোরআনের মধ্যে বিকৃতি আনার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের কোন ষড়যন্ত্রই সফল হয়নি। আজও কোরআন অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে, এবং কিয়ামত পর্যন্ত মওজুদ থাকবে। সারা বিশ্বে একই উচ্চারণে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন রয়েছেন, লিখিত আকারে মওজুদ কোরআনে মজিদ কোন কারণে পৃথিবী হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেও এই কোরআন মজিদ লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বরণে টিকে থাকবে। কোরআনকে অবিকৃত অবস্থায় টিকিয়ে রাখার এই ঐশী ব্যবস্থার বিশ্ব ইতিহাসে কোন তুলনা নেই।

কোরআনে মজিদের এই শাব্দিক ও আক্ষরিক সংরক্ষণের সাথে আল্লাহর অমোঘ বিধানে তার অর্থ ও মর্মের ইতিহাসের পরম্পরায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাসূলে পাকের মুখ নিসৃত ব্যাখ্যা ও মর্ম হাদিসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। এসব রেওয়ায়েত ও সাহাবায়ে কেরামদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগে যুগে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিশ্ববরেন্য ও ইসলামী বিশ্বে আস্থা-ভাজন জ্ঞানী পন্ডিতেরা কোরআনের বিস্তারিত তফসীর লিখেছেন, তাদের সবার তফসীরে কোরআনের অর্থ ও মর্মের ঐক্য রয়েছে। খুটি নাটি বিষয়ের আলোচনায় বা বিষয় বস্তুর বিস্তৃত বিষদ বিবরণে প্রত্যেক মোফাস্‌সিরে কোরআনের তফসীর স্বতন্ত্রের অধিকারী, কিন্তু মূল অর্থে ও মর্মে এসব তফসীরে কোন পার্থক্য নেই। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত কোরআনের এই অর্থ ও মর্মের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মাঝে ইতিহাসের পাতায় কখনো কখনো এমন কিছু লোকের অস্তিত্ব দেখা যায়, যারা কোরআনের ইতিহাসের পরম্পরায় সংরক্ষিত অর্থ ও মর্মের বিরুদ্ধে নিজেদের মনোবৃত্তি দাসত্বে কোরআনের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বে তার স্বীকৃতি পায়নি এবং তাদের সেই অবাঞ্ছিত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য এই ধরনের অবৈধ প্রয়াসের ফলেই উম্মাহর ঐক্যে বিভেদ ও বিরোধের পথ খুলে যায়। ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। কোরআনের অর্থ বা এর তাফসীর করার

www.pathagar.com

জন্যে ইসলামী জ্ঞানে বলীয়ান হতে হবে। হাদিস, ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান অপরিহার্য। এসব জ্ঞানের সাথে সাথে আরবী ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি মৌলিক শর্ত। ইসলামের সীমিত জ্ঞান, আরবী ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই ধরণের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে অতীতে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কয়েকটি মৌলিক তফসীর কর্মের নাম উল্লেখ করছি, যার দ্বার ইলমে তফসীরের মাধ্যমে কোরআনে মজিদকে তার মূল অর্থে ও মর্মে সংরক্ষণ করার কুদরতী ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১)	আল্লামা ইবনে যারির তাবারী (মৃত্যু হি: ৩১০)	جامع البيان فى تفسير القرأن
(২)	ইমাম আল বাগুভী	تفسير البغوى – معالم التنزيل
(৩)	ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী	التفسير الكبير
(৪)	ইমাম জাস্সাস	تفسير احكام القران
(৫)	ইমাম ইবনে কাসির	تفسير ابن الكثير
(৬)	আল্লামা জোমেখশরী	تفسير الكشاف
(৭)	আল্লামা বায়জাবী	أنوار التنـــزيل
(৮)	আল্লামা হাফেজুদ্দীন আল নাসাফী	مدارك التنـــزيل
(৯)	আল্লামা আলাউদ্দিন বাগদাদী	تفسير الخازن
(১০)	আল্লামা জালালুদ্দীন সৈয়ুতী	تفسير جلالين
(১১)	শেখ ইসমাইল হক্কী	تفسير روح البيان
(১২)	আল্লামা শাওকানী	تفسير فتح القدير
(১৩)	আল্লামা আলুসী	تفسير روح المعانى
(১৪)	আল্লামা মোহাম্মদ আবদুহ	تفسير المنار
(১৫)	শেখ মাহমুদ আল শালতুত	تفسير القران الكريم
(১৬)	ইমাম কুরতুবী	التفسير القرطبى
(১৭)	আল্লামা সাইয়েদ কুতুব	فى ظلال القرأن

www.pathagar.com

(১৮)	আল্লামা আব্দুল কাদির	موضح القران
(১৯)	মওলানা আশরাফ আলী থানভী	بيان القرأن
(২০)	মওলানা আবুল আ'লা মওদুদী	تفهيم القرأن
(২১)	মুফতি শফী	معارف القرأن

গুরুত্বপূর্ণ তফসীরের সংখ্যা অনেক বেশী যার উল্লেখ সম্ভব নয়, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কয়েকটি তফসীরের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো মাত্র।

হাদিস বা সুন্নাহর সংরক্ষণ

রাসুলে পাকের জীবদ্দশায় তিনি কোরআনকে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং রাসুলের হাদিস লিখে রাখতে বারন করতেন, কেননা তখনও কোরআনের অবতরন শেষ হয়নি। এমন অবস্থায় কোরআনের সাথে হাদিসের সংমিশ্রনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যেতো না। অতঃপর রাসুলেপাকের তিরোধানের পর যখন কোরআনের সংরক্ষন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেলো এবং হাদিসের জ্ঞান সাহাবায়ে কেরামদের অন্তরেই অবস্থান করছিলো, ইসলামের সুসন্তানেরা হাদিস সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন। ইসলামের পঞ্চম খলিফা রাশেদ বলে খ্যাত হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ সর্বপ্রথম এই মহান কাজের উদ্যোগ নেন। তিনি তৎকালিন সমাজের বিশিষ্ট পন্ডিত আবু বকর বিন হযমকে এ কাজের দায়িত্ব দেন। আবু বকর বিন হযম বুদ্ধিজীবি, পন্ডিত ও উলামাদের সহযোগিতায় হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণের কাজ শুরু করে দেন এবং দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই হাদিসে রাসুলের বেশ কয়েকটি সংকলন তৈরী হয়ে যায়। যে সব মোহাদ্দেসীনগণ এ মহান কাজে এগিয়ে আসেন, তারা হলেন,

(১) ইবনে শেহাব জুহরী।	মৃত্যু- ১২৪ হিজরী।
(২) ইবনে জুরায়েজ মক্কী।	মৃত্যু- ১৫০ হিজরী।
(৩) ইবনে ইসহাক।	মৃত্যু- ১৫১ হিজরী।
(৪) মোয়ামার ইমানী।	মৃত্যু- ১৫৩ হিজরী।
(৫) সাইদ বিন আবি অরুবা মাদানী।	মৃত্যু- ১৫৬ হিজরী।
(৬) রাবী বিন সুবাইহ।	মৃত্যু- ১৬০ হিজরী।

উপরোল্লিখিত মোহাদ্দিসগণ অতুলনীয় নিষ্ঠা ও পরম আন্তরিকতার সাথে হাদিস সংকলনের কাজে অগ্রসর হন। হাদিসের সত্যতা যাচাই করার জন্যে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। যে ব্যক্তির কাছে কোন হাদিস পাওয়া যেতো, তার থেকে শুরু করে যে সমস্ত ব্যক্তিদের মারফতে হাদিসটি তার কাছে পৌছেছে, তাদের প্রত্যেকের

www.pathagar.com

জীবনেতিহাস তথা দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোরও খোঁজ খবর নেয়া হতো। যদি কোন ব্যক্তির জীবনে তার কথা ও কাজে এতটুকু গরমিল পাওয়া যেতো, মোহাদ্দেসীনগণ সেসব ব্যক্তিদের কাছ থেকে হাদিস নিতে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কোন রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করার পূর্বে বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এভাবে মোহাদ্দেসীনদের মধ্যে হাদিসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্যে নতুন এক বিষয়ের সংযোজন হলো, যাকে জ্ঞানের দুনিয়ায় 'আসমায়ুর রেজাল' বলে অভিহিত করা হয়। এভাবে রাসুলে পাকের হাদিস সংকলন করতে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সরেজমিনে ৫ লক্ষাধিক ব্যক্তির বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত সংরক্ষণ করা হয়। হাফেজ ইবনে হাযার আসকালানী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (الإصابة في احوال الصحابة) -এর মধ্যে এ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়, বরং ইসলামী জ্ঞানের এই দ্বিতীয় উৎসটির সংকলন ও সংরক্ষণে সতর্কতা ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দিকটি তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।

মোহাদ্দেসীনদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পরিণতিতে অনেক হাদিস সংকলন তৈরী হয়ে যায়। সাথে সাথে হাদিসের মান নির্ধারনের বিজ্ঞান সম্মত বিধি-বিধান ও তারা তৈরী করেন। সে সব নিয়ম নীতিকে 'উসুলে হাদিস' বলা হয়ে থাকে। এ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের অমর অবদান হিসেবে হাদিসের বিশাল ভান্ডার আজ আমাদের মাঝে মওজুদ রয়েছে।

'সিহাহ সিত্তা' নামে খ্যাত ৬ টি হাদিস সংকলন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। তারা ছাড়া ও অনেক মোহাদ্দিসগণ হাদিস সংকলনে অবদান রাখেন। তাদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

ইমাম বোখারী (মৃত্যু হিঃ ২৫৬)	ইমাম মোসলিম (মৃত্যু হিঃ ২৬১)
ইমাম তিরমিজি (মৃত্যু হিঃ ২৭৯)	ইমাম আবু দাউদ (মৃত্যু হিঃ ২৭৫)
ইমাম নাসায়ী (মৃত্যু হিঃ ৩০৩)	ইমাম ইবনে মাজা (মৃত্যু হিঃ ২৭৩)
ইমাম দারেমী (মৃত্যু হিঃ ২৫৫)	ইমাম তাহাবী (মৃত্যু হিঃ ৩২১)
ইমাম তেবরানী (মৃত্যু হিঃ ৩৬০)	ইমাম দারে কুত্নী (মৃত্যু হিঃ ৩৮৫)
ইমাম ইবনে হযম আন্দোনুসী (মৃত্যু হিঃ ৪৫৭)	ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু হিঃ ৪৫৮)
ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা'	ইমাম হাকেমের 'আল মোসতাদরিক'
ইমাম আহমদের 'মুসনাদ'	

সিহাহ সিত্তার সংকলন সমুহে শুধু সহিহ হাদিসই স্থান পেয়েছে। অনান্য সংকলনগুলোর মধ্যে হাদিস বলে পরিচিত সকল রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মোহাদ্দিসগণ হাদিস পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে কঠোর নিয়ম কানুন তৈরী করে গেছেন। নকল ও দূর্বল হাদিসের পরিচয় চিহ্নিত করেছেন। ইলমে হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানী মানুষের চোখে

www.pathagar.com

পরিশুদ্ধ, দূর্বল ও মনগড়া নকল হাসিদের পার্থক্য গোপন থাকতে পারে না। এভাবে ইসলামী ইলমের দ্বিতীয় উৎসটির সংরক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন ও ফিকাহর মত পার্থক্য

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজামদের যামানা থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছিলো তাতে হাদিসও ফিকাহ ছিলো একটি সমন্বিত বিষয়। সে সময়ে ফিকাহকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপান্তরিত করার ধারনা সৃষ্টি হয়নি। ইলমের এই দুই শাখার সমন্বিত বিষয়ের অবস্থান থাকার ফলে হাদিসের সংকলন ও তৎসংলগ্ন বিষয়াদির উপর গবেষনা কাজের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু হাদিসের পাশাপাশি ফিকাহর সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। অতঃপর দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই এমন কিছু ব্যক্তিতের অভ্যুদয় ঘটে, যারা ফিকাহ শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে বিন্যাসিত করেন। তারাও আসলে মোহাদ্দিস ছিলেন, কিন্তু ফিকাহর স্বতন্ত্র পরিচয়ে সংকলন কাজে বিশেষভাবে যত্নবান হন। মূলতঃ মোহাদ্দিস ও ফকিহ একই কাজ করেন। পার্থক্য যা ছিলো, তা হলো:

- মোহাদ্দেসীনদের কাছে হাদিসের শব্দ অগ্রাধিকার পায়, শব্দের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতেই তারা রায় দেন, পক্ষান্তরে ফকিহরা শব্দের অর্থ ও মর্মকে বেশী অগ্রাধিকার দেন।
- কোন বিষয়ে দুইটি হাদিসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মোহাদ্দেসীনগণ দুইটি হাদিসের মধ্যে সনদের গুণগত মানের পার্থক্যকেই অগ্রাধিকারের একমাত্র মানদন্ড মনে করেন, পক্ষান্তরে ফকিহগণ হাদিসের সাথে শরীয়তের মৌলিক রূপরেখা ও মূলনীতির সামঞ্জস্যকে অগ্রাধিকারের মানদন্ড হিসেবে মেনে নেন।
- ফকিহগণ ইসলামের মূলনীতি ও মর্মের জ্ঞানে মোহাদ্দিসীনদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর। হযরত আমাশ, যিনি মূলতঃ মোহাদ্দীস ছিলেন এবং ইমাম আজম আবু হানিফার উস্তাদ ছিলেন, ইমাম সাহেবের প্রজ্ঞাও দূরদৃষ্টি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, (نحن الصيادلة وانتم الاطباء) (আমরা ঔষধ বিক্রেতা আর তোমরা হলে চিকিৎসক) অর্থাৎ যেমন ঔষধালয়ে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধের সমারোহ থাকে সত্যি কিন্তু বিক্রেতার তার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত নন, কিন্তু চিকিৎসকগণ ঔষধের ভান্ডার না রাখলেও তার প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তেমনি মোহাদ্দিসীনদের কাছে হাদিসের সমারোহ রয়েছে কিন্তু সত্যিকার প্রয়োগ সম্পর্কে ফকিহগণ অভিজ্ঞ।

ইমাম তিরমিজী ফকিহদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

(وهم أعلم بمعنى الحديث) তারা (ফকিহগণ) (হাদিসের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে বেশী জ্ঞানী)

এ কারণে ফকিহদের রেওয়ায়েত অপেক্ষাকৃত কম হয়। হাদিস সংকলনে ফকিহদের শর্তাবলী খুবই শক্ত ছিলো। ইমাম আবু হানিফা মোহাদ্দিসীনদের সমসাময়িক যুগের হওয়া সত্বেও রেওয়াতে হাদিসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হবার কারণ এটাই।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফার যুগ থেকে ফিকাহকে স্বতন্ত্র বিষয় রূপে সংকলন করার ধারা চালু হয়ে যায়, অতঃপর বিভিন্ন ইমাম ও মোজতাহীদগণের অভ্যুদয় ঘটে। যারা ফিকাহশাস্ত্রকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করে সংকলন করে যান। ফিকাহর ইমামদের মধ্যে ৪জন ইমাম বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। যাদের নামের সাথে ৪টি ফিকাহর মাযহাব গড়ে উঠেছে, তারা হলেন:

(১)ইমাম আবু হানিফা (মৃত্যু হিঃ ১৫০)

যিনি ৮৩০০০ মাসয়ালা নিজমুখে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে ৩৮০০০ ইবাদাত সংক্রান্ত ও ৪৫০০ বৈষয়িক ব্যাপারে। তার সংকলিত মোট মসলার সংখ্যা ৬ লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফাকে ইমামে আজম বলে অভিহিত করা হয়।

(২) ইমাম মালেক (মৃত্যু হিঃ ১৭৯)

তার সংকলিত মসলার সংখ্যা ৩৬০০০, তিনি ফকিহ হওয়া সত্বেও একজন প্রসিদ্ধ মোহাদ্দিস। তার হাদিস সংকলন (الموطا) ইলমে হাদিসের উচুমানের কিতাব।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (মৃত্যু হিঃ ২০৪)

তার মূল কিতাব (كتاب الام) বিরাট বিরাট ৭ খন্ডে লিখিত। তিনিও একজন মোহাদ্দিস ছিলেন।

(৪) ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (মৃত্যু হিঃ ২৪১)

তিনিও একজন বিশিষ্ট মোহদ্দিস। তার ফতোয়া মসলা-মাসায়েলকে পরবর্তিকালে ৪০ খন্ডে লিখা হয়েছে।

এই চারজন ইমামের ফিকাহ ও ইজতিহাদকেই বিশ্বের মুসলমানেরা সাধারনভাবে অনুসরণ করেন। এই চারজন অনুসরণীয় ইমাম ছাড়া ও ইলমে ফিকাহর ময়দানে বহু বিশিষ্ট ইমাম ও মোজতাহিদদের সমাবেশ ঘটেছে। তাদের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ইমামগণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু- হিঃ ১৮৩) যিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (كتاب الخراج) এর প্রণেতা। ইমাম মুহম্মদ (মৃত্যু- হিঃ ১৮৯) যারা দু'জন ইমাম আজমের বিশিষ্ট সাগরেদ ছিলেন। ইমাম জাফর ও ইমাম আবু হানিফার সাগরেদ ছিলেন। ইমাম মালেকের ফিকাহর অনুসরণে যে সমস্ত ফকিহগণ বিশেষ ভূমিকা রাখেন তারা হলেন;

(১) আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব, (২) আব্দুর রহমান বিন কাসেম,
(৩) আশহাব বিন আব্দুল আযিয, (৪) আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম,

www.pathagar.com

এবং (৫) ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া আল লাইসী, প্রমুখ।
ইমাম শাফেয়ীর ফিকাহ্ যে সমস্ত ফোকাহাদের কল্যাণে প্রসিদ্ধি লাভ করে তারা হলেন;
(১) ইমাম বুয়েতী, (২) ইমাম মজনী, এবং
(৩) ইমাম রবয়ী, প্রমুখ।

ইমাম আহমদের ফিকাহ তার সাগরেদ ইবনে কোদামার অবদানে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার লিখিত গ্রন্থ (المغني) একটি অতুলনীয় অবদান। উপরোক্ত ইমামগণ মূলতঃ চার ইমামের ফিকাহ্রই ধারক ও বাহক ছিলেন। কিন্তু ইজতিহাদের হক আদায় করতে গিয়ে অনেক বিষয়ে ভিন্নমতও পোষণ করেছেন। পরবর্তিকালে ইলমে ফিকাহর ময়দানে আরো অনেক ইমামের সমাবেশ ঘটেছে, যারা ইজতিহাদের পথে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া, তাঁর সাগরেদ হাফেজ ইবনে কাইয়েম, ইবনে হাদী, ইবনে কাসীর, হাফেজ ইবনে রজব, মুল্লা আলা কারী, ইমাম নুবুবী, ইমাম তাহাবী, ইমাম বগোভী, খতিব বাগদাদী প্রমুখ ইমামগণ ফিকাহর গবেষনায় অভূতপূর্ব উন্নতি করেন। মিসরের মুফতী আবদুহু, ভারতের শাহ্ অলীউল্লাহ্ দেহলভী ও অপরাপর উলেমারা ফিকাহ শাস্ত্রের উন্নয়নে ভুমিকা রেখেছেন। এসমস্ত মনিষীদের অগাধ পান্ডিত্য ও সাধনার ফলে আমরা আজ ঘরে বসে ফিকাহর বিশাল ভান্ডার নাগালের মধ্যে পাচ্ছি।

তাবেয়ীদের যুগ

সাহাবাদের পদাংক অনুসরণ করাই তাবেয়ীনদের মূলনীতি ছিলো। কোরআন ও সুন্নার আমলে সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শকে কঠোরভাবে মেনে চলতেন। সকল দ্বীনি ব্যাপারে সাহাবাদের উপর নির্ভর করতেন। তাদের সামগ্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতেন না। কোন হাদিসের ভিত্তিতেই তারা মত পার্থক্য করতেন। সাহাবায়ে কেরামগণই এমনি মত পার্থক্যের বুনিয়াদ রেখে গিয়েছিলেন।

হযরত উসমানের খিলাফতের সময় থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং সদ্য বিজিত বিভিন্ন এলাকার জনগণের তরবিয়তের দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, শুধুমাত্র বসরা ও কুফাতেই তিনি শতাধিক সাহাবা বসবাস করতেন। মিসর ও সিরিয়াতে ও সাহাবারা বসবাস শুরু করেন। তাদের প্রত্যক্ষ শিক্ষা-দিক্ষায় তাবেয়ীদের বিরাট একটি দল গড়ে উঠে। তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ফিকাহ্র আলাদা আলাদা মযহাব গড়ে উঠে। প্রত্যেক শহরের জনগণ তাদের শহরের ফকিহদের মতামতকে প্রাধাণ্য দিতে থাকে।

বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ফকিহদের ইজতিহাদী কেন্দ্র হয়ে যায়। যার সংক্ষিপ্ত বিবরন নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

মদীনাঃ তাবেয়ীদের যামানায় মদীনা মনোয়ারাতে প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ও পন্ডিতদের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব, সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর অবস্থান করতেন। অতঃপর কাজী ইয়াহিয়া বিন সাঈদ, রাবিয়া বিন আব্দুর রহমান প্রমুখ খ্যাতি লাভ করেন। তারা ইলমে ফিকাহর বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ব্যাপক ইজতিহাদের স্বাক্ষর রাখেন। তারা তাদের ফিকাহর মূলনীতি প্রণয়নে মদীনা ও মক্কার আলেমদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতেন। তারা সাধারনভাবে সাহাবাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের রেওয়াতের উপর অধিক নির্ভর করতেন। তদুপরি তারা মদীনার কাজীদের ফয়সালা সমূহকে তাদের ফতোয়ার বুনিয়াদ মনে করতেন।

মক্কাঃ মক্কার প্রসিদ্ধ আলেমদের মধ্যে আতা বিন আবি রাবাহ তার ইজতিহাদী কর্মের জন্যে ইমামের মর্যাদা লাভ করেন।

কুফাঃ কুফায় অবস্থানরত বিশিষ্ট মোজতাহীদদের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম নখয়ী ও ইমাম শায়বী খ্যাতি লাভ করেন।

বসরাঃ বসরায় অবস্থানরত ফকিহদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম ছিলেন হযরত ইমাম হাসান বসরী, যার অবদান ইতিহাসের পাতায় সমুজ্জল হয়ে আছে।

ইয়ামেনঃ ইয়ামেন দেশে হযরত তাউস বিন কাইসান ইজতিহাদের ময়দানে ব্যাপক অবদান রাখেন।

সিরিয়াঃ সিরিয়ায় ইমাম মাখহুলের মত ব্যক্তিত্ব ইজতিহাদী খিদমত আঞ্জাম দেন।

তাবেয়ীদের যামানায় হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব মদিনার আলেমদের মুখপাত্র ছিলেন। মক্কা, মদিনা তথা হেযাযে তার ইজতিহাদ সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে। অপর দিকে হযরত ইব্রাহিম নখয়ী কুফার উলেমাদের মুখপাত্র ছিলেন। কুফা, বসরা তথা ইরাকে তার ইজতিহাদ খ্যাতি লাভ করে। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব খলিফা হিসাবে হযরত উমরের ফয়সালা সমূহকে তার ইজতিহাদের বুনিয়াদ মনে করতেন। তিনি হযরত উমরের সমস্ত ফয়সালাকে সংকলন করেন ও তারই ভিত্তিতে ফতোয়া দিতেন। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহিম নখয়ী খলিফা হিসাবে হযরত আলীর রায় সমূহকে তার ফতোয়ার ভিত্তি মনে করতেন এবং তার রায় সমূহকে সংকলন করে তারই ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতেন। এই দুইজন যখন কোন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতেন, তাকে অত্যন্ত সমীহের চোখে দেখা হতো। সবাই মনে করতেন তাদের ফিকাহর ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। পরবর্তীকালে যখন ইলমে ফিকাহকে আরো

www.pathagar.com

সুসংহত ও বিস্তারিতভাবে সংকলিত করা হয়, তখন এই দুই মহান ইমামের মূলনীতি সমূহ সর্বত্র অগ্রাধিকার পায়। সাহাবায়ে কেরামদের হাতে গড়া তাবেয়ী ইমামগণ সাহাবাদের আদর্শকেই তাদের গবেষণার ভিত্তি মনে করতেন। তারা সাহাবাদের প্রণীত মূলনীতি সমূহকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতেন। তাই হক পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতনের প্রেক্ষাপটে এই যুগেই খলিফা রাশেদ বলে খ্যাত হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয ইতিহাসের ধারাকে বদলে দেন। জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামের আদর্শানুযায়ী সংস্কার করেন, ফলে ইসলামী ইলমের বিভিন্ন শাখায় বর্ণনাতীত উৎকর্ষ সাধন হয়। ইলমে হাদিস ও ফিকাহর লালন হতে থাকে। তাই তাবেয়ীদের যুগ কে ইসলামী ইলমের সংরক্ষণ ও লালনের যুগ বলা যেতে পারে।

তাবেয়ীদের পরবর্তীযুগ

তাবেয়ীদের পরবর্তীযুগে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক, নৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণে অনেক বিভ্রান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বিভ্রান্তির এই পটভূমি বুঝবার জন্যে নিচের বিষয়গুলোর উপলব্ধি অপরিহার্য।

১. খোলাফায়ে রাশেদীনদের যামানায় পৃথিবীর যে বিশাল এলাকা ইসলামের ছায়া তলে এসে যায়, সেখানে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ দলে দলে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় তাদের চিন্তাধারা ও কর্মের সংস্কার সাধন করা অপরিহার্য্য ছিলো। কিন্তু সে কালের বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতন ও অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক অস্থিরতার কারণে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

২. খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়ার পর মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সার্বিক চেহারা পালটে যায়। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দেশের রাজনীতি অর্থনীতি ও অপরাপর বিষয়াদীর সাথে সাথে মুসলমানদের আদর্শিক, নৈতিক, তথা আত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রন ও খলিফাদের হাতে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। মানব জীবন ও জাতীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগ অখন্ডিত ছিলো। নতুন মুসলমানেরা দেশের সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকেই ইসলামের স্বরূপ ও মুল্যোবোধ অবলোকন করতে পারতো, কিন্তু খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইসলামের সামগ্রিক জীবন খন্ডিত হয়ে পড়ে। অখন্ড ইসলামী জীবনের অখন্ড মূল্যবোধ চরম ভাবে অবহেলিত হয়ে পড়ে, ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবন থেকে ইসলামের রূপ ও মুল্যবোধ অবলোকন করার কোন উপায় থাকেনা।

৩. মানুষের মৌলিক অধিকার অস্বীকৃত হয়, বাক-স্বাধীনতা এবং হককে হক বলা ও নাহককে না হক বলার অধিকার বিলুপ্ত হয়, ফলে ইসলামের আভ্যন্তরীণ নৈতিক শক্তি আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

৪. মুসলমানদের আর্থিক অবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন আসে। সরকারী ধন-ভান্ডারে অস্বাভাবিক স্ফিতি দেখা দেয়। ইবনে খলদুন ইসলামের দ্বিতীয় শতকে মুসলিম শাসকদের বার্ষিক আয়ের যে হিসাব উল্লেখ করেছেন, সেই মোতাবিক তাদের বার্ষিক আয় মোটামুটি ভাবে প্রায় ১ বিলিয়ন টাকা। সে যুগের সস্তা বাজারে এই অংক খুবই অস্বাভাবিক। এই বিশাল অর্থ সরকারী কোষাগারে থাকতো এবং শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ব্যয় করা হতো। ফলে শাসক গোষ্ঠি ও তাদের সহযোগীরা অত্যাধিক জৌলুসময় জীবন যাপন করতেন। ইসলামী বাইতুল মালের ধারনা বিলোপ পেয়েছিলো।

৫. একদিকে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির অপ্রতুল চর্চা, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের দর্শন ও চিন্তাধারা মুসলিম দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়ে পড়ে, ফলে সাধারন মানুষ চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে অনেক ধরনের কুটিল চিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বিজাতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার লালন চলতে থাকে, ফলে পর্যায়ক্রমে এসব বিজাতীয় চিন্তাধারা ইসলামী চিন্তাধারার অংশে পরিণত হয়ে যায় এবং এই অবৈধ অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করা হতে থাকে।

৬. পুরাতন রসম-রেওয়াজ সংস্কৃতির অংগ হয়ে যায় এবং কিছু কিছু লোক এসব রসম-রেওয়াজকে ইসলামী সংস্কৃতির অংশে পরিণত করার আন্দোলন করতে থাকে। ফলে এসব কিছু ইসলামী চিন্তাধারার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

উপরোল্লিখিত পটভূমিতে মুসলিম মানসে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম নেয়। বিশেষ করে ইরাক অনেক বিভ্রান্ত চিন্তার সুতিকাগারে পরিণত হয়ে পড়ে। খারেজী, মোতাজেলী, জোহমী, বাতেনী, শিয়া, কোরআন মাখলুক হওয়ার সমস্যা, গ্রীক দর্শনের জড়বাদী চিন্তাধারা মুসলিম মানসকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। হক পন্থী উলেমারা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখেন এবং অনেকে অকুতোভয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন এবং সময়ে সময়ে অকথ্য নির্যাতন ও ভোগ করেছেন। হক ও বাতিলের এই টানা পোড়নে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা দেখা দেয় ও বিভিন্ন এলাকার লোকদের মনে অন্য এলাকার লোকদের সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহ দানা বেধে উঠে। প্রত্যেক এলাকার লোকেরা তাদের অঞ্চলের আলেমদের ইজতিহাদকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। বিশেষ করে মক্কা ও মদীনার লোকেরা ইরাককে সন্দেহের চোখে দেখতেন। এমন কি, ইমাম মালেক ইরাককে বিকৃতির কেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করেন এবং সাধারনভাবে ইরাকে অবস্থানরত উলেমাদের মতামত সম্পর্কে ও সন্দেহপরায়ণ হয়ে পড়েন।

মক্কা ও মদীনা কেন্দ্রিক উলেমারা ফিকাহর সংকলনে হাদীসের শব্দার্থের উপরই নির্ভর করতেন। তারা ইরাকের উলামাদের উপর বেশী কেয়াস নির্ভর হবার অভিযোগ করতেন। ইমাম মালেক এই ভিত্তিতেই ফিকাহর সংকলন করেন। তার পর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল এ ধারাতেই ইলমে ফিকাহর সংকলনের খিদমত আঞ্জাম দেন।

www.pathagar.com

অপরদিকে ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) ইরাকের এই পরিবেশে ফিকাহ শাস্ত্রকে অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তার মতে কোন বিষয়ে ফতোয়া দেবার পূর্বে ঐ বিষয়ের কার্যকারণ বা মূল কারণগুলো খুঁজে বের করা অপরিহার্য। যেহেতু নতুন কোন হাদীস পাওয়ার আর কোন পথ নেই তাই ঐ সব মূল কারণগুলো বা কার্যকারণের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হবে। এ ভাবে তিনি ইলমের ফিকাহ সংকলন করেন। তিনি ইরাকে অবস্থানরত সাহাবীদের মতামতের উপর বেশী নির্ভর করতেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), যাকে সাহাবাদের মধ্যে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ট আলেম বলা হতো, এর কাছ থেকে ইলম নিতেন। তিনি হযরত আলীর মতামতকে তার ফিকাহর অবলম্বন বানিয়েছেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারীর মতো সাহাবী ও ইরাকে অবস্থান করতেন,তার ইলম ইমাম আজমের ফিকাহয় স্থান পেয়েছে। এ সব বরেন্য সাহাবাদের ইলম ছাড়া ও তিনি আহলে বাইতের আলেমদের মধ্যে ইমান জাফর সাদেক, যায়েদ বিন আলী বিন হোসাইন ও মোহাম্মদ বিন হানিফার কাছ থেকে ইলমের উপকরণ গ্রহণ করতেন। তাই ইরাকের সন্দেহ ও অনাস্থার পরিবেশে বসবাস করে ও ইমাম মাহেব তার যোগতা ও নিষ্ঠার কারণেই ইলমে ফিকাহর ইতিহাসে অতুলনীয় অবদান রাখতে সমর্থ হন।

ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার দরবারে প্রায় ৯০ জন বড় বড় আলেম সর্বদা উপস্থিত থাকতেন । কোন মসলা তার কাছে আসলে তিনি একক ভাবে ঐ বিষয়ের উপর ফতোয়া না দিয়ে উপস্থিত ফকীহদের সামনে আলোচনার জন্য ৩ দিন যাবত রাখতেন, অতঃপর তাদের মতামত নেবার পরই তিনি তার ফতোয়া জারী করতেন। তিনি আলেমদেরকে তাদের মতামত স্বাধীনভাবে দিতে উৎসাহিত করতেন। এ কারনেই ইমাম আজমের ফিকাহ মুসলিম দুনিয়ার সর্বাধিক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও অধিকাংশ লোক অনুসরণ করে।

বিভিন্ন ফিকাহর অনুসরণ বিভেদ নয়

একটি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য মনে রাখতে হবে যে ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ কোন এক ফিকাহর অনুসরণ বা তাকলিদ করতেন না, কোন এক ফিকাহর তাকলিদ তারা প্রয়োজনীয় মনে করতেন না।

সমাজের সাধারন মানুষ কোরআন ও হাদিসের অনুসরণ করতেন। নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত সহ বিভিন্ন বন্দেগীর বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান সবারই ছিলো, শৈশবেই পিতা-মাতা বা উস্তাদের কাছে শিখে নিতেন। কোন বিষয়ে জানা না থাকলে তারা স্থানীয় কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন। তারা কোন ফিকাহর ভিত্তিতে জবাব দিলেন তা তাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো না। পক্ষান্তরে আলেম সমাজ কোরআন হাদিসের উপর তাদের ইলমের ভিত্তিতে আমল করতেন। তার আমল কোন ফিকাহর সাথে মিলে যাচ্ছে বা কোন ফিকাহর পরিপন্থি হচ্ছে তা তাদের চিন্তার বিষয় ছিলো না। তারা যে সব

www.pathagar.com

প্রসিদ্ধ ঈমামদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারা তাদের উস্তাদদের ইজতিহাদের ধারার আলেম বলে পরিচিত হতেন। তারা উস্তাদের গবেষণা কর্মের প্রভাবাধীন হতেন সত্যই কিন্তু সব বিষয়ে উস্তাদের গবেষণার অনুসরণ করতেন না। যে সব বিষয়ে তারা ভিন্ন মত পোষন করতেন তা প্রকাশ্যভাবে বলতেন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম জাফর, ইমাম তাহাবী প্রমুখ হানাফী ফিকাহ্র ইমাম বলে পরিচিত কিন্তু তারা নিজস্ব যোগ্যতায় ইজতিহাদ করতেন। এমনি করে ইমাম নাসায়ী, ইমাম বায়হাকীকে শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাদের উস্তাদের কল্যাণে, যদি ও তারা নিজেরা বিশিষ্ট মোজতাহিদ ছিলেন। ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আজমের সাগরিদ ছিলেন কিন্তু মদিনার আলেমদের কাছে বিশেষ ভাবে ইলম হাসেল করেন এবং মদীনার আলেমদের মতামতকে ইমাম আজমের ফিকাহ্র সাথে সমন্বিত করার চেষ্টা করেন।

পূর্বের কোন ইমামের ইজতিহাদকে কবুল করে নেয়াকে আলেমদের জন্যে তকলিদ বলা হয়না। যেমম ইমাম আবু হানিফা তার ফিকাহ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উস্তাদ ইবরাহিম নখয়ীর ইজতিহাদকে গ্রহণ করছেন। কোন বিষয়ে ইমাম ইবরাহিম নখয়ীর ইজতিহাদ পাওয়া গেলে তিনি তাকে অগ্রাধিকার দিতেন। ইমাম মোহাম্মদের (كتاب الاثار) আব্দুর রাজ্জাকের (جامع) ও আবু বকর সাইবা তার কিতাবে ইবরাহিম নখয়ীর ইজতিহাদকে সংকলিত করেছেন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাফী ফিকাহ্র সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। ইমাম মালেক মদীনার আলেম সাঈদ বিন মোসাইয়েবের ইজতিহাদকে সাধারন ভাবে কবুল করেছেন। ইতিহাসের ধারায় আমরা যত মোজতাহিদ ও বিশিষ্ট আলেমদের সাক্ষাৎ পাই। তাদের গবেষণা কর্মে ও এই মূলনীতি পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের ভারতবর্ষের মোজতাহিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী মদীনায় শাফেয়ী ফিকাহ্র আলেমদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন ও শাফেয়ী ফিকাহ্র দ্বারা প্রভান্বিত হন এবং তার গবেষনায় শাফেয়ী ফিকাহকে অগ্রাধিকার দিতেন। তবে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।

হিজরী সালের ৪র্থ শতকের শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক তথা জাতীয় জীবনের পরিবর্তিত পটভূমিতে আলেম সমাজ জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ময়দান থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন এবং ফিকাহ্র ইজতেহাদই তাদের মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। ইজতেহাদের জন্যে যে সমস্ত যোগ্যতা অপরিহার্য, তার অভাব থাকা সত্বেও অনেকে ইজতিহাদের মতো সুক্ষ বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ফলে সাধারন মানুষের জন্যে ফিকাহ্র আমল কষ্ঠসাধ্য হয়ে দাড়ায়। সত্যিকার অর্থে ইজতিহাদের পথ সীমিত হয়ে পড়ে। তখন উলেমারা সুনির্দিষ্ট ফিকাহ্র তাকলিদের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। কারন;

১. ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে যত ধরনের মত পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা সবই চার ইমামের ফিকাহ্র মধ্যে মওজুদ রয়েছে।

www.pathagar.com

২. বিশিষ্ট চার ইমামের ইজতিহাদের বাইরে নবতর ইজতিহাদের বিষয় অত্যন্ত সীমিত। নতুন কোন বিষয় উদিত হলে ও চার ইমামেরই প্রনীত মূলনীতির ভিত্তিতেই তার সমাধান সম্ভব।

৩. সাধারন ভাবে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের ইলম দিন দিন কমে যাচ্ছে, তাই উলেমারা এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছেছেন যে বিশিষ্ঠ চার ইমামের ফিকাহ্ সবগুলোই হক, এর মধ্যে যে কোন একটির অনুসরণ করলেই সুন্নতের অনুসরণ হবে।

৪. ফিকাহ্র তাকলিদ কোন শরীয়তের নিদের্শ নয়, বরং অবস্থার পরিপেক্ষিতে প্রয়োজন মাত্র। ফিকাহ্র তকলিদ হক ও বাতিলের মানদন্ড নয়।

এ সব কারণে উলেমায়ে কেরামগণ তকলিদকে বৈধ ঘোষণা করেছেন সাথে সাথে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিশেষ লোকদের বেলায় কোরআন হাদিসের প্রমাণ না জেনে ফিকাহ্র তাকলিদ উচিত নয়। অর্থাৎ গতানুগতিক ভাবে তাকলিদ অনভিপ্রেত, অপরদিকে ইজতিহাদের দরজা উম্মুক্ত রাখতে হবে। ইজতিহাদের শর্তগুলো পূরণ করলে অবশ্যি ইজতিহাদের দ্বার অবারিত রাখতে হবে। একটা প্রগতিশীল শরীয়তের জন্যে এই প্রগতিশীল সমাজে ইজতিহাদ অপরিহার্য।

তাকলিদের মূলনীতি

যেহেতু ফিকাহ্র মত পার্থক্য কোন বিভেদ নয়। যে কোন ফিকাহ্র অনুসরণ কোরআন হাদিসেরই অনুসরণ। ফিকহার বিভিন্ন মযহাবের অনুসরণকে ইসলামের ইতিহাসে কখনও বিভেদের উৎস মনে করা হয়নি।

- ফিকহার প্রকার ভেদে বিভিন্ন মসজিদ নিদিষ্ট করা বা একে অপরকে নাহক বলার রেওয়াজ কোন দিনই ছিলোনা।
- নামাজে ফিকাহর মত পার্থক্যের কারণে কোন ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার ব্যাপারে সংকীর্ণতা ছিলো না।
- ফিকাহ্র ইমামদের মত পার্থক্যকে দেখা হতো এভাবে;

مذهبنا صواب يحتمل الخطأ و مذهب غيرنا خطأ و يحتمل الصواب

(আমাদের মযহাব সঠিক (এ জন্যেই অনুসরণ করি) কিন্তু এর মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে (এ জন্যেই বিবাদ করিনা) পক্ষান্তরে অন্যান্য মযহাব হলো ভুল কিন্তু সঠিক হবার সম্ভাবনা রয়েছে)

এই দৃষ্ঠিভঙ্গিই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের মযহাবকে ঠিক মনে করে আমল করি কিন্তু সেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে তাই নিজের মযহাবকেই একমাত্র হক বলে বাড়াবাড়ি করিনা, বরং কোরআন ও হাদিসের প্রমান সাপেক্ষে আমল করি এবং অন্য মযহাবকে অঠিক হবে উড়িয়ে দেইনা, কারন তা সঠিক হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

www.pathagar.com

- ফিকহার মতামতে অনড় মনোভাব দ্বন্দ, বিবাদ ও দলাদলি সৃষ্টি করে উম্মাহর ঐক্যে বিভেদ টেনে আনে।
- ফিকহার মত পার্থক্যেকে স্বতন্ত্র গ্রুপ বা দল সৃষ্টির মাধ্যম করে নেয়া বা নিজের দল বা গ্রুপকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্টতর মনে করে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের প্রশ্নে বৈষম্য করা দ্বীনি অপরাধ। যেমন বিয়ে শাদীতে, ব্যবসার শরীক নির্বাচনে, প্রতিবেশী নির্বাচন বা বন্ধুত্ব করার প্রশ্নে ফিকাহর আনুগত্যকে অহেতুক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা ইসলামী ঐক্যের পরিপন্থি।

ফিকাহর তাকলীদ কি অবৈধ?

বিশিষ্ট ইমাম ইবনে হযম আন্দুলুসীর মতে যুক্তি ও প্রমাণের মাপকাঠি ছাড়া কোন এক ইমামের তাকলিদ করা হারাম। কিন্তু বিশ্বের অপরাপর বরেন্য আলেমগণ তাঁর এই মতকে তার একান্ত নিজস্ব মত মনে করেন। ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠ আলেমদের মত নিম্নরূপ:

- আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের সক্রিয় অনুভূতি ছাড়া কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের অন্ধ অনুসরণ অবশ্যই হারাম।
- আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের উদ্দেশ্যেই কোন ব্যক্তি বা গোষ্টীর গবেষণার অনুসরণ কখনো বিভেদের উৎস হতে পারে না বা তা অবৈধ হতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তি বা গোষ্ঠির তাকলিদ মূলতঃ আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের লক্ষ্যেই। অবশ্য কিছুলোক বা গোষ্টীর সাথে একাত্বতার উদ্দেশ্যে কোরআন হাদিসের সঠিক আনুগত্যের সক্রিয় অনুভূতি ছাড়া কোন এক মযহাবের তাকলিদ করা বৈধ তাকলিদ নয়। তা আসলে নিজেদের দল বা গোষ্টীর শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেই হয়ে থাকে। এখানে মূল প্রশ্নটি মনস্তাত্বিক বা নিয়তের।
- এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চার ইমামের তাকলিদ মোটেই অবৈধ তাকলিদের পর্যায়ে পড়ে না। জনসাধারন কোরআন হাদিস থেকে সরাসরি প্রমাণাদি সংগ্রহ করার যোগ্যতা রাখে না, তাই কাকে ও জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়। ইসলামের প্রথম যুগে যখন ইলমে ফিকাহর সংকলন হয়নি, তখন সাধারন মানুষেরা এভাবেই আমলের পথ খুঁজে নিতেন। আজ যখন ফিকাহর সংকলন সম্পন্ন হয়েছে, তাই বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন করে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। হাতের কাছেই সংকলিত ফিকাহর ভান্ডার মওজুদ রয়েছে। বিশ্বে কোন ইমামই এই ফিকাহকে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা বলে দাবী করেননি। তাই আল্লাহ ও রাসুলের সঠিক আনুগত্যের নিশ্চয়তার জন্যেই কোন এক ফিকাহর তাকলিদ করা হয়ে থাকে, যা কোন ক্রমেই অবৈধ হতে পারে না।
- চার ইমামের ফিকাহর বাইরে যদি কোন ব্যক্তি কোরআন হাদিসের আনুগত্য করে তাকে অপরাধী করা যাবে না। যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা নিয়ে চার ইমামের মতামতের

www.pathagar.com

বাইরে স্বতন্ত্র ফতোয়া দিয়েছেন তারা হলেন মোজতাহিদ, তাদের সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণা রাখা যাবে না। তারা শরীয়তের জ্ঞান-ভান্ডারে জ্ঞানের সংযোজন করার মহত্বের অধিকারী। পক্ষান্তরে সাধারন জনগণের মধ্যে যারা চার ইমামের মধ্যে কারো তাকলিদ না করে কোরআন ও হাদিসের আনুগত্যের দাবী করেন তারা আসলে কোন ইমাম বা মোজতাহিদেরই তাকলিদ করছেন নিঃসন্দেহে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে যারা আহলে হাদিস বা সালাফি বলে পরিচিত হয়েছেন তারা বিশেষভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফিকাহরই অনুসরণ করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া সংকলন তাদের ফিকাহর উৎস। কোন কোন মসলার ব্যাপারে তারা সাউদী আরবের কয়েকজন বরেন্য আলেমদের ফতোয়ার অনুসরণ করেন। যারা এ যোগ্যতা রাখেন না তারা তাদের নিজস্ব আলেম বা মসজিদের ইমামের কথা মানেন ও অনুসরণ করেন। তাদের আমলও আসলে তাকলিদ ভিত্তিক। তাকলিদ একটি বাস্তবতা। তারা এই বাস্তবতাকে যদিও বা অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে চার ইমামের ফিকাহর অনুসারীরা এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

- তাকলিদের মধ্যে দলাদলীর সম্ভাবনা রায়েছে বলে যারা ফিকাহর অনুসরণকে এড়িয়ে যেতে চান, তারা সুনির্দিষ্ট ফিকাহর অনুপস্থিতিতে আরো ব্যাপকতর বিভেদ ও দলাদলীতে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন আলেমের বিভিন্ন মতের মাঝে তারা হাবুডুবু খান তখন বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ফিকাহর মত পার্থক্যের স্বরূপ বোধগম্য না হওয়ার ফলেই ফিকাহর আনুগাত্য এড়িয়ে যাবার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বর্তমানের দলাদলী ও আসলে অজ্ঞতার ফসল। আলেম নামধারী ব্যক্তি যারা এসব দলাদলীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা আসলে আলেম নন।
- আসল সমস্যা হলো বিভেদমূলক প্রচারণা। হাদিসও ফিকাহর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ফিকাহয় হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বোধগম্য হয়। হাদিসের অর্থ ও বিভিন্ন হাদিসের মান নির্ধারণ ইজতেহাদী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব। ফিকাহর ইমামগণ এই কাজটাই করেছেন। উম্মতের এই মহান সন্তানগণ ফিকাহর যে বিরাট ভান্ডার উপহার দিয়ে গেছেন তাকে অবহেলা করে দলাদলী ও ফিতনা এড়িয়ে যাবার কোন পথ নেই। ফিকাহর এই অবদান আসলে উম্মতের জন্যে বিরাট রহমত। যে কোন আলেম এই কথা মানতে বাধ্য।
- বিভিন্ন ইমামের নিজস্ব গবেষনার ধারা স্বতন্ত্র তাই কোন একজন ইমামের তাকলীদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে একই ধারার আনুগত্যের নিশ্চয়তা থাকে। খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন ইমামের মতামতের মধ্যে সহজতর বিষয়গুলোর আমল শরীয়তের প্রতি সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। এই মনোভাব অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

কোন জীবিত আদর্শ টিকে থাকে জীবিত মহান ব্যক্তিদের অবদানে। শুধু অতীতের মহান ব্যক্তিদের স্মৃতি কোন জীবন্ত আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। ইসলামী

www.pathagar.com

ইতিহাসের প্রতি যুগে এই মহান জীবিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বিদ্যমান। সেই সব ব্যক্তিদের নিশ্বাসে দ্বীনে হানিফ তার সঠিক স্বরূপে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামী ইলমের এই ধারা অব্যাহত থাকতে হবে। শুধু ফিকাহ্র ময়দানে নয়। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে রেনেসাঁর স্বাক্ষর রাখার জন্যে ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। অতীতের মহান ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আগামীর জীবন্ত ব্যক্তিদের অবদানের প্রত্যাশা ইসলামী আদর্শবাদের জয়যাত্রা সুনিশ্চিত করবে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ফিকহার তাকলিদের উপর একটি সমীক্ষা

এই উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটেছে উমাইয়া সাম্রাজ্যের আমল থেকে। অতঃপর কখনো আরবদের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছে, আবার কখনো হয়েছে তুর্কি, আফগানী বা ইরানীদের মাধ্যমে। ইসলামের ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে হাদিসে রাসুলের চর্চাই এমন একটি হাতিয়ার যা উম্মতের আকিদা-বিশ্বাস ও আমলকে ইসলামের সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে সক্ষম। মক্কা-মদীনা ও নিকটবর্তী মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইলমে হাদিসের চর্চা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মজবুত শিকড় গেড়ে বসে। ফলে সেই অঞ্চলে বড় বড় মোহাদ্দিসিনের আবির্ভাব ঘটে। অষ্টম শতাব্দির প্রখ্যাত ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার সুযোগ্য সাগরেদ হাফেজ ইবনে কাইয়েম ইলমে হাদিসের ধারক ও বাহক ছিলেন। পক্ষান্তরে অনারব এলাকা যেমন তুরস্ক, আফগানিস্তান বা ইরানের উলামা ও পন্ডিতগণ দর্শন, তর্কশাস্ত্র, কবিতা, জ্যোতিষবিদ্যা, ফিকাহ্, ফিকাহ্র মূলনীতি ধর্মতত্ব ও মর্মীবাদ বা সুফিবাদের প্রতি ঝুকে পড়েন বেশী বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ঝুকে পড়তে বাধ্য হন। এই সব এলাকায় সে সব আলেম ইলমে হাদিসের চর্চার প্রতি ঝোক প্রবনতা দেখান তারা ও হেযায বা আরব উলেমাদের প্রভাবাধীন হয়েই খিদমত আঞ্জাম দিতেন। অন্যদিকে তারা তাদের দেশীয় উস্তাদদের গবেষণা ধারার সাথে একাত্ম হয়ে থাকতেন ফলে ঐসব এলাকার উলেমা সমাজ ইলমে হাদিস থেকে অনেকখানি দূরে সরে যান। কিন্তু হাদিসের ইলম ছাড়া সুষ্ঠ আকিদা বিশ্বাস সুনিশ্হিত করা সম্ভব ছিলো না। ভারতীয় উপমহাদেশে আকিদা-বিশ্বাসের ময়দানে যতো ভারসাম্যহীনতা জন্ম নিয়েছে, যার ধারা আজও অনেকাংশে অব্যাহত রয়েছে, তা মূলতঃ ঐ সময়েরই সৃষ্টি। ভারতীয় উপমহাদেশের এই সব সমস্যা মূলতঃ ইরান, আফগানিস্তান ও তুরস্কের মাটি থেকেই সংক্রমিত হয়।

উপ-মহাদেশের যে সমস্ত এলাকায় আরব আলেমগণ ইসলাম প্রচার করেছেন, তারা সেখানে ইলমে হাদিসের উপঢৌকন ও সাথে করে এনেছেন, ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় ইলমে হাদিসের চর্চা হতে থাকে। উপ-মহাদেশ ছাড়াও আরব আলেমগণ ইয়েমেন, হিজরে মওত, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইলমে হাদিসের ভিত্তিও সুদৃঢ় করে দেন। সারা উপ-মহাদেশে একমাত্র গুজরাট

www.pathagar.com

এলাকাতেই আরব উলেমাদের আগমন ঘটে তাই সেখানে ইলমে হাদিসের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। এবং (كنز العمال)-এর প্রণেতা শেখ আলী মোত্তাকী ও শেখ মোহাম্মদ তাহের পাটনির মত মোহাদ্দিস সেখানে সৃষ্টি হন এবং আগাগোড়াই ইলমে হাদিসের চর্চা চলতে থাকে। কিন্তু গুজরাট ছাড়া উপ-মহাদেশের সমস্ত এলাকায় তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানের আলেম ও সুফীদের দ্বারা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। অতঃপর উপ-মহাদেশে ইরানী উলেমাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হিজরী দশম শতাব্দীতে ইরানে সাফাভী সরকারের পতনের পর সেখানে শীয়াবাদ ধর্মীয় আদর্শ বলে ঘোষনা করা হয় এবং হাদিসের চর্চা একেবারেই মুলতুবী হয়ে পড়ে। ইরানের এই পরিবর্তন আমাদের ধর্মীয় জীবনে ও অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতঃপর দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের চর্চা খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু দেশে যদি ও ইসলামের প্রচারের সূচনা আরবের দ্বারাই হয়েছিলো, কিন্তু আরবদের শাসন শেষ হবার পর সেখানে গজনী ও গৌরী সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিলো, তারা আফগানিস্তানের এলাকা থেকে এসেছিলেন। ফলে সেখানে ইলমে হাদিসের চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে আলেম সমাজ ফিকাহ, দর্শন সুফীবাদ ও অপরাপর বিভিন্ন তাত্বিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। শুধু মাত্র বরকতের জন্য হাদীস পড়া হতো। মিশকাত শরীফ পড়লেই তাকে মোহাদ্দিস মনে করা হতো, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোরআন বা তফসীরের চর্চা ও ইলমে হাদিসের চর্চার সাথে জড়িত। তাই ইলমে হাদীসের সাথে সাথে কোনআন ও তফসীরের ইলম ও কমে যেতে থাকে।

অতঃপর আস্তে আস্তে ইলমে হাদিসের চর্চা আবার শুরু হয়। বিশিষ্ট মোহাদ্দীস শেখ আবদুল হক (মৃত্যু হিঃ ১০৫২) ইলমে হাদিসের ব্যপক প্রসার ঘটান তার খিদমতের জন্যে তাকে ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের প্রবক্তা বলে সম্মান দেয়া হয়। তারপর অনেক আলেমের আগমন ঘটেছে, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইলমে হাদীসের সত্যিকার প্রসার ঘটেনি। এমনকি আজকের দরসে নেজামীর জনক হযরত আল্লামা মুল্লা নেজামুদ্দীন সিহলভী (মৃত্যু হিঃ ১১৬১) যখন এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, সেখানে ও ইলমে হাদীসের স্থান মুখ্য ছিলো না, বরং ফিকাহ, তর্কশাস্ত্র, হিকমত, আকায়েদ ও তাত্বিক বিষয়গুলো মুখ্য বিষয়ে পরিনত হয়। অপরাপর সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যে গুলো ইরানী উলেমারা নিয়ন্ত্রন করতেন এবং ফার্সী ভাষা এখানের সরকারী ভাষা ছিলো, ইলমে হাদীস ও তফসীরের ভুমিকা নিতান্ত গৌন ছিলো। অতঃপর ইলমে হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ও ইসলামী জ্ঞানের মশাল হযরত ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর আগমন ঘটে এবং তাঁর ব্যাপক খিদমতের ফল স্বরূপ উপমহাদেশে ইলমে হাদীস শিকড় গেড়ে বসতে সক্ষম হয়। পরবর্তি যুগে তার সন্তান ও সাগরেদদের অবিরাম ও নিরলস সাধনার ফলে এখানে ইলমে হাদীস ব্যাপক ভাবে ছড়িযে পড়ে।

www.pathagar.com

এই মহান ইমামের জন্ম ১১১৪ হিঃ ও ইন্তেকাল ১১৭৬ হিঃ-তে হয়েছিলো, হযরত শাহ্ আবদুল আযিয, হযরত শাহ্ রফিউদ্দীন, হযরত শাহ্ আবদুল কাদির ও হযরত শাহ্ আবদুল গণী তাদের মহান পিতার পদাংক অনুসরণ করে কোরআন ও হাদীসের ইলমে অভূতপূর্ব অবদান রাখেন, অতঃপর তাদের সাগরেদদের বিরাট কাফেলা উপ-মহাদেশে ইসলামী ইলমের স্বাক্ষর রাখেন, ফলে উপমহাদেশের অবস্থান সারা মুসলিম বিশ্বে সম্মানের সাথে স্বীকৃতি লাভ করে। মিসরে 'আল মানার' পত্রিকার সম্পাদক তদানিন্তন অবস্থায় লিখেছেন;

যদি আমাদের ভারতীয় ভাইয়েরা সে যুগে ইলমের হাদীসের সাধনায় এগিয়ে না আসতেন, তা হলে ঐ এলাকায় ইলমে হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়ে যেতো। মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হিযাযে দশম শতাব্দী থেকেই এ ক্ষেত্রেই দুর্বলতা এসে যায় যা চতুর্দশ শতাব্দির প্ররান্তে চরম অবস্থায় পৌছে।

ইলমে হাদিসের চর্চার একটা স্বাভাবিক পরিণতি এই যে কোরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। যা আমরা দেখতে পাই মুসলিম বিশ্বের ঐ সমস্ত এলাকায় যেখানে ইলমে হাদীসের ব্যাপকতা ঘটেছে। সেখানে ফিকাহ্‌র মত পার্থক্যকে এতো কঠোরতার সাথে দেখা হয় না, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে উপরের পটভূমিতে সে পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এখানে ফিকাহ্‌র মত পার্থক্য দ্বন্দ ও কলহের উৎস।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বিবাদ, কলহ, দলাদলী, অনাস্থা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে সাধারনভাবে বিভিন্ন ফিকাহ ও বিশেষ ভাবে কোন এক ফিকাহ্‌র কোন ভূমিকা নেই। ফিকাহ্ উম্মতের প্রয়োজনে মহত একটি অবদান। প্রত্যেক মৌলিক ইলমকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা না দেয়া ও অপরাপর আনুসঙ্গিক বিষয়াদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া তথা ফিকাহ্‌র ধারক ও বাহকদের অসহিষ্ণু মনোভাব এ সব অঘটনের জন্য দায়ী।

এ দেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন, তারা যে ফিকাহ্ অনুসরণ করতেন তাদের প্রভাবে মুসলিম জনগণ সেই ফিকাহ্‌র অনুসারী হতেন। উপমহাদেশে ইসলামের প্রসারে তুর্কী, আফগানী ও ইরানী উলেমারা মুখ্য ভূমিকা রাখেন। তারা সবাই হানাফী ফিকাহ্‌র অনুসারী ছিলেন। শুধু মাত্র অনুসারী নন তারা আদতে মযহাবের প্রচারে ও প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাদের অধিকাংশই ইলমে হাদীস সম্পর্কে অনেকটা উদাসীন ছিলেন। ফলে এখানের সাধারন জনসাধারন তাদের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতেন। ইরানী ধর্মীয় প্রভাব আমাদের ধর্মীয় জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। এমন কি ইসলামের মৌলিক পরিভাষা গুলোকে ও তাদের নিজস্ব ভাষায় রূপান্তরিত করে ফেলেন যা আমাদের ধর্মীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে সন্তর্পণে। খোদা, পয়গম্বর, ফিরিশতা, বেহেশত, দোযখ, গোনাহ-সোয়াব, পুলসিরাত, নামাজ, রোজা, দরুদ সালাম জাতীয় ইসলামী মৌলিক পরিভাষাগুলো ইসলামের মূল পরিভাষাগুলোর স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। তাদের এই

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির কারনেই উপমহাদেশের সর্বত্র হানাফী মযহাব ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের মাদ্রাজ ও কেরালা ছাড়া সর্বত্রই হানাফী ফিকাহ্‌র জয়যাত্রা নিশ্চিত হয়ে যায়। হানাফী মযহাবের গনমুখী ও যুক্তিভিত্তিক পটভূমি ও এই মযহাবের সম্প্রসারণে সাহায্য করে। কিন্তু এর প্রচারকদের কঠোর ও অসহিষ্ণুতা ও অসহনশীলতা আমাদের উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে।

শতাব্দীর এই উত্তরাধিকার আমাদের ধর্মীয় জীবনে অত্যন্ত গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী শিক্ষাকে ফিকাহ্ কেন্দ্রীক করে প্রবর্তন করার প্রবণতা এই উত্তরাধিকার সৃষ্টিতে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে আসছে। ফিকাহ্‌র প্রচারকগণ প্রথম থেকেই ফিকাহ্‌র প্রাধান্যের জন্য তর্ক-বিতর্ক ও মোনাজিরার পথ বেছে নিতেন, অপর দিকে শিক্ষায় ও এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা হয়। পরবর্তীকালে আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার ধারা আলাদা হয়ে যাবার পরও ধর্মীয় শিক্ষার ঐ প্রাচীন ধারা অব্যাহত থাকে। সেখানেই হাদীস পড়ানো হয় ফিকাহ্‌রই উদ্দেশ্য। একজন ছাত্র যখন মাদ্রাসাতে বোখারী, মোসলেম বা সিহাহ সিত্তার কোন কিতাব পড়তে থাকেন। সামনে উপবিষ্ট উস্তাদ চুপচাপ শুনতে থাকেন, দ্বীন আখলাক, ঈমান, আকায়েদ বা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কতো হাদিস পেরিয়ে যায়, উস্তাদ মোহ্তারিম কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন না, কিন্তু যখনই কোন ফিকাহ্‌র মত পার্থক্য জড়িত কোন হাদীস এসে যায়, তখন তিনি নীরবতা ভেঙ্গে ফিকাহ্‌র উপর তার পান্ডিত্য বিশদভাবে বয়ান করেন এবং ফিকাহ্‌র ইলমকে হাদিসের দরস বলে পেশ করতে থাকেন। একে আর যাই বলা হোক না কেন ইলমে হাদিসের দরস বলা যায় না। উস্তাদই বা কি করবেন, পরীক্ষায় যে এগুলোই আসবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার কথা যখন এসে গেলো তখন একথাও বলতে হয় যে একদিকে ঐ ছাত্ররা দরসে হাদিসে শুধু ফিকাহই পড়ছেন। তফসীরের দরসে অনুরূপ মোতাশাবিহাত (রূপক আয়াত) ও হরূপ মোকাত্তিয়াত (সুরার শুরুতে লিখিত বিচ্ছিন্ন হরফ)-এর ব্যাখ্যা শুনছেন বেশী। সাথে সাথে উসুলে ফিকাহ্, মানতেক, হিকমত ও উসুলে তফসীরের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো এবং আকায়েদে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মোজহাবী মত বিরোধের বিবরন যা মূলতঃ গ্রীক দর্শন থেকে উৎসারিত হয়েছে, তা অধ্যয়ন করেছেন, আরবী সাহিত্য বলতে ইসলাম প্রাদূর্ভাব ঘটার অনেক আগের (سبع معلقات) বা এ জাতীয় চরিত্র বিধ্বংসী বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করছেন আরবী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে। উপুর্য্যপরি উর্দু ও ফার্সীতে লিখিত সুফি আকিদার বা মর্মীবাদের কবিতাগুলোকে তাদের নিত্য সহচর করে দেয়া হয়। যা পরবর্তিকালে তাদের ওয়াজ নসীহতের মূল উপাদানে পরিণত হয়। এমনি অবস্থায় একজন ছাত্র যখন আলেম হয়ে বেরিয়ে আসেন, তখন তার মানসে ফিকাহ্‌র এই রূপ ছাড়া আর কোন বিষয় সাড়া জাগাতে পারে কি? উলেমা সমাজ এই মান্ধাতা শিক্ষার পরিবর্তনে এগিয়ে এসেছেন নিঃসন্দেহে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা আজও অত্যন্ত অপ্রতুল। ধর্মীয় শিক্ষার আমুল পরিবর্তন ছাড়া ফিকাহ্‌র সহনশীলতা ও সহ অবস্থানের মনোভাব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। অপরিহার্য এই সহনশীলতা সৃষ্টির জন্যে নিচের কয়েকটি কথা আন্তরিকতার সাথে মনে রাখতে হবে।

- চার ইমামের চার ফিকাহর প্রত্যেকটিই হক। চার ইমামের বাইরে ও যারা কোরআন সুন্নাহর আমল করেন, যাদেরকে আহলে হাদিস বা সালাফী বলা হয়, তারাও হক। বন্দেগী কবুল করার মালিক আল্লাহ।
- ফিকাহর ভিত্তিতে স্বতন্ত্র মসজিদ স্থাপন করা অবশ্যই বর্জনীয়। হজ্বের সময় বিভিন্ন মযহাবের মুসলমানেরা একই ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করেন।
- হজ্বের বাইরে ও এই মনোভাব বজায় থাকা উচিৎ। আমি আরব দেশগুলোতে লক্ষ্য করেছি, রমজানের তারাবীর সময় সমস্ত মুলমানগণ একই ইমামের পেছনে নামাজ পড়ছেন। কিন্তু বিতেরের সময় জামাত ছেড়ে দিয়ে একাকী নামাজ পড়ছেন। মযহাবী মত পার্থকের এমনি বহিঃপ্রকাশ ত্যাগ করতে হবে। বৃহত্তর জামাতের স্বার্থে লঘু পার্থক্যকে ভুলে যেতে হবে।
- অন্য ফিকাহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পরিহার করতে হবে।

আকিদা ও বিশ্বাস উম্মতের আসল সম্পদ

ইসলামী জীবনাদর্শের আকিদা ও বিশ্বাসই ইসলামকে অপরাপর মত ও পথ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে ভাস্কর করে রেখেছে। অতীতের উম্মতদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে সুস্পষ্ঠ রূপে দেখা যায় যে আম্বীয়া-রাসুলগণ যে আকিদা ও বিশ্বাসের পয়গাম নিয়ে আগমন করেছিলেন তাদের উম্মতগণ তা বিকৃত করে ফেলে, ফলে সে আদর্শের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে আমাদের পূর্বতন ইহুদী ও খৃষ্টানদের ইতিহাস এ কথার বাস্তব প্রমাণ। উম্মতে মোহাম্মদীর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে তিনি প্রতি যুগে এমন সব ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন যারা ইসলামের আকিদা বিশ্বাসকে তথা ইসলামের সকল দিক ও বিভাগকে আবর্জনামুক্ত করেছেন। ঐ সব মহান ব্যক্তিদের অবদান এই উম্মতের জন্য টনিকের কাজ করে এসেছে। বিগত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, যখনই মুসলমানগন আকিদা বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনই তাদের মধ্যে অনেক ধরনের আদর্শিক রোগ সৃষ্টি হয়েছে। আকিদা বিশ্বাস হলো উম্মতের আসল সম্পদ। প্রত্যেক ইমাম, সংস্কারক বা পন্ডিতদের প্রধান কাজ হলো আকিদার লালন। কোরআন ও হাদিসের জ্ঞানই এর রক্ষা কবচ। তাই মুসলিম উম্মাহর সকল বিভেদ ও বিরোধের উৎস হলো আকিদা - বিশ্বাসের নৈরাজ্য। ইরাকের মাটিতে অনেক উত্থান পতন ঘটেছে। ইরাক ও ইরানে উম্মতের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারী অনেক বিভেদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন বিভেদের প্রাচীর অল্প দিনেই ভেংগে পড়েছে, আবার কোন কোন বিভেদ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এ সব বিরোধ ক্ষনস্থায়ী হোক বা দীর্ঘস্থায়ী এর নেতিবাচক প্রভাব সুদূর প্রসারী। ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের এই বিরোধ গুলোর রাজনৈতিক দিকগুলোর প্রভাব ক্ষনস্থায়ী ছিলো, কিন্তু এর

www.pathagar.com

তাত্বিক পর্যায়ের বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। খারেজী, জোহমী, মোতাজেলী, কাদেরী ইত্যাদি এই পর্যায়ের। রাসুলে পাকের জাল হাদীস সেখান থেকে তৈরী হয়েছে। বানানো হাদিসের সমস্যাই হলো অনেক গুলো বিরোধের বুনিয়াদ। বানানো হাদিসের ফিতনার সাথে সাথে ইসরাইলীয়াত বলে আর একটি সমস্যা মাথা চাড়া উঠে। এই ইসরাইলীয়াত হলো এমন সব কথা কাহিনীকে হাদিস বলে চালিয়ে দেয়া যা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সমাজে তাদের নবীদের কাহিনী বলে প্রসিদ্ধ ছিলো, ইচ্ছাকৃত ভাবে এ সব ভিত্তিহীন কথা ও কাহিনীকে হাদীস বলে চালানোর চেষ্টা। আকিদা - বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সমস্ত বিরোধ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো তাদের মধ্যে একমাত্র শিয়া মতবাদ ছাড়া আর সব মতবাদ যেমন খারিজী, মরজিয়া, মুতাজিলা, আহ্‌লুস সাফা ও বাতেনী মতবাদ সমূহ প্রথমতঃ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হলে ও আস্তে আস্তে এর রাজনৈতিক প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং গ্রীক দর্শনের ছত্রছায়ায় নিছক তাত্বিক দর্শনে পরিনত হয়ে পড়ে। যাকে ইসলামের ইতিহাসে 'আকায়েদ' বা আকিদা বিশ্বাসের মতবাদ বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে। যা বিষের মত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যে বিভেদের কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

এই বিভ্রান্ত চিন্তা গুলো মুসলিম উম্মাহ্‌র মুল শক্তির মোকাবিলায় বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। মোহাদ্দেসীন ও ফোকাহাদের প্রজ্ঞ্যা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তিহীন করে দিয়েছে।

ঈমান ও আকিদাগত এই বিরোধে যে বিষয়টি সব চাইতে বেশী বিতর্কের বিষয়ে পরিনত করেছিলো তা হলো ইমানের তাৎপর্য।

ইমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) এই বিরোধের চুড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। তার প্রজ্ঞ্যা ও যুক্তির মাধ্যামে তিনি আহলে সুন্নত অল জামাতের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ঠ করে দিয়েছেন, যা 'ইসলামী আকায়েদ' বলে স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিনত হয়েছে।
ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ইমানের ব্যাখা দিয়েছেন এ ভাবে;

الايمان هو الاقرار باللسان و التصديق بالجنان و العمل بالاركان

(ইমাম হলো মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া ও বিধি বিধানের আমল)

শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ইমান হতে পারেনা, যদি শুধু মৌখিক স্বীকৃতিতেই কেউ মুমিন হয় তবে মোনাফিকদের ও মুমিন বলতে হয়, কিন্তু কোরআনে মোনাফিকদের মুমিন বলা হয়নি। এমনি করে কেউ অন্তরের বিশ্বাসে মুমিন হতে পারেনা, তা হলে সব আহলে কিতাব মুমেন হয়ে যেতো, তেমনি কোন মুমিন গোনাহ করে বসে তখন সে বেঈমান হয়ে যায়না, ইমানদারই থাকে, তবে গোনাহাগার মুমিন, গোনাহ ছগিরা হলে নেক আমল দ্বারা মাফ হয়ে যায় আর গোনাহ কবিরা হলে ও বেঈমান হয়ে যায় না, কারণ তওবার মাধ্যামে তার গোনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। এই ফরমুলা দিয়ে আহলুল সুন্না অল জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে। আকিদগত বিরোধের চুড়ান্ত নিস্পত্তি হয়ে যাবার পর ও

www.pathagar.com

আকিদাগত দিক গুলোই সমস্ত বিভেদের মূল উৎস হয়ে রয়েছে। তবে হক পন্থী লোকদের জন্য হক পথ বের করে নেয়া কোন কঠিন কাজ নয়।

দার্শনিক চিন্তাধারার বিষাক্ত ছোবল

উপরিল্লিখিত বিভেদের পটভূমিতে উম্মতের ঐক্যে আর একটি বিভেদের উপাদান সংযোজিত হলো তা হলো দার্শনিক চিন্তাধারার ধুম্রজাল। ইসলামের সত্যিকার জ্ঞানের অভাবে এক শ্রেনীর স্বাধীন চিন্তার মানুষ গ্রীক দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

ইসলামের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম দর্শনের পাশাপাশি প্রাচীন গ্রীক দর্শনের চর্চা ব্যাপকতর ছিলো। বিশেষ ভাবে ইরাক, ইরান ও আশেপাশে এলাকায় গ্রীক দর্শনের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলো। ইসলামের আদর্শিক ঝটিকায় একাধারে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম দর্শনের বুনিয়াদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। অপর দিকে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সর্বগ্রাসী গতি ও থেমে যায়। সাথে সাথে ইরানের শক্তি শালী সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রকৃতি পূজা ও অগ্নিপূজার ক্ষন ভংগুর দর্শন ধুলিস্মাত হয়ে যায়। যত দিন ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তি সুদৃঢ় থাকে, ইসলামের বলিষ্ট আবেদনের সামনে কোন দর্শনই মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তিকালে রাজনৈতিক উত্থান পতন এবং ইসলামী শিক্ষার চর্চা সীমিত হয়ে পড়ার ফলে তথা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে বিভিন্ন ধরনের বিভেদের বীজ অংকুরিত হবার ফলে পরাজিত গ্রীক দর্শন বিভিন্ন উপায়ে মুসলিম মানসে বিষাক্ত আঘাত হানার সুযোগ পায়।

- ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায়, আল্লাহ পাকের সিফাতের ব্যাখায়, কোরআনের রূপক বিষয় গুলোর মর্ম উদ্ধারে তথা অদৃশ্য বিষয়াদীর বস্তুতাত্বিক ব্যাখা দিতে গিয়ে নব্য মুসলিম মানসে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক চিন্তাধারা ধুম্রজাল সৃষ্টি করে। ফলে তারা ইসলামী আদর্শ, আকিদা - বিশ্বাসের সাথে ঐ সব দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত হন।
- আদর্শিক ভাবে পরাজিত ব্যক্তি ও গোষ্টিরা রাজনৈতিক ভাবে ইসলামকে পরাজিত করার কোন উপায় না দেখে দার্শনিক ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আকিদা বিশ্বাসে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে কিছু কিছু মুসলিম দার্শনিক ও পন্ডিতগন গ্রীক দর্শনের চাকচিক্যময় চিন্তাধারায় মনোনিবেশ করেন।
- সরকারী পৃষ্ট পোষকতায় গ্রীক দর্শনের গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় এবং গ্রীক দর্শনের পিতা বলে খ্যাত এ্যারিষ্টটলের দর্শন আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে মুসলিম যুবকদের হাতে হাতে পৌছে যায়। ফলে এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে দর্শনের আলোচনা ও গবেষনা আধুনিকতার ছাড় পত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।
- গ্রীক দর্শনের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় যেমন তর্কশাস্ত্র, প্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও এমন ধরনের বিষয়াদী যার আলোচনা ও গবেষনা ইসলামী

www.pathagar.com

আদর্শবাদের সাথে সংঘর্ষশীল ছিলো না বরং তার প্রয়োজনীয়তা ছিলো। কিন্তু গ্রীক দর্শনের অতি প্রকৃতিবাদ বা নির্ভেজাল জড়বাদ যার বিষয় বস্তু ছিলো ঈশ্বরবাদ, মুসলিম মানসকে বিষাক্ত করে তুলছিলো। মূলতঃ এই দর্শন প্রাচীন গ্রীসের প্রতিমাবাদের দার্শনিক রূপায়ন, যার কোন বাস্তবতা ছিলো না, শুধু চিন্তার বিলাসীতা চরিতার্থ করতো। বিশেষ করে একজন তাওহীদবাদী মুসলমানের আকিদা ও বিশ্বাসের জন্য এই সব অবাস্তব বল্গাহীন চিন্তা মনমগজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিলো।

- গ্রীক দর্শনের এই জড়বাদ বা (MATAPHYSICS) আজকের সকল দর্শন শাস্ত্রের মূল। যার মূল হলো বল্গাহীন স্বাধীন চিন্তা ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান। একদিকে স্বাধীন নিয়ন্ত্রনহীন চিন্তা, অপরদিকে বাস্তবে পরীক্ষিত জ্ঞান যখন সত্য সন্ধানের মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে মানুষের মনে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয় দোলা দিতে থাকে। এবং সন্তর্পর্ণে তার মন থেকে ঈমান বিদায় নিয়ে যায়। এভাবে ঈমানের আসল শক্তি হারিয়ে তারা বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে যায়।
- গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে একতত্ত্বাবাদে বিশ্বাস করতেন। তাদের দর্শনেও এর প্রতিফলন দেখা যেতো। কিন্তু দার্শনিক এ্যারিষ্টটল ছিলেন সম্পূর্ণ জড়বাদী এবং দূর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের মধ্যে এ্যারিষ্টটলের দর্শনই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আরবী ভাষায় অনুদীত হয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, এবং এ্যারিষ্টটলের ব্যক্তিত্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তার নাম সম্মান ও ভীতির সৃষ্টির করতো। তার কথা যেনো ঐশী বাণী, যার প্রতিবাদ অসম্ভব।
- গ্রীক দর্শন মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু যোগ্য লোকের সমর্থন পুষ্ট হতে সক্ষম হয়। তারা এ্যারিষ্টটলের দর্শনকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে ব্রতী হন। তাদের মধ্যে ইয়াকুব কিনদী (মৃত্যু- হিঃ ৪২৮) বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই সমস্ত আরব পন্ডিতেরা সমস্ত মুসলমানদের দৃষ্টিতে গ্রীক দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃত হন। তারা মুলতঃ এমন সব বিষয়ের প্রবক্তা ছিলেন যার সাথে মূল আদর্শের কোন সম্পর্ক ছিলো না। এই সব দার্শনিকগন আরব বিশ্বে এমন মর্য্যাদা পেতে সক্ষম হন যা স্বয়ং এ্যারিষ্টটল বা তার সাথীরা গ্রীসে কল্পনা ও করতে পারেননি। মুসলমান জনগণ এসব দর্শনের মূল ভাষা জানতেন না তারা সর্বতো ভাবে আরবী অনুবাদের উপর নির্ভর করতেন। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে অনুবাদ কখনো আসল হতে পারেনা। বিশেষ করে দার্শনিক বিষয় বস্তুর অনুবাদ সহজেই পাঠকের মনে ভ্রম সৃষ্টি করে। মূল তত্বই যদি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তবে শাখা প্রশাখায় সে ভ্রম ব্যাপকতর হয়। ফলে উপরোক্ত দার্শনিকগনই গ্রীক দর্শনের মেরুদন্ডে পরিণত হয়ে পড়েন। এই পটভুমিতে জড়বাদী দর্শন চর্চা মুসলমানদেরকে ইসলামের জ্ঞান থেকে সরিয়ে রাখে যা পরিনামে ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে দূর্বল করে দেয়।

www.pathagar.com

অজানা অদেখা বিষয় বস্তুর উপর স্বাধীন চিন্তার অবাধ আনাগোনায় মুসলিম মানসে নানা সন্দেহ দানা বেধে উঠে। এই সময় মুতাজেলী সম্পদায়ের লোকেরা এই দর্শন চিন্তাকে ধর্মের সাথে জড়িয়ে ফেলেন। তারা ধার্মিক দার্শনিক ছিলেন। দার্শনিক চিন্তাকে ধর্মতত্বের সাথে মিলিয়ে তাদের তবতর দৃষ্টিভঙ্গিকে ইমান ও কফুরির মানদন্ডে পরিনত করে ফেলেন। 'কোরআন সৃষ্ট' এর সমস্যাও এমনি এক সমস্যা। মোহাদ্দেসীনরা মনে করতেন যদি কোরআনকে মাখলুক বলে মেনে নেয়া হয়, তবে কোরআনের শব্দ ও অর্থের সমন্বিত আদি মৌলিক কিতাবের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেতো। পরবর্তি কালে কোরআনকে শাব্দিক ও আর্থিক পরিবর্তনের কেন্দ্রে পরিণত করা হতো। এই কারণে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল অকথ্য নির্যাতন বরদাশত করেছেন কিন্তু এই বাতিল মতবাদের সামনে মাথা নত করেননি। ইমামের বলিষ্ঠতা ও দূরদর্শীতার কাছে বাদশা মামুনের রাজকীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তাদের ধর্ম দর্শন ইতিহাসের পাতাতেই শুধু স্থান করতে সফল হয়েছে মাত্র।

- ইমাম আহম্মদের পর বিশিষ্ট পন্ডিত ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী দর্শন ও ইসলামী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। যদি ও তিনি মোতাজেলীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাদের দার্শনিক চিন্তাকে অস্বীকার করেননি, বরং যুক্তির মাধ্যামে ইসলামী চিন্তাধারাকে তাদের দার্শনিক চিন্তা ধারার সাথে মিলিয়ে ইসলামী দর্শনের বুনিয়াদ রেখেছেন। তার চিন্তাধারাকে সমঝোতার চিন্তাধারা বলাই অধিকতর শ্রেয়। এভাবে মোতাজেলীদের ধর্ম দর্শন বিদায় নিলে ও গ্রীক দর্শনের মারাত্মক বিষক্রিয়া উম্মতের ঐক্যকে ভেতর থেকেই নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছিলো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দর্শনের বিষক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

ইমাম আহমদের এই আত্মত্যাগকে ইসলামের ইতিহাসে ইসলামের স্বার্থে অতুলনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দিস আলী বিন আল মাদীনী বলেছেন;

ان الله اعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث ، ابو بكر الصديق يوم الرده و احمد بن حنبل يوم المحنة—

(আল্লাহ এই দ্বীনকে হেফাজত করেছেন দুইজন ব্যক্তির দ্বারা। ইসলাম থেকে বিদ্রোহীদের বিরূদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও খলকে কোরআনের ফিতনায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল।)

ইমাম আহমদের এই আত্মত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহপাক তার কালামে পাককে শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছেন।

www.pathagar.com

ইখওয়ানুছ সাফা আন্দোলন

চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে বাগদাদে 'ইখওয়ানুছ সাফা' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা আধুনিক ফ্রীম্যাশন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রীক দর্শনের পক্ষে কাজ করতে থাকে। তাদের এই মিশনারী কাজ অত্যন্ত নিয়ম শৃংখলা ও গোপনীয়তার সাথে আঞ্জাম দিতো। তাদের ঘোষনাপত্রে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এভাবে বলা হয়েছিলো;

"ইসলামী বিধান সমূহ মূর্খতা ও বিভ্রান্তিতে ভরে গেছে। তাকে কেবল দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমেই পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব। কেননা দর্শনই হলো সত্যকে উদ্ভাবনের সঠিক পথ। এর মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চিন্তার স্বাধীনতা সবই রয়েছে। তাই দর্শনের সংমিশ্রনেই শরীয়ত চলতে পারে ও লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।"

এই সংগঠন থেকে ৫২টি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। তার মধ্যে দর্শনের আলোকে ইসলামী আকিদার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তাতে তর্কশাস্ত্র, হিকমত, প্রকৃতি দর্শনের ছত্রছায়ায় ইসলামী চিন্তাধারার স্বরূপ তুলে ধরে। এই সংগঠন ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাদের কার্যক্রম প্রকাশ্যে ইসলামের স্বপক্ষে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দর্শনের সাহায্যে তারা ইসলামের আকিদা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামের মূল উৎস থেকে অনেক দুরে সরিয়ে নিয়ে যান। তারা শরীয়তকে স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতো, কোরআন হাদিসের প্রয়োজন সেখানে গৌণ।

বাতেনী মতবাদ

ইসলামের আদর্শবাদ ও দর্শন মূলতঃ বিপরিত ধর্মী দুই চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় তথা দর্শনের জয়গানে যখন আধুনিক মানস মুখরিত, তখন দর্শনের চাইতে ও মারাত্মক এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদি ও এই নতুন সমস্যা দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু দর্শনের ঘোলা পানিতেই এর আগমন ঘটে। যারা এই আন্দোলনের জনক তারা সবাই পরাজিত গোত্র ও দলের লোক, ইসলামের বিরূদ্ধে প্রতিশোধের মনোভাবই তাদেরকে এ পথে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামের আদর্শিক উৎস শব্দ ও অর্থের সমাহার এবং এর অকৃত্রিমতা সুদৃঢ় পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত, যাকে ইসলামে বলা হয় 'তাওয়াতোর' বা অবিচ্ছিন্ন সুত্রে গ্রথিত।

ইসলামের ইবাদাত বন্দেগী সহ অপরাপর পরিভাষাগুলো আল্লাহর নবীই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। এসব পরিভাষার অর্থ ও তিনিই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যা হাদিস রূপে সংরক্ষিত হয়েছে। তাই এসব পরিভাষার অর্থে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করার কোন উপায় নেই। যেমন, নবুয়ত, রেসালাত, ফিরিস্তা, বেহেশত, দোযখ, দ্বীন, শরীয়ত, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি পরিভাষা সমুহের যে অর্থ আমরা রাসুলে পাকের কাছ থেকে শিখেছি সেটাই এ সবের অর্থ। এ সবের মনগড়া কোন অর্থ ও ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআন হাদিসের অর্থ ও মর্ম রাসুলে

www.pathagar.com

পাক,সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে এযাম ও অপরাপর ইমাম, মোহাদ্দিস ও মোজতাহিদদের মাধ্যমে অটুট পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁচেছে। এর মধ্যে নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া বা মর্ম বের করার কোন অবকাশ নেই। এর বাহ্যিক অর্থে ও নিগুঢ় তত্ত্বে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু এই মতবাদের উদ্যোক্তরা এসব পরিভাষার প্রকাশ্য অর্থ ও গোপন অর্ন্তনিহিত অর্থের পার্থক্য খুঁজে পান। তাদের মতে এসব পরিভাষাগুলোর প্রতিষ্ঠিত অর্থ যা আমরা মূল উৎস থেকে ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় পেয়েছি, তা এসবের বাহ্যিক অর্থ মাত্র। পক্ষান্তরে তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত প্রদত্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবারই প্রয়াস পেতেন। তারা বলতেন, সাধারন মানুষ যারা এসব পরিভাষার বা শরীয়তের বাতেনী নিগুঢ় তত্ত্বের জ্ঞান রাখেনা, তারাই শরীয়তের বিধি বিধানের দায়িত্ব বা বোঝা বহন করবে, যারা শরীয়তের অন্তর্নিহিত বাতেনী বা নিগুঢ় তত্ত্বের জ্ঞান রাখে তারা এসব দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তারা অনিয়ন্ত্রিত বল্গাহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তারা তাদের এই বিভ্রান্ত মতের সমর্থনে কোরআনের এই আয়াতের মনগড়া অর্থ করতো। ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিজস্ব মনগড়া বিভিন্ন বাধ্য বাধকতা ও নিয়ম নীতির বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়ার অর্থে আল্লাহ এরসাদ করেছেন;

و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم – (الاعراف ١٥٧)

(আল্লাহর নবী) তাদেরকে (ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে) ঐ সব বোঝা থেকে মুক্তি দেবেন যার তলে তারা পিষ্ঠ হচ্ছিল, ঐ বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন যার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিলো।)

এই মতবাদের লোকরা এই আয়াতকে তাদের যুক্তির পেছনে উল্লেখ করতো। এভাবে তারা বাতেনী জ্ঞানের দোহাই দিয়ে শরীয়তের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। তারা যে ব্যাখ্যা দিতেন তার নমুনা নিম্নরূপঃ

"নবী এমন সত্বার নাম যার উপর পবিত্রাত্মার প্রস্রবন প্রবাহিত হয়, জিব্রাইল কারো নাম নয় বরং ঐ প্রস্রবনেরই নাম। পরকাল বা পুনরাবর্তনের অর্থ হলো সকল জিনিসের তার আসলের দিকে ফিরে যাওয়া। পবিত্রাত্মার অর্থ হলো গোপনীয়তার উম্মোচন। গোসলের অর্থ শপথের নবায়ন। জ্বিনার অর্থ হলো বাতেনী ইলমের নুতফা এমন এক সত্বার প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যারা শপথের মধ্যে শরীক নয়। পবিত্রতার অর্থ হলো বাতেনী মতবাদ ছাড়া অপরাপর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পর্কচ্ছিন্নতা। তায়াম্মুমের অর্থ হলো অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে জ্ঞানার্জন করা। নামাজের অর্থ হলো যুগের ইমামের প্রতি দাওয়াত। যাকাতের অর্থ হলো সামর্থবান ব্যক্তি। রোজার অর্থ হলো গোপনীয়তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা। হজ্বের অর্থ হলো ঐ ইলম অর্জন করা যা বুদ্ধির কিবলাহ ও লক্ষ্য। জান্নাতের অর্থ হলো বাতেনী ইলম। জাহান্নামের অর্থ হলো জাহেরী ইলম। কাবা নবীর সত্বা। কাবার দরজার অর্থ হলো হযরত আলীর সত্বা। নূহের তুফানের অর্থ হলো ইলমের তুফান, যার মধ্যে অনুসারীরা ডুবে যান। নমরুদের আগুনের অর্থ হলো রাগের আগুন-আসল আগুন নয়। হযরত ইব্রাহিমকে যে তার পুত্রকে জবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তার অর্থ হলো পুত্রের

www.pathagar.com

কাছে নতুন করে শপথ নেয়া। ইজাজ-মাজুজ বলতে বুঝায় জাহেরী ইলমের ধারা। হযরত মুসার লাঠির অর্থ হলো তার যুক্তি।"
(মোহাম্মদ হোসেন দেলমী: আলে মোহাম্মদ)

তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রচারণায় আহলে বায়েতের প্রতি ভালবাসার আশ্রয় নেয়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, দর্শন প্রীতি, যথেচ্ছাচারের মোহ, ইসলামী ইবাদত বন্দেগীর ভীতি তাদেরকে এ পথে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের মতে ইসলামী আদর্শের সত্যিকার ধারক ও বাহকগণই হলো ইসলামের আসল শত্রু, তাদের হত্যা করা অপরিহার্য্য। এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা গোপন সংগঠন গড়ে তুলে সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ইতিহাসের এই সময়ে কোন ব্যক্তিরই জান নিরাপদ ছিলো না। সকালে আবার ঘুম থেকে জাগতে পরবে এমন আশা কেউ করতে পারতো না। তাদের এই জঘন্য মতবাদের শিকারে পরিণত হয়ে কত লোক যে প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব দেয়া মুশকিল। যে সমস্ত মহান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা তাদের হাতে নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে নিজামুল মুলক তুসী ও ফখরুল মূলক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
(নিজামুল মুলক তুসী- ৫৬০)

দর্শনের চিন্তা ও চর্চা এই মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন, কিন্তু দর্শনের ভ্রান্ত প্রয়োগে যে চিন্তার অস্থিরতা সৃষ্টি হতো তাই এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য দায়ী।

এই মতবাদ ইতিহাসের পাতায় বিলিন হয়ে গেলেও মাঝে মাঝে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এই মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কাদিয়ানী ও বাহাই সম্প্রদায় সমুহ ও বাতেনী ফিরকার মতোই ইসলামের পরিভাষাগুলোর প্রতিষ্ঠিত অর্থকে বিকৃত করে ফেলে।

ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ইসলামী জ্ঞানের সত্যিকার উৎসকে অস্বীকার করলে ইসলামী আদর্শবাদের ইমারতে ফাটল ধরে যায়। কোন ইমাম বা মোজাদ্দিদের অবদান ইমরতকে চুড়ান্ত ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করে সত্যি কিন্তু ধারাবাহিক সংস্কার প্রয়াস ও মূল উৎসের সাথে সম্পর্কহীনতার ফলে বার বার এই হামলা হতে থাকে। বাতেনী মতবাদের প্রশ্নেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। দর্শনের চোরাগলিতে উম্মতের আকিদা-বিশ্বাস কলুষিত হয়েছে চরমভাবে। বিভিন্ন আলেমের অবদানে এই ফিতনা বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। বিশেষ করে ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু হিঃ ৬০৫) তার বিশাল ব্যক্তিত্ব ও তার ক্ষুরধার যুক্তি ও পন্ডিত্যের দ্বারা বাতেনী মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেন এবং উম্মতের সমস্ত উলেমা সহ সাধারন জনসাধারন এই মতবাদের বিষাক্ত অভিশাপ থেকে মুক্তি পান। অতঃপর ইসলামের তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের আকিদার পরিপন্থি গ্রীক দর্শনের লালন ও গবেষনার ব্যাপকতা হ্রাস পায় এবং আস্তে আস্তে ইসলামের আদর্শবাদ ঐ দর্শনের বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্তি পায়।

www.pathagar.com

কিন্তু আবারো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো ভিন্নভাবে বিশিষ্ট দার্শনিক ইবনে রুশদের আগমনে (মৃত্যু হিঃ ৫৯৫) দার্শনিক ইবনে রুশদ গ্রীক দর্শনের সম্প্রসারনে যে ভূমিকা রাখেন পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ তা অকোপটে স্বীকার করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে ইমাম গাজ্জালীর আগমনে গ্রীক দর্শনের ভিত্তি চুরমার হয়ে যায়, কিন্তু ইবনে রুশদের আগমনে গ্রীক দর্শন আবার একশ বছরের জন্য প্রাণ ফিরে পায়।

বাতেনী মতবাদের পতন হয়েছে সত্যি কিন্তু সেই মতবাদের ছায়া আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে এ যুগের বিভ্রান্ত মতবাদগুলোতে।

কাদীয়ানী ও বাহাই ফিরকাহ

পাকিস্তানের কাদীয়ানী ও ইরানের বাহাই ফিরকাদ্বয় বাতেনী মতবাদের মতই ইসলামের পরিভাষাগুলোর প্রতিষ্ঠিত অর্থ বিকৃত করে ফেলে।

কাদীয়ানী সম্প্রদায়, যাদেরকে পাকিস্তান ও সউদী আরব সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে অমুসলিম ঘোষনা করা হয়েছে। ইসলামের 'খতমে নবুয়ত' 'মসীহ' হযরত ঈসার অবতরন, 'মোযেযা' 'ইয়াযুয মাযুজ' এর ধারনাগুলোকে নিজেদের মর্জিমতো বদলিয়ে নেয়। শরীয়তে যেভাবে এসব ধারনা উপস্থাপন করা হয়েছে, তারা তাকে উপেক্ষা করেছে। এসব পরিভাষার যে অর্থ ও মর্ম রাসুল পাকের তরফ থেকে পাওয়া গেছে, অতঃপর তা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও বিভিন্ন ইমাম ও পন্ডিতদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁচেছে এবং বিগত ১৪০০ বছর ধরে ইসলামী উম্মাহ যে অর্থ গ্রহণ করে এসেছে এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইমাম ও মনিষীদের লিখনীতে যে অর্থ ও মর্মের ঐক্য রয়েছে, কাদীয়ানীরা তা একেবারে অস্বীকার করে বসে এবং তার পরিবর্তে নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং এক নতুন দ্বীন ও শরীয়ত সৃষ্টি করে। এভাবে তাদের জনক নবুয়তের দাবী করে বসেন। বাতেনী মতবাদের পদ্ধতিতে কাদীয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদের ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে। অসংখ্য মুসলমান তাদের ঈমান হারিয়ে কাদীয়ানী হয়ে যান। সরকারী পর্যায়ে প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টিতে তারা সাফল্য লাভ করে। ফলে কাদীয়ানীরা তাদের বিভ্রান্ত মতবাদ সম্প্রসারণে অনেক দূরে এগিয়ে যায়। খতমে নবুয়তের ধারণায় তারা সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টিতে অসংখ্য পুস্তিকা বের করে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী তার বইতে বাতেনী চিন্তাধারার অনুকরণে কোরআন ও হাদিসের মনগড়া অর্থ দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। উলেমারা এসব বইয়ের জবাবে অনেক বই-পুস্তক লিখেন তাতে এই মতবাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায় এবং সে সময়ের যুগস্রষ্টা আলেম ও চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী কাদীয়ানী সমস্যার উপর তার স্বভাব সিদ্ধ ক্ষুরধার যুক্তিতে যে বই লিখেন তাতেই আদর্শিকভাবে কাদীয়ানী মতবাদের সমাধী তৈরী হয়ে যায় এবং অল্পদিনের ব্যবধানেই তারা তাদের দার্শনিক ও রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং পরিণতিতে সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

ইরানের বাহাই সম্প্রদায় মূলতঃ শীয়া আদর্শে বিশ্বাসী হলে ও তারা শীয়াদের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি চরমপন্থী সম্প্রদায়। শীয়ারা ও তাদেরকে মুসলিম হিসাবে মানতে অস্বীকার করেছে। তাদের বাতেনী মতবাদ তাদেরকে ইসলামী আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাদের বিকৃত চিন্তাধারার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ;

"একমাস রোজা রাখা ফরজ তবে মাস হলো ১৯ দিনের। রোজার শুরু সূর্যোদয় থেকে। ১৯ বছর বয়স থেকে ৪২ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ শরীয়ত মানতে বাধ্য, অতঃপর তারা স্বাধীন। উজু ফরজ নয় বরং মোস্তাহাব। নারীর দর্শন অবৈধ নয়, পর্দার কোন প্রয়োজন নেই। যে ঘরে তাদের ধর্মের জনক জন্মগ্রহণ করেছে সে ঘরের জিয়ারত ফরজ। ঈমান কবুল করার পর কোন কিছুতেই মানুষ অপবিত্র হয় না। সে যাই স্পর্শ করে পবিত্র হয়ে যায়।"

বাহাই ও কাদীয়ানী মূলতঃ একই ধরণের ভ্রান্ত মতবাদ। বাতেনী মতবাদের প্রেতাত্মা তাদেরকে নতুন দ্বীন ও শরীয়ত বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের তৎপরতা সীমিত পর্যায়ে চালু থাকলেও তারা ইসলামী উম্মতের বহির্ভূত সম্প্রদায় মাত্র।

- মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসে মাঝে মাঝেই এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎ মেলে যারা বাতেনী মতবাদের পথ ধরে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও ধারণার বিরুদ্ধে তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা চালু করার চেষ্ট করেছে। কোথাও এমনি ধরণের ধৃষ্টতাকে তারা স্বাধীন চিন্তার পান্ডিত্য বলে দাবী করেছে আবার কোথাও বা বাতেনী ইলম বলে দাবী করেছে। আমাদের যুগের কিছু বিভ্রান্ত চিন্তার লোক নবীর মোযেযাকে অস্বীকার করে কোরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এসবই বাতেনী চিন্তার ফসল।
- শরীয়তের বন্ধন থেকে যারাই মুক্তি পেতে চেয়েছে তারা ইলমে জাহের ও বাতেনের পার্থক্যের আশ্রয় নিয়েছে। মারেফত ও তরিকতের নামাবলীধারী একদল স্বার্থপর, মূর্খ ব্যক্তিরা কোরআনে মজিদের আয়াতের প্রতিষ্ঠিত ও সঠিক ব্যাখ্যা থেকে সরে গিয়ে মনগড়া অর্থ ও মর্ম বের করার প্রয়াস পায়। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين – الحجر) (তোমার মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তোমার রবের বন্দেগী কর) এই আয়াতের মধ্যে (اليقين - ইয়াকীন) শব্দের অর্থ ভাষাতত্বের দিক থেকে হোক বা মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের দিক দিয়েই হোক, সর্বকালে প্রতিষ্ঠিত অর্থ হলো 'মৃত্যু'। কেননা আখেরাতের জীবন সম্পর্কে মৃত্যুই একীন বা প্রত্যয় সৃষ্টি করে। আয়াতে মানুষদেরকে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত আল্লাহর বন্দেগী করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত নফসপোরস্ত লোকগুলো এই প্রতিষ্ঠিত অর্থকে এড়িয়ে গিয়ে মনগড়া অর্থ করেছে এভাবে, "ইলমে একীন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত রবের বন্দেগী করো।" অর্থাৎ তাদের মতে ইলমে একীন (বাতেনী ইলম) সৃষ্টি হয়ে গেলেই শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

এভাবে তারা জাহেরী, বাতেনী ইলমের দোহাই দিয়ে বনী আদমকে বিভ্রান্ত করেছে নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে।

বাতেনী চিন্তাধারার বিষক্রিয়া থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো ইসলামী ইলমের মূল উৎসের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, কোরআন-হাদিসের সত্যিকার জ্ঞানের সম্প্রসারন করা। কিন্তু সরকারী পৃষ্টপোষকতায় কেরাআনে মজিদ ও হাদিসের গবেষনা ও সম্প্রসারনের পরিবর্তে দর্শন শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, কবিতা, জ্যোতিসবিদ্যা ও ধর্মতত্ব সহ তাত্বিক ষিয়গুলোর বল্গাহীন ব্যবহার মুসলিম মানসকে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলো।তাই এই সব আধুনিক ও তাত্বিক বিষয়গুলোর মূল্যবোধ ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে যাচ্ছি, যা পরবর্তী আলোচনার জন্যে ফল প্রসু হবে।

দশর্ন শাস্ত্র ও পৌত্তলিকতা

গ্রীক দর্শন হলো এই সকল শাস্ত্রের বুনিয়াদ। গ্রীক দর্শনের স্রষ্টা সম্পর্কিত মতবাদের বুনিয়াদ হলো তাদের প্রাচীন দেবদেবীর ধরনা। গ্রীসের প্রাচীন দার্শনিকগণ সবাই পৌত্তলিক ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তাদের পৌত্তলিক ধারণাকে জড়বাদী দর্শনে রূপান্তরিত করা হয় তখন তারা তাদের এই ধারণাকে দর্শনের পরিভাষা দিয়ে আধুনিক দর্শন হিসেবে তুলে ধরেন। গ্রীক দর্শনে বিশ্ব জগতের স্রষ্টার যে রূপ তুলে ধরা হয়েছে তাতে তিনি হলেন নিষ্ক্রিয়, তার কোন ক্ষমতা নেই। তারা তাকে নিতান্ত অক্ষম স্বত্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। তার কোন সক্রিয় ইচ্ছা ছাড়া তার তরফ থেকে বুদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে। যাকে তাদের দর্শনে মূল উৎস (FIRST ORIGINE) বলে অভিহিত করা হয়েছে। যাকে পৌত্তলিক ধারনায় ঈশ্বর বলা হয়েছে। তার অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি বুদ্ধি হলো স্বয়ং সম্পন্ন, ক্রীয়াশীল ও শক্তির কেন্দ্র। যাকে তাদের দর্শনের পরিভাষায় (FIRST INTELLECT) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বুদ্ধি বা (INTELLECT) এর কল্যাণে বিভিন্ন প্রভাবশালী গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রভাবশালী গ্রহের সংখ্যা হলো নয়টি। সর্বশেষ গ্রহ (MOON) যাকে তাদের ক্রমিক ধারায় (TENTH INTELLECT) হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, তাকে তারা (ACTIVE INTELLECT) বা স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি বলে ঘোষনা করেছে। এই স্বাধীন চিন্তা বা মুক্তবুদ্ধি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, যা বিভিন্ন প্রভাবশালী গ্রহের প্রভাব স্বীকার করে বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করে। এই রূপান্তরের মাধ্যমেই খনিজ সম্পদ, গাছপালা, তরুলতা ও জীবন সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন গ্রহের অসংখ্য প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঐ মুক্তবুদ্ধিই এই দর্শনে স্রষ্টা সহ সকল বিষয়ে ধারনা লাভ করার একমাত্র বাহন। এই দর্শনে মুক্তবুদ্ধির মহাশক্তি বা চিন্তার মহিমা প্রকাশ পেয়েছে সত্যি কিন্তু স্রষ্টা ঈশ্বরকে অক্ষম ও পঙ্গু করে দেখানো হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত পৌত্তলিক মতবাদে এই ধারনার প্রভাব দেখা যায়। ঈশ্বর বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টি করে অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন। তার সমস্ত ক্ষমতা অসংখ্য দেবদেবীর হাতে তুলে দিয়েছেন। সমস্ত ভাল কাজের দায়িত্ব একজন দেবীর হাতে ও মন্দ কাজের দায়িত্ব অন্য একজন

www.pathagar.com

দেবতার হাতে অর্পিত হয়েছে। এসব ধারনা মূলতঃ গ্রীক দর্শনের মূল দেবদেবীর ধারনা থেকে উৎসারিত হয়েছে।

গ্রীক দর্শনের সুত্রটি নিচের বিন্যাস থেকে এক নজরে দেখা যেতে পারে।

FIRST ORIGINE (মূল উৎস) ঈশ্বর

↓

FIRST INTELLECT (MIND, চিন্তা বা বুদ্ধি)

↓

ক্রমানুসারে নয়টি INTELLECT বা বুদ্ধি, যা নয়টি প্রভাবশালী গ্রহ, যথা:-

SECOND INTELLECT	NINTH SKY	দ্বিতীয় বুদ্ধি
THIRD INTELLECT	STAR PLANET, তারকারাজী	তৃতীয় বুদ্ধি
FOURTH INTELLECT	SATURN, শনিগ্রহ	চতুর্থ বুদ্ধি
FIFTH INTELLECT	JUPITAR, বৃহস্পতি গ্রহ	পঞ্চম বুদ্ধি
SIXTH INTELLECT	MARS, মঙ্গল গ্রহ	ষষ্ট বুদ্ধি
SEVENTH INTELLECT	SUN, রবি গ্রহ	সপ্তম বুদ্ধি
EIGTH INTELLECT	VENUS, শুক্র গ্রহ	অষ্টম বুদ্ধি
NINETH INTELLECT	MERCURY, বুধ গ্রহ	নবম বুদ্ধি
TENTH INTELLECT	MOON, সোম গ্রহ	মুক্ত বুদ্ধি

এই শেষোক্ত দশম বুদ্ধি বা সোমগ্রহকে তারা সর্বশক্তিমান 'মুক্তবুদ্ধি' বলে ঘোষণা করেছেন। গ্রীক দর্শনের এই মতবাদ কিভাবে ইসলামী আদর্শবাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিশ্বাসে সহায়ক হতে পারে? এই ধরনের চিন্তার ধারকদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক এরসাদ করেছেন;

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون الاّ كذبا – (الكهف)

(তাদের মুখ থেকে অনেক বড় কথা বের হচ্ছে, যা সর্বের মিথ্যা)

ভাবতে আশ্চর্য লাগে মুসলমানদের মধ্যে পন্ডিত বলে খ্যাত ব্যক্তিরা কিভাবে এই দর্শনকে চরম সত্য বলে গ্রহণ করে এর জনককে অবতারের স্থানে সমাসীন করেছিলেন।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক (IMMANUEL KANT) (মৃত্যু ১৮০৪ খৃঃ) এই মুক্তবুদ্ধির উপর তার গ্রন্থ (CRITIQUE OF PURE REASON) লিখে মুক্তবুদ্ধির দর্শনের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব দান করেন। আজকের মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন এই দার্শনিকেরই চিন্তার ফসল, যা আলোচিত গ্রীক দর্শনেরই আধুনিক সংস্করণ। এখানে উল্লেখ করা অপরিহার্য্য যে গ্রীক দর্শনের ব্যবহারিক দিকগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই বা ইসলামী আদর্শবাদের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। বরং ইসলাম বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে উৎসাহ প্রদান করে। আমাদের সমালোচনার বিষয় হলো গ্রীক দর্শন বা আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জড়বাদ বা (MATAPHYSICS)। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে মুসলিম পন্ডিতগণ দর্শনের ব্যবহারিক দিকগুলোর প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেননি বরং জড়বাদী দিকগুলোকেই তাদের গবেষণার মূল বিষয়ে পরিণত করেন। ফলে ঐসব পন্ডিতদের গবেষনার ফলশ্রুতি স্বরূপ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপর যে অবদান পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সীমিত এবং তাও মিল্লাতের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়নি জড়বাদী দর্শনের ব্যাপকতর চর্চায়।

জ্যোতিষবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা

জ্যোতিষবাদের মূল বক্তব্য হলো, মানুষের ভাল-মন্দ, রোগ-ব্যাধি, সুখ-শান্তি, সাফল্য-ব্যর্থতার উপর বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব রয়েছে। যেহেতু সৌর জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রভাবে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত, তাই ঐসব শক্তির কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়। সৌর জগতের বিশাল সৃষ্টির কাছে মানুষ নিতান্তই দুর্বলতম জীব তাই তাদের ভাগ্যের উপর ঐসব সৃষ্টির প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

জ্যোতিষবিদ্যাও প্রাচীন গ্রীসের প্রতিমাবাদ থেকে রূপান্তরিত জড়বাদী দর্শন থেকেই উৎসারিত হয়েছে। গ্রহ উপগ্রহের ক্ষমতাশীল হওয়ার মতবাদের প্রভাব সমকালীন বিভিন্ন পৌত্তলিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর পরিলক্ষিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র গ্রহদের প্রভাবের সাথেই জড়িত নয়, বরং যে কোন বিশাল ও শক্তিধর সৃষ্টির প্রশ্নেই মানুষের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের বুনিয়াদই গড়ে উঠেছে এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর। পারসিকদের অগ্নিপূজা ও প্রকৃতি পূজার উৎসও সেখানেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিশাল সৃষ্টি জগতের অগণিত শক্তিধর সৃষ্টির সামনে মানুষের অসহায়ত্বই ফুটে উঠেছে এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্ববিরোধিতারও কোন অন্ত নেই। একদিকে তারা দাবী করছেন মানুষের বুদ্ধি হলো মহাশক্তিধর বা সৃষ্টির মূল শক্তি। পক্ষান্তরে তারাই আবার বলছেন, বিশাল এই সৃষ্টির কাছে মানুষ নিতান্তই অসহায়। বিভিন্ন শক্তির পূজা এই অসহায়ত্বেরই বহির্প্রকাশ, তাই মানুষ অসংখ্য অবতার মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং এসব অবতারদের লিষ্ট দীর্ঘ থেকে

www.pathagar.com

দীর্ঘতর হতে থাকে। এই অসহায়ত্বের ইতিটানার জন্যেই ইসলাম এসেছে। আল-কোরআন ডাক দিয়েছে;

أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار – ما تعبدون من دونه الاّ اسماء سميتموها انتم و ابـــاءكم ما انزل الله بها من سلطان – (يوسف)

(বিভিন্ন (অসংখ্য) প্রভূদের আনুগত্য শ্রেয় না একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর? তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তারা (কোন বাস্তব প্রতিভূ নয়, বরং) নিছক নামমাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ নির্ধারণ করেছো, (সে সম্পর্কে) আল্লাহ পাক কোন ক্ষমতা অবতরণ করেননি।)

জ্যোতিষবিদ্যা মুসলিম সমাজে গ্রীক দর্শনের সাথে সাথে সন্তর্পণে প্রভাব বিস্তারে সাফল্য লাভ করে। পরবর্তীকালে জ্যোতিষবিদ্যা সাম্রাজ্যের উত্থান পতনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক রাজা-বাদশা ও তাঁদের আমীর উমারা সহ সকল প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আপন আপন জ্যোতিষী ছিলো, তারা এই সব ব্যক্তিদের ভবিষ্যত গণনা করতো। নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কানী দিতো। অধিকাংশ রাজনৈতিক ঝগড়া বিবাদের পশ্চাতে গণকদের হাত থাকতো।

জ্যোতিষবিদ্যা গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং একটি আধুনিক দর্শনের রূপ নিতে প্রয়াস পায়। তারা মানুষের ভাগ্য গণনা নিমিত্তে ১২ মাসে ১২ টি রাশি নির্ণয় করেছে, যা ক্রমিক অনুসারে নিম্নরূপ:

PISCES XII	মীনরাশি	Feb19 – Mar 20	حوت
AQUARIUS XI	কুম্ভরাশি	Jan 20 – Feb 19	دلو
CAPRICORN X	মকররাশি	Dec 20 – Jan 20	جدى
SAGTARIUS IX	ধনুরাশি	Nov 22 – Dec 21	قوس
SCORPIO VIII	বৃশ্চিকরাশি	Oct 23 – Nov 22	عقرب
LIBRA VII	তুলারাশি	Sept 23 – Oct 23	ميزان
VIRGO VI	কন্যারাশি	Aug 23 – Sep 23	سنبلة
LEO V	সিংহরাশি	July 22 – Aug 23	أسد
CANCER IV	কর্কটরাশি	Jun 21 – Jul 22	سرطان
GEMINI III	মিথুনরাশি	May 21 – Jun 21	جوزا
TAURAS II	বৃষরাশি	Apr 20 – May 21	ثور
ARIES I	মেষরাশি	Mar 20 – Apr 20	حمل

www.pathagar.com

এসব শব্দগুলোর সাথেও পৌত্তলিকতার ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এর মূল দর্শন ইসলামী আদর্শবাদের সাথে দূরতম সম্পর্কও রাখে না। বিভিন্ন মানুষের জন্মদিন নিয়ে ঐ সমস্ত রাশির সঙ্গে মিলিয়ে তাদের ভাগ্য গণনা করা হয়। আজও জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা ও প্রয়োগও কম নয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকায় নিয়মিত মানুষের ভাগ্যের ভালমন্দের খবর ছাপা হচ্ছে। অসংখ্য মানুষ এগুলো পড়ছেন ও প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। একজন অমুসলিমের জন্য এটা কোন অস্বাভাবিক কাজ নয়, কিন্তু কোন মুসলমানের জন্য এটা কোন মতেই বৈধ নয়। নিজে গণক হওয়া বা অন্য গণকের কাছ যাওয়া উভয়ই ঈমান বিরোধী। জ্যোতিষবিদ্যা মূলতঃ যাদুর একটা অংশ। সর্বপ্রকার যাদুকে ইসলামে অবৈধ করা হয়েছে। যাদুকে হাদিসে মারাত্মক ধরনের কবিরাহ গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আইনে যাদুগরের শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক এই প্রশ্নে এক মত। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে;

من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد – (رواه أحمد)

(যে ব্যক্তি জোতিষবিদ্যা থেকে কিছু গ্রহণ করলো, সে ব্যক্তি যাদুবিদ্যার কিছু অংশ গ্রহণ করলো। যত বেশী অর্জন করবে ততো বেশী যাদু অর্জিত হবে।)

আল্লাহর নবী কঠোরভাবে জোতিষীদের দ্বারা ভাগ্য গণনার সমালোচনা করেছেন। আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন;

من أتى عرافا ، فساله عن شئى لم تقبل صلاته أربعين يوما – (رواه مسلم)

(যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, তার ৪০ দিনের নামাজ কবুল করা হবে না।)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে;

من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بمانزل على محمد – (رواه أحمد)

(যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং গণকের কথায় বিশ্বাস করে, সে (নবী) মোহাম্মদের উপর অবতীর্ণ দ্বীনকেই অস্বীকার করে।)

এমনি ধরণের অনেক হাদিস দিয়ে হাদিসের কিতাব সমূহ ভরে আছে। এতো কঠোর ও সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও এই মানসিকতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসলে ঈমানী শক্তি যখন হ্রাস পেতে থাকে, মিল্লাতের মধ্যে এই সব রোগ সংক্রামক আকারে বেড়ে যায়।

- আল্লাহপাক চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারাজী, গ্রহ, উপগ্রহ, আসমান, যমিন সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহরই বিধান মতো নির্ধারিত কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। এসব বিশাল সৃষ্টির নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা প্রভাব নেই। এসব সৃষ্টি তার সেরা সৃষ্টি মানুষেরই কল্যাণে নিয়োজিত। কোরআনে মাজিদে একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন উপায়ে। নিচের উদাহরণগুলো প্রনিধানযোগ্য;

www.pathagar.com

و من اياته الليل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس و لاللقمر و اسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون - (فصلت)

(দিন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য আল্লাহরই নিদর্শনাবলীর মধ্যে (তাই, তোমরা চন্দ্র সূর্য্যকে সিজদা করোনা, বরং আল্লাহকেই সিজদা করো যিনি এসব সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাকেই বন্দেগী করো।)

و الشمس والقمر و النجوم مسخرات بأمره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين – (الاعراف)

(চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্ররাজী আল্লাহর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত, তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন এবং তারই নির্দেশে পরিচালিত। আল্লাহ বিশ্বব্রহ্মান্ডের রব পবিত্রাত্মা।)

هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب – (يونس)

(তিনি সূর্য্য সৃষ্টি করেছেন আলোর (রোদ্রের) জন্য আর চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন রশ্মির জন্যে এবং তাদের কক্ষপথ নির্ধারিত করেছেন যেনো তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো।)

و علامات و بالنجم هم يهتدون - (النحل)

(এগুলো হলো) নিদর্শনাবলী এবং তারকারাজীর সাহায্যে তোমরা দিক নির্দেশ করো।)

لتهتدوابها فى ظلمات البر و البحر - (الانعام)

(যেনো তোমরা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথের দিশা পাও।)

এসব বিশাল সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য এসব আয়াতে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, সবকিছুর নিয়ন্তা। তিনিই সব রহস্যের জ্ঞান রাখেন, মানুষের জীবন মৃত্যু, ভালমন্দের তিনিই একমাত্র মালিক। মানুষের ভালমন্দ, সাফল্য ও ব্যর্থতার পেছনে এসব সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রভাব রেখে দেননি। তিনি এই দর্শনের ঈশ্বরের মতো অচল ও ক্ষমতাহীন নন, কিংবা তিনি কাউকে তার প্রতিভূ বানাননি। ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই হাতে। কোন মুসলমান তার ভাগ্য গণনায় জ্যোতিষীর স্বরণাপন্ন হতে পারে না।

ক্যালেন্ডারের তারিখ নির্ধারণ বা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা কোন অবৈধ আমল নয়।

কোরআনের আয়াতে আল্লাহপাক মানুষের রোগ ব্যাধির চিকিৎসা রেখেছেন। আল্লাহর নবী আমাদেরকে বিস্তারিত বিধি বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। ক্ষতিকর যাদু বা অবাধ্য জিন্নাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে কোরআনের আয়াতের সাহায্যে আমল করার ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। আল্লাহর নবীর উপর ও অবৈধ যাদুর আসর হয়েছিলো। আল্লাহপাক সুরা

www.pathagar.com

ফালাক ও সুরায়ে নাসের আমলের মাধ্যমে তাকে যাদুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার নিয়ম শিখিয়েছিলেন। কোরআনের আয়াতের তাবিজ বা ঝাড়ফুককে বৈধ আমল বলা হয়েছে। তবে তাবিজের ব্যবসা অবশ্য ঘৃণিত কাজ।

রুহ হাজির করার আমল বা জিন্নাত হাজির করে তাদের সাহায্য চাওয়া অবৈধ আমলেরই অংশ। ধোকাবাজ লোকেরা ইসলামের আড়ালে শয়তানের সাহায্যে তাদের অনৈসলামী, অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে আপামর জনসাধারনকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এটা যাদুরই অংশ মাত্র। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য চাইতে পারে না।

কবিতা কাব্যের সাধনা

ভাষার ইতিহাসের সাথে সাথে কবিতার ইতিহাস ও সংযুক্ত। কবির শক্তিশালী কবিতা অনেক ক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রেখেছে, আবার বহুক্ষেত্রে মানুষকে সীমাহীন বিভ্রান্তির অতল গহবরে ফেলে দিয়েছে। কবিতার এই শক্তিকে রাসুলেপাক স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে;

ان من الشعر لحكمة *(কিছু কিছু কবিতা যুক্তিপূর্ণ হয়ে থাকে)*

কল্যাণধর্মী কবিতার প্রশংসার সাথে সাথে তিনি অনিষ্টকর কবিতার সমালোচনায় বলেছেন;

لان يمتلى جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلى شعرا

(কারো পেট পূজ রক্তে ভরে যাওয়া এর চাইতে শ্রেয় যে তার পেট কবিতার দ্বারা ভরে যায়।)

কবিতার এই শক্তিধর দিকটির কারণেই আরবের কাফিরগণ রাসুলেপাক (সাঃ) কে কবি বলে চিত্রিত করতো। কিন্তু স্বাধীনভাবে কবিতার জ্ঞান কখনও হিদায়াতের উৎস হতে পারে না। হিদায়াত বা মানবতার কল্যান আল্লাহর ওহী বা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাস ও আমলের মাধ্যমেই সম্ভব। যদি কবি ওহীর জ্ঞানে বিশ্বাসী না হন, তার কবিতা ঐশী জ্ঞানের প্রতিফলন না ঘটায় তবে সে কবিতা মানবতার কল্যানে আসতে পারেনা। অর্থাৎ ঐশী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিমার্জিত কবিতা মানুষের কল্যাণে শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে, তেমনি বলগাহীন স্বাধীন চিন্তার কবিতা বিভ্রান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। কবি যে চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাই তার কবিতায় প্রকাশ পাবে। তাই মুক্তবুদ্ধির কবিতা বলতে চরিত্রহীন বিভ্রান্তি মূলক প্রচারণা বুঝায়। ইসলামের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে আরবী কাব্য উৎকর্ষের উন্নত মানে পৌঁছে ছিলো এবং ঐ শক্তিশালী হাতিয়ার ব্যক্তি-গোষ্ঠীর বড়াই, কারো প্রশংসা ও নিন্দার বাড়াবাড়ি, গালাগালি, হিংসা বিদ্বেষ, পৌত্তলিকতার গুণকীর্তন, সৌন্দর্য চর্চায় চরিত্রহীনতার ও অশ্লীলতার ব্যাপকতায় ব্যবহৃত হতো, যা সুস্থ মানবতার জন্য ঘাতক বিষ স্বরূপ। এ কথা শুধু আরবদের বেলাতেই নয়। আদর্শহীন সমাজের সমস্তই কাব্যই এর প্রমাণ বহন করে। ঐ সব কাব্যে তাদের লোকাচার, প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে।

www.pathagar.com

আবার কোথাও সৌন্দর্য চর্চার নামে নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও অবাধ যৌন বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তথাকথিত স্বাধীন চিন্তা যাকে সৌন্দর্যের সাধনা বলে অভিহিত করে থাকে। কোন কবিতাই আদর্শ নিরপেক্ষ বা সার্বজনীন নয়। কবিতার ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। কোন কোন প্রচার ধর্মী আদর্শহীন কবিতা তার পাঠককে আদর্শহীনতার পথে সাহসী করে তুলে, আবার কোন কোন কবিতা মানুষকে আদর্শবাদ সম্পর্কে নিস্পৃহ বা ধর্মনিরপেক্ষ করে তুলে, পরিণতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার অবধারিত প্রভাবে তাকে আদর্শবাদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাকে যারা সার্বজনীন বলে এর সাধনা করেন তাদের আদর্শিক পরিণতি একথার সত্যতা প্রমাণ করে। আধুনিক কবিতা বলে খ্যাত কবিতা মানুষকে তথাকথিক মুক্তবুদ্ধির সক্রিয় সমর্থক করে তুলে। মর্মীবাদ বা বিভ্রান্ত সুফীতত্বের কবিতা মানুষকে ধর্মকর্ম থেকে দুরে সরিয়ে দেয়। লালন শাহ, হাসান রাজা প্রমুখ কবি এ পথের দিশারী। বিভিন্ন মাজারে ও পীরের আস্তানায় এ ধরনের কবিতার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। কবিতার কথাকে যখন ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তখন তার প্রভাব দ্রুত সংক্রমিত হয়। অন্যথায় আস্তে আস্তে পাঠকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কবিতাকে শুধু সাহিত্যের বাহন হিসেবে অধ্যায়ন করলে এই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন পাঠকের মন ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে পরিতৃপ্ত থাকে। উম্মুক্ত মনকে বিষাক্ত করতে ত্বরিত ভূমিকা পালন করে। উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষার অধিকাংশ কবি, বিশেষ করে বাংলা ভাষার সংখ্যাগরিষ্ট কবিরা আদর্শবাদ সম্পর্কে মোটেই সজাগ নন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শিক প্রভাব তাদের উপর সুস্পষ্ঠ। কবিতার এই সাধারন ভূমিকার কথা সামনে রেখেই আল্লাহর রাসুল কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইসলাম জ্ঞানের সমস্ত শাখা প্রশাখা তথা সভ্যতা, কৃষ্ঠি ও সংস্কৃতির সমস্ত বাহনকে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত করার জন্য মূলনীতি পেশ করেছে, মূলনীতির সঠিক জ্ঞান ছাড়া এ সব উপকরন ও বাহন কল্যাণ কর হতে পারে না,

কোরআনে মজিদে কবিতার সত্যিকার অবস্থানকে চিত্রিত করা হয়েছে এ ভাবে;

و الشعراء يتبعهم الغاؤن الم تراهم فى كل واد يهيمون – و انهم يقولون مالا يفعلون ، الاّ الذين امنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا و انتصروا من بعدما ظلموا و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون – (الشعرأ)

(সাধারনত) কবিদের অনুসরন করে বিভ্রান্ত লোকেরা, তোমরা কি দেখনা যে তারা প্রতি উপত্যাকাতেই বিচরণ করে এবং তারা যা বলে তা করেনা। একমাত্র তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, আল্লাহকে বেশী করে স্বরন করেছে এবং নিপীড়িত হবার পর শুধু প্রতিশোধ নিয়েছে (সীমালংঘন করেনা) নিপীড়ন কারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের প্রতিফল কি হবে?

www.pathagar.com

এই আয়াতে আদর্শহীন গতানুগতিক কবিদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সাথে সাথে ব্যতিক্রমধর্মী কল্যাণকর কবিদের গুণাবলী বা পরিচয় ও তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারন গতানুগতিক কবিদের মধ্যে যারা এসব ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী হবে, তারা কল্যাণধর্মী বলে বিবেচিত হবে।

আদর্শহীন কবিদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ ভাবে,

১. বিভ্রান্ত লোকই তাদের অনুগত হবে, আদর্শবাদী লোক তাদের অনুসারী হবেনা, অর্থাৎ তাদের কবিতা শুধু বিভ্রান্ত লোকদের জন্যেই আবেদন রাখবে মাত্র।

২. তারা হলো ভোল পালটানো ব্যক্তিত্ব , ক্ষনিকে তাদের এক রূপ আবার ক্ষনিকেই তার উল্টো। অর্থাৎ তারা কোন কল্যাণ ধর্মী আদর্শের নয়, বরং তাদের মনোবৃত্তিরই দাস বা স্বার্থের পূজারী।

৩. কবিতার মাধ্যমে যে সব ভাল কথা বা কল্যাণধর্মী চিন্তাধারার কথা বলে তাদের বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়ন করেনা, অর্থাৎ কথা ও কর্মে বৈপরিত্য তাদের চরিত্রের বিশেষ দিক। কবিতার মাধ্যমে হয়তো নিপীড়িত জনগণের জন্য মমতার প্রকাশ করলো, কিংবা কবিতার মাধ্যমে মানবতার জয়গান গাইলো কি তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তার কোন প্রতিফলন দেখা যায়না।

৪. তারা সীমালংঘন কারী বা চরমপন্থী, কারো প্রসংসায় বা নিন্দায় সমস্ত সীমা লংঘন করে। তাদের মনোবৃত্তির দাসত্বেই বা ব্যক্তি সার্থের নিমিত্তেই কারো প্রসংসা বা নিন্দা করে, সত্যকে সত্য বলার বা মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সৎসাহস নেই বা সততার অভাব। জালেমের জুলুমের বিরোধিতায় বা ন্যায়ের পক্ষ নিতে গিয়ে চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। ইনসাফ বা ন্যায়ের ধারনা তাদের কবিতায় অনুপুস্থিত।

- পক্ষান্তরে কোরআনের এই আয়াতে মুসলমানদের তথা মানবতার কল্যানে নিয়োজিত কবিদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে নিম্নরূপ:

১. তারা অহীর জ্ঞ্যান অনুযায়ী তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখবে, অর্থাৎ তারা হবেন ঈমানদার ব্যক্তি, ঈমান হবে তাদের মূলশক্তি।

২. ঈমানের সাথে সাথে তারা ভাল কাজ ও করবে। অর্থাৎ তারা ঈমানে ও আমলের শক্তিতে বলীয়ান হবে। ঈমান ও আমল হলো সমস্ত কল্যান ধর্মী কাজের পূর্ব শর্ত।

www.pathagar.com

৩. তারা সদা আল্লাহর স্মরনে নিমগ্ন থাকবে। এমন কোন কাজ করবেনা যা খোদার স্মরনের পরিপন্থি । খোদা ভীতির ভিত্তি ছাড়া কোন ব্যক্তির কর্ম নির্ভরযোগ্য হতে পারেনা।

৪. তারা প্রতিশোধ প্রবণ নয়। বরং তারা ইনসাফ প্রিয় চরিত্রের অধিকারী। কবিতার বৈধ ও অবৈধ সীমারেখার উপরোক্ত কোরআনী বিধানের আলোকে ইসলামী ইতিহাসের অতীত-বর্তমান কবিদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে হতাশ হতে হয়। রাজা বাদশাহদের দরবারের দরবারী কবিরা নিজেদের আত্নসম্মান বিক্রি করে পার্থিব সম্পদের লিপ্সায় সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলে তুলে ধরে যোগ্যতার প্রমাণ দিতেন। এ ধরণের কবিদের বাড়াবাড়িতেই অনেক রাজা বাদশাহ তাদের অন্যায় অবিচার তথা ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারায় টিকে থাকার অনুপ্রেরণা পেতেন। বাদশাহ আকবরের দ্বীনে ইলাহীর পশ্চাতে এই শ্রেণীর কবিদের ভূমিকা অনেক বেশী। বিশেষ করে গ্রীক দর্শনের গোলক ধাঁধায় যতো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে কবিদের কর্ম অনেকাংশে দায়ী। নিয়ন্ত্রণহীন চরিত্রই এমন যা অন্যায়ের পক্ষে ভূমিকা পালন করে । পাশ্চাত্যের অনুকরণে বা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে যে সব কবিতা লিখা হয় তা মুসলিম উম্মাহর কোন উপকারে আসেনা। এই শ্রেণীর অসংখ্য কবিদের মধ্যে আবার কিছু কিছু এমন কবিদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাদের শক্তিশালী কবিতায় ইসলামী রেঁনেসার পথ খুলে দিয়েছে তাদের মধ্যে মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী ও আল্লামা ইকবালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি নজরুল ইসলামের অধিকাংশ গজল, ফররুখ আহমদের কবিতা সমুহ পাঠকের মনে ইসলামের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে কবি কোন অনুসরণীয় আদর্শ নন, ভাল কবিতার সুফল ও মন্দ কবিতার কুফল পাঠকের মনে প্রভাব সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক।

<u>তর্কশাস্ত্র</u> ঃ মুসলিম উম্মাহর বিভেদে, ইসলামী মূল্যবোধের বিকৃতিতে তর্কশাস্ত্রের গবেষনা ও তর্কশাস্ত্রকে ইসলামের ব্যাখাতা বলে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ ভাবে ইসলামের ধর্মতত্বকে তর্কশাস্ত্রের অধিনস্ত করে ইসলামের সঠিক জ্ঞানের পথ কুয়াসাচ্ছন্ন করা হয়েছে।

<u>শেষ কথা</u> ঃ জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান ও বাহন গুলোকে ইসলামের দেওয়া সীমারেখার মধ্যে ব্যবহার না করার ফলে অসংখ্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। দর্শন, জ্যোতিষবিদ্যা, কবিতা ও তর্কশাস্ত্রের লালন কোন অবৈধ কাজ নয়। বরং ইসলাম সকল ধরনের জ্ঞানের পথে উৎসাহ যোগায়। কিন্তু ইসলামী আদর্শবাদের সাথে এ সব জ্ঞানের বাহন গুলোকে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামকে ইসলাম প্রদত্ত পদ্ধতিতেই শিখতে হবে, অন্য কোন উপায়ে বা জ্ঞানের অন্য কোন বাহনের সাহায্যে ইসলামকে জানার চেষ্টা করলে অপরিসীম সন্দেহ ও বিভ্রান্তি জন্ম নিতে বাধ্য। ইসলামের ইতিহাসে এ কথার অসংখ্য প্রমান পাওয়া যায়।

জ্ঞানের বিভিন্ন বাহন, দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে ঐ সব জ্ঞানের মধ্যে যে গুলো কল্যানকর তা গ্রহন করা যেতে পারে আর যে সব দিকগুলো আদর্শের জন্য ক্ষতিকর তা বর্জন করতে হবে। এই নীতি পালন না করার ফলেই মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক জীবনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। দার্শনিক চিন্তাধারার গোলকধাধায় যারা ইসলামী আকিদা বিশ্বাসে বিকৃতি নিয়ে আসতো তারা সমাজে বুদ্ধি জীবি বলে স্বীকৃতি পেতো। সরকারী পৃষ্টপোষকতায় বিভিন্ন প্রার্থিব সুযোগ সুবিধে পেতো। পক্ষান্তরে যারা ইসলামের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামদের পদাংক অনুসরনের দাওয়াত দিতেন তাদেরকে আধুনিক জ্ঞানের বিরোধী বা গোড়া বলে চিত্রিত করে সমাজে কোন ঠাসা করার চেষ্টা করা হতো। ইসলামের ইতিহাসের সাম্যক জ্ঞান না থাকার ফলে আজ ও এক শ্রেনীর শিক্ষিত মানুষ ইতিহাসের বিশিষ্ট উলেমা ও ইমামদের ভূমিকার সমালোচনা করেন।

শীয়াবাদ- একটি ব্যাপকতর বিভেদ ঃ

রাসুলে পাক (সাঃ) এরসাদ করেছেন,

خير القرون قرني الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

(ইসলামের সর্বশ্রেষ্ট যুগ সেটাই যার মধ্যে আমি প্রেরীত হয়েছি অতঃপর শ্রেষ্টত্বের মাফ কাঠিতে) তাদের পরবর্তীযুগ, অতঃপর তাদের পরবর্তীযুগ)

এই হাদিসের আলেকে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে রাসুলের পর সাহাবায়ে কেরামদের যুগ, অতঃপর তাবেয়ীনদের যুগ অতঃপর তাবেয়ীদের পরবর্তীযুগ চিহ্নিত হয়েছে।

উম্মাহর ইতিহাসের সর্বকালের সর্বসম্মত মত হলো নিম্নরূপ;

أفضل الناس بعد الانبياء عليهم الصلوة و السلام ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن ابى طالب غامرين على الحق و مع الحق

(নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ট মানুষ হযরত আবু বকর, অতঃপর হযরত উমর তার পর হযরত উসমান ও হযরত আলী, তারা সবাই সত্য পথের পথিক ও হকপন্থি)

আহলুল সুন্নত অল জামাতের এই সর্ব সম্মত ও প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের পরিপন্থি আকিদা ও বিশ্বাসে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষন করেন।

www.pathagar.com

(১) ইলমের উৎস

কোরআনে মজিদের বাস্তব ব্যাখা বা সূন্নতে রাসুল উম্মতের জন্য অবশ্যি অনুসরণীয়, যা আমরা পেয়েছি সাহাবায়ে কেরামদের মারফতে। যে ইলম পরবর্তীযুগে হাদীস বলে সংকলিত হয়েছে এবং যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। কিন্তু শিয়ারা হাদীস প্রাপ্তির জন্য অভিনব এক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তারা উম্মতের সর্ব সম্মত হাদীস ভান্ডারকে হাদীস বলে মানতে অস্বীকার করেন, তারা শুধু সে সব হাদীসকেই হাদীস বলেন যা তারা রাসুল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হযরত আলী, হযরত ফাতেমা ও তাদের সন্তানদের মাধ্যমে পেয়েছেন। অপরাপর সমস্ত সাহাবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীসকে তারা আগ্রাহ্য করেন।

(২) খিলাফতঃ

الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا

(আমার পর খিলাফত ৩০ বছর যাবত বহাল থাকবে অতঃপর তা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে)

এই হাদিসে রাসুলের আলোকে খিলাফতে রাশেদা হযরত আবু বকরের যুগ থেকে হযরত আলীর শাহাদাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যাদের আনুগত্য সুন্নাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে শামিল। আল্লাহর রাসুল এরসাদ করেছেন,

عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين

(তোমরা আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত মেনে চলবে)

কিন্তু শীয়া মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমানকে খোলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে অস্বীকার করেন।

(৩) ইমামতঃ

তারা রাসুলে পাকের বর্ণিত খেলাফত ব্যবস্থার পরিবর্তে ইমামতের আকিদায় বিশ্বাস করেন। তাদের আকিদায় তাদের ইমামগণ মাসুম বা গোনাগ করতে অক্ষম। আহ্‌লুল সুন্নত অল জামাতের আকিদায় একমাত্র নবী রাসুলগণই হলেন মাসুম। শীয়াদের ইমামত হযরত আলী থেকে শুরু হয় এবং হযরত আলীর সন্তানদের মধ্যে সীমিত। ইমামগণ যেহেতু মাসুম এবং সরাসরি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিযুক্ত তাই তারা শুধু রাসুলেপাকের সুন্নাহ্‌র প্রবর্তক বা প্রশাসকই নন, বরং তারা উম্মতের সরাসরি আনুগত্যের হকদার এবং হকও বাতিল, নেকী, বদী ও সত্য মিথ্যার তারাই হলেন মানদন্ড। তাদের উপর ঈমান আনা ও তাদের নিঃশর্ত আনুগত্য করা মুসলমানদের জন্য ফরজ এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঈমান ও কুফুরীর পার্থক্য নির্ণীত হবে।

www.pathagar.com

(৪) বাতেনী কোরআনঃ

তারা কোরআনের জাহেরী ও বাতেনী অর্থে বাতেনী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত। আহলুল সুন্নত অল জামায়াত কোরআনের বাতেনী অর্থ, বলতে সুন্নাহ বা হাদীসে রাসুল মনে করে। হাদীসই কোরআনের বাতেনী অর্থ এছাড়া কোরআনের কোন বাতেনী অর্থ নেই। কিন্তু শীয়াদের মতে কোরআনের আসল অর্থ শুধু ইমামগণই জানেন। সেটাই বাতেনী অর্থ। তাদের দৃষ্টিতে কোরআনের বাতেনী অর্থে বিশ্বাস ও আমল ফরজ। যারা কোরআনের এই বাতেনী অর্থে বিশ্বাস করে না বা সেই মোতাবেক আমল করে না তারা উম্মতে মোহাম্মদীর ভেতর শামিল নয়।

(৫) শীয়া ফিকাহঃ

উপরোক্ত মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তাদের শরীয়ত ও ফিকাহ সংকলিত হয়েছে, এই ফিকাহ হযরত জাফর সাদেকের নামের সাথে জড়িত করে ফিকাহ জাফরিয়া বলে পরিচিত হয়েছে। এভাবে তারা নবতর শরীয়ত ও ফিকাহর ধারক ও বাহক। যা সাধারণ মুসলমানদের শরীয়ত ও ফিকাহ থেকে মৌলিকত্বের দিক দিয়েই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

(৬) তাদের মতবাদের বুনিয়াদ সাহাবা ও সুন্নী বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই উম্মতে মুহম্মদীর বৃহত্তর ইতিহাস ও ধারার বাইরে স্বতন্ত্র ইতিহাস ও আদর্শিক ধারার ধারক ও বাহক।

এখানে আমরা এই সব মৌলিক বিরোধগুলোর তাৎপর্য ও ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সুন্নতের অভিনব উৎস

রাসুলেপাকের ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি, কখনও জিহাদের ময়দানে, কখনো রাতের গভীরে তার স্ত্রীদের সান্নিধ্যে, কখনও সফরে দু'এক সাথীদের কাছে আবার কখনো সীমিত সংখ্যক সাহাবাদের কাছে বা বিপুল সংখ্যক লোকদের কাছে শরীয়তের বিধান জারী করেছেন, যারাই যা শুনতেন নিজে মনে রাখতেন, আমল করতেন ও অনুপস্থিতদের কাছে বলতেন। রাসুলেপাকের প্রতিটি বাণী এক সাথে সকল সাহাবাদের পক্ষে শোনা সম্ভব ছিলো না। রাসুলেপাকের সকল সাহাবীদের কাছ থেকেই হাদিস পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু নবী পরিবারের সদস্যদের পক্ষে রাসুলেপাকের সব বাণী শোনা ও মনে রাখা কোন মতেই সম্ভব নয়। সর্বত্র তাদের উপস্থিতিও অবাস্তব। তাই শুধুমাত্র কয়েকজন আহলে বাইতের কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদিস গ্রহণ করলে এবং অপরাপর সমস্ত সাহাবাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদিস সমূহকে অস্বীকার করলে রাসুলে পাকের অধিকাংশ হাদিসকেই অস্বীকার করা হয়। উপর্য্যুপরি প্রশ্ন থেকে যায় যে

www.pathagar.com

সমস্ত সাহাবাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদিসকে অস্বীকার করতে হবে কেন? তাদের এই মতবাদ কয়েকটি অবশ্যম্ভাবী ফলাফল সৃষ্টি করে। যেমনঃ

কোরআন ও হাদিসে ইসলামের যে বিশ্বজনীন রূপ তুলে ধরা হয়েছে, তার ভিত্তিতে ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের আদর্শ। রাসুলে পাকের সরাসরি শিক্ষায় ও তরবিয়তে তার সহচরদের জীবনে তাদের সামগ্রিক চিন্তায় ও কর্মে এক বিপ্লবী পরিবর্তন এসেছিলো। ফলে বিশ্ব ইতিহাসে শত্রুর দৃষ্টিতেই হোক বা মিত্রের দৃষ্টিতে, সাহাবায়ে কেরামদের জামাত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের জামাত বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কোরআনে মজিদের অসংখ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামদের প্রশংসা করা হয়েছে। রাসুলে পাক তার জীবনের প্রতিক্ষণে, যুদ্ধে কি শান্তিতে সুসময়ে কি অসময়ে, সুখে কি দুঃখে সর্ব অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামদের উপর অপরিসীম আস্থা রাখতেন। সাহাবাদের মধ্যে চুড়ান্ত পর্যায়ের ঈমান, আখলাক ও মানবীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিলো। এজন্যেই রাসুলে পাক এরসাদ করেছেন;

اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم –

(আমার সাহাবাগণ তারকার সমতুল্য, যাকেই তোমরা অনুসরণ করো সত্যের দিশা পাবে) তাই একথা বললে এতটুকু সত্যের অত্যুক্তি হবে না যে আজকের সমাজে নৈতিকতা, ন্যায়-নীতি তথা মানবীয় মূল্যবোধের যে অস্তিত্ব রয়েছে তা সাহাবায়ে কেরামদের অতুলনীয় চরিত্র মাধূর্যেরই ফসল।

কিন্তু শীয়াদের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামদের বিশাল চারিত্রিক সৌধ ক্ষণিকেই ধুলিস্মাৎ হয়ে যায় এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয় যে (نعوذ بالله) সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মুসলমান হিসেবে প্রাথমিক যোগ্যতারও অভাব ছিলো। এমন কি রাসুলে পাকের হাদিস বলার জন্য একজন সাক্ষী হিসেবে তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বস্তুতঃ শীয়াবাদ উম্মতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের উপর বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণার উপর লালিত হয়েছে।

- বিশ্বে মানবতা, মুসলমানদের পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও আস্থা, রক্ত বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র, পরিবার, গোষ্ঠী বা স্বজন প্রীতির উচ্ছেদ সহ মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবাত্মক যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সবই মৌখিক দাবী হয়ে যায় আর বাস্তবে রাসুলে পাকের পারিবারিক গোলামী প্রতিষ্ঠার সত্যকে মেনে নিতে হয়।

নবী রাসুলদের সম্পর্কে আল্লাহপাক এরসাদ করেছেন;

ولايأمركم ان تتخذوا الملائكة و النبين اربابا ا يامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون –(ال عمران)

www.pathagar.com

(নবী রাসুল তোমাদেরকে এই নির্দেশ দেন না যে তোমরা ফিরিস্তা ও তাদের সন্তানদেরকে প্রতিভূ হিসেবে গ্রহণ করো। তারা কি তোমরা মুসলমান হয়ে যাবার পর তোমাদেরকে কুফুরীর নির্দেশ দিবেন?)

যে নবীদেরকে নিজেদেরকে প্রতিভূ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সেই নবী কিভাবে তার আহলে বাইতকে প্রতিভূ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন? মানবতার মহান নবীর প্রতি এটা কি চরম অবমাননা নয়?
রাসুলে পাক এরসাদ করেছেন;

انا معشر الانبياء لانورث ماتركناه صدقة –

(আমি নবী পরিবারের সদস্য। আমি কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, যা কিছু ছেড়ে যাই তা হলো সাদকা)

যে নবীর উত্তরাধিকার বলে কিছু ছিলো না, সেই নবী তার আহলে বাইতকে উম্মতের প্রতিভূ বানিয়ে যাবেন। এটা নবী চরিত্রকে কালিমাযুক্ত করার নামান্তর নয় কি?

- নবী তার উম্মতের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন না যা পরবর্তীযুগে দ্বীন ও শরীয়তের পথে চলতে সত্য মিথ্যার মানদন্ড হবে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় না কি যে নবী তার নবুয়তি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যান নি? (نعوذ بالله)
- তাদের এই অভূতপূর্ব জ্ঞানের উৎস মেনে নিলে কি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শবাদই সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় না?

খলিফা নির্বাচনে শীয়াবাদ

শীয়াদের মতে হযরত আলীর খিলাফত রাসুলে পাকের আদেশে প্রতিষ্ঠিত। তাই রাসুলে পাকের ইন্তেকালের পর খিলাফতের হক তারই ছিলো। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণ তার হক ছিনেয়ে নিয়েছেন। এজন্যে শীয়ারা ইসলামের প্রথম তিন খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক ও উসমান গণীকে 'গাসেব' বা জোরপূর্বক অধিকার হরনকারী বলে আখ্যায়িত করেছে।

শীয়াদের এই দাবীর পেছনে তারা একটি মাত্র হাদিসই উল্লেখ করে থাকেন, হাদিসটি মোসলেম শরীফে বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসের একাংশ।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ايهاالناس فانما انا بشر يوشك ان يأتي رسول ربي فـــاجيب و
انى تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب الله و استمسكو به فحــث
على كتاب الله و رغب فيه ثم قال و اهل بيتى اذكركم الله فى اهل بيتى اذكركم الله فى اهل بيـــتى ،
فقال له حصين ، و من اهل بيته يازيد اليس نسائه من اهل بيته ، قال نسائه من اهل بيته و لكــــن

www.pathagar.com

اهل بيته من حرم الصدقة بعده – قال من هم ؟ قال هم ال على وال عقيل وال جعفر وال عبـــاس ، قال كل هولاء حرم الصدقة؟ قال نعم –

(রাসুলেপাক এরসাদ করেছেন, আমি একজন মানুষ, সময় ঘনিয়ে এসেছে, কখন রবের দূত এসে যাবেন- জবাব দিতে হবে। আমি তোমাদের কাছে দুটি ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে হিদায়ত ও নূর রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে ধরো। অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার আহলে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। (অতঃপর) হোসেন হাদিসের বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যায়েদ, নবীর স্ত্রীগণ কি তার আহলে বাইত নন? তিনি জবাবে বললেন, হাঁ তার স্ত্রীগণ আহলে বাইত। তাঁর আহলে বাইত হলেন তারা যাদের উপর সাদকা হারাম করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করলেন, কাদের উপর সাদকা হারাম করা হয়েছে? জবাব দিলেন, তারা হলেন, আলে আলী, আলে আকীল, আলে জাফর ও আলে আব্বাস। বললেন, তাদের সকলের জন্যই কি সাদকা হারাম করা হয়েছে? জবাব দিলেন- হাঁ।)

আলোচ্য হাদিসটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। মোহাদ্দেসীনের কাছে উপরের রেওয়ায়েতটি সর্বাধিক মজবুত। বিদায় হজ্বের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে মক্কা যাবার সময় মধ্য রাস্তায় (خم) নামক স্থানে রাসুলেপাক এক খোতবায় একথা বলেছিলেন। এজন্যে হাদিসটিকে (غدير خـــم) এর হাদিস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসুলেপাক এই প্রসিদ্ধ খোতবাহটি হজ্ব দিবসের (৯ই জিলহজ্ব) ৯ দিন পুর্বে দিয়েছিলেন। হাদিসটি দীর্ঘ খোতবার একটি অংশ, তার অর্থ এই দাড়ায় যে তিনি এই কথাগুলো শ্রোতাদের বিরাট জমায়েতে বলেছিলেন। অগণিত লোক তা শুনেছিলেন। হাদিসটি সহীহ হাদিস হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু হাদিসটির কিছু কিছু রেওয়ায়েতে উপরের অংশের সাথে আরো কিছু বর্দ্ধিত অংশের উল্লেখ রয়েছে তারা সবাই শীয়া আকিদায় বিশ্বাসী। তাদের এই রেওয়ায়েতগুলো ছাড়া আর কোন রেওয়ায়েতে ঐ বর্ধিত অংশগুলো পাওয়া যায় না। এ কারনেই মোহাদ্দিসীনেরা ঐ বর্ধিত অংশকে জাল হাদিস (موضــوع) বা বানানো হাদিস বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঐ বর্ধিত অংশগুলো নিম্নরূপঃ

(الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب برسالتى و بالولاية لعلى من بعدى)

"আল্লাহ মহান তার দ্বীনের পূর্ণতা দানে, তার নিয়ামতের সমাপ্তিতে ও আমার রিসালাত এবং আমার পর আলীর নেতৃত্বে রবের সন্তোষ বিধানে"

এই বর্ধিত অংশের বর্ণনাকারীরা দাবী করেছেন যে গাদীরে খোমের এই হাদিস সম্বলিত খোতবাটির পর পরই কোরআনে মজিদের প্রসিদ্ধ আয়াত;

www.pathagar.com

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا –

নাযিল হয়। তাদের মতে ঐ বর্ধিত অংশেরই মর্ম ও এই আয়াতে প্রতিধ্বনিত হয়। তাদের এই দাবিই বর্ধিত অংশের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে। কেননা একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে এই প্রসিদ্ধ আয়াতটি ৯ই জিলহজ্বে আরাফাতের দিনে আরাফাতের ময়দানেই নাযিল হয়েছিলো। এ প্রসংগে হযরত উমরের একটি বর্ণনা প্রনিধানযোগ্য। একজন ইহুদী হযরত উমরেকে বলেছিলো যে আপনাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যদি তেমনি আয়াত আমাদের উপর নাযিল হতো তবে আমরা ঈদ উদযাপন করতাম। হযরত উমর জিজ্ঞাসা করলেন সেটা কোন্ আয়াত? সে জবাবে বললো, সেটি হলো (اليوم اكملت لكم), হযরত উমর বললেন, আমার খুব ভাল করে মনে আছে এই আয়াতটি কখন নাযিল হয়েছিলো। তিনি বললেন, আয়াতটি আরাফাতের দিনে এমনঅবস্থায় নাযিল হয় যখন রাসুলেপাক আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত ছিলেন। উম্মতের মধ্যে এই প্রশ্নে কোন দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে ঐ বর্ধিত অংশ সম্বলিত হাদিসটি আরাফাত দিনের ৯ দিন পুর্বে বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লেখিত রয়েছে।

ঐ হাদিসে উল্লেখিত অংশের সাথে সাথে আরো কিছু বর্ধিত অংশ ও রয়েছে, যা হলো নিম্নরূপ;

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله –

(হে আল্লাহ যারা আলীকে রক্ষা করে তাদেরকে তুমি রক্ষা করো, যারা তার শত্রুতা করে তাদের তুমি শত্রুতা করো, যারা তাকে সাহায্য করে, তাদের তুমি সাহায্য করো, যারা তাকে লাঞ্ছিত করে তাদের তুমি লাঞ্ছিত করো।)

তাদের দাবী অনুযায়ী যদি এই দোয়া রাসুলের দোয়া বলে ধরে নেয়া যায় তবে পরবর্তী ফলাফল তাই হতো, যা এই দোয়াতে বলা হয়েছে, কেননা রাসুলে পাকের দোয়া অবশ্যই কবুল হতো। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতা আমাদের সামনে অন্য চিত্র তুলে ধরে।

অতএব বর্ধিত অংশ গুলোর কোন ভিত্তি নেই। এ গুলো এমন লোকদের হাতে গড়া হয়েছে যারা না আল্লাহকে ভয় করে আর না রাসুলকে বা তার বংশধরকে ভালবাসে। এই মনগড়া হাদিসের উপরই তাদের গোটা মতবাদের সৌধ গড়ে উঠেছে।

মিথ্যার বড়াই যতোই হোক না কেন তার সাথেই মিথ্যার প্রমাণ থেকেই যায় এ কথা তাদের মন মানসিকতাতে আরো স্পষ্ঠ হয়ে যায়। এ হাদিসের বর্ধিত অংশ গুলোর পর পরিসংহারে আরো কিছু কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহর রাসুল ঐ খোতবার পর তিনি হযরত আলীকে তার পর খলিফা হিসাবে ঘোষনা করেন এবং সমবেত সাহাবায়ে কেরামদের কাছ থেকে হযরত আলীর আনুগত্যের শপথ নেন এবং শীয়াদের বিশেষ নিয়মে হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের কাছ থেকে আনুগত্যের অভিবাদন নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো, এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা ও হযরত আলীর খিলাফতের শপথ নেবার পর খেলাফতে রাশেদার সুদীর্ঘ ৩০ টি বছর শেরে খোদা হযরত আলী বা সাহাবাদের মধ্যে কেউ এ বিষয়টি উত্থাপন করলেন না। যে সাহাবারা নবী প্রেম ও নবীর আদেশ পালনে সর্বপ্রকার ত্যাগের অসংখ্য ঘটনার ইতিহাস রেখে গেছেন, হযরত আলীর সৌর্য্য বির্য্যের কাহিনীতে ইতিহাসের পাতা ভরা, কি করে সম্ভব যে সাহাবাদের কেউ সত্য কথা বলার প্রয়োজন মনে করলেন না বা হযরত আলী ভয়ের কারণে নীরব রইলেন এবং খিলাফতের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন খলিফাদের সাহায্যে করলেন? এমন কি যখন তিনি খলিফা হলেন তখনও বিষয়টি উত্থাপন করলেন না।

কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আলোচ্য হাদিসের ঐ বর্ধিত অংশগুলো সাহাবাদের পরবর্তীযুগে তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের (?) হাতে গড়া, এর সাথে সত্যের দূরতম সম্পর্ক ও নেই।

এবারে মূল হাদিসের প্রসংগে আসা যাক, সেখানে এমন কোন কথা নেই যার মধ্যে হযরত আলীকে বা তার সন্তানদেরকে নেতৃত্বে বসানো বা ইলমের একমাত্র উৎস হবার ইংগীত পাওয়া যায়।

হাদীসে আলে রাসুলকে একটি ভারী জিনিস বলে উল্লেখ করে তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের কে সতর্ক করে দিয়েছেন, মোহাদ্দেসীনেরা এর ব্যাখ্যায় একমত যে উম্মতকে আলে রাসুল সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আগের উম্মতগন তাদের রাসুলদের আওলাদদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করে যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তেমন অবস্থার যেনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তারা কোথাও বা আলে নবীদেরকে আল্লাহর স্থানে বসিয়ে অবতার বানিয়ে নিয়েছিলো আবার কোথাও তাদেরকে জুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিনত করা হয়েছে। এ ধরনের বাড়াবাড়ী করা থেকেই তাদেরকে ভারী জিনিস বলে সতর্ক করে দিয়েছেন ।কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের উম্মতের মধ্যে ও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। খারেজী সম্প্রদায়ের প্রসংগে আলোচনার সময় এ প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে এই ব্যাখার সত্যতা পাওয়া যায়।

কোরআনের আয়াতে খিলাফতে রাশেদার প্রমাণঃ

সুরা নুরে আল্লাহপাক এরসাদ করেছেন;

و عد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعدخوفهم أمنا يعبدوننى لايشركون بى شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ۞ (النور)

(যারা তোমাদের মধ্যে থেকে ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদের জন্যে আল্লাহর এই ওয়াদা যে তাদেরকে পৃথিবীর খেলাফত দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তি উম্মতদেরকে

www.pathagar.com

খিলাফত দেয়া হয়েছিলো। এবং তাদের জন্য তাঁর পছন্দ মতো দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং ভয়ভীতির অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। যেনো তারা আমারই বন্দেগী করে, কাউকে আমার সাথে শরীক করেনা, অতঃপর যারা কুফুরী করবে তারা না ফরমান হয়ে যাবে।)

সুরা নূর নাযিল হবার সময় বর্তমান সাহাবায়ে কেরামদের জন্য এই আয়াতে কতিপয় ওয়াদা করা হয়েছে। ঐ সময়ের পরীক্ষিত সাহাবায়ে কেরামদের জন্যেই এই ওয়াদা। ওয়াদা গুলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহর যমীনে খেলাফত দান।

২. তাদের জন্যে আল্লাহর মনোনীতি দ্বীনের সার্বিক প্রতিষ্ঠা,

৩. ভীতির পরিবেশের সমাপ্তি করে নিরাপত্তাদান ও শান্তির প্রতিষ্ঠা।

ইতিহাসের যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই ওয়াদা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সত্যিকার অর্থে দ্বীন ইসলাম তার সকল শাখা-প্রশাখায় পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্টিত হয়েছে। দ্বীনের কোন দিকই বাস্তবায়নের বাইরে থাকেনি এবং দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে ইসলামের কোন আমলে ভয়ভীতির কোন অবকাশ ছিলোনা, বরং তাদের জান মাল সহ সামগ্রিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। একজন নিঃসঙ্গ মহিলার পক্ষে ও নিরাপদে সফর করতে কোন ভয়ের কারণ ছিলো না। এই অবস্থা কি বৃহত্তর মুসলিম জাতির অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেনা?

পক্ষান্তরে শীয়াদের আকিদা অনুযায়ী হযরত আলীর খিলাফত ও ইমামতের কথা গোপন রাখতে হয়েছে নিরাপত্তার অভাবে বা শীয়া মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের জন্য কোন নিরাপত্তা ও শান্তি ছিলোনা । এমন কি আজ পর্যন্ত ও শীয়া মতবাদ নিরাপত্তা পায়নি। এ জন্য তার আসল আদর্শকে সর্বতোভাবে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের আকিদা বিশ্বাস কোন দিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি বা শান্তি ও নিরাপত্তা পায়নি । এ কথা শীয়া আলেমগণও স্বীকার করেন। বলা হয়েছে;

مامن الامة أحد بايع مكرها غير علي وار بعتنا – (احتجاج طبرس ٤٨)

(এই উম্মতের মধ্যে হযরত আলী ও আমাদের চারজন "তাদের মতে হযরত মোকদাদ বিন আল আসওয়াদ, আবু যার গাফারী, সালমান ফারেসী এবং অপর একজন, যাকে নিয়ে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে" ছাড়া আর কেউ বাধ্য হয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফতের বাইয়াত করেননি। অর্থাৎ তাদের আকিদা মতে এই কয়েকজন ছাড়া আর সবাই আন্তরিকভাবে বাইয়াত করেছিলেন। এজন্যে এই পাঁচজন সাহাবীকে আজীবন সত্য গোপন রাখতে হয়েছে নিরাপত্তার অভাবে।)

এই আয়াতেরও অর্থ ইতিহাসের বাস্তবতায় এ কথা সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয় যে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী

www.pathagar.com

(রাঃ)-এর খেলাফতের কথাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে, যা আল্লাহর পছন্দনীয় দ্বীন।

সুরা আল ফাতহা (الفتح) তে এরসাদ হয়েছে;

٥ سيقول المخلفون اذانطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ، يريدون ان يبدلوا كلام الله – قـل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لايفقهون الاّ قليلا–

٥ قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فان تطيعـــوا يؤتكم الله اجرا حسنا و ان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما –

উপরোক্ত দু'টি আয়াতের প্রথম আয়াতে হোদাইবিয়ার সন্ধির সফরে অনুষ্ঠিত বাইয়াতে রেজোয়ানে শরীক সাহাবাদের বিষেশ মর্যদার কথা ঘোষনা করতে গিয়ে নিকটতম একটি বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে সে বিজয়ে তোমরা বিরাট সম্পদ পাবে। সে গনীমতের পথে যখন তোমরা যাত্রা করবে তখন ঐ সমস্ত দূর্বল ইমানের বেদুইনগণ, যারা হোদাবিয়ার সফরে তোমাদের সঙ্গ দেয়নি, তোমাদের সাথে শরীক হবার বাসনা প্রকাশ করবে, তখন তাদেরকে তোমরা বলবে, না তোমরা আজ শরীক হতে পারবেনা। নিকটতম ঐ বিজয়ের ব্যাখায় তফসীরের কিতাব সমুহে খয়বরের যুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হোদাইবিয়ার অনুপস্থিত দূর্বল ইমানের লোকদের জন্য খয়বরের গনিমত নিষিদ্ধ করা হয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ঐ সব লোকদের প্রতি বলা হলো; অতঃপর তোমাদেরকে এক শক্তিশালী দলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেওয়া হবে, সে ডাকে সাড়া দেওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য থাকবে। যদি তোমরা আনুগত্য করো তবে তোমরা প্রতিদান পাবে। অন্যথায় শাস্তি অনিবার্য। আয়াতে ঐ যুদ্ধের বৈশিষ্ঠতা এ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে বিপক্ষ দলকে দুইটা পথের মধ্যে একটি গ্রহন করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে, প্রথমতঃ ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে, ইসলাম কবুল না করলে যুদ্ধ করা হবে । এই দুইটা বিকল্প ছাড়া কোন সন্ধি বা কর আদায়ের মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ানোর পথ থাকবেনা।

মোফাস্সেরীনদের অধিকাংশই এই যুদ্ধকে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের যুগের মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ইমামার বনী হানিফা ও মোসাইলামার বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা সেই জিহাদই ছিলো এমন জিহাদ যেখানে কোন সন্ধির অবকাশ ছিলোনা (تفســـير روح المعـــانى) এই প্রেক্ষাপটে হযরত আবু বকরই হলেন সেই আহবানকারী যা উপরের আয়াতের মধ্যে (ستدعون) (তোমাদেরকে জিহাদের ডাক দেওয়া হবে) বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক কোরআনে মজিদের আয়াতে সেই আহবানকারীর স্বীকৃতি দিয়েছেন। এভাবে তার খিলাফত কোরআন দ্বারা প্রমাণিত।

www.pathagar.com

- রাসুলে পাক যে দশজন সাহাবাকে তাদের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন যাদেরকে ইসলামে 'আশারায়ে মোবাশ্বিরা' বলে স্বরন করা হয়। তাদের শিরোনামেই হযরত আবুবকর ও উমর ফারুকের নাম রয়েছে। তাদের ইসলাম কবুল করার পর থেকে রাসুলে পাকের তিরোধান পর্যন্ত এমন একটি প্রমাণ ও রাখেননি যে তাদের ইমানে, ত্যাগ-তিতীক্ষায়, বৈষয়িক স্বার্থ বিসর্জনে, দ্বীনের পথে কোন ত্যাগ স্বীকারে সন্দেহের অবকাশ পাওয়া যায়। নবী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তারা নিবেদিত প্রান সহচরের ভূমিকায় ইতিহাসের পাতায় অবিশ্বরনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিজরতের বিপদ সংকুল সফরে হযরত আবু বকর ছিলেন তার সাথে। আত্নীয়তার বন্ধনে ও হযরত আবু বকর রাসুলে পাকের সর্বাধিক প্রীয়তমা স্ত্রীর পিতা ছিলেন। হযরত উমর ও রাসুলে পাকের অপর স্ত্রীর পিতা। হযরত উসমান রাসুলে পাকের দুই কন্যার স্বামী যে জন্য তাকে 'জিন্নুরায়েন' বলা হয়েছে। এ হেন ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করা কোন ইমানের পরিচায়ক নয়।
- শীয়া মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি কাগজের পাতায় লিখতে ও বড় কষ্ট হয়। তারা শুধু এ সব মনিষীদের খিলাফতকেই অস্বীকার করেননি, অত্যন্ত বর্বর ভাষায় গালাগালী করেছেন। রাসুলের পাকের দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তি জীবনের অক্লান্ত সাধনার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে লক্ষাধিক মুসলমান রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে তার কয়েকজন পারিবারিক সমস্যা ও অপরাপর ৩/৪ জন ব্যক্তি ছাড়া সবাই তাদের ভাষায় মুনাফিক (نعـوذ بـالله) হয়ে গেছেন। তারা সবাই দ্বীনে হানিফের বিদ্রোহী হয়ে নবীর শিক্ষাকে ব্যক্তি স্বার্থের যুপোকাষ্ঠে মুহূর্তেই জলাঞ্জলী দিলেন। এ ধরনের কথা তাদের মত স্বার্থপর, চরিত্রহীন ও জালেম ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনা। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের শত্রুদের হাতকেই শক্তিশালী করেছে।
- শীয়া মতবাদের সুচনা লগ্ন থেকেই তাদের এই মানসিকতায় কোন পরিবর্তন বা নমোনিয়তা দেখা দেয়নি, কেননা হিংসা, বিদ্বেষ ও মিথ্যের বেশাতীর উপর তাদের দ্বীন প্রতিষ্টিত হয়েছে। শীয়া পন্ডিতদের মধ্যে কেউই হযরত আবু বকর, উমর, উসমান বা ইসলামের শ্রেষ্ট সন্তানদের নাম ভদ্র ভাবে নিতে পারেনি। শীয়াদের উপর লিখিত যে সব কিতাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো;
- (الجامع الكافي) যাকে শীয়াবাদের বিশ্বকোষ (Encyclopedia) বলা হয়ে থাকে।
- (احتجاج طبرسـي) লেখক (علامة نورس طبرسي) একটি নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ, যা প্রতি যুগের শীয়া আলেমদের কাছে সমভাবে গ্রহন যোগ্য।
- (تحرير الوسيلة – حمله حيدرى – مستدرك الوسـائل)এমনি সব গ্রন্থ যার উপর শীয়া উম্মত একান্তভাবে নির্ভর করে। তদুপরি সমকালীন যুগের বিশিষ্ট শীয়া আলেম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর লিখা(;الحكومة الاسـلامية – كشف الاسرار) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ

www.pathagar.com

সব গ্রন্থ সমুহের লেখকগণ শীয়া ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের ও যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের মধ্যে কোন একজন ও সাহাবায়ে কেরাম বা হ্যরত আবুবকর, উমর ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে কোন ভাল কথা বলা দূরের কথা ভদ্রভাবে নাম উচ্চারণ ও করতে পারেননি।

- তাদের এই চরম পক্ষপাত দুষ্ট ও জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মুসলিম উম্মাহ্‌র একান্ত প্রিয়জন, মহান ব্যক্তিদেরকে কলংকিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আপামর মুসলমানগণ হ্যরত আলী, হাসান, হোসাইন (রাঃ) ও অপরাপর আওলাদে রাসুলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তাদের ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করে এবং সাথে সাথে উম্মতের এই সেরা সন্তানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভারে শ্রদ্ধাবনত। এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার তাকিদেই তারা সাহাবায়ে কেরামদের নামের সাথে সাথে আহলে বাইতের নামানুসারে নিজেদের সন্তান সন্ততীদের নাম করনকে পরম সম্মানের কারন মনে করে। পক্ষান্তরে শীয়াবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন ব্যক্তির নামও আবু বকর, উমর, উসমান, খালেদ, বেলাল বা অপরাপর সাহাবাদের নাম পাওয়া যাবে না। বরং মোশরেকানা রীতিতে তাদের নাম আব্দুল আলী, আব্দুল হোসাইন, আব্দুল হাসান ইত্যাদি ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়।
- শীয়াগণ রাজতন্ত্রীদের মতো পারিবারিক নেতৃত্বে বিশ্বাসী। আওলাদে রাসুলের মধ্যে যদিও আলে আলী, আলে আকিল, আলে আব্বাস ও আলে জাফর শামিল, কিন্তু তারা অযৌক্তিকভাবে হ্যরত আলীর পারিবারিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মতবাদে বিশ্বাসী। একদিকে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির দাবী অপর দিকে সামন্তবাদী রাজতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গির কালো ছায়ায় তাদের মতবাদ পক্ষপাতদুষ্ট।
- ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি ছিলো কোরানী দৃষ্টিভঙ্গি, যা আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে (ان اكرمكم عند الله اتقاكم) (তোমাদের মধ্যে মর্যাদার অধিকারী ঐ ব্যক্তি যে বেশী তাকওয়াপন্থী) পক্ষান্তরে শীয়ারা তাদের সম্প্রদায়িক স্বার্থে আলে আলীর বংশানুক্রমিক ধর্মীয় এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মতবাদে বিশ্বাসী। এই বিকৃত মানসিকতাকে যুক্তির মতবাদে পরিণত করতে গিয়ে তারা নির্বিবাদে ও নির্বিকারে কোরআনের অপব্যাখ্যা, হাদিসে রাসুলের অস্বীকৃতি তথা মিথ্যা ও মনগড়া হাদিস বানানোর কারখানা কায়েম করেছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন।

ইমামত ও বেলায়েতে ফকীহ

শীয়াদের অসংখ্য দল-উপদল নির্বিশেষে তাদের সকল সম্প্রদায় সামষ্টিকভাবে ইমামতের আকিদায় বিশ্বাস করে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের মৌলিক বিশ্বাসের মত ইমামত ও তাদের একটি মূল আকিদা। এই আকিদায় বিশ্বাস করা বা না করার উপর ঈমান ও কুফুরী নির্ভর করে।

www.pathagar.com

ইমামত সম্পর্কে শীয়াদের আকিদা নিম্নরূপ:

- উম্মতের দ্বীনি ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইমামদের উপর অর্পিত হয়েছে। ইমামগণ সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত, তাদের আনুগত্য নবীর আনুগত্যের মতোই ফরজ।
- উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ইমামগণ হলেন নবীদের মতো মাসুম তাদেরকে কোন গোনাহ স্পর্শ করতে পারে না। নবীদের মতো তারাও আল্লাহর নির্বাচিত প্রতিনিধি।
- ইমামগণ শুধু শরীয়তে মোহাম্মদীর প্রচারকই নন, বরং তারা হলেন স্বাধীন ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তারা নিজেদের তরফ থেকে শরীয়তকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা রাখেন। উম্মতকে জান্নাত বা দোজখ প্রদান করার এখতিয়ার ও তাদের উপরই ন্যস্ত।

এই মূল বিশ্বাসে সমস্ত শীয়া দল-উপদল ঐক্যবদ্ধ। শীয়াদেরই একটি উপদল বলে দাবীদার বাহাই সম্প্রদায় সমস্ত শীয়া দলগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্রের অধিকারী। যাদের আকিদা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। শীয়াদের অপরাপর দলসমূহ বাহাই সম্প্রদায়কে শীয়া হিসেবে মানতে রাজী নয়।

শীয়া বহুসংখ্যক দল ও উপদলে বিভক্ত, তাদের মধ্যে তিনটি হলো বড় বড় দল। সেগুলো নিম্নরূপ:

১) ফাতেমী শীয়া

যারা বোহরা নামে সমধিক পরিচিত। এই ফিরকার অনুসারীগণ ভারত, পাকিস্তান ও ইয়ামেনে বসবাস করে। তাদের ইমামদের সংখ্যা ২১ জন। অতঃপর স্বাধীন দাওয়াতদানকারী বা দায়ীর যুগ শুরু হয়েছে। এইসব (دعاة المطلقين) তাদের উম্মতের রুহানী ইমাম। এই ফিরকার লোকেরা দাবী করে যে এসব (دعاة) বা দাওয়াতদানকারীদের মধ্যে ২৩ জন ইয়েমেনে ও ২৩ জন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। বোহরাদের মতে রমজানের রোজা সর্ব অবস্থাতেই ৩০ দিন, চাঁদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ইমাম প্রদত্ত কেলেন্ডার তারা অনুসরণ করেন। তারা নামাজ সহ অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগী তাদের সমজিদে একত্রে আদায় করেন। বিয়ে শাদী ও তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

২) ইসমাইলী শীয়া

যাদেরকে সাধারনভাবে আগাখানী বলা হয়ে থাকে। আগাখানের ইমামত আজও পূর্ববত চালু রয়েছে। বর্তমান ইমাম হচ্ছেন প্রিন্স করিম আগাখান, যিনি তার দাদা কতৃক মনোনীত। আগাখানীদের ইবাদাত বন্দেগী খুবই সীমিত। ইমামের অনুমতি ছাড়া তাদের বিয়ে হতে পারে না। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সবই তাদের জামাতখানায় অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

ইমাম তার ইচ্ছামতো জান্নাতী বা দোজখীদের নাম নির্বাচন করেন। অন্যকথায় তাদের ইমামই তাদের দ্বীনের সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। এই ফিরকার সাথে শরীয়তে মুহম্মদীর সম্পর্ক খুবই নগন্য। বৈষয়িক ধন-সম্পদে তারা বলিয়ান এই আর্থিক শক্তির কল্যাণেই তারা আজও মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্য হিসেবে পরিচিত।

৩) ইসনা আশারিয়া বা ১২-ইমামে বিশ্বাসী শীয়া

এই মতে অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক, যারা ইরানে, ইরাকে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভারতে ও পাকিস্তানে বসবাস করে। বস্তুতঃ তারাই আজ শীয়া উম্মতের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা যে ১২ জন ইমামকে অনুসরণ করেন তারা হলেন,

(১) হযরত আলী, (২) হযরত হাসান, (৩) হযরত হোসাইন, (৪) হযরত হোসাইনের পুত্র আলী যাকে ইমান যয়নুল আবেদীন বলা হয়ে থাকে, (৫) ইমাম যয়নুল আবেদীনের পুত্র মুহম্মদ বিন আলী যাকে ইমাম বাকের বলা হয় এবং (৬) ইমাম বাকেরের পুত্র ইমাম জাফর সাদেক।

এই ছয়জন ইমাম সম্পর্কে শীয়াদের সমস্তদল উপদল একমত। ১২ ইমামের অনুসারীরা অতঃপর ইমাম জাফরের তৃতীয়পুত্র হযরত মুসা কাজিমকে সপ্তম ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে ইসমাইলী ও অন্যান্য ফিরকার শীয়াগণ ইমাম জাফরের জৈষ্ঠপুত্র হযরত ইসমাইলকে সপ্তম ইমাম বলে দাবী করেন। এর পর থেকে ইমামতের পরম্পরা ভিন্ন দুই ধারায় চলতে থাকে। ১২ ইমামের অনুসারীরা হযরত মুসা কাজিমের সন্তানদের মধ্যে ইমামতকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অপর দিকে অন্যান্য দলের অনুসারীরা হযরত ইসমাইলের সন্তানদের মধ্যে ইমামত সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে।

এই আলোচনা থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে শীয়াদের কোন ফিরকাই হযরত হাসান (রাঃ)-এর সন্তানদের ইমামতের মধ্যে শামিল করে নি, কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে প্রথমতঃ হযরত হাসানের পুত্রকে ইমাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু হযরত হাসান যেহেতু মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচার তাকিদে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষে পদত্যাগ করেন, তাই তার সন্তানগণ এই সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়ে যান।

অতঃপর ১২ ইমামের অনুসারীদের পরবর্তী ইমামগণ নিম্নরূপ:

(৭) হযরত মুসা কাজিম, (৮) মুসা কাজিমের পুত্র আলী বিন মুসা, (৯) আলী বিন মুসার পুত্র মুহম্মদ তকী, (১১) আলী বিন মুহম্মদ তকীর পুত্র হাসান বিন আলী আসকারী এবং (১২) হাসান বিন আলী আসকারীর পুত্র মুহম্মদ বিন হাসান যিনি হলেন সর্বশেষ ইমাম যাকে গায়েবী ইমাম মেহেদী হিসাবে বিশ্বাস করা হয়। শীয়াদের মতে সর্বশেষ ইমাম যিনি গায়েবী-ইমাম মেহেদী হিঃ ২৫৫ সালে জন্মগ্রহন করেন এবং ৪ বা ৫ বছর বয়সে আল্লাহ্‌র কুদরতে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান এবং এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেন এবং সেখানে তিনি আজও জীবিত আছেন।

www.pathagar.com

যেহেতু শীয়ারা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে ইমামের উপস্থিতি অপরিহার্য্য, যিনি উম্মতের সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রন করেন। তাই তাদের মতে এই শেষ ইমাম কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। এবং কিয়ামতের পূর্বে কোন এক সময়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং ইমাম মেহদী হিসাবে সারা পৃথিবীতে শীয়াবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

শীয়াদের মতে ইমামদের মর্যাদা

সাম্প্রতিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ শীয়া আলেম ও ইরানে শীয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং শীয়া ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (الحكومة الاسلامية)-এর ৫২ পৃষ্ঠায় (الولاية التكوينية) শিরোনামে ইমামের মর্যাদাও ক্ষমতা সম্পর্কে লিখেছেন;

و ان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقامالايقرب ملك مقرب ولانبي مرسل و بموجب ما لدينا من الروايات وا لاحاديث فان الرسول الاعظم (ص) والائمة (ع) كانوا قبل هذا العالم انوار فجعلهم الله بعرشه محدقين و جعل لهم من المنزلة و الزلفى مالا يعلمه الا الله – (مطبوعة كتاب خانة بررك اسلامى – ايران)

(আমাদের দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়গু লোর মধ্যে একটি এই যে আমাদের ইমামদের এমনি অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে যে কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিস্তা বা প্রেরিত রাসুলও তার নিকটে পৌঁছুতে পারে না। আমাদের রেওয়ায়েত ও হাদিস সমুহের ভিত্তিতে মহান রাসুল (সঃ) ও ইমামগণ (আঃ) এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে নূর ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তার আরশকে বেষ্টনকারী রূপে রাখলেন এবং তাদেরকে এমন মর্যাদা ও নৈকট্যদান করলেন যে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।)

আয়াতুল্লাহ খোমেনী তার এই মন্তব্যে তাদের ইমামদের মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফিরিস্তাদের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। বরং তার ভাষায় নবীগণ বা ফিরিস্তারা ইমামদের মর্যাদার কাছাকাছি পৌঁছুতেও অক্ষম। অর্থাৎ ইমামগণ হলেন মুখ্য আর নবীগণ হলেন গৌন। খোমেনী সাহেব অন্যত্র বলেছেন;

فان للامام مقاما محمودا و درجة سامية و خلافة تكوينية تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات الكون – (الحكومة الاسلامية)

(ইমামের জন্য রয়েছে প্রশংসিত স্থান ও সমুন্নত মর্যাদা এবং রয়েছে সৃষ্টি জগতের পরিচালন ক্ষমতা, যে ক্ষমতাকে বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি অনুপরমাণু আনুগত্য করে ও মাথা নত করে দেয়।)

এখানে ইমামের মর্যাদা নবীর মর্যাদার চাইতেই শুধু উন্নততর করে দেখানো হয়নি, বরং ইমামদেরকে তিনি খোদায়ী শক্তিরও অংশীদার বানিয়েছেন, কেননা ইসলাম যে

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে তাতে প্রকৃতির সব কিছু তার অণু পরমাণু কেবল আল্লাহ্‌রই অনুগত। আয়াতুল্লাহ খোমেনী আরো বলেন;

لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة – (الحكومة الاسلامية)

(ইমামগণ কোন বিষয় ভুলে যেতে পারেন বা গাফেল হতে পারেন এমন কথা আমরা চিন্তাও করতে পারিনা।)

ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে সাধারনভাবে যারা জ্ঞান রাখেন তারা ইমাম খোমেনীর এই মন্তব্যগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মেনে নিতে পারেন না। এখানে আমরা কিছু বিশিষ্ট ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের এমন সব মন্তব্য তুলে ধরবো, যা শীয়া মতবাদের ইমাম হিসাবে তাদেরই মন্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো শীয়া সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত গ্রন্থাবলী থেকে নেয়া হয়েছে। এসব মন্তব্য যাদের মন্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সত্যতা যাচাই করার কোন উপায় নেই। এসব মন্তব্যগুলো শীয়াদের মধ্যে বহুল প্রচারিত এবং তাদের আলেমগণ এভাবেই দাবী করেছেন। অধিকাংশ বিষয়েরই আপত্তিকর মন্তব্যগুলো হযরত জাফর সাদেকের নামের সাথে জড়িত করে ফেলা হয়েছে। বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ্‌র হাদিস সংরক্ষণের মত কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিয়ম পদ্ধতি সেখানে নেই। হাদিস সংকলনে বর্ণনাকারী থেকে মূল কথার ধারক পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার ব্যবস্থা রয়েছে, যার দ্বারা সনদের মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার পথ খোলা থাকে এবং উক্ত হাদিসের বা বর্ণনার মান নির্ধারিণ করা যায়। এভাবেই শুদ্ধ, ভাল বা দূর্বল হাদিসের সনাক্ত করা যায়, বানানো বা মন গড়া হাদিস ধরা পড়ে যায়। আবার ঐ হাদিস বা বর্ণনার বক্তব্যকে কোরআন হাদিসের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সাথে মূল্যায়ন করার ও ব্যবস্থা রয়েছে। তাই কোন অবৈধ ধারণা বা বিষয় সম্বলিত কোন হাদিস বা বর্ণনা টিকতে পারেনা। কিন্তু শীয়াদের বেলায় এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার দ্বারা বর্ণনাকারীর বর্ণনার সত্যতা বিচার করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হযরত জাফর সাদেকের ইন্তেকালের ২০০ বা ৩০০ বছর পর কোন শীয়া আলেম কোন কিতাব লিখতে গিয়ে লিখলেন 'ইমাম জাফর এ কথা বলেছেন' তিনি বললেন না, এ কথা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন বা কার কাছে শুনেছেন, বা এ কথা তার কাছে কোন পরম্পরায় পৌছুলো। শীয়ারা তার এই কথা মেনে নিলো এবং সর্বত্রই সে কথা ইমাম জাফরের মন্তব্য বলে স্বীকৃতি পেলো। কিন্তু আসলে কথাটি ঐ আলেমেরই বক্তব্য মাত্র। ইমাম জাফরের সাথে সে কথার কোন সম্পর্ক নেই। বিনা প্রমাণে ইমাম জাফরের কথা বলে দাবী করা অপরাধ।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সব সন্তব্যগুলো ইমাম জাফর বা অপরাপর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের মন্তব্য বলে বিভিন্ন শীয়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে মন্তব্য গুলো কোরআন হাদিসের মূল শিক্ষার পরিপন্থি এবং শীয়াবাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র সেখানে। তাই সে সব কথা ও মন্তব্য গুলোকে আমরা ঐ সব লিখকদের দাবী অনুযায়ীই লিখবো, কিন্তু

www.pathagar.com

ঐ সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের মন উন্মুক্ত রাখবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সব কথা যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতিষ্টিত আকিদার পরিপন্থি ঐ সমস্ত সম্মানিত লোকদের কথা নয়। এ গুলো স্বার্থান্বেষী লোকদের মনগড়া কথা, যা জনশ্রুতির ভিত্তিতে প্রচলিত ও সংকলিত।
এখন আমরা এই প্রসংগে আরো কতিপয় মন্তব্য উল্লেখ করবো;
ইমাম আলী বিন মুসা বলেছেন;

الامام المطهر من الذنوب و المبرأمن العيوب – فهو معصوم مويد، موفق ، مسدد قد أمن من الخطـأ و الزلل و العثار – يخصه الله بذلك ليكون حجة على عباده و شاهده على خلقه–(اصول الكافى)

(ইমাম সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তি ওত্র ৰুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র । তিনি নিষ্পাপ, আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্যে ও ক্ষমতার বলিয়ান, আল্লাহ তাকে অবিচল রাখেন, তারা ভুল ত্রুটি ও পদসখলন থেকে নিরাপদ ও নিরাপত্তায় থাকেন। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তারা বৈশিষ্টমন্ডিত হন যেনো তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর তার প্রমান এবং তার সৃষ্টিকুলের উপর সাক্ষী হতে পারেন।)

ইমামের এই মর্যদা নিঃসন্দেহে নবুয়তের মর্যদার চাইতে শ্রেষ্টতর। নবীগন মানুষ ছিলেন তাই মানুষ হিসাবে কখনও কখনও ভুল বা বিস্মৃতি সম্ভব। বাস্তবে যা ঘটেছে ও নবীদের জীবনে, কিন্তু যে মর্যাদা এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেটা অতি মানবের মর্যদা।

শীয়াদের বিশিষ্ট পন্ডিত আল্লামা বাকের মজলেসী তার লিখিত হায়াতুল কুলুব গ্রন্থে প্রমান করেছেন যে ইমামদের মর্যাদা রাসুলদের মর্যদার চাইতে উন্নতর। এ কারণেই কালেমায়ে তাইয়েবার দ্বিতীয় অংশটি (محمــد رســول الله) শীয়া সমাজে স্বল্প উচ্চারিত। ইরানের রাজনৈতিক ইসলামী সমাবেশে বা মিছিলে কালেমা তাইয়েবার প্রথম অংশ বলার পর তার দ্বিতীয় অংশ হিসাবে (علــى ولى الله) বেশী উচ্চারিত হয়। এভাবে শীয়া দ্বীনে ইমামের এই মর্যদায় রাসুলের অপরিহার্যতা অনেকাংশেই লঘু হ'য়ে গেছে।
ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন,

ماجاء به على أخذبه و ما نهى عنه انتهى عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد ولمحمد الفضــل على جميع خلق الله عزو جل المتعقب عليه فى شئى من احكامه كاالمتعقب على الله و على رســوله و الراد عليه فى صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله ، كان امير المومنين باب الله الذى لايوتــــى الاّ منه و سبيله الذى من سلك بغيره يهلك وكذلك جرى لائمة الهدى واحــد بعــد واحــد –

(اصول الكافى)

(আলী যে বিধান সমুহ উপস্থাপন করেছেন, তার উপর আমল করি আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকি। তার জন্য তেমনি মর্যদা যেমন মোহাম্মদ (সঃ) কে দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আল্লাহর সারা সৃষ্টির উপর। আলীর উপর তার কোন আদেশ নিষেধে আপত্তি উত্থাপনকারী তেমনি অপরাধী যেমন আল্লাহ ও রাসুলের বিধানের উপর

www.pathagar.com

আপত্তি উত্থাপন কারী। আলীর কোন কথা যা বড়ই হোক আর ছোট, অস্বীকার করা আল্লাহর প্রতি শিরকের সমতুল্য। আমিরুল মুমেনীন আল্লাহর এমনি দরজা যা ব্যতিরেকে আর কোন দরজা দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়। ঐ ছাড়া অন্য কোন রাস্তায় ধংশ অনিবার্য, এমনি ভাবে সমস্ত হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের মর্যাদা চালু রয়েছে একের পর এক)

ইমাম জাফরের আর একটি মন্তব্য নিম্নরূপ;

ان الائمة عليهم السلام يعلمون ما كان و ما يكون وانه لايخفى عليهم شئ صلوات الله عليـــهم – (اصول الكافى)

(ইমামগণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু জানেন। কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়)

ইমাম জাফরের মতানুযায়ী হযরত আলী ও অপরাপর ইমামগণ হচ্ছেন বিধান দাতা। সাধারন মুসলমানগণ যেমন রাসুলেপাকের আনুগত্য ও অনুসরন করে। হালাল-হারাম, নির্দেশ-নিষেধের সার্বিক অধিকার ইমামদেরই এখতিয়ার ভুক্ত। অপরদিকে তাদের ইমামগন গায়েবের আলেম। বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তারা জানেন। ইসলামী আদর্শবাদে গায়েবের ইলম একমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতা, বিশ্বের কোন সৃষ্টিই, এমনকি আল্লাহর নবী রাসুলগন ও গায়েবের ইলম রাখতেন না। কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এ কথা সুস্পষ্ঠ করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের এই প্রতিষ্টিত আকিদার বিরুদ্ধে শীয়াগণ তাদের ইমামদের কে গায়েবের আলেম মনে করেন অর্থাৎ তাদের ইমামগণ শুধু নবীদের চাইতেই শ্রেষ্ট নয়, বরং আল্লাহর ক্ষমতায় ও অংশীদার;

ইমাম বাকের বলেন,

ان الله لايستحى ان يعذب أمة دانت بامام ليس من الله و ان كانت فى اعمالها بـــرة تقيـــه و ان الله ليستحى ان يعذب أمة دانت بامام من الله و ان كانت فى اعمالها ظالمة مسيئة – (اصول الكافى)

(আল্লাহ পাক এমন উম্মতকে শাস্তি দিতে বিরত হবেন না যারা এমন ইমামকে মান্য করবে যিনি আল্লাহর মনোনীত নন (যেমন সাধারন মুসলমানগন হযরত আবু বকর, উমর ও উসমানকে খলিফা হিসাবে মান্য করে) যদিও ঐ উম্মত আমলের দিক দিয়ে সৎ ও পরহেজগার হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ এমন উম্মতকে শাস্তি দিতে বিরত থাকবেন যারা এমনি ইমাম মান্য করবে যারা আল্লাহর মনোনীত (যেমন শীয়া, যারা হযরত আলীকে ইমাম মান্য করে) যদিও সেই উম্মত আমলের দিক দিয়ে গোনাহাগার ও জালেম)

এটা একজন শীয়া ইমামের কথা মাত্র নয়, বরং শীয়া উম্মাহর ধর্মদর্শনই এটা। যা নাসারাদের ধর্ম দর্শনের সাথে মিলে গেছে। নাসারারা যেমন হযরত ইসাকে আল্লাহর প্রতিভূ বানিয়ে আমল থেকে মুক্তি পেয়েছে, শীয়ারা ও তেমনি। ইমামদেরকে আল্লাহর প্রতিভূতূল্য বানানোর পর এবং উপরোক্ত দর্শন প্রচারিত হবার পর সাধারন শীয়া আর আমলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা। ইমামদের প্রতি ইমান থাকাটাই নাযাতের জন্যে যথেষ্ট। ইমামগন তাদের অনুসারীদের রক্ষা করবেন। এ কারনেই আজকের ইরানের আলীশ্বান

www.pathagar.com

মসজিদ গুলোতে নামাজের ব্যবস্থা কমই। রাজনৈতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলোতে অগণিত মানুষের ভীড় হয় ঠিকই কিন্তু দ্বীনে মুহম্মদীর আনুগত্য লঘু থেকে লঘুতর হয়ে যাচ্ছে।
ইমাম জাফরের আর একটি মন্তব্য,

و كان أمير المومنين كثيرا يقول أنا قسيم بين الجنة و النار و أنا صاحب العصا و الميسم و لقد أقرت لى جميع الملائكة و الروح و الرسل مثل ما أقروا به محمد – (اصول الكافى) •

(আমেরুল মুমেনিন প্রায়ই বলতেন আমি আল্লাহর তরফ থেকে জান্নাত ও দোযখের বন্টন কারী হবো, আমার কাছে মুসার লাঠি ও সোলাইমানের আংটি রয়েছে, আমার জন্য সমস্ত ফেরেস্তা, জিব্রিল এবং সমস্ত রাসুলগন তেমনি শপথ নিয়েছিলেন যেমন মোহাম্মদের জন্য নেয়া হয়েছিলো।)

এ কথা দ্বারা তারা হযরত আলীকে নবী হিসাবেই তুলে ধরেছেন। অতঃপর আমাদের আখেরী নবী আর শেষ নবী রইলেন না।
ইমাম জাফর বলেন,

ان عندنا علم التوراة و الانجيل و الزبور و تبيان مافى الالوح – (اصول الكافى)

(আমাদের কাছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুরের ইলম রয়েছে এবং এই সব কিতাবগুলোর মধ্যে সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।)

ইমাম জাফর সাদেক আরো বলেছেন,

نحن شجرة النبوة و بيت الرحمة و مفاتيح الحكمة و معدن العلم و موضع الرسالة و مختلف الملائكة – (اصول الكافى)

(আমরা নবুয়তের বৃক্ষ, রহমতের ঘর, হিকমতের চাবি, ইলমের খনি, রিসালাতের পাদপিঠ ও ফিরিস্তাদের মিলন ক্ষেত্র)

ইমাম জাফরের আর একটি মন্তব্য,

و انا عندنا الجفر و ما يدريهم ما الجفر – قال قلت و ما الجفر ؟ قال وعاء من أدم فيه علم النبين و الوصيين و علم العلماء الذين مضو من نبى اسرائيل ثم قال و ان عندنا مصحف فاطمة عليها السلام و ما يدريهم ما مصحف فاطمة قال فيه مثل قرأنكم هذا ثلث مرات والله مافيه من قرأنكم حرف واحد – (اصول الكافى)

(আমাদের কাছে 'আল জুফার' আছে। তারা জানে কি, আল জুফার কি? আমি তখন জিংগাসা করলাম, সেটা কি? ইমাম বললেন, সেটা হলো চামড়ার একটা থলে, তার মধ্যে সমস্ত নাবীদের ও প্রতিনিধিদের ইলম রয়েছে, আরো রয়েছে বনী ইসরাইলী উলেমাদের ইলম, অতঃপর বললেন, আমাদের কাছে ফাতেমার কিতাব রয়েছে, তারা জানে কি

www.pathagar.com

ফাতেমার কিতাব কি? ইমাম বললেন, ফাতেমার কিতাবটি তোমাদের কোরআনের চাইতে ৩গু ণ বড়, যার মধ্যে তোমাদের কোরআনের একটি শব্দ ও নেই)

হিদায়াতের এই উদ্ভুত উৎসের কথা কোন রূপকথার কাহিনী বলে মনে হয়। এই বর্ননায় 'মসহাফে ফাতেমা' বলে যে কিতাবের উল্লেখ রয়েছে ইমাম জাফরের অন্য এক বর্ণনায় তা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাসুলে পাকের তিরোধানের পর হযরত ফাতেমা যখন খুবই মর্মাহত, যা শুধুই আল্লাহই জানতেন। তাই আল্লাহ পাক ফিরিস্তা পাঠিয়ে তাকে শান্তনা দানের ব্যবস্থা করেন। হযরত ফাতেমা যখন এই কথা হযরত আলীকে বললেন, তিনি তখন বললেন, হে ফাতেমা, যখন ফিরিস্তারা আবার আগমন করেন, আমাকে জানাবে, অতঃপর যখন ফিরিস্তারা আবার আগমন করলেন, হযরত ফাতেমা তাকে জানালেন। হযরত আলী ফিরিস্তাদের কথাগুলো কাগজের পাতায় লিখে রাখলেন। সেটাই হলো 'মসহাফে ফাতেমা' সেই মসহাফই এমন কিতাব যা কোরআনের তিন গুন বড়। যার মধ্যে কোরআনে কারিমের একটি শব্দ ও নেই। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ও বৃহত্তর কোরআন দেয়া হলো, যা শুধু শীয়া ইমামদের কাছেই রয়েছে এবং শীয়ারাই তার আমল করে।

ইমাম জাফর অন্যত্র বলেছেন,

اما علمت ان الدنيا و الاخرة للامام مضيعوا حيث يشأ و يدفعها الى من يشأ – (اصول الكافى)

(তোমরা জান কি, ইহকাল ও পরকাল সবই ইমামের মালিকানা, যিনি যথা ইচ্ছা রাখবেন ও যাকে ইচ্ছা দিবেন। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের ভাল মন্দ সবই ইমামের নিয়ন্ত্রনে, যাকে যতটুকু ইচ্ছা করেন দিবেন।) অর্থাৎ সব ক্ষমতা ইমামদের হাতে যা একান্ত আল্লাহরই এক্তিয়ার ভূক্ত বলে কোনআন সুস্পষ্ঠ করে দিয়েছে।

ইমামের আত্মগোপনঃ ছোট ও বড় নিরুদ্দেশ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে শীয়াদের দ্বাদশ ইমাম হাসান বিন আলী আসকারীর পুত্র মুহম্মদ বিন হাসান প্রায় ১২০০ বছর পূর্বে ২৫৫ হিঃ জম্মলাভ করেন। তিনি হলেন শীয়াদের শেষ ইমাম বা গায়েবী ইমাম। যিনি মত্র ৪/৫ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যান এবং এক পাহাড়ের গোহায় আত্মগোপন করেন। এবং আজও তিনি সেখানে জীবিত আছেন এবং সেখান থেকেই শীয়া উম্মত তথা বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। শেষ ইমাম পাহাড়ের গোহাতেই অবস্থান করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের পূর্বে কোন এক সময় পাহাড়ের গোহা থেকে বেরিয়ে এসে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি তার সাথে হযরত আলী কতৃক সংরক্ষিত আসল কোরআন যা বর্তমান কোরআন থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র 'মাসহাফে ফাতেমা' 'আল জোফর' ইত্যাদি নিয়ে আসবেন। তিনি শেষ যামানার ইমাম, গায়েবী ইমাম বা 'মাহদী' বলে পরিচিত হবেন।

শীয়াদের আকিদা মতে তাদের গায়েবী ইমাম পাহাড়ের গোহায় আত্মগোপন করার পর প্রথম কয়েক বছর তার বিশিষ্ট কয়েকজন সহচরের মাধ্যমে তার উম্মতের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তার ঘনিষ্ট সহচরগণ পাহাড়ের গোহায় গিয়ে তার সাথে দেখা করে আসতেন এবং ইমামে গায়েবের সীল মোহর সহ তার নির্দেশাবলী নিয়ে আসতেন। আত্মগোপনের এই পর্যায়কে শীয়া আকিদায় ছোট নিরুদ্দিষ্ট (الغيبة الصغرى) বলা হয়ে থাকে। অতঃপর ইমামে গায়েবের এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন থেকে শুরু হয় 'বড় আত্মগোপন' বা (الغيبة الكبرى) এর অধ্যায়।

শীয়া উম্মতের ইমামতের এটাও এক অদ্ভুত ইতিহাস। যেহেতু তাদের আকিদা মতে নিস্পাপ ইমামের পুত্র সন্তানই পরবর্তী ইমাম এবং এই বংশ পরম্পরাতেই তাদের ইমামতের ধারা চলছিলো। কিন্তু একাদশ ইমাম হাসান আসকারীর সময়েই এধারায় বাধা সৃষ্টি হয়। ইমামের পারিবারিক সুত্র থেকে জানা যায় যে ইমাম হাসান আসকারী নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি নিঃসন্তানই ইন্তেকাল করেন। যেহেতু শীয়া আকিদা মতে নিস্পাপ ইমামদের উপস্থিতি অপরিহার্য। ইমামের উপস্থিতি ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতি টিকতে পারে না, তাই ইমাম হাসান আসকারীর ইন্তেকালের ৪/৫ বছর পূর্বে তার এক বাদীর কোলে এক পুত্র সন্তানের খবর দেয়া হয়। সেই পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়। অতঃপর ইমামের ইন্তেকালের মাত্র ১০ দিন পূর্বে তার ৪/৫ বছরের শিশুপুত্র ইমামে গায়েব হিসাবে আত্মগোপন করে পাহাড়ের গোহায় অবস্থান নেন। এই শিশুপুত্রকে তার আত্মগোপনের পূর্বে কেউ দেখেনি। অবস্থা দৃষ্টি মনে করা স্বাভাবিক যে যদি ইমাম হাসান আসকারীর সত্যি কোন পুত্র সন্তান থাকতো তবে ইমামে গায়েবের এই ইতিবৃত্ত সৃষ্টি করার প্রয়োজন দেখা দিতো না। শীয়া ফিরকার অপরাপর শাখা-প্রশাখার মত আজও তাদের জীবিত ইমাম অবস্থান করতেন।

শীয়াদের মতে যেহেতু ইমামে গায়েব লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন তাই তার জীবিত প্রতিনিধির অবস্থান অপরিহার্য। ঐ প্রতিনিধির আনুগত্য ও ইমামে গায়েবের আনুগত্যের মতোই অপরিহার্য। আয়াতুল্লাহ খোমেনী তার সময়ে ইমামে গায়েবের প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে আয়াতুল্লাহ খোমেনায়ী সেই প্রতিনিধি। তার আনুগত্য ইমামে গায়েবেরই আনুগত্য।

ইমাম মেহদীর ভূমিকা

বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস রাখে যে কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মেহদী জন্মগ্রহন করবেন। সে সময়েই হযরত ইসা (সাঃ) আকাশ থেকে স্বশরীরে অবতরণ করবেন এবং তারা সারা বিশ্বে ইসলামী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।

কিন্তু শীয়া মযহাবে ইমাম মেহেদী বা তাদের শেষ ইমামের কাজ হবে ভিন্নতর। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি হযরত আলীর পূর্বতন তিন খলিফা ও রাসুলে পাকের পবিত্র স্ত্রীদের (امهات المومنين) উপর প্রতিশোধ নেবার কাজকেই তার পবিত্র দায়িত্ব (!) হিসেবে

www.pathagar.com

পালন করবেন। এই বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ প্রবণ মনোভাবের কারণেই শীয়া আলেমগণ তাদের আখেরী ইমাম মেহদীর সত্বর আগমনের জন্য সব সময় দোয়া করেন।

ইমাম বাকের বলেন,
"যখন ইমাম মেহদী আবির্ভূত হবেন, তিনি কাফেরদের পূর্বে সূন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সুন্নী আলেমদের বিরুদ্ধে নিধন যজ্ঞ চালাবেন।"

"যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, আল্লাহ ফিরিস্তাদের দ্বারা তাকে সাহায্য করবেন। তার হাতে বাইয়াতকারীদের মধ্য সর্বপ্রথম থাকবেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ) অতঃপর হযরত আলী, তিনি হযরত আয়েশাকে জীবিত করে তার বিরূদ্ধে হযরত ফাতেমার প্রতিশোধ নেবেন।" (علامة باقر مجلسي/حق اليقين)

আল্লামা বাকের মজলিসী তার কিতাবে এই প্রতিশোধের এমন বর্ব্বর চিত্র তুলে ধরেছেন। যা কোন দ্বীনদ্বার লোক শুনতে রাজী হবেন না। হযরত আবুবকর ও হযরত উমরের বিরূদ্ধেই তাদের প্রতিশোধ প্রবণতা তীব্রতর। এ সব বর্ণনা স্ববিস্তারে লিখে মুমিন মুসলমানদের মনে কষ্ট দেয়া ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না।

শীয়া মযহাবের দুইটি মূলনীতি

শীয়া মযহাবের সমস্ত ইমামগণ ও উল্লেখযোগ্য পন্ডিতগণ তাদের দ্বীনের দুইটি মূলনীতির উল্লেখ করেছেন, তা হলো;

(১) (كتمان الحق) বা সত্যকে গোপন রাখা।

(২) (التقية) বা সত্যকে গোপন করার কৌশল হিসেবে আসল কথা না বলে মিথ্যার মাধ্যমে শ্রোতাকে প্রতারিত করা।

সত্যকে গোপন রাখাই হলো শীয়া মযহাবের ভিত্তি। তাদের আসল আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গোপন রেখে জনগণের গ্রহণযোগ্য কথা বলে তাদের মযহাব টিকিয়ে রাখার এই প্রয়াস তাদের মযহাবের সুচনালগ্ন থেকেই অব্যাহত রয়েছে। তাদের মযহাবের বাইরের লোকদের কাছে আসল কথা না বলে প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করা তাদের দৃষ্টিতে দ্বীনের কাজ। শুধুমাত্র নিজেদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী-বিশ্বস্থ লোকদের কাছেই তাদের আসল আকিদা ও বিশ্বাস প্রকাশ করা যাবে। এর ফলে শীয়াদের আসল রূপ ইসলামের ইতিহাসে কোন দিনই সুস্পষ্ট হয়নি। তাদের মৌলিক গ্রন্থাবলীতে, যা সহজলভ্য নয়, শীয়া মযহাবের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সাধারনভাবে প্রচারিত আদর্শবাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।
ইমাম জাফর বলেছেন,

www.pathagar.com

انكم على دين من كتمه اعزه الله و من اذاعه اذله الله (اصول الكافى)

(তোমরা এমন দ্বীনের অনুসারী যে যারা এই দ্বীনকে গোপন রাখবে আল্লাহ তাকে সম্মান দেবেন, আর যারা এই দ্বীনের প্রচার করবে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।)

ইমাম বাকের বলেন,

ان احب اصحابى الىّ اودعهم وافقهم و اكتمهم لحديثنا (اصول الكافى)

(আমার সাথীদের মধ্যে তারাই আমার বেশী প্রিয় যারা বেশী খোদাভীরু, বেশী ওয়াকিফহাল ও আমাদের মতাদর্শকে বেশী করে গোপন করে।)

পক্ষান্তরে দ্বীনে ইসলামের মৌলিক কাজ হলো এই আদর্শবাদের প্রচার ও প্রসার। সারা কোরআনে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তাকিয়া মূলতঃ সুন্নি উলেমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। শীয়া আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুন্নিদের বিভ্রান্ত করে রাখাই এই আকিদার উদ্দেশ্য।

ইমাম জাফর বলেছেন,

يا ابا عمير تسعة اشعار الدين فى التقية و لادين لمن لاتقية له – (اصول الكافى)

(হে আবু উমায়ের, আমাদের দ্বীনের দশ-ভাগের মধ্যে নয় ভাগই হলো তাকিয়া। যার তাকিয়া নাই, তার দ্বীন ও নাই।)

তিনি আরো বলেছেন,

لا و الله ما على وجه الارض شئى احب الىّ من التقية ياحبيب انه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله – (اصول الكافى)

(আল্লাহর শপথ, বিশ্ব জগতে তাকিয়ার চাইতে প্রিয় কিছু নেই। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়া করবে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকিয়া করবে না আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।)

এই তাকিয়ার ফরজ আদায় করতে তাদের ইমামদের আদর্শ দেখানো হয়েছে। তার থেকে বুঝা যায় যে তাকিয়ার জন্যে কোন বিষয় নির্দিষ্ট নেই। দ্বীনের যে কোন বিষয়ে বা অপরাপর কোনও ব্যাপারে তাকিয়া করা শুধু জায়েজই নয়- ফরজ।

তাকিয়ার এই আকিদাকে যদি গোপন রাখা না হতো তবে এই তাকিয়ার কল্যাণে সমস্ত শীয়া সম্প্রদায় বিশ্ব সমাজে চরম অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য জনগোষ্ঠিতে পরিণত হতো। আইন-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্য সহ মানবজীবনের কোন পর্যায়েই তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হতো না বা তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করতো না। শীয়া মতবাদের এই দুই মূলনীতির স্বরূপ জানার পর তাদের সাথে কোন লেনদেন, সন্ধি বা সমঝোতায় আস্থা রাখা যায় কি?

www.pathagar.com

ইসলামের কষ্ঠিপাথরে ইমামতের দর্শন

ইমামত হলো এমন একটি বুনিয়াদ যার উপর শীয়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। এই বুনিয়াদ ছাড়া শীয়া দ্বীনের কোন অস্তিত্ব নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত ইমামত সম্পর্কে শীয়া মযহাবের যে সমস্ত বর্ণনাগুলোও মতামত তুলে ধরা হয়েছে, তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

(১) ইমামগণ আল্লাহ কতৃক মনোনীত। প্রত্যেক ইমামের পুত্র সন্তান তার পরবর্তী ইমাম।
(২) ইমামগণ শেষ নবীর সমকক্ষ ও পূর্বতন সমস্ত আম্বিয়াদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর। শেষ নবীর উপর শুধু কোরআন নাযিল হয়েছে; আর ইমামদের কাছে পূর্বতন নবীদের সহীফাসমূহ, মসহাফে ফাতেমা, আল জোফার ইত্যাদি ঐশী উৎস সমূহ রয়েছে।
(৩) ইমামগণ সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাদের নির্দেশ ছাড়া বিশ্ব প্রকৃতির অনু-পরমাণুও চলতে পারে না।
(৪) বিশ্বটিকে থাকার জন্যে ইমামের অস্তিত্ব অপরিহার্য। ইমাম না থাকলে বিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে।
(৫) ইমামগণ বেহেশত দোযখের মালিক। কাউকে নিজের ইচ্ছায় বেহেশতে বা কাউকে দোযখে দেবার ক্ষমতা তাদের রয়েছে।
(৬) ইমামদের উপর ঈমান আনা বা না আনার উপর ঈমান ও কুফর নির্ভর করে।
(৭) আমল না করলেও ইমামের উপর ঈমানই নাযাতের জন্যে যথেষ্ট। ইমামের উপর ঈমান না আনলে কোন নেক কাজই কাজে আসবে না।
(৮) ইমাম যাকে ইচ্ছা জীবিত করতে সক্ষম। কাউকে বার বার জীবন দানে ও মৃত্যু ঘটাতে পারেন।
(৯) ইমামের মর্যাদা নবুয়তের মর্যাদার চাইতে উন্নততর।
(১০) ইমামগণ নবীদের মত নিস্পাপ।
(১১) ইমাম মেহ্দীর হাতে বাইয়াত করার জন্যে রাসূলে পাক, হযরত আলী ও ফাতেমা কিয়ামতের পূর্বে আবার জীবিত হবেন।
(১২) ইমামগণ সব গায়েবী ইলম জানেন। বিশ্ব প্রকৃতির কোন কিছুই তাদের অজানা নেই।
(১৩) ইমামদের কাছে ফিরিস্তাদের আগমন হয়ে থাকে।
(১৪) আসল কোরআন শুধু ইমামদের কাছেই রয়েছে।
(১৫) ইমামতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ছাড়া সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, মুমিন নারী-পুরুষ সবাই বেঈমান, ফাসেক ও বেদ্বীন।

ইমামত সম্পর্কে উপরোক্ত আকিদার ফসল নিম্নরূপ:

(১) ইমামগণ আল্লাহর গুণের অংশীদার, তারা আল্লাহর অবতার। আল্লাহর ক্ষমতা ইমামদের হাতে ন্যস্ত।
(২) শেষ নবীর ইন্তেকালে নবুয়ত প্রকারান্তরে বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং ইমামতের মাধ্যমে নবুয়তের মর্যাদা ও পরম্পরা বহাল রয়েছে।

www.pathagar.com

শীয়া দর্শনের ইমামত সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্লেষনের পর এই আকিদা ও বিশ্বাসের বিরূদ্ধে কোন যুক্তি বা প্রমাণ তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। ইসলাম সম্পর্কে সাধারন জ্ঞান সম্পন্ন একজন মুসলমানও এসবের অসারতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

এসব আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে কোরআন হাদিসের দূরতম সম্পর্কেও নেই। ইসলামের ইতিহাসে আকিদা বিশ্বাসের মৌলিকত্বে এতো ব্যাপক বিরোধ আর কোন ফিরকার তরফ থেকে এসেছে বলে জানা যায় না।

শীয়াদের বেলায়েতে ফকীহ্ মতবাদ ও রাজনৈতিক দর্শন

ইমামে গায়েবের অনুপস্থিতিতে তার জীবিত প্রতিনিধির অবস্থান অপরিহার্য। সেই প্রতিনিধি সময়ের ইমাম হিসেবে পরিগণিত। রাজনৈতিকভাবে শীয়াবাদে এই ব্যবস্থাকে বেলায়েতে ফকীহ্ বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় 'ফকীহ্'র আনুগত্য ইমামের আনুগত্যের মতোই ফরজ। শীয়া আকিদায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নবীর আনুগত্য ইমামের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। ইমামের আনুগত্যই আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য। এটি একটি স্বয়ং সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের আনুগত্যই হলো শীয়া রাজনীতি। খোমেনী সাহেবের (ولاية الفقيه)-এর মর্মও এটাই।

ইমাম খোমেনী বলেছেন,

اذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فانه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي منـــهم و وجب على الناس ان يسمعوا له و يطيعوا و يملكه هذا الحاكم من امر الادارة و الرعايه و السياســة للناس ما كان يملك الرسول و أمير المومنين – (الحكومة الاسلامية)

(যখন কোন ফকীহ্ জ্ঞানে ও ন্যায় বিচারের মানদন্ডে কোন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে দাঁড়িয়ে যান, তখন তিনি সেই সমাজে ঐ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন যা নবীদের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। সকল জন সাধারনের জন্য তার আনুগত্য ফরজ। এই ফকীহ্ সরকার পরিচালনায়, সামাজিক জীবনের প্রশাসনে ও বিধি বিধান প্রয়োগে উম্মতের রাজনীতি পরিচালনায় স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হন। যেমনটি ছিলেন আল্লাহর নবী ও আমিরুল মুমেনীন আলী।)

খোমেনী সাহেব এখানে হযরত আবু কবর, উমর ও উসমান (রাঃ) কে ইচ্ছাকৃতভাবে খারিজ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে খোমেনীর আমলে তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন।

ইমাম খোমেনী অন্যত্র বলেছেন,

ان الفقهاء هم اوصيأ الرسول من بعد الائمة و فى حال غياهم و قدكلفوا بالقيام بجميع مـــا كلـــف الائمة بالقيام به –(الحكومة الاسلامية)

www.pathagar.com

(ফকীহগণ ইমামগণের পর বা তাদের অনুপস্থিতিতে রাসুলের প্রতিনিধি। তারা সে সব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী যা ইমামের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো।)

অর্থাৎ ফকীহগণও সরাসরি রাসুলের প্রতিনিধি। তাদের আনুগত্য রাসুলেরই আনুগত্য। বর্তমান যুগে ইমাম খোমেনায়ী এই মর্যাদায় সমাসীন রয়েছেন। ফকীহ যা বলেন তার দ্বীনি ভিত্তি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল এখতিয়ার তারই। যিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। জনগণের নির্বাচিত সরকারের সমালোচনা করা একটা বৈধ কাজ, কিন্তু ফকীহর কোন সিদ্ধান্তের সমালোচনা অবৈধ বা অন্য ভাষায় তার সমালোচক মোনাফিকও বেদ্বীন। তিনি সরকারের সমালোচনা করতে বা সরকারকে উৎখাত করতে পারেন, কিন্তু সরকার তার বিরূদ্ধে একটি শব্দও করতে পারে না।

এখানে চতুর্দশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের পোপবাদের চেহারা দেখা যায়। যাকে ধার্মিকদের শাসন বা মোল্লাতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় ধর্মীয় নেতাই সকল ক্ষমতার আধার হয়ে থাকে। তাই শীয়া রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তাদের ফকীহর হাতে ন্যস্ত। তাই তাকে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় এক নায়ক বা অন্য ভাষায় এই ব্যবস্থাকে ধর্মীয় স্বৈরাচার বলা যায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একে (Theocracy) বলা হয়েছে। শীয়াবাদে ব্যক্তি বা তার প্রতিষ্ঠানের আনুগত্যই আদর্শের আনুগত্য বলে স্বীকৃত।

পক্ষান্তরে ইসলামের খিলাফত আল্লাহর কোরআন ও সুন্নতে রাসুলের প্রয়োগ বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র। এর আনুগত্য শর্তহীন নয়। নিঃশর্ত আনুগত্য শুধু আল্লাহ ও রাসুলের। কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে খলিফার মতামতকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, বরং তেমনি সমালোচনা অপরিহার্য। আদর্শই আনুগত্যের উৎস। আদর্শ স্বয়ং সম্পন্ন। এর কোন সরকারী ব্যাখ্যাতা নেই। প্রত্যেক মানুষের জন্যেই সমালোচনার দরজা উম্মুক্ত। খোলাফায়ে রাসেদীনদের যুগে সমালোচনার এই মৌলিক অধিকার শুধু স্বীকৃতই ছিলো না, বরং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতও হয়েছে।

হযরত উমর বলেছেন,

دعه لاخير فيهم ان لم يقولوها لنا و لاخير فينا ان لم نقبل – (كتاب الخراج)

(তাদেরকে সমালোচনা করতে দাও। তারা যদি সমালোচনা না করে তবে তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, আর যদি আমরা সেগুলো মেনে না নেই তবে আমাদের মধ্যেও কোন মঙ্গল নেই।)

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে খলিফা বা তার প্রশাসন দেশ শাসন করবেন ইসলামী আদর্শবাদের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে। আর এই শাসন ইসলামী আদর্শবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন আপামর জনসাধারণ। তাই সার্বভৌমত্বের ধারক ও বাহক বলেএখানে কেউ নেই।

www.pathagar.com

শীয়া মযহাবের ফিকাহ

ইমামতের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে ইমামগণ সরাসরি আল্লাহরই প্রতিনিধি। তারা নিজেরাই হালাল হারাম, বৈধ অবৈধতার নিয়ামক। তাই স্বভাবতই তাদের ফিকাহর উৎসও তারাই। ইমামহণ যা বলেছেন, তাই অবশ্য পালনীয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে শীয়া উম্মতের জন্য সংকলিত কোন ফিকাহর কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু হিজরী ২৫৫ সালে যখন তাদের শেষ ইমাম গায়েব হয়ে গেলেন, তখন থেকেই সমস্যার সূচনা হলো। প্রথম কয়েক বছরেও সমস্যা দেখা দিলো না। কেননা কিছু প্রতিনিধির মাধ্যমে ইমামে গায়েবের সীল মোহর সহ তার নির্দেশাবলী পৌঁছে যেতো। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরই সমস্যা দেখা দেয়।

শীয়া ফিকাহর মূল উৎস ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ) এর সমসাময়িক যুগের বিশিষ্ট ফকিহ ছিলেন। ইসলামের ইলমে ফিকাহর সংরক্ষণের কাজ সে যুগেই হয়েছিলো ব্যাপকতর ভাবে। ফিকাহর সংকলনে ইমাম আজম বিভিন্ন সময়ে ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম বাকের, হযরত যায়েদ, আলী বিন হোসাইন ও মোহম্মদ বিন হানফিয়ার সাথে ইলমের আদান প্রদান করতেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। তার নামে ইমামত সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনার উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব যদি তারই কথা হতো তবে ইমামে আযম বা তার পরবর্তী বা সমসাময়িক ইমামদের লিখনীতে অবশ্য তার উল্লেখ থাকতো। ইমাম আজম, ইমাম আবু ইনসুফ, ইমাম মুহম্মদ ও ইমাম জাফরের লিখনীতে ঐ সব বিষয়ের উল্লেখ না থাকা এটাই প্রমাণ করে যে ইমাম জাফর সাদিকের মত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ঐ সব অনৈসলামী ধারনা থেকে অনেক উর্দ্ধে। পরবর্তীযুগে শীয়া সমাজে মনগড়া ও জাল হাদিসের সয়লাবে ঐসব উক্তি সমূহ ইমাম জাফর সাদেকের নামে জড়িত করা হয়েছে। শীয়া উলেমারা ইলমে হাদিস অস্বীকার করার ফলে ঐসব উক্তির সত্যতা যাচাই করার কোন অবলম্বনই নেই। পরবর্তী পর্যায়ে শীয়াদের অন্যান্য চিন্তাধারার মত ফিকাহও সুন্নী বিদ্বেষে লালিত হতে থাকে। ইসলামের ফিকাহ মূলতঃ সংকলিত হয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচার, ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বা তাদের প্রণীত মূলনীতির আলোকে। কিন্তু শীয়াগণ প্রথম তিন খলিফাদের যুগের সমস্ত ইলমকে শুধু বিসর্জনই দেইনি, বরং সে সমস্ত বিচার ও ফয়সালার বিরোধিতা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিচের কয়েকটি উদাহরণ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

- হযরত উমর ফারুকের যামানায় তারাবীহের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায়ের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছিলো। সমস্ত সাহাবাগণ এই ব্যবস্থাকে সুন্নতে রাসুলের সত্যিকার বাস্তবায়ন বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাসুলেপাকের জীবদ্দশায় বিভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ রমজান মাস কোরআনের মাস। এ মাসে হযরত জিব্রাইল সাধারন নিয়মের অনেক বেশী অবতীর্ণ হতেন এবং কোরআনের পুনরাবৃত্তি

www.pathagar.com

করাতেন। তাই রমজানের রাতে জামাতে তারাবিহের ব্যবস্থা করা বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠেনি। রাসুলে পাকের মন মানসিকতা ও আন্তরিক ইচ্ছারই বাস্তব রূপ দেন হযরত ফারুকে আযম। কিন্তু শীয়াগণ তারাবিহের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। শীয়া উম্মতের এই সুন্নি বিদ্বেষী মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন আয়াতুল্লাহ খোমেনী। তিনি তার (كشف الاسرار) গ্রন্থে অভিযোগ করে বলেছেন যে সারা বিশ্বের সুন্নি সমাজ আবু বকর ও উমরের প্রকাশ্য কোরআন বিরোধিতা নীরবে মেনে নিয়েছে।

- (تحرير الوسيلة)-তেই বলা হয়েছে; নামাজে এক হাতের উপর আরেক হাত বাধলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। হাঁ যদি ধোকা দেবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি সুন্নিদের অনুসরণ করে তবে তার নামাজ নষ্ট হবে না।
- হযরত উমরের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে খোমেনী সাহেব তার (كشف الاسرار) গ্রন্থে বলেছেন; কোরআন 'নেকাহ মোতাকে' জায়েজ করেছে আর উমর তা হারাম করেছেন।

নেকাহ মোতা বা ভোগের উদ্দেশ্যে বিবাহ

নেকাহ মোতা বলা হয় স্বল্প সময়ের জন্য মজুরীর প্রতিদানে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যৌন কর্ম করা। তদানিন্তন সমাজের ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত অনাচারগুলো রাসুলেপাক আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে অবৈধ ঘোষনা করেছেন। যেমন মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমে কার্যকরী হয়েছে। কোরআনে প্রথমে বলা হলো, মদে উপকারের চাইতে অপকার বেশী। অতঃপর বলা হলো, তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের কাছেও এসো না। তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে মাদকদ্রব্য চুড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে সুদ ও পর্যায়ক্রমে হারাম করা হয়েছে। নারী সম্ভোগের ব্যাপক অভ্যাসেরও ইতি টেনেছেন পর্যায়ক্রমে। দাস প্রথা তথা কৃতদাসীদের সাথে যৌনকর্ম অবৈধ ঘোষনার জন্য একই হিকমত অবলম্বন করা হয়। অস্থায়ী বা সম্ভোগ বিবাহও এই যৌন অনাচারকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমতি থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে এই অস্থায়ী বিবাহ হারাম করা হয়েছে। কোরআনে মজিদেই বলা হয়েছে;

والذين هم لفروجهم حافظون الاّ على ازواجهم أو ماملكت ايمانكم فانهم غير ملومين – فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون – (المومنون)

(মুমিন তারাই যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ কে সংযত রাখে, তবে তাদের 'স্ত্রী ও মালিকানা'-ভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে চাইলে তারা সীমালংঘনকারী হবে।)

www.pathagar.com

এই আয়াতে যৌন কর্মকে বৈধ করা হয়েছে শুধু স্ত্রীদের সাথে এবং মালিকানাভূক্ত দাসীদের সাথে। এর বাইরে আর কোথাও যৌনকর্ম করলে তারা সীমালংঘনকারী। তফসীর কারকগণ এই আয়াতকে মোতা নিকাহ্ হারাম হওয়ার যুক্তি হিসাবে তুলে ধরেন। ক্ষণিকের সম্ভোগ সাথীকে স্ত্রী বলা হয় না। মানবেতিহাসে কোথাও এদেরকে স্ত্রী বলা হয়নি, আজও বলা হয় না। মালিকানাভূক্ত দাসীর সাথে যৌন কর্মের অনুমতি কৃতদাস প্রথা বিলুপ্ত করার পূর্বের কথা। সেই অনুমতির সাথেও দাসীর গর্ভের সন্তানকে নিজস্ব সন্তানের হক প্রদান করার শর্ত জড়িত ছিলো এবং মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে দাসী স্বাধীন হয়ে যেতো। এই অস্থায়ী ব্যবস্থাও দাস প্রথাকে উৎখাত করারই প্রক্রিয়ার একটা অংশ মাত্র। কিন্তু শীয়া সম্প্রদায় কোরআনকে তাদের মানদন্ডে ব্যাখ্যা করে এবং হাদিসে রাসুলকে অস্বীকার করে তাই নেকাহ্ মোতার মত একটি জাহেলী ধারণাকে তাদের শরীয়তের অংশ বানিয়ে নিয়েছে।

বার ইমামের আকিদায় বিশ্বাসী শীয়ারা মোতা শুধু বৈধই মনে করে না, বরং হযরত উমরের বিদ্বেষে একে চরম ও পরম ইবাদত বলে মনে করে। এখানে উল্লেখ্য যে শীয়াদের অন্যতম ফিরকাহ্ 'বোহ্রা' মোতা বিবাহকে সুন্নিদের মতোই হারাম মনে করে।

শীয়া মযহাবে প্রকাশ্য বেশ্যা নারীর সাথেও মোতাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইমাম খোমেনীর লেখা (تحرير الوسيلة) দ্বিতীয় খন্ডে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইমাম সাহেব সেখানে উপদেশের সুরে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন বেশ্যা মেয়েলোকের সাথে মোতা করে, তবে যেন সে সেই নারীকে জঘন্য পেশা ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে।

আমাদের বোধগম্য নয় যে সোয়াবের নামে যে জঘন্য পাপাচারে সে ব্যক্তি নিয়োজিত হলো তার চাইতে আরো জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে?

শীয়াদের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব (الجامع الكافي)-তে কিতাবুল রওজায় ১২৭ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা পাঠকের কাছে কোন উপন্যাসের পহেলী মনে হবে। "মুহম্মদ বিন মুসলিম একদিন একটি স্বপ্ন দেখেন এবং ইমাম জাফরের কাছে এর মর্ম জানতে চান। হযরত ইমাম তার মর্ম এই বলেন যে তুমি একটি মেয়েলোকের সাথে মোতা করবে, তা তোমার স্ত্রীর জানা হয়ে যাবে। অতঃপর তোমার উপর রেগে গিয়ে তোমার কাপড় ছিড়ে ফেলবে। অতঃপর বর্ণনাকারীর নিজস্ব বর্ণনায় বলেছেন, জুম্মার দ্বিপ্রহরে আমি আমার ঘর দোরে বসে ছিলাম, সামনে দিয়ে একজন মহিলা গমণ করলো। তার রূপ আমাকে আকৃষ্ট করলো। আমি আমার কৃতদাসকে ঐ স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে আসতে বললাম। অতঃপর সে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। অতঃপর আমি তার সাথে মোতা করলাম। অন্য কামরায় অবস্থানরতা আমার স্ত্রী কিছুটা অনুমান করতে পেরে হঠাৎ আমাদের কাছে এসে গেলো। ঐ মেয়েলোকটি তো পালিয়ে গেলো। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার মূল্যবান জামাটি যা আমি ঈদের নামাজের জন্য ব্যবহার করতাম, ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।"

www.pathagar.com

বর্ণনায় ইমামের কেরামতও বয়ান করা হয়েছে আবার মোতার বৈধতাও। শীয়া কিতাব সমূহে এই জঘন্যতম পাপাচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলা হয়েছে। এই আলোচনার পর 'ফেকাহ জাফরী' সম্পর্কে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে কি?

শীয়া মযহাবে মাশহাদ ও মাযারের ভূমিকা

যেহেতু শীয়া দর্শনে চিন্তার ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কোরআনের ব্যাখ্যায় তারা স্বাধীন, সাহাবাদের আদর্শ অনুপস্থিত। মনোরাজ্যের বল্গাহীন বিচরনে তাদের ধর্মীয় চিন্তাধারার সৌধ নির্মিত, তাই তাদের নিস্পাপ অতিমানব ইমামদের আত্মার ইংগিতেই তাদের সার্বিক জীবন পরিচালিত। এ কারণে তাদের ইমাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবর তাদের সমূহ আকর্ষনের কেন্দ্র। তাই শীয়া বিশ্বের সর্বত্র এধরনের কবরগুলোকে 'মাশহাদ' বা সাক্ষাতের কেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। কারবালা সহ বিভিন্ন মাশহাদে অগণিত বনী আদমের ভীড়। নিস্পাপ অতিমানবদের কাছে চাওয়া পাওয়ার কাকুতি মিনতি। মাশহাদ সমূহে মহামূল্য কারুকার্য কর্ম সর্বত্র পরিলক্ষিত। মসজিদ সমূহ প্রায় পরিত্যক্ত। কিন্তু মাশহাদ ও মাযারগুলোর জৌলুস বেড়েই যাচ্ছে। দূর-দুরান্ত থেকে স্বদল বলে সেথায় ভীড় জমানোর মানসিকতা দর্শনীয়। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কবরে যে বিশাল সৌধ বানানো হয়েছে, যতো মূল্যবান বস্তু দিয়ে কারুকার্য করা হয়েছে, এবং যেভাবে সেখানে বনী আদমের ভীড় জমে আর মানুষের চাওয়া পাওয়ার মিনতি দেখা যায়, তা দেখে মনে হয় জীবিত খোমেনীর চাইতে মৃত খোমেনী তাদের বেশী প্রয়োজন।

এইসব মাশহাদে সারা বছরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে সাথে বার্ষিক ওরশ অনুষ্ঠান করা তাদের দ্বীনের অংগে পরিণত হয়েছে। মাশহাদ ও মাযার জিয়ারত অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগীর চাইতে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্বাবা শরীফের জিয়ারতের চাইতে কারবালা ও মাশহাদের জিয়ারত বেশী অপরিহার্য। তাদের দ্বীনের সমস্ত বুনিয়াদ এই সব মাশহাদ কেন্দ্রীক। তারা ঐ সব কবরবাসীর নামে মানত রাখে। তাদের কাছে পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়াদির জন্যে দোয়া করে।

রাসুলেপাকের শিক্ষার প্রভাবে দীর্ঘদিন যাবত উম্মাহর আকিদা ও বিশ্বাসে বিকৃতি দেখা দেয়নি। সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগে কবরবাসীর উদ্দেশে মানত করা বা আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের কবরে গিয়ে মনস্কামনা জানানোর মত গোনাহর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে ইহুদী, নাসারা ও মোশরেকীনদের অনুকরণে কবরপূজার সূচনা সর্বপ্রথম শীয়াবাদই করেছে। তাদের ইমামদেরকে অবতার বানানোর এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

মুশরেক ও কাফেরগণ প্রতিমা বা অবতারের কাছে আবেদন নিবেদন করতো তাদের সুপারিশের আশায়, যদিও তারা আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষমতাকে স্বীকার করতো। তাদের সম্পর্কেই কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

و لئن سئلتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون - (الزخرف)

(যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারা বলবে আল্লাহ, অতঃপর তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে?)

لئن سئلتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر ليقولن الله فانى يؤفكون - (العنكبوت)

(যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর কে চন্দ্র সূর্য্য নিয়ন্ত্রন করেন। তারা বলবে আল্লাহ, অতঃপর তারা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছে?)

لئن سئلتهم من نزل من السماء ماء فاحيابه الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لايعقلون - (العنكبوت)

(যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষন করেন ও মৃত মাটিকে জীবিত করেন, তারা বলবে আল্লাহ, বলুন সকল প্রশংসা আল্লাহরই, কিন্তু তারা অধিকাংশই নির্বোধ।)

قل من يرزقكم من السماء و الارض أمن يملك السمع و الابصار و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى و من يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلاتتقون - (يونس)

(বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান যমিন থেকে রিজিক দান করেন, কে শ্রবণ শক্তিও দৃষ্টিশক্তির মালিক, কে মৃতকে জীবন দান করেন, আবার জীবিতকে মৃত্যু দেন, আর কেই বা সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করেন? তারা বলবে আল্লাহ। অতঃপর বল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবেনা।)

এই আয়াতগুলোর তরজমা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে কাফের মোশরেকগণও বিশ্বাস করতো যে এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক, প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহই, তিনিই জীবন মৃত্যুর মালিক। এই বিশ্বাস থাকা সত্বেও তারা তাদের প্রতিমাকে অবতার হিসাবে অর্চনা করতো। তারা মনে করতো অবতারের মাধ্যমেই তারা নিস্কৃতি পাবে। তাদের মনোভাবকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে এভাবে, (لانعبد هم الاّ ليقربنا الى الله زلفى) (আমরা তাদের বন্দেগী করি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে।) তারা তাদের অবতারগুলোকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করতো। তারা মনে করতো আল্লাহ আমাদের ধরা ছোঁয়ার অনেক দূরে। সরাসরিভাবে তার নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়, তাই মাধ্যম অপরিহার্য। আল্লাহপাক এমনি চিন্তার প্রতিবাদ করে বলেছেন;

و اذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان -

(যখন আমার বান্দাহগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাদের বলে দিন যে আমি তাদের অতি নিকটে, যখন কেউ আমাকে ডাকে আমি তার সাড়া দেই।)

www.pathagar.com

ঐ সমস্ত অবতারগুলো প্রথমতঃ প্রতিমা ছিলো না। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে;

و قالوا لاتذرن الهتكم و لاتذرن ودًا و لاسواعا و لايغوث و يعوق ونسرا و قداضلوا كثيرا

(তারা বলে ওদ, সোয়া, ইয়াগু স, ইয়াযুক ও নসরকে ছেড়ে দিও না (তাদেরকে আঁকড়ে ধরে থাক) এভাবে তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে।)

তফসীরে পাওয়া যায় যে আরব এলাকায় ওদ, সোয়া, ইয়াগুস, ইয়াযুক ও নসর নামে বিভিন্ন বোজর্গ ব্যক্তি ছিলেন, তারা যখন ইন্তেকাল করেন প্রথমতঃ তাদের অনুসারীরা তাদের কবরে আবেদন নিবেদন করতো। পরবর্তীকালে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হতে থাকে। তারা ঐ সব মূর্তিগুলোকে বা সেই সমস্ত বোজর্গদেরকে আল্লাহ্‌র অবতার মনে করতো। প্রতিমা পূজা, কবর পূজা তথা প্রকৃতিপূজার মূল দর্শন এটাই যা কোরআনে মজিদে উল্লেখিত হয়েছে। ইতিহাসের এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই রাসুলেপাক কবর সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। প্রথমতঃ তিনি কবর জিয়ারত করা থেকেই নিষেধ করে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে কবর জিয়ারতের সুফল সামনে রেখে জিয়ারতের অনুমতি দেন, কিন্তু কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। তাঁর ইন্তেকালের অন্তিম মূহুর্তে তিনি বলেন,

لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيأهم مساجدا – (متفق عليه)

(আল্লাহ ইহুদী ও নাসারাদের অভিশপ্ত করেছেন যে তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদত কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে।)

لعن الله زورات القبور و المتخذين عليها المساجد و السراج – (ابو داود – ترمذى)

(আল্লাহ কবর জিয়ারতকারিনীদের ও ঐসব লোকদেরকে অভিশম্পাত দিয়েছেন যারা কবরকে ইবাদত কেন্দ্র বানিয়েছে ও বাতি জ্বালিয়েছে।)

اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد بعدى – (الموطأ)

(হে আল্লাহ আমার কবরকে প্রতিমা বানাবেন না যে আমার পর সেথায় বন্দেগী করা হবে।)

শীয়াদের মাশহাদ, রওজা ও মাযার নিয়ে যে বাড়াবাড়ি তা কি উপরোক্ত মোশরেকানা দৃষ্টিভঙ্গিরই বহির্প্রকাশ নয়? আওলাদ রাসুলের মহব্বতের নামে উম্মতের স্কন্ধে করব পূজার ভয়াবহ অভিশাপ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র ইতিহাসে কবর পূজার যতো বিচিত্র অপরাধ সংযোজিত হয়েছে সবই সন্দেহাতীতভাবে শীয়াবাদ থেকে উৎসারিত।

আধ্যাত্মবাদ ও বাতেনী চিন্তাধারায় শীয়াবাদ

শীয়া মযহাবের আরেকটি দিক হলো তার আধ্যাত্মিক ও বাতেনী চিন্তাধারা। দ্বীন ও শরীয়তকে তাদের বাতেনী দৃষ্টিভঙ্গির অধীন করা হয়েছে। বাতেনী চিন্তাধারা এমনি এক ভয়ংকর রোগ যে তার প্রতিকার নেই। শরীয়তের বন্ধন সেখানে শিথিল হয়ে যেতে বাধ্য।

www.pathagar.com

আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার ভিত্তি হলো স্বপ্ন, কাশফ, আত্মিক প্রত্যয় বা অন্তর্দৃষ্টি। যখন এসব ক্ষণ-ভঙ্গুর ও দূর্বল বাহনগুলোকে হিদায়াতের উৎস বানিয়ে নেয়া হয়, তার গোমরাহী কে ঠেকাতে পারে? ইসলামের প্রাথমিক যুগে এর নজীর পাওয়া যায় না। হিদায়াতের জন্য এসব অভিনব পন্থার জনকও শীয়া দ্বীন। গ্রীক, পাশ্চাত্য, পারসিক তথা পৌত্তলিক দর্শনের সংমিশ্রনে বাতেনী ও আধ্যাত্মবাদ এই উম্মতের আদর্শিক জীবনে বিরাট অভিশাপ বয়ে এনেছে। উপ-মহাদেশে যখন এই বাতেনী আদর্শবাদের সয়লাব এসে পৌঁছে, তখন উপমহাদেশের নব্য মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হিন্দুদের যোগী, সন্যাসী, ঋষি ও তপজপ মানসিকতা তা সহজেই কবুল করে নেয়। এর ফলে পবিত্র তাসাউফের নামে এই নতুন ফিতনা সৃষ্টি হয়। যার সাথে দ্বীন ইসলামের কোন সম্পর্ক ছিলো না। শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্ত নব্য পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মবাদ বা বাতেনী মতবাদ গড়ে উঠে। লালন শাহের মর্মীবাদ, হাসান রাজার সূফীতত্ব মুসলিম দর্শনের অংশে পরিণত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে ইসলামের সুফীবাদ বা ইলমে মারেফতের সাথে এই দর্শনের দূরতম সম্পর্কও নেই। কিছু কিছু সুফী নামধারী বিভ্রান্ত লোক এই দর্শনের ছত্রছায়ায় ইসলামের রাজপথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

রসম রেওয়াজ, রীতি-নীতি সর্বস্ব শীয়াবাদ

ইসলামের তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের মৌলিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবার পর শীয়া মতবাদ কতকগুলো রসম রেওয়াজ ও রীতি-নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাবলীকে সুন্নী উম্মতের বিরূদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শীয়া আলেমগন কোন সুযোগই হাত ছাড়া করেননি। শীয়াদের মসীর্য়া ও বিলাপের বিষয় বস্তুও ভাষার দিকে একটু তলিয়ে দেখলে এর সত্যতা উপলব্ধি করতে একটুও দেরী হবেনা। কারবালার ঘটনাবলীর স্মরনে শীয়া সমাজে অগনিত রসম রেওয়াজ সৃষ্টি হয়েছে। এসব রসম রেওয়াজের উপরই তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ সব রসম ও রীতিনীতিই সেখানে মুখ্য। পক্ষান্তরে শরীয়তের ইবাদত বন্দগী গৌন।

ইসলামী তাওহীদের কোরআনী দৃষ্টিভঙ্গি

তাওহীদের শিক্ষা এমন একটি মহা সম্পদ যা মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ব ইতিহাসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে মহীয়ান করে রেখেছে। তাওহীদের নিখুত জ্ঞান ও তার লালনই মুসলিম উম্মাহর স্থায়ীত্বের মূল চাবি কাঠি। শীয়া মযহাবের আদর্শিক বিকৃতির জন্যে মূল কারণ হলো ইসলামী তাওহীদকে ত্যাগ করা। এই মুহুর্তে ইসলামের তাওহীদের একটি চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

তাওহীদকে মুটামুটি ভাবে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়;

(১) প্রতিপালনের তাওহীদ (২) ইবাদাত বন্দেগীতে তৌওহীদ (৩) সিফাতের তাওহীদ

www.pathagar.com

প্রতিপালনের তাওহীদ

- আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, তিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, রূপায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী। তাঁর সৃষ্টিকর্মে কার ও কোন অংশীদারত্ব নেই। তাঁর সৃষ্টিতে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সৃষ্টির কোন অংশই এমন নয় যা অন্যের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টি কর্ম মূলতঃ আল্লাহর সৃষ্টির নকল। আসল উপাদান আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি শুধু স্রষ্টাই নন তিনি রক্ষনাবেক্ষন ও প্রতিপালনকারীও। মানুষ বা সৃষ্টির অভাব বা প্রয়োজন জেনে তা পুরণ করে সার্বিকভাবে প্রতিপালন ও সংরক্ষণ তিনিই করেন। এ কাজে তার কোন অংশীদার নেই। তিনি এই বিশাল সৃষ্টির মালিকই শুধু নন তার পরিচালনার দায়িত্ব ও তারই। তিনিই এই সাম্রাজ্যের সম্রাট, রাজাধিরাজ। তারই আইন এখানে চলে ও চলবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় সর্বভৌমত্ব তারই। তার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের উপর কারো হস্তক্ষেপ চলবেনা। আসমান, যমিন, আরশ কুরসী, বিশ্বজগতের ও সৌর জগতের ও ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন, জাতির উত্থান পতন, মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মালিকানা তারই ও এসব বিষয়ের যাবতীয় নিয়ম বিধান সবই তার হাতে। মানুষের আধ্যাত্মিক, বৈষয়িক তথা সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।
- তিনিই সকল ধরণের দোষ-ক্রটি মুক্ত, তিনি ছাড়া আর কোন সত্বাই বাস্তবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে না। যে সমস্ত শক্তির অস্তিত্বে দোষ-ক্রটির সংমিশ্রন রয়েছে তারা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হতে পারে না। সকল দোষ থেকে মুক্ত ও সকল প্রকার দূর্বলতার উর্দ্ধে না হলে সে সত্বার জন্য সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ অঘটনের বুনিয়াদ হতে বাধ্য। নবী-রাসুলগনও সকল দোষ-ক্রটির উর্দ্ধে নন, তাদের নিস্পাপ হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে তাদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখা হয়। নবীর অস্তিত্ব স্বয়ং সম্পন্ন উৎস নয়। নবী ছাড়া আর কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ নেন নি।
- একমাত্র তিনিই সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী, সে জ্ঞান বাহ্যিক জ্ঞানই হোক বা গায়েবী জ্ঞানই হোক। মানুষের জ্ঞান তার প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সীমিত। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সার্বিক জ্ঞান একমাত্র তারই নিয়ন্ত্রনে। তার জ্ঞান কোন আশ্রয়, বাহন বা অবলম্বনের মুখাপেক্ষি নয়। মানুষের জ্ঞান অবলম্বন ভিত্তিক, নবীদের জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত। জ্ঞানের উৎস একমাত্র আল্লাহ।
- তিনিই একমাত্র সত্বা যিনি সারা বিশ্বের পরোয়া না করে তার ইচ্ছা কার্যকরী করতে পারেন। তার ইচ্ছায় কেউ কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না।

www.pathagar.com

ইবাদত বন্দেগীতে তাওহীদ

- ইবাদত বন্দেগীর সকল শাখা-প্রশাখা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট। একমাত্র আল্লাহই এমন শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী যে একমাত্র তিনিই বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী। আর কেউ কোন উপায়ে এই অধিকারের অংশীদারত্ব পেতে পারে না।
- আবেদন নিবেদন, মানত ইত্যাদি তারই দরবারে করা যাবে, কেননা আর কোন সত্বা এমন নেই যিনি মানুষের চাওয়া পাওয়া ও আকুতি মিনতি শুনে তার জবাব দিতে পারেন।
- তিনিই নিরাপত্তাদানকারী। নিরাপত্তাদানের উৎস একমাত্র তিনিই। এমন কেউ নাই, যিনি নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিতে পারেন। জীবন মৃত্যুর প্রশ্নে, সম্মান, অসম্মানের প্রশ্নে, আখেরাতের শাস্তি ও নাযাতের প্রশ্নে পার্থিব বা অপার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রশ্নে একমাত্র তিনিই নিরাপত্তা দান করতে পারেন। নবী রাসূলগণও এই ক্ষমতা রাখেন না।

এখানে রাসুলেপাকের বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রনিধানযোগ্য;

يا معشر قريش ، اشتروا انفسكم لا اغنى عنكم من الله شيئا و يا عبد مناف لا اغنى عنكم من الله شيئا ، يا عباس ما اغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالى – لااغنى عنك من الله شيئا –

(হে কোরাইশগণ, তোমরা তোমাদের জীবনকেত্র ক্রয় করে নাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে কোন নিরাপত্তা দিতে পারবো না। হে আবদে মান্নাফ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবো না। হে আব্বাস বিন মুত্তালিব, আমি তোমাকে আল্লাহর তরফ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবো না, হে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ, তুমি আমার সম্পদ চাইতে পার, কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারবো না।)

- তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী। তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে তার শক্তি ও সামর্থের কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তার ইচ্ছাই চুড়ান্ত।

و اذا سئلت فسئل الله و اذا استعنت فاستعن بالله و اعلم لو اجتمعت الامة على ان ينفعوك بشئى لم ينفعوك بشئى الاّ ماكتب الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشئى فلن يضروك بشئى الا ماكتب الله عليك

(তোমার যদি কিছু চাওয়ার থাকে, একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও। যদি কারো সাহায্য প্রার্থনার থাকে তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জেনে রাখো, যদি সারা সৃষ্টি জগত একত্রি ত হয়ে তোমার কোন কল্যাণ কয়তে চায় তবে তোমার কোন উপকারই করতে পারবেনা। সেই টা ছাড়া যা তিনি তোমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং যদি সারা

www.pathagar.com

সৃষ্টিজগত একত্রি ত হয়ে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তবে তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। সেইটা ছাড়া যা তিনি তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন।)

- অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে আল্লাহর এই ক্ষমতার কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

সিফাতের তাওহীদ

কোরআন মজিদে আল্লাহর সুন্দরতম নামের কথা বলা হয়েছে, যাকে হাদিসে ইসমে সিফাত বলা হয়েছে। ঈমানে মোফাসসালে আল্লাহর এসব ইসমে সিফাতের উপর ঈমান ঘোষনা করা হয়েছে। এই ঈমান ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। হাদিসের কিতাবে আল্লাহর ৯৯টি ইসমে সিফাতের উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর এসব ইসমে সিফাতের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো এসব সিফাত বা গুণের মালিক একমাত্র আল্লাহ বলে গভীর বিশ্বাস রাখা। আর কোন সত্বার মধ্যে এসব গুণের অংশীদারত্ব থাকতে পারে না।

আল্লাহর এই তাওহীদ তার সার্বিক ব্যাপকতা সহ বোধগম্য হবার পর স্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহর ব্যাপকতর এই তাওহীদে কাকে অংশীদার বানানো যাবে না। সম্ভাব্য অংশীদারত্বকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা:-

(১) আল্লাহর ইলমে অংশীদারত্ব, (২) আল্লাহর ক্ষমতার প্রয়োগে অংশীদারত্ব, (৩) ইবাদাত বন্দেগীতে অংশীদারত্ব ও (৪) অভ্যাসে শিরক।

এসবগুলোর ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয় বা তার প্রয়োজনও নেই। সংক্ষিপ্তভাবে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর জ্ঞান অসীম আর তার সৃষ্টির জ্ঞান স্বসীম। তাঁর অসীম জ্ঞানে কাউকে অংশীদার করা তাওহীদের পরিপন্থি। আল্লাহই হাজের, নাজের ও গায়েবের আলেম। কেউ তার এই মর্যাদায় শরীক নয়। ক্ষমতার প্রয়োগে অংশীদারত্বের অর্থ হলো, উপকার, অপকার, মান সম্মান, রিজিক দৌলত, হায়াত মওত ইত্যাদি সবই একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতাও তিনিই তার প্রয়োগ করেন, আর কেউ পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে এসব ক্ষমতা প্রয়োগে অংশীদার হতে পারে না। ইবাদতে বন্দেগীতে শিরকের অর্থ হলো ইবাদাতের সকল উপকরণ ও অবলম্বন একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট রাখা। ইবাদতের কোন দিকই অন্য কারো জন্যে নিয়োজিত করা তাওহীদের পরিপন্থী। এমনি করে মানুষের সামগ্রিক অভ্যাসে আল্লাহর ব্যাপকতর তাওহীদকে বাস্তবে প্রকাশ করতে হবে। অভ্যাসের অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহর তাওহীদের পরিপন্থি কোন চিন্তা বা কাজ করা তার তাওহীদে অংশীদারত্বেরই নামান্তর।

কেন এই পীড়াদায়ক বিরোধের উপাখ্যান

কিছু কিছু লোক সমালোচনার সুরে বলেন, আজকের রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে পরিবর্তীত বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার পটভূমিতে মুসলিম উম্মাহর

www.pathagar.com

অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখিন। সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিরোধী শক্তি সমূহ মুসলিম উম্মাহর আভ্যান্তরীন বিরোধকে ব্যবহার করে উম্মাহর জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনছে, তাই মুসলিম উম্মাহর আদর্শিক বিরোধ ও বিভেদের আলোচনা অনভিপ্রেত। অপরদিকে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর থেকে ইরানের নেতৃত্ব আদর্শিক বিরোধের কথা না বলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কথাই বলেছেন, এহেন অবস্থায় আদর্শিক বিরোধ ও বিভেদের কথা ইসলামী ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

এই বিষয়ে লেখার সময়ে আমার মনে যে এ কথাগুলো আসেনি তা নয়। কিন্তু আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নই। শুধু আমিই বা কেন যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন তারাও এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হবেন না। ইসলামী আদর্শবাদে বিশ্বাসী লোকদের ঐক্যকেই ইসলামী উম্মাহর ঐক্য বলা যায়। আদর্শবাদের ঐক্যের প্রশ্নে সংখ্যার প্রশ্নটি মূখ্য নয়। আদর্শহীন, আদর্শ বিরোধী বা চরিত্রহীন জন সমষ্টির ঐক্যে ইসলামের কোন ফায়দা নেই বা তাতে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবারও কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে সত্যিকার মুসলিম জনগোষ্টির ইসলামী ঐক্যই আল্লাহর কাম্য। মুসলমানদের কল্যান তেমন ধরনের ঐক্যেই নিহিত রয়েছে। এই মহান উদ্দেশ্যে সত্যিকার ইসলামের ব্যাপক প্রচার এবং বিভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কারাভিযান অপরিহার্য।

মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর শিবিরে যতো দল, মত, গোষ্ঠী বা ফিরকা রয়েছে, তাদের সবাইকে সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরূদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেননা ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলিম নামের বিরোধী, তাদের আদর্শিক জীবন যাই হোক না কেন। এটা তখনই সম্ভব হ'তে পারে যখন বিভিন্ন দল-মত গোষ্টি বা ফিরকাহর আসল রূপ জানা যাবে। কারো আসল রূপ জানার পরই তার সাথে কোন সমঝোতায় পৌছা সম্ভব। বিশেষ করে ছদ্মবেশী ও আত্নগোপনকারীদের সাথে কোন সমঝোতা বা সহযোগিতা হতে পারেনা। বার ইমামের অনুসারী শীয়াদের যে আকিদা ও বিশ্বাস তাদের বৈশিষ্ট উলেমাদের দ্বারা বিশেষ করে ইমাম খোমেনীর লিখা গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, তার দ্বারা তাদেরকে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর সহযাত্রী হিসেবে প্রমান করেনা। যদি তারা তাদের বিভ্রান্ত আদর্শবাদ ও মুসলিম বিরোধী কালো ইতিহাসের বিরূদ্ধে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চান তবে তা হতে হবে মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠিত আকিদা বিশ্বাসের সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ও সুন্নী বিদ্বেষের অতীত ইতিহাসের ধারা ছিন্ন করে। কিন্তু আজকের শীয়া নেতৃত্ব অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। রাজনৈতিক ময়দানে সুন্নী বিদ্বেষ গোপন রাখতে পারেন নি। তারা তাদের আমেরিকা বিরোধী ভূমিকায় সাধারন জনগণকে আংশিকভাবে প্রতারিত করতে সফল হলেও ওয়াকিফহাল মহলকে প্রতারিত করতে পারেন নি। আজ আফগানিস্তানে তাদের যে ভুমিকা সেটা কি সুন্নী বিদ্বেষেরই বহির্প্রকাশ নয়? ইরানের অভ্যন্তরে বসবাসরত সুন্নীদের সাথে তাদের সম্পর্ক আর গোপন কিছু নয়। শীয়া নেতৃত্বকে দুইটি পথের একটি বেছে নিতে হবে। যদি তারা তাদের অতীত ধারার সাথে

www.pathagar.com

সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিম উম্মাহর সাথে একাত্মতা ঘোষনা করতে চান, যা তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন মুসলিম দেশে অহরহ বলে থাকেন বা তাদের লিখিত প্রচার ধর্মী প্রকাশনীতে প্রকাশ পায়, তবে তাদেরকে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে তাদের বিশিষ্ট উলেমাদের লিখিত গ্রন্থাবলী, যেমনঃ

كشف الاسرار – الحكومة الاسلامية – تحرير الوسيلة – احتجاج طبرسى – الجامع الكافى

ইত্যাদির মাধ্যমে যে সব আকিদার উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং সাহাবাও সুন্নিদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগান্ডা বন্ধ করতে হবে। সাথে সাথে দেশে বিদেশের রাজনীতিতে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে রাজনীতি করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর সূচনালগ্ন থেকে ইতিহাসের পরম্পরা ও ইসলামী আদর্শবাদের ক্রমিক বিকাশের ধারায় ইতিবাচক সংযোজন করতে হবে। ইতিহাসের পরম্পরা ও আদর্শিক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে আবদান রাখা হয় তা তাদের গোষ্ঠী বা ফিরকার আদর্শভান্ডারই বিকশিত করবে মাত্র। তারা সত্যি উম্মাহর আদর্শভান্ডারকে বিকশিত করতে চান কিংবা তাদের ফিরকার, তাদের ভূমিকার মাধ্যমে তার স্বাক্ষর রাখতে হবে। কিংবা তাদের অঘোষিত মৌলিক আদর্শের সাথে প্রকাশ্যে একাত্ৃতা প্রকাশ করে নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরতে হবে। সে অবস্থায় সহ অবস্থানের ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ভূমিকা রাখার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নেয়া যেতে পারে। বর্তমানের অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন আদর্শিক সম্পর্ক ও অনির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক ও আদর্শিক আঁতাতের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

এই কাংখিত লক্ষ্যে অগ্রগতির আশায় এই পীড়াদায়ক বিরোধ ও বিভেদের আলেখ্য লিখেছি।

ইলমে মারেফত বা সূফীতত্ব

বাতেনী দর্শন, স্রষ্টা সম্পর্কে বিতর্কিত চিন্তা, মানুষের মন চিন্তা ও বুদ্ধি সম্পর্কে জটিল চিন্তাধারার ধারক ও বাহক হিসাবে মূল তাসাউফ বা ইলমে মারেফতকে বিদয়াত বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তাসাউফ বা সুফি শব্দটি ফার্সী ভাষার তাই একে ইরান থেকে উদ্ভূত এক বিদয়াতী আদর্শ বলে আখ্যায়িত করে ইলমে মারেফতকে অস্বীকার করা যায় না, কিংবা তাসাউদের ব্যাপক বিভ্রান্তি বা স্বার্থান্বেষী মহলের ব্যবহার জনিত সৃষ্ট গোমরাহী দেখে ঘাবড়ে গিয়ে গোটা ইলমকে অস্বীকার করা অজ্ঞতার সামিল।

ইরানের প্রভাব আমাদের ধর্মীয় জীবনের সর্বত্র পড়েছে ব্যাপকভাবে, নামাজ, রোজা, দরূদ, সবে কদর, সবে মেরাজ, খোদা, পয়গম্বর, বেহেশত, দোযখ, পুরসিরাত ইত্যকার ইসলামী পরিভাষাগুলো ও ফারসী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রচলিত হয়ে পড়েছে, তাই বলে কি এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে? ইলমে হাদিসের মধ্যে বানানো হাদিসের ফিতনা, ইসরাইলীয়াতের কাহিনী সংযোজনের সমস্যা দেখে কি ইলমে হাদিসকে অস্বীকার করতে হবে? ফিকাহর নামে কোন্দল, কলহ, লড়াই ও ঝগড়া দেখে কি ইলমে ফিকাহকেই

www.pathagar.com

ত্যাগ করতে হবে? উম্মতে মুহম্মদীর মধ্যে আল্লাহপাক বিভেদের ফেতনা দিয়েছেন যেমন তেমনি সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়ের বা যাচাই-বাচাইয়ের কষ্টিপাথরও রেখেছেন প্রতি পর্যায়ে। ইলমে মারেফতকে বেদআত বা গোমরাহী বলে একে অস্বীকার করলে উম্মতের কত সাধক ও মহান ইমামদের অবদানকে অস্বীকার করতে হয়।

এই ময়দানে তাবেয়ীদের যুগ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে, হযরত ইমাম হাসান বসরী, ইব্রাহিম বিন আদহাম, ফোজাইল বিন আয়াজ, মারুফ কুরখী, জুনায়েদ বাগদাদী, সরী সকতি, সহল তসতরী, আবু তালেব মক্কী, আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এ পথের পথিকৃত ছিলেন। যাদের নেকী ও বুজুর্গী সম্পর্কে কখনও কোন দ্বীমত পোষন করা হয়নি, তেমনি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, খাজা শেহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, বাহাউদ্দীন নকশবন্দী, মোজাদ্দিদ আলফে সানী শেখ আহমদ সারহান্দী ইলমে মারেফতের দিকপাল ছিলেন। এভাবে শেষ যুগের ইমাম হযরত শাহওয়ালী-উল্লাহ, আমীরে শরীয়ত সাইয়েদ আহমদ শহীদ, সাইয়েদ ইসমাইল শহীদ ও ইলমে মারেফতের অভিযাত্রিক ছিলেন।

একদিকে এইসব মনিষীদের বুজুর্গী ও দ্বীনে ইসলামে তাদের ব্যাপক খিদমতের কথা স্বীকার করা আবার অপর দিকে ইলমে মারেফতকে বিদয়াত আখ্যা দিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরকেই গোমরাহ বলে ঘোষণা করার মধ্যে কোন বুদ্ধিমত্তা নেই।

ইলমে মারেফতের উৎপত্তি

রাসুলেপাক (সাঃ) যে দ্বীন আল্লাহর তরফ থেকে আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, তার একটি দিক হলো ঈমান বা বিশ্বাস আর অন্য দিকটি হলো আমল বা বাস্তব রূপায়ন।

ইমামের বুনিয়াদ হলো তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত। এই বিশ্বাসের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তা হলো, (১) মৌখিক স্বীকৃতি বা প্রকাশ্য ঘোষনা যা একজন মানুষের সামাজিক অবস্থান নিশ্চিত করে, এটি হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর (২) অন্তরের বিশ্বাস বা অন্তরের গভীরতায় ঈমানের প্রতিষ্ঠা, মন ও চিন্তায় সর্বাত্মক বিপ্লব (৩) মন ও চিন্তার এই সর্বাত্মক বিপ্লবের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে তার আমলের মাধ্যমে। মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজনে যে আমল তা মন ও চিন্তার পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ জনিত আমলের সমপর্যায়ের নয়। প্রথমটি সমাজের প্রয়োজনে আর অন্যটি তার মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র যা হলো নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক। এটিই হলো ইসলামী আমল। এই আমলের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর রয়েছে; ফরজ, ওয়াজিব, নফল ও মোস্তাহাব হলো এই সব স্তরের নাম। তেমনিভাবে এসব আমলগুলোর পরিধিও ব্যাপকতর। আল্লাহর হক আদায়ের মাধ্যম হিসাবে যে আমল তা এর একটি স্তর, এই স্তরটির পরিধিও এক নয় কেননা আল্লাহর হক ব্যাপকতর। মানুষের হক আদায়ের আমলের পরিধিও বিচিত্র। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, জিহাদ বা অন্যায়ের বিরূদ্ধে সংগ্রাম, ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধও এসব আমলের স্তর। আবার ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে ইসলামী ইলমের বিকাশ ঘটানো, প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহান সৃষ্টিক্ষমতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ঈমানের বাস্তব রূপায়ন বা আমলের জন্য ঈমানের পরিশুদ্ধি অপরিহার্য। মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তার আমলের মধ্যেই তার ঈমান মূর্ত হয়ে উঠবে, আমল ঈমানের কারনেই মহিয়ান হয়ে উঠবে। ঈমানের এই অবস্থা যাকে ইলমে তাসাউফে হাল বলা হয়ে থাকে, সম্পূর্ণরূপে অন্তরের ব্যাপার- মনের ব্যাপার। বাহ্যিক ঈমান পরিচিতির জন্যে বা সামাজিক প্রয়োজনে অপরিহার্য, কিন্তু অন্তরের বা মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ বা হালে এর স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে নাযাত প্রাপ্তি সম্ভব নয়। মনের এই পরিবর্তন বা তার মানসিক অবস্থাকে কোরআন এভাবে চিত্রিত করেছে;

انما المومنون الذين اذا ذكر الله و جلت قلوبهم و اذا تليت عليهم أياته زادتهم ايمانا و علـــى ربهـــم يتوكلون – (الانفال)

(তারাই সত্যিকার ঈমানদার যাদের অবস্থা এমনি যে যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র জিকির করা হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়া হয়ে তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর নির্ভর করে।)

ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون و الذين هم بايات ربهم يومنون و الذين هم بربهم لايشـــركون و الذين يوتون ما أتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون – أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لهـــا سابقون – (المومنون)

(নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্থ হয়ে থাকে এবং তারা তাদের রবের নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের সাথে কাউকে অংশীদার করে না। তারা আল্লাহরই পথে আল্লাহরই ভয়ে খরচ করে, তাদের মন সন্ত্রস্থ থাকে এই অনুভূতিতে যে তাদেরকে আবার আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে। বস্তুতঃ তারা সব সময় কাজে প্রতিযোগিতা করে এবং অগ্রগামী হয়।)

تقشعر منه جلودالذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر الله – (الزمر)

(যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের শরীর কেঁপে উঠে (আল্লাহভীতি তার দেহেই প্রকাশ পায়,তাদের শরীর ও মন আল্লাহর জিকিরের প্রতি ঝুকে পড়ে।)

و الذين أمنوا أشد حبالله – (البقرة)

(যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা রাখে।)

و الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم – (ال عمران)

(তারা সব অবস্থায় আল্লাহকে স্বরন করে, দন্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট হয়ে এবং শায়িত অবস্থায়।)

www.pathagar.com

و اذكر اسم ربك و تبتل اليه تبتيلا – (المزمل)

(তোমার রবের নাম স্বরন করো, এমনি একাগ্রচিত্তে যে সকল অবলম্বন ছিন্ন করে আল্লাহ্রই দিকে ঝুঁকে পড়ো।)

الآ بذكر الله تطمئن القلوب – (الرعد)

(জেনে রাখো, আল্লাহ্র জিকির দ্বারাই কলবের প্রশান্তি আসে।)

ان الله أشترى من المؤمنين أنفسهم و اموالهم بان لهم الجنة

(আল্লাহ পাক জান্নাতের বিনিময়ে মুমেনের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন)

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء – (الانعام)

(আল্লাহ পাক যাকে হিদায়াত দিতে চান তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন, এবং যাকে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ দ্বিধাগ্রস্থ করে দেন যেনো তা স্বজোরে আসমানের দিকে চড়তে থাকে)

أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه – (الزمر)

(অতঃপর আল্লাহ পাক যার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন সে ব্যক্তি আল্লাহ্র তরফ থেকে নূর প্রাপ্ত হয়।)

এমনি ধরণের অগণিত আয়াতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ঈমান মনে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে হবে এবং তার বহিঃপ্রকাশ অপরিহার্য, ইমানের এই অবস্থা বা 'হাল' ছাড়া সে ঈমান তার নাযাতের রক্ষা কবচ হতে পারেনা। উপরের এসব আয়াতগুলোর সাথে সাথে হাদিসের কিতাবে অসংখ্য হাদিসও পাওয়া যায় যার দ্বারা ঈমানের আত্মিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

এখানে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো।

হাদীসে এরসাদ হয়েছে;

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك – (متفق عليه)

(ইহসান বলা হয় সেই অবস্থাকে যে তুমি আল্লাহ্র বন্দেগী এমন মনোভাব নিয়ে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তা না হয় তবে মনে করতে হবে যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।)

من احب لله وابغض لله و اعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان –

(যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্যে বিদ্বেষ পোষণ করে। আল্লাহ্রই জন্যে দান করে, আল্লাহরই জন্যে সাহায্যের হাত থামিয়ে দেয় সে ব্যক্তি তার ঈমান পূরণ করলো।)

www.pathagar.com

اللهم اجعل حبك احب الىّ من نفسى و اهلى و من الماء البارد

(হে আল্লাহ তোমার ভালবাসাকে আমার নিজের অস্তিত্বের চাইতে, আমার পরিবার পরিজনের চাইতেও চরম পিপাসার্ত অবস্থায় ঠান্ডা পানির চাইতে অধিকতর প্রিয় বানিয়ে দাও।)

اللهم اجعل حبك احب الاشياء الىّ كلها و خشيتك أخوف الاشياء عندى و اقطع عنى حاجـــات الدنيا بالشوق الى لقائك اذا اقررت أعين اهل الدنيا من دنياهم فاقررعينى من عبادتك –

(হে আল্লাহ সকল জিনিষের চাইতে তোমার ভালবাসা আমার কাছে প্রিয়তর করে দাও। তোমার ভীতি আমার কাছে সমস্ত প্রকার ভীতির চাইতে অধিকতর ভীতিপ্রদ করে দাও। তোমার দর্শনের আগ্রহ এতো বেশী করে দাও যেন সারা পৃথিবীর সকল কামনা-বাসনা বিস্মৃত হয়ে যায়। যখন তুমি দুনিয়াদারদের পার্থিব সম্পদ দিয়ে তাদের চক্ষুকে ঠান্ডা করবে, তখন যেনো তোমার ইবাদাত আমার চক্ষুকে ঠান্ডা করে।)

اللهم اجعلنى اخشاك كانى أراك ابدا حتى القاك –

(হে আল্লাহ তোমাকে যেনো এমনভাবে ভয় করতে পারি যেন আমি তোমাকে দেখছি এবং এই প্রত্যয় যেন টিকে থাকে আর তোমার দর্শন যেনো পাই।)

اللهم انى اسألك التوفيق لمحابك من الاعمال و صدق التوكل عليك و حسن الظن بك –

(হে আল্লাহ আপনি যে আমল পছন্দ করেন, আমাকে সেই আমল করার তৌফিক দিন, আপনার উপর সঠিকভাবে নির্ভর করার এবং আপনার প্রতি সু-ধারণা রাখার তৌফিক দিন।)

اللهم انى اسألك نفسا بك مطمئنة تومن بلقائك و ترضى بقضائك وتقنع بعطائك –

(হে আল্লাহ, আপনার কাছে এমন মন চাই যা আপনার প্রতিই পরিতৃপ্ত হবে। যে মন আপনার দর্শন প্রত্যাশী হবে, আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং আপনার দানের প্রতি নির্ভরশীল হবে।)

اللهم افتح مسامع قلبى لذكرك –

(হে আল্লাহ আমার অন্তরের কান আপনার জিকিরের জন্য খুলে দিন।)

اللهم اجعل وساوس قلبى خشيتك و ذكرك اجعل همتى و هوائى فيما تحب و ترضى –

(হে আল্লাহ, আমার মনের কোণায় কোণায় আপনার ভীতি সৃষ্টি করে দিন, আপনার জিকির সৃষ্টি করে দিন। আপনার সন্তোষ ও ভালোবাসাই আমার কামনা-বাসনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করে দিন।)

এই বিষয়ের উপর কোরআনের আয়াত ও হাদীসের কোন ইয়ত্তা নেই। যার দ্বারা বোঝা যায় যে ঈমানের এই বহিঃপ্রকাশ বা হাল একজন মুমিনের জন্য কাম্য। ঈমানের

www.pathagar.com

এইরূপ ছাড়া ঈমানের বিকাশ সম্ভব নয়। রাসুলেপাক (সাঃ) ঈমানের এই হালের বা অবস্থার জন্যেই তরবিয়ত দিতেন। ঈমানের এই উন্নয়ন বা মুমিনের ঈমানের শক্তি সৃষ্টিতে রাসুলেপাকের শিক্ষা ও আমল তথা সাহাবায়ে কেরামদের বিশাল জ্ঞান-ভান্ডার মওজুদ রয়েছে। রাসুলেপাকের সান্নিধ্যে এবং আল্লাহর তরফ থেকে অহী নাযিলের ঐশী পরিবেশে সাহাবায়ে কেরামদের মনে ও অন্তরে এই অবস্থার বিকাশ ঘটতো ক্ষনিকেই। তদুপরি রাসুলেপাকের ইল্‌ম, হিকমত ও তাযকিয়ার প্রভাবে সাহাবায়ে কেরামদের ঈমানের মান উন্নতির চরম পর্যায় পৌঁছুতে দেরী হতো না। তাদের মনোরাজ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো পূর্ণরূপে।

কিন্তু রাসুলেপাকের অনুপস্থিতিতে এবং দূর-দূরান্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নতুন মুসলমানদের মনে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিলো না বিভিন্ন কারনে, তদুপরি তরবিয়াত ও তায্‌কিয়ার কাজ অপর্যাপ্ত হওয়ার ফলে ঈমানের এই কাংখিত বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো না।

ইল্‌মের চর্চা ঠিকই চলছিলো। ঈবাদত বন্দেগীর বাহ্যিক আমলগুলোও প্রতিপালিত হচ্ছিল। এগুলো ছিলো আইন-শৃংখলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মন-মানসিকতায় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিলো। বিশেষ করে খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তির পর রাজতন্ত্রের অধীনে রাজা-বাদশা, তাদের উজির-নাজির সহ সরকারী আমলারা তথা অধিকাংশ আলেম উলেমাগণও বস্তুবাদী জীবনের দিকে ঝুকে পড়েন, সাহাবাদের জীবন যাত্রা পরিত্যক্ত হয়ে যায়, ফলে মুসলিম উম্মাহয় বহু অবাঞ্ছিত মত বিরোধ সৃষ্টি হয়। এসব মত-বিরোধের মূল কারন ছিলো ঈমানী শক্তির অনুপস্থিতি। ঈমানের আবেদন দূর্বল থেকে দূর্বলতর হয়ে যাচ্ছিল। ঈমানের উপস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ছিলো নিতান্ত সীমিত পরিধিতে। সমাজের শাসক ও শাসিত উভয়ই ছিলেন মুসলমান, কিন্তু ঈমানের পরিচর্যা ও বিন্যাসের প্রয়াস ছিলো নগণ্য।

এই পরিস্থিতিতে ইসলামী ইল্‌মের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ইতিবাচক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাদের যোগ্যতার সৎব্যবহার করতে থাকেন। হাদীস-সংকলন, ইল্‌মে হাদীসের বিন্যাস, আসমায়ে রেজাল ও ফিকাহর ময়দানে ব্যাপক নবতর তৎপরতা দেখা যায়।

এই সমস্ত মৌলিক কাজের পাশাপাশি কতিপয় মহান ব্যক্তি মুসলমানদের ঈমানী শক্তির অবক্ষয় দেখে সংকিত হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে মন ও মানসিকতায় ইসলামী পরিবর্তন আনার জন্যে বিভিন্ন ফরমূলা তৈরী করেন। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে মনোরাজ্যে ইসলামী চরিত্রের বিকাশের লক্ষ্যে অপরাপর মুসলমানেদেরকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন।

www.pathagar.com

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি বিষয়ের রূপ দেয়া হয় পরবর্তী পর্যায়ে। মন ও মানসিক অবস্থায় ইসলামের প্রভাব সুদৃঢ় করার এই নবতর কর্মসূচীকেই ইল্‌মে মারেফত বলা হয়।

ইলমে মারেফতের স্বরূপ

উপরের ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে মুসলমানদের ঈমানকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে ব্যাপক দাওয়াতী ও তরবিয়তী কাজের বিশেষ বিশেষ ফরমুলাগুলোকে ইলমে মারেফত বলা হয়, যা পরবর্তীকালে একটি ইলম বলে পরিগণিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইলমে মারেফত হাদীস সংকলন, আসমায়ে রেজাল, ইলমে ফিকাহ বা ইসলামী আকায়েদের সংরক্ষনের মতো কোন ইলম নয়, এর স্বরূপ স্বতন্ত্র।

আংশিকভাবে হলেও নিচের উদাহরণ থেকে ইলমে মারেফতের স্বরূপ বুঝতে সহায়ক হবে;

- বিভিন্নভাষার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে প্রথমতঃ একটি জনগোষ্ঠী যেভাবে কথা বলে বা ভাবের আদান-প্রদান করে, যে শব্দ যেভাবে, যে ভঙ্গিতে ও যে অর্থে ব্যবহার করে সেটাই ভাষা। সেই ভাষাভাষী লোকদের ভাষার জন্যে কোন ব্যাকরন বা কথা ও শব্দের নিয়মাবলী বিন্যাস করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তারা যা বলে তাই ভাষা। ভাষার মূল ধারার ভিত্তিতেই কবি সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়। তাদের সাহিত্য কর্মই সে ভাষার আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর পরবর্তীকালে যখন অন্য ভাষাভাষী লোকদের কাছে বা নতুন নতুন লোকদের কাছে সেই ভাষাকে একটি ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেয়া হয়, তখন মূল ভাষাভাষী লোকদের বা সাহিত্যিক বা পন্ডিতদের ভাষাকে সামনে রেখে ব্যাকরন ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয় এবং আস্তে আস্তে একটি ভাষাতত্ব জন্ম নেয়। যার অনেক কিছুই আসল ভাষাভাষীদের কাছে অপ্রয়োজনীয় নিরর্থক বলে মনে হয়। তেমনি রাসুলেপাকের সান্নিধ্যে সাহাবায়ে কেরামদের মন-মস্তিষ্কে, অন্তরের গভীরে ঈমানের যে প্রত্যয় সৃষ্টি হতো বা সাহাবায়ে কেরামদের অন্তরে ইসলামের আদর্শানুযায়ী কোরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী ইবাদতের মাধ্যমে যে ঈমানী বিকাশ সৃষ্টি হতো, তার জন্যে অন্য কোন নিয়ম নীতির প্রয়োজন ছিলো না বা প্রয়োজন হতো না, কিন্তু ইসলামের পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে তথা ইবাদতের শর্তাবলী পূরণ করা না হলে সাধারনভাবে এই প্রত্যয় সৃষ্টি হয় না। তাই সাধারনের বোধগম্য করার জন্যেই ইলমে মারেফতের নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়। মনের এই কাংখিত অবস্থাকে ইলমে মারেফতের ভাষায় হাল বলা হয়েছে।
- যে কোন ভাষায় যারা কথা বলেন বা শব্দের উচ্চারণ করেন, সেটাই তার মূল উচ্চারণ। কোরআনের শুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে অক্ষরের মাখরাজ আসলে তাই যা ভাষাভাষীদের কথায় প্রকাশ পায়। বিশেষজ্ঞরা ভাষাভাষীদের উচ্চারণ পদ্ধতি সামনে

www.pathagar.com

রেখে এই সব মাখরাজ নির্ধারণ করেছেন। এরই ভিত্তিতে ইলমে তাজবীদ প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো অন্য ভাষাভাষীদের সুবিধের জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রাপ্তি বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে প্রণীত বিভিন্ন পদ্ধতিও তেমনি। কিন্তু ইবাদাত বন্দেগীর ইসলামী নিয়মের বাইরে নতুন কোন নিয়মের কোন অবকাশ নেই সেখানে। প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী সহজতর করে সাধারনের বোধগম্য করাই ছিলো ইলমে মারেফতের লক্ষ্য।

উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এ বিষয়ে বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী, ইলমে হাদীসের মহান ইমাম, ফকিহ, ইমাম হাসান বসরী (রঃ) যিনি হিজরী ২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও তার জীবনে মুসলমানদের ঈমানী নৈরাজ্য দেখে ঈমানকে পরিচ্ছন্ন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মুসলমানদের এই পরিবর্তীত অবস্থা দেখে রাসুলেপাকের এই হাদিসটি তুলে ধরে মুসলমানদের সর্তক করে দিতেন;

مالفقر أخشى عليكم و لكن أخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنا فسوها كما تنا فسوها فتهلككم كما اهلكتهم)

(তোমাদের দারিদ্রতা আমাকে ভীত করে না, আমি যা ভয় করি তা হলো এই যে পার্থিব সম্পদের এতো প্রশস্থতা হোক, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের হয়েছিলো, অতঃপর তোমরা এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, এবং তোমাদেরকে তেমনি ধ্বংশ করে দিক যেমন পূর্বতনদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো।)

সম্পদের প্রাচুর্যই দ্বীনি অবক্ষয়ের কারণ- একথাটি তিনি বারবার তুলে ধরতেন। ইমাম হাসান বসরীর অবদানে মুসলিম উম্মাহর ঈমানী শক্তিতে বিরাট বিকাশ সাধিত হয়। অতঃপর মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে বিভিন্ন তরিকতের ইমামদের আগমন ঘটেছে এবং আস্তে আস্তে ইলমে মারেফত একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইলমে মারেফতের লক্ষ্য

ইলমে মারেফতের মূল লক্ষ্য হলো ঈমান ও একীন সৃষ্টি করা, যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা। ইবাদত বন্দেগীতে আগ্রহ ও আনন্দানুভুতির সৃষ্টি, আখেরাতের জীবনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও পার্থিব জীবনের মায়া লাঘব তথা মন ও মানসে অনাবিল প্রশান্তি ও ধৈর্য্য সৃষ্টি করা। ইলমে মারেফতের এই লক্ষ্যে পৌছার জন্যেই তরিকতের বিভিন্ন ইমামগণ তাদের সার্বিক অবদান রেখেছেন যুগে যুগে। কোথাও ওয়াজ নসীয়তের মাধ্যামে, কোথাও লিখনীর মাধ্যমে, কোথাও ব্যক্তিগত তরবীয়তের ও তাযকিয়ার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে পৌছার জন্যে উম্মতকে পথ দেখিয়েছেন।

www.pathagar.com

এখানে ইলমে মারেফতের উপর লিখিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধতম গ্রন্থগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো;

ইলমে তাসাউফের গ্রন্থাবলী

১. (كتاب اللمع) প্রণেতা ঃ শেখ আবু নসর সেরাজ (মৃত্যু হিঃ ৩৭৮) এই বইটি হলো ইলমে মারেফতের উপর লিখিত প্রথম বই।

২. (كشف المحجوب) প্রণেতা ঃ সৈয়দ আলী হুজেরী বা দাতা গঞ্জে বখস (মৃত্যু হি: ৪৬৫)

৩. (احياء علوم الدين) প্রণেতা ঃ হযরত ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু হিঃ ৫০৫)

৪. (فتوح الغيب) প্রণেতা ঃ হযরত আবদুল কাদের জিলানী (মৃত্যু হিঃ ৫৬১)

৫. (رسالة قشيرية) প্রণেতা ঃ ইমাম আবুল কাশেম কুশাইরী (মৃত্যু ৪৬৫)

৬. (غنية الطالبين) প্রণেতা ঃ হযরত আবদুল কাদের জিলানী (মৃত্যু হিঃ ৫৬১)

৭. (عوارف المعارف) প্রণেতাঃ শেখ শেহাবুদ্দীন সহরোয়ার্দী (মৃত্যু হিঃ ৬৩২)

৮. (مدارج السالكين) প্রণেতাঃ হাফেজ ইবনে কাইয়েম (মৃত্যু হিঃ ৭৯১) কিতাবটি তার শেখ আব্দুল্লাহ আনসারীর কিতাব (منازل السائرين)-এর ব্যাখ্যা।

৯. (مكتوبات امام ربانى) প্রণেতাঃ শেখ আহমদ সারহিন্দী বা মুজাদ্দিদে আলফে সানী (মৃত্যু হিঃ ১০৭৯)

১০. (القول الجميل) প্রণেতাঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (মৃত্যু হিঃ ১১৩১)

১১. (صراط مستقيم) প্রণেতাঃ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (মৃত্যু হিঃ ১২৪৬)

ইলমে মারেফতের উপর লিখিত প্রসিদ্ধতম এইসব গ্রন্থগুলোর পাঠকগণ গ্রন্থগুলোর মধ্যে মূল বিষয় যা পাবেন তা হলো, ঈমানের গুরুত্ব, একীন সৃষ্টির উপায়, শরীয়তের গুরুত্ব, ঈবাদতের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টির পদ্ধতি, নিয়তের পরিশুদ্ধ, সবর, শোকর ইত্যাদির গুরুত্বও ইত্যকার মৌলিক বিষয়ের উপর আলোচনা। ঈমানের পরিশুদ্ধি ও ইহসান ছাড়া তাযকিয়া হয় না। এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে বিভিন্ন পন্থার অবতারণা করা হয়েছে। ইমামগণ কোন এক পন্থায় ঐক্যমত পোষণ করেন না, এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত পন্থার কোন ইয়ত্তা নেই। কেউ কেউ এমনও বলেছেন;

طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق –

(আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় সৃষ্টিজগতের বৈচিত্রের মতই বিচিত্র।)

www.pathagar.com

অলী কাকে বলে?

আল্লাহপাকের নৈকট্যলাভকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহপাক তাঁর অলী বা নিকটতম বান্দাহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আরবী ভাষায় (ولى) শব্দের বিপরীত শব্দ হলো (عدو) বা শত্রু। (ولى)-এর শাব্দিক অর্থ হলো 'নিকট' অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। এই অর্থেই অলীকে 'বন্ধু' বলা হয়ে থাকে। কেননা বন্ধু নিকটতম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে (عدو) শব্দের অর্থ হলো 'দূর' বা যে ব্যক্তি আল্লাহর না ফরমানী ও গোনাহর দ্বারা আল্লাহর অনেক দূরে চলে যায়। এই অর্থেই (عدو)-কে শত্রু বলা হয়। কেননা শত্রু তার মনের অনেক দূরে চলে যায়। অলীদের সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেছেন,

و الذين امنوا و كانوا يتقون –

(যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অর্জন করেছে, তারাই আল্লাহর অলী। ঈমান ও তাকওয়া ছাড়া বেলায়াত লাভ অসম্ভব।)

সহীহ বোখারীর হাদীসে হযরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রাসুলেপাক এরসাদ করেছেন, আল্লাহ বলেন,

"যে ব্যক্তি আমার অলীর সাথে শত্রুতা করে সে ব্যক্তি আমারই সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষনা করে। আমার কোন কাজে কখনও এমন সংকোচ হয় না, যেমন আমার সেই বান্দার জান কবজ করতে হয় যে মউত পছন্দ করে না, কেননা আমি তাকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করিনা। কিন্তু মউত তার জন্যে অবধারিত। সব চাইতে যে জিনিসের মাধ্যমে আমার বান্দাহ আমার নৈকট্য লাভ করে, তা আমার ফরজের আদায়। ফরজের উর্দ্ধে আমার বান্দাহ নফলের মাধ্যমে বরাবর আমার সন্তোষলাভের চেষ্টা করতে থাকে। এভাবে তাকে আমি ভালোবেসে ফেলি। আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে হামলা করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলাফেরা করে। অতঃপর সে আমার তরফ থেকেই শুনে ও আমার তরফ থেকেই দেখে, আমার তরফ থেকেই হামলা করে, আমার দ্বারই চলে।"

এই হাদীসের মধ্যে আল্লাহপাক তার অলীর আমলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন,

(১) (مقتصدون اصحاب اليمين) ঐ সমস্ত লোক যারা ফরজ ও ওয়াজিবের আদায়ের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে।

(২) (سابقون المقربون) ঐ সমস্ত লোক যারা ফরজ ও ওয়াজিবের আদায়ের সাথে সাথে নফল ও পুরা করে, তারা আল্লাহর নৈকট্যলাভের সৌভাগ্য লাভে বলিয়ান হয়। যাদের প্রশংসায় আল্লাহপাক কোরআনে মজিদের সুরা ফাতেহা, সুরা ওয়াকিয়া, সুরা আল দাহার ও সুরা আল মুতাফফেফীন এর মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এই হাদীসে বান্দার বেলায়েত প্রাপ্তির মৌলিক উপাদান সমূহের উল্লেখ করেছেন। তরিকতের ইমামগণ এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করেছেন। তরিকতের নির্দিষ্ট পথ ছাড়াও অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব। সাধারণভাবে আত্ম-সমালোচনা, সুন্নতের অনুসরণ, অধিক জিকির আযকার ও দোয়া, কোরআন হাদীসের গবেষণা ও সাধনা, ফিকাহর সাধনা ইত্যাদির মাধ্যমেও আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব। এখানে একটি মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও মূলনীতিতে ও এর আমলে কোন বিভিন্নতা নেই। এসব আমল মানব জীবনের জন্যে সমভাবে অপরিহার্য। কোন অংশের আমল ও কোন অংশকে ছেড়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই। হাদীসের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের যে আমলের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে শুধু নামাজ, রোজা, জিকির আযকাব, জাকাত ইত্যাদির মত দৈহিক ও আর্থিক ঈবাদতই উদ্দেশ্য নয়, বরং এর মধ্যে সমস্ত হকুকুল ইবাদ, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তথা একামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন ও শামিল রয়েছে।

অলী হবাব জন্যে যে স্বতন্ত্র বিশেষ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে তা হলো ইসলামের কোন বিভাগে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা, যেমন হাদীসের সাধনা, কোরআনের সাধনা, দাওয়াতে দ্বীন, তাবলীগে দ্বীন, একামতে দ্বীনের সাধনা, আত্মপরিশুদ্ধি বা তাযকিয়ার সাধনা, বা ইলমে দ্বীনের চর্চার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। উম্মতের বড় বড় ইমামগণ এসব উপায়ের কোন এক উপায়ের প্রতি এক কেন্দ্রীয়তার মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়েত লাভ করেছেন। ইমামে আজম আবু হানিফার বেলায়েত, অপরাপর আরো ৩ জন ইমামের বেলায়েত, প্রসিদ্ধ মোহাদ্দীস ইমাম বোখারীর বেলায়েত, অপরাপর মোহাদ্দেসিনের বেলায়েত তথা যুগে যুগে ইসলামের বিশিষ্ট ইমাম ও মোজাদ্দেদীনদের বেলায়েত উল্লেখযোগ্য।

এসব উদাহরণে বোঝা যায় যে উপায় ভিন্নতর, লক্ষ্য এক, আর তা হলো আল্লাহর নৈকট্যলাভ।

তরীকতের ইমামগণ এ জন্যেই তাদের নির্ধারিত উপায়কে ফরজ, সুন্নত বা ওয়াজিব বলেননি। এসব নিয়মকে তারা (مباح) মোবাহ বা বৈধ নিয়ম বলে উল্লেখ করেছেন। যারা একটু বেশী অগ্রসর হয়ে বলেছেন তারা একে মোস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন।

একারণে ফিকাহর চার ইমাম, হাদীসের ইমামগণ, অষ্টম শতাব্দীর শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম ইবনে কাইয়্যেম, ইমাম ইবনে যোওজী, শেষ জামানার ইমাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ সহ কেউ ইলমে মারেফতকে ইসলামের বহির্ভূত পথ বলে উল্লেখ করেননি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইলমে তাসাউফের কোন অপরিবর্তনীয় পথ নেই। বিশিষ্ট সাধকগণ যুগে যুগে এর পরিবর্তন,

www.pathagar.com

পরিবর্ধন বা সংস্কার করেছেন। ভারতীয় উপ-মহাদেশেই ইলমে মারেফতের অস্তিত্ব বৈচিত্রময়। মোজাদ্দীদ আলফে সানী থেকে এই সংস্কার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। মওলানা রশীদ আহমেদ গংগুহী, হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজির মক্কী, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান, মওলানা হোসাইন আহমদ প্রমূখ উলামায়ে কেরাম ইলমে তাসাইফের সংস্কার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। এভাবে উপমহাদেশের অধিকাংশ উলেমারা ইলমে তাসাউফের সাথে জড়িত ছিলেন এবং এই ইলমকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছেন। ইসলামের বিশিষ্ট ইমাম ও পন্ডিতদের সাথে ইলমে মারেফতের যে বিরোধের ইতিহাস তা হলো বিভ্রান্ত তাসাউফ বা ইলমে মারেফতের বিকৃতির সমালোচনার ফসল। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে হক পন্থী আলেমদের ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের সমালোচনা ও প্রতিরোধের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার ফলেই আজ আমরা সত্যকে সত্য বলে পাই এবং অন্যায়কে অন্যায় হিসাবে চিত্রিত করতে পারি। কোন ইলমের মূল অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা বা তার বিকৃতির সমালোচনা এক কথা নয়। বরং দ্বিতীয়টি মূল ইলমের অস্তিত্বের জন্যেই অপরিহার্য। হাফেজ ইবনে কাইয়েম তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (مدارج السالكين)-এর মাধ্যমে ইলমে মারেফতের যে পূর্ণবিন্যাস করেছেন বা শাহ ওয়ালী উল্লাহ তার (ازالة الخفا) ও (القول الجميل) কিতাবে যে সংস্কারের প্রয়াস করেছেন, তা ইলমে মারেফতের অবিকৃত চরিত্র বজায় রাখার জন্যে অপরিহার্য ছিলো।

ইলমে মারেফতের ইতিহাস

ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুগের তরিকতের ইমামদের মধ্যে কোন বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না। তেমনি কিছু প্রকাশ পেলেই তরিকতের আলেমরাই তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রথম যুগের এই সব মনিষীদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী, ইব্রাহিম বিন আদহাম, ফোজায়েল বিন আয়াজ, মারুফ কুরখী, শফিক বলখী, জুনায়েদ বাগদাদী, সহল তসতরী, আবু তালেব মক্কী ও শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) সম্পর্কে ইমাম তাইমিয়া তাই বলেন,

"তারা হলেন ইসলামের ইমাম, হেদায়েতের পথ প্রদর্শক আল্লাহপাক তাদের জন্যে উম্মতের মধ্যে 'হকের স্বীকৃতি' (لسان صدق) রেখে দিয়েছেন।(جلاء العينين৫৭) অনত্র তিনি এই সব বোজর্গদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, (اكابر شيوخ الصالحين) যারা হলেন বিশিষ্ট নেক বুজুর্গ।"

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, তরিকতের সকল ইমামগণ কিতাব ও সুন্নাহর আমলের প্রশ্নে ঐক্যমতে পৌচেছেন, তরিকতের ইমামদের কথায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

www.pathagar.com

হাফেজ ইবনে কাইয়েম তার (مدارج السالكين) গ্রন্থে বলেছেন, বুদ্ধিমান লোকদের কাজ হবে প্রত্যেক জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় নিজের অংশ নিয়ে নেয়া- এটাই হক পন্থী লোকদের পথ।

ইলমে মারেফতের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ইসলামী ইতিহাসের মধ্যযুগে এসে। সে সময় বিজাতীয় দর্শনের ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে ইলমে মারেফতের মধ্যে দার্শনিক সূফীতত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে। ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম রাজী (রঃ) বিজাতীয় দর্শনের অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্যে দার্শনিক উপায়েই তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ইসলামের সামগ্রিক জীবন দর্শনে বিজাতীয় দর্শনের প্রভাব স্তিমিত হয়ে গেলেও ইলমে মারেফতে দার্শনিক চিন্তার প্রাধান্য বাড়তেই থাকে। অতঃপর প্রখ্যাত সূফী শেখ মহীউদ্দীন বিন আরাবীর আগমন ঘটে। তিনি তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইলমে মারেফতের উপস্থাপনা করেন এবং (وحدة الوجــود) অস্তিত্বের একত্ব এর চরম বিতর্কিত দর্শন তুলে ধরেন। এই মতবাদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন আল্লাহর পথের পথিক যখন আল্লাহর চরম ও পরম নৈকট্য লাভ করে তখন তার চোখে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। বাস্তবে সারা বিশ্বজগত ও সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকলেও সে একমাত্র আল্লাহরই অস্তিত্ব অবলোকন করে। মানব কুল, সমস্ত জীবন্ত সৃষ্টি তথা সমস্ত সৃষ্টিলোক সবই তার চোখে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব থাকে না। এটাই হলো মারেফতের চূড়ান্ত পর্যায়। এই দার্শনিক ব্যাখ্যা ইলমে মারেফতকে এক মারাত্মক সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করায়।

শেখ মহীউদ্দীন বিন আরাবী তাঁর (فتوحات مكية) ও (فصوص الحكم) গ্রন্থে তার মতবাদ কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তার দার্শনিক ব্যাখ্যা সমকালীন সূফী সমাজকে গ্রাস করে নেয়। সমকালীন সূফী সমাজ এই বিভ্রান্ত মতবাদকে ইলমে মারেফতের বুনিয়াদ হিসাবে কবুল করে নেন। ইলমে মারেফতের পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ ইবনে আরাবীর ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেননি। ইবনে আরাবীর ইলমী যোগ্যতার সামনে তারা আত্মসমর্পন করেন। ইবনে আরাবী হিঃ ৬৩৮ সালে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর পরই বিশিষ্ট ইমাম, ফকীহ ও মোহাদ্দীস ইমাম ইবনে তাইমেয়া জন্মগ্রহন করেন, তিনি ইন্তেকাল করেন হিঃ ৬৮২ সালে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার বিশাল পান্ডিত্য ও ইসলামী ইলমের সাহায্যে এই ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করেন। ইবনে তাইমিয়া শেখ ইবনে আরাবীর ক্ষণজন্মা প্রতিভা ও তার ব্যক্তিগত আমলের প্রশংসা করার সাথে সাথে তার (وحــدة الوجــود) এর ভ্রান্ত দর্শনকে নাকোচ করে দেন। ইবনে আরাবীর ধারণায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেউ স্রষ্টা আর কেউ সৃষ্টি নেই। তার মতে স্রষ্টাই সৃষ্টি আর সৃষ্টিই স্রষ্টা। অস্তিত্বে বান্দাহ ও মাবুদের, দোয়া প্রার্থী ও দোয়া

www.pathagar.com

কবুলকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার মতে আল্লাহর মহিমার প্রকাশই বৈচিত্রময়, তা ঐ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতিফলন মাত্র। স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। এটা একটি এমনি দার্শনিক চিন্তাধারা যার কোন অন্ত নেই। পরিনতিতে মানুষকে রাসুলের শিক্ষা থেকে সরিয়ে দেয় যা মারাত্মক একটি বাতেনী সমস্যা হিসাবে সমস্ত ইসলামী শিক্ষাকে গ্রাস করে নেয়। ইবনে তাইমিয়ার ক্ষুরধার যুক্তিতে প্রমাণ হয়ে যায় যে ইবনে আরাবীর এই মতবাদ রাসুল প্রদত্ত আদর্শের সাথে সংঘাতশীল। ইবনে তাইমিয়ার কল্যাণে সাধারনভাবে এই মতবাদের বিষক্রিয়া লঘু হয়ে যায়। কিন্তু ইলমে মারেফতের ময়দানে তার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাইরে দার্শনিক তত্বের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। ইলমে হাদীস ও তফসীরের চর্চা কমে যেতে থাকে। প্রথম যুগের ইমামদের মতো ইসলামী পান্ডিত্যের অভাবে সূফী খানকা সমূহে এমন ধরনের আকিদা ও চিন্তার লালন হতে থাকে, যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। সারা মুসলিম বিশ্বেই এই অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। বিশেষ করে ভারতীয় উপ-মহাদেশের সূফী দর্শন বিকৃতির শিকার হয় বেশী। যোগী, সন্যাসী ও তপ-যপের দেশে, কোরআন হাদীসের পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে ইবনে আরাবীর মতবাদ সূফী দর্শনকে গ্রাস করে নেয়। কোরআন হাদীসের নির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে থাকে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এখানে সেখানে সমালোচনা হতে থাকে ফলে তাঁর খিদমতের ফায়দা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ইবনে তাইমিয়ার পর থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে আরাবীর এই ভ্রান্ত দর্শনের কোন গঠনমূলক সমালোচনা দেখা যায় না। সূফী সমাজে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের এটাই কারণ।

এই অবস্থায় উপ-মহাদেশের সূফী দর্শনে বিভিন্নমূখী গোমরাহী ঢুকে পড়ে। অনেক মনগড়া ঈবাদত বন্দেগী চালু হয়ে যায়। সে সময়ে লিখিত শেখ গোয়ালিয়ারীর কিতাব (جواهر خمسة) অধ্যায়ন করলে একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। লেখক তার কিতাবে বিভিন্ন ধরনের নামাজের উল্লেখ করতে গিয়ে নামাজে আহযাব, সালাতুল আশেকীন, নামাজে তানবীরুল কবুর ও বিভিন্ন সময় ও অবস্থার জন্যে বিভিন্ন ধরনের নামাজের কথা লিখেছেন, শরীয়তে যার কোন অস্তিত্ব নেই। তার কিতাবে ফিরিস্তাদের কাছে আবেদনের ব্যবস্থা রয়েছে। বইটির বিভিন্ন শিরোনামা 'কবরের দাওয়াত' 'ফিরিস্তাদের দাওয়াত' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি লিখতে গিয়ে কোরআন হাদীসের উৎসকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

এভাবে আকিদা, বিশ্বাস ও আমলে ইলমে মারেফত তার মূল লক্ষ্যের অনেক দূরে সরে যায়। অতঃপর মোজাদ্দীদ আলফে সানীর আগমন ঘটে। তিনি তাঁর ইসলামী ইলম ও প্রতিভার ভিত্তিতে ইবনে আরাবীর 'অস্তিত্বের ঐক্য' মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ইবনে আরাবীর ভ্রান্ত দর্শনের সংস্কার সাধন করেন। তিনি ইলমে মারেফতের ময়দানে সংস্কার সাধনের সাথে সাথে সাধারনভাবে ইসলামী আদর্শের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর এই সংস্কার সাধনের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। ইমাম শাহওয়ালী উল্লাহ্ ইলমে তাসাউফকে আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তার সুবিশাল যোগ্যতার মাধ্যমে তিনি ইসলামের ব্যাপক খিদমত আঞ্জাম দেন। এই সংশোধন প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় আমীরুল মুমেনীন সাইয়েদ আহমেদ শহীদের লিখনীতে ও আমলে। তার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (صراط مستقيم) এ এর বিস্তারিত রূপ রেখা পাওয়া যায়। হক পন্থী উলেমা ও সূফীদের তরফ থেকে এই সংস্কার প্রয়াস আজও অব্যাহত রয়েছে।

ইলমে মারেফতের বুনিয়াদ

আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের বাস্তব ফর্মূলা দেয়াই হলো ইলমে মারেফাতের লক্ষ্য; আল্লাহকে হাজের নাজের মনে করা, ঈমান ও একীনের পথে ইহ্সানের মর্যাদার পৌঁছানোর কাজকেই মারেফত বলা হয়। এ পথের পথিককে সালেক, সূফী বা অলী হিসাবে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ্র সিফাত সমূহের উপর এমনি একীন সৃষ্টি হয়ে যায় যে পৃথিবীর সবকিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্র সন্তোষই তার জীবনের একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঈমান ও একীনের এই মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই তাসাউফ। শাহওয়ালী উল্লাহ্ এ লক্ষ্যে কয়েকটি বুনিয়াদের উল্লেখ করেছেন।

<u>**প্রথমতঃ**</u> সকল পর্যায়ের আমলে সালেহার বাস্তবায়নে একীন সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনটি গুণের অপরিহার্যতা রয়েছে, তা হলো; (১) আমলে এখলাস সৃষ্টি করা, (২) অধিক পরিমানে আমলে সালেহার বাস্তবায়ন এবং (৩) নম্রতা ও বিনয়ের সাথে এইসব ঈবাদত করা। এই কয়েকটি গুণের সমন্বয়ে যে নেক আমল, তাই একীন সৃষ্টির সহায়ক।

<u>**দ্বিতীয়তঃ**</u> একীন অর্জনের পথে মুমিনকে অনেক স্তর বা ‘মাকাম’ অতিক্রম করতে হয়। সাফল্যের সাথে এই সব মাকাম অতিক্রম করার উপর সালেকের সাফল্য নির্ভর করে। প্রতিটি মাকামের চরিত্র তার অবস্থায় প্রকাশ পাবে, একেই বলা হয় ‘হাল’। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন মাকামে বিভিন্ন ‘হাল’ প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সাধক এইসব মাকামের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। শেখ আবু তালেব মক্কী ১০টি মাকামের উল্লেখ করেছেন, যথা (১) তওবা- এই মাকামে তওবার ‘হাল’ প্রকাশ পেতে হবে, (২) জোহদ বা মোহমুক্তি- এই মাকামে ‘জোহদের’ হাল প্রকাশ পেতে হবে, (৩) সবর বা ধৈর্য্য- সবরের ‘হাল’ এখানে প্রকাশ পাবে, (৪) শোকর বা কৃতজ্ঞতা- এখানে কৃতজ্ঞতার ‘হাল’ তার অস্তিত্বে প্রকাশ পেতে হবে, (৫) রাযা বা আশা - এর অর্থ হলো আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি আস্থাবান হওয়া, (৬) খওফ বা ভীতি- আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যাওয়া। এখানে হালের প্রকাশে আশা ও

www.pathagar.com

ভয়ের মাঝেই ঈমানের অবস্থান, (৭) তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা- এখানে এই হালের প্রকাশ ঘটতে হবে, (৮) রেজা, অর্থাৎ সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে- আল্লাহ্‌র প্রতি এই সন্তুষ্টির হাল প্রকাশ পেতে হবে, (৯) ফকিরী- অর্থাৎ পার্থিব সম্পদের প্রতি নিস্পৃহতার বাস্তব 'হাল' প্রকাশ পেতে হবে এবং (১০) মোহব্বত বা ভালবাসা- আল্লাহ ও রাসুলের মহব্বতের প্রকাশ তার হালে হতে হবে।
সাধকদের মতে মাকামাতের সংখ্যা অনেক বেশী, তবে উপরোক্তগুলোই মূল মাকাম।

<u>তৃতীয়তঃ</u> যখন একজন সালেক উপরোক্ত মাকামাত সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে ও প্রতি অবস্থায় তার 'হাল' প্রকাশ পায় এবং শেষে তার মনে একীন সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন সে যা বলে একীনের সাথে বলে, যা করে একীনের সাথে করে। আশা-নিরাশা সবই আল্লাহ্‌রই জন্যে হয়ে যায়, সে তখন উপায় ও উপাকরনের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে উপায় ও উপকরনের মালিকের উপর নির্ভরশীল হয়। তার অন্তরে সব মাকামের সমন্বয়ে সুমহান মাকাম তৈরী হয়। এটাই মারেফতের শেষ স্তর। এই পর্যায়েই সালেকের আমলে কিরামাত প্রকাশ পায় বা তার দ্বারা অনুসারীদের তরবিয়াত ফলপ্রসু হয়। (القول الجميل)
একীন হলো ঈমানের মূল শক্তি ও ভূষন, একীন ছাড়া ঈমান খোলস মাত্র। রাসুলেপাক দোয়া করতেন এভাবে;
"আমাকে এমন একীন দান করুন যেন পৃথিবীর বিপদ-আপদ সহজ হয়ে যায়।"
মওলানা এসমাইল শহীদ বলেছেন, একীনের ফলেই অন্তর থেকে অপবিত্রতা দূর হয়ে যায় এবং পবিত্রতায় বিভিন্ন মৌলিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয়। একীনের ফল স্বরূপ যে সব মৌলিক গুণাবলীর সৃষ্টি হয় তা হলো, সাহস, তৃপ্তি বা তুষ্টি, উদারতা, দয়া, সবর, কৃতজ্ঞতা, সন্তোষ, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি।

এই একীনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ্ বলেন,
"একীন থেকে সেই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে যা নেক বান্দাদের মনে প্রদত্ত হয়। এই একীন কোন প্রমাণ বা যুক্তি নির্ভর নয় বা অনুকরণ বা অনুসরণের ফল নয়।"

রাসুলেপাক ইরসাদ করেছেন,
যখন ঈমানের নূর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়, সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, এর নিদর্শন কি? আল্লাহ্‌র রাসুল জবাব দিলেন, "আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ, পার্থিব বিষয়ের মোহমুক্তি বা ঘৃণা এবং মৃত্যুর পূর্বেই তার প্রস্তুতি।"

www.pathagar.com

ইলমে মারেফতে ইলম ও যুক্তির পাশাপাশি ইলমের ফলিত রূপ বা তার বাস্তবায়নের 'হাল' এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইলমের বাহ্যিক প্রতিফলনকেই 'হাল' বলা হয়ে থাকে। এই 'হাল' ছাড়া ইলম নাযাতের চাবিকাঠি নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ সম্পর্কে বলেছেন,
"সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের অপরাপর বিশিষ্ট সাধক ব্যক্তিগণ ইলম ও হালের সমন্বিত ব্যক্তি ছিলেন, অতঃপর যখন আহলে ইলম ও আহলে হাল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখনই শুন্যতা সৃষ্টি হলো।

(مدارج السالكين)

উপরে যে সব মাকামের কথা বা ঈমানের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলোই হলো ঈমানের দাবী। এই সব দাবী পূরণ করতে না পারলে ঈমান অপূর্ণ থেকে যায়। হাফেজ ইবনে কাইয়েম তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (زاد المعاد)-এ এই সব মাকাম ও ঈমানের স্তরগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তরিকতের ইমামদের মতে বর্ণিত সব মাকামগুলোর পর সর্বশেষ স্তরটির নাম হলো ফানাফিল্লাহ। যার অর্থহলো একীনের মাধ্যমে ঈমান এমনি এক স্তরে পৌঁছে যায় যখন সালেক তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে, আল্লাহর সন্তোষের মাঝে নিজের চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বাসনা-কামনাকে বিলীন করে দেয়। নিজের বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একজন মুমিনের জীবনে এই স্তর তার চরম ও পরম কাম্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দিদার লাভই তার একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই ফানাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন; প্রথম ফানা আম্বিয়া ও পূর্ণাংগ অলীদের অংশ, দ্বিতীয় ফানা সাধারন অলীদের ভাগ। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ফানা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন;

এই ফানা যখন সালেকের জীবনে আসে তখন আল্লাহ ছাড়া অপরাপর সবকিছু তার মাসসপটে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আল্লাহর প্রেম, ইবাদাত ও জিকিরের গভীরতায় সালেকের মন আল্লাহর অস্তিত্বে হারিয়ে যায়। পরম আকাংখিতের আকাংখা আর কারো জন্যে কোন অস্তিত্বের জায়গা ছেড়ে দেয় না, তাই বস্তুর অস্তিত্ব, দৃশ্যমানের দর্শন ও প্রকাশ্যের প্রকাশ তার কাছে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, এমনি করে পার্থিব জড় জগৎ তার কাছে ফানা হয়ে যায়। শুধু আল্লাহর অস্তিত্বই তার কাছে অবশিষ্ট থাকে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও পূর্ণ অলীদের ফানার চেয়ে এই দ্বিতীয় স্তরের ফানার মর্যাদা কম। তাই আম্বিয়া, বিশিষ্ট সাহাবা বা বিশিষ্ট অলীদের জীবনে এই ফানা আসেনি। এই ফানার সুচনা হযরত তাবেয়ীদের যামানা থেকে সুচিত হয়েছে। বিশিষ্ট সালেক হযরত আবু ইয়াজিদ, আবু হাসান নূরী, আবু বকর শিবলী প্রমুখের জীবনে এই ফানার প্রমাণ পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। পক্ষান্তরে আবু সোলায়মান দারানী, মারুফ কুরখী, ফুজায়েল বিন আয়াজ ও জুনায়েদ বাগদাদীর বেলায় এই ফানা অনুপস্থিত। (العبودية)

পরবর্তীকালে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বর্ণিত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ফানাকে (وحدة الشهود) বা 'দর্শনের ঐক্য' নামে বিস্তারিত তথ্য সহ ব্যাখ্যা করে মোজাদ্দীদে আলফে সানী শেখ ইবনে আরাবীর (وحدة الوجود) মতবাদের সমালোচনা করেন। এই অর্থে সালেকের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত সৃষ্টি বিলীন হয়ে যায়। এক আল্লাহকেই সে সর্বত্র দেখতে পায়, এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের ফানা বা (وحدة الشهود) যা ইবনে আরাবীর মতবাদ থেকে মৌলিকত্বের দিক দিয়ে ভিন্নতর। ইবনে আরাবীর ধারনা মতে সালেকের কাছে আল্লাহ ছাড়া সমস্ত সৃষ্টির মূল অস্তিত্বই লোপ পায়। সৃষ্টির মূল অস্তিত্বের বিলোপ ও সৃষ্টিকে না দেখা এক জিনিষ নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে সাহাবায়ে কেরামগণ রাসুলেপাকের সান্নিধ্যে ফানার সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তারা বাস্তবকে বাস্তব বলে দেখতেন ও সাথে সাথে আল্লাহ্র নৈকট্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অলী হলেন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবাগণ। হযরত আবু বকর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ অলী, অতঃপর হযরত উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) অতঃপর আশারায়ে মোবাশ্বেরাদের মধ্যে অবশিষ্ট; তালহা বিন উবায়দুল্লাহ, জোবায়ের বিন আল আওয়াম আল যাররাহ আবু উবায়দা সায়াদ বিন আবি ওক্কাস, আবদুর রহমান বিন আউফ ও সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) এর মর্যাদা। যাদের জীবদ্দশাতেই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অতঃপর (السابقون الاولون) বা প্রাথমিকতার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পর তাবেয়ীনে এযামগণ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ অলী। তাবেয়ীনদের মধ্যকার অলী সাহাবা অলীদের সরাসরি তরবীয়তে বেলায়েতের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন।

তাবেয়ীদের পরবর্তী পর্যায়ের বেলায়েতের পশ্চাতে আহলুল সুন্নতে আল জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে উম্মতের মধ্যে যাদের নেকী ও বুজুর্গী সর্বতোভাবে স্বীকৃত। যাদের জন্যে উম্মতের (لسان صدق) বা সত্য সাক্ষ্য রয়েছে, তাদের বেলায়েত মেনে নিতে হবে। তাদের বেলায়েত বিশেষ ইলম 'কাশফ' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাশফের ইলম শরয়ী ইলমের মর্যাদা সম্পন্ন নয়, কেননা কাশফ এর ইলমে ভ্রান্তি সম্ভব। এজন্যে কাশফের ইলমকে সরাসরি মানা যায় না। বরং কোরআন হাদীসের অনুকূলে হলেই শুধু মেনে নেয়া যায়। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ আমাদের পথ প্রদর্শক। সাহাবায়ে কেরামগণ নিজেদের কাশফের ইলমের উপর নির্ভর না করে

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামদের পরামর্শভিত্তিক মতামত কবুল করতেন। কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামগণই শয়তানের ওসওয়াসা থেকে মুক্ত। আল্লাহপাক বলেন;

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولانبى الاّ اذا تمنى القى الشيطان فى اُمنيته فينسـخ الله مـا يلقـى الشيطان ثم يحكم الله أياته والله عليم حكيم – (حج)

(আমি তোমার পূর্বে যতো রাসুল বা নবী পাঠিয়েছি, তারা যখন কোন কামনা করে, তখন শয়তান তার সেই সেই কামনায় মন্ত্রণা দেয়। অতঃপর আল্লাহ সেই মন্ত্রণাকে বানচাল করে দিলেন এবং তার আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আল্লাহ প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী।)

এই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে আল্লাহপাক একমাত্র নবী রাসুলদেরকেই শয়তানের ওসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। নবী রাসুল ছাড়া আর কাকেও এই নিরাপত্তা দেননি। তাই রাসুল ছাড়া কেউ মাসুম নন। অলী হবার জন্যে নিস্পাপ হওয়া শর্ত নয়। কিংবা ক্ষমাযোগ্য (শিরক ব্যতিরেকে) গোনাহ্ হতে মুক্ত হওয়া কোন শর্ত নয়। এমনকি কবিরা গোনাহর পর তওবা করলে সেই গোনাহও তার অলী হবার পথে বাধা নয়। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

و الذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون – لهم ما يشاؤن عند ربهم ذلك جزاء المحسـنين ليكفر الله اسؤا الذى عملوا و يجزيهم أجرهم باحسن الذى كانو يعملون – (الزمر ٣٥)

(যে ব্যক্তি সত্যকে উপস্থাপন করে ও তার সত্যতা স্বীকার করে তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাদের রবের কাছে তাদের ঐসব কিছুই রয়েছে যা তারা চাইবে। এসব তাদের ভাল কাজেরই প্রতিদান। যেন তাদের শ্রেষ্টতম আমলের প্রতিদান দিয়ে তাদের নিকৃষ্টতম আমলকে ব্যর্থ করে দেন।)

এই আয়াতে আল্লাহপাক তার বান্দাকে মোত্তাকী হিসেবে অভিহিত করছেন, যাদেরকে অলী বলা হয়েছে অন্যত্র। আবার তারা গোনাহও করেছে। তাই ক্ষমাযোগ্য কোন গোনাহ অলী হবার অন্তরায় নয়। একমাত্র শীয়া মযহাবেই তাদেরকে মাসুম বা নিস্পাপ বলা হয়েছে। কিছু কিছু বিভ্রান্ত সূফীগণ ও অলীদেরকে নিস্পাপ মনে করেন। তারা শীয়াদের 'অলী মাসুম' এর স্থলে 'অলী মাহফুজ' শব্দ ব্যবহার করেন। শব্দ ভিন্ন কিন্তু অর্থ একই। এই আকিদা আহলুল সুন্নতে অল জামাতের আকিদা নয়। এই সমস্ত বিভ্রান্ত লোকেরা যুক্তি হিসাবে হযরত মুসা ও খেজেরের কাহিনী তুলে ধরেন। তাদের মতে খেজের ছিলেন অলী, হযরত মুসার চাইতে গায়েবের বেশী আলেম এবং নিস্পাপ, সাথে সাথে নবীর আনুগত্যের উর্দ্ধে। কিন্তু ঐ সমস্ত লোকেরা ভুলে যান যে হযরত মুসা তার কওমের জন্যে নবী ছিলেন, কিন্তু হযরত খেজের তার কওমভূক্ত ছিলেন না, তাই হযরত মুসার আনুগত্যের বাইরে ছিলেন। পূর্বতন নবীগণ তাদের স্ব স্ব গোত্রের বা কওমের নবী ছিলেন, পক্ষান্তরে নবীয়ে আখেরুজ্জামান (সাঃ) হলেন সারা বিশ্ব-জগতের নবী।

www.pathagar.com

তিনি বলেন,

و كان النبى يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة –

(পূর্বে নবীগণ তাদের কওমের জন্য বিশেষভাবে প্রেরীত হতেন আর আমি প্রেরিত হয়েছি সারা মানব সমাজের জন্যে।)

কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

قل يا ايهاالناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض –

(হে মানব গোষ্ঠী আমি তোমাদের সকলের জন্যে সেই আল্লাহর রাসুল, যিনি আসমান ও জমিনের মালিক।)

অন্যত্র এরসাদ হয়েছে;

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا –

(আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যেই সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।)

অতঃএব নবীর আনুগত্যের বাইরে আর কোন আনুগত্যের উৎস নেই। সালেক কখনও কখনও মনে করে যে তার কাশফ হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা কাশফ নয়, বরং তা তার অনুমান (ظـن) মাত্র। ধারণা বা অনুমানকে 'কাশফ' বলা যায় না। কাশফের সীমা ও স্বরূপ সম্পর্কে মোজাদ্দীদে আলফেসানী তার (مكتوبات) এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

নবীর বাতেন আল্লাহর সাথে এবং তার জাহের মাখলুকের সাথে ব্যস্ত- এটাই ফানার সর্ব্বোচ্চ স্তর। নবীর সান্নিধ্যে ও তার সরাসরি তরবিয়তে সাহাবায়ে কেরামদের তাযকিয়া হওয়ার ফলে ফানার এই সর্ব্বোচ্চ ও চুড়ান্ত মর্যাদা তারা ও পেয়েছিলেন। পরবর্তীযুগের আওলীয়াদের মাঝে যারা জাহের ও বাতেনের মাঝে এই ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছেন, কিংবা আগামীতে যারা এমনি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন, তারাই বান্দাদের জন্যে অনুকরণীয় অলী বা কামেল অলী। জাহের ও বাতেনের এই পার্থক্য সূচিত না হলে সেই ফানা ফিতনার জন্ম দেয়। কাজেই নবীর আনুগত্য বা তার আদর্শের পরিপন্থি যে কোন কাজ গোমরাহী।

শরীয়ত ও মারেফতের সম্পর্ক

ইলমে মারেফতের সমস্ত ইমামগণ শরীয়তের প্রাধান্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্য কথায় তারা শরীয়াতের সত্যিকার আমলের জন্যেই মারেফতের চর্চা করেন।

www.pathagar.com

ইলমে মারেফতের সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (كتاب اللمع) এর (اقامت شريعت) অনুচ্ছেদে শরীয়তের প্রাধান্যের কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে)
(رسالة قشيرية) এ বলা হয়েছে;

وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة فعدوا قلة المبالة بالدين أوثق ذريعة و استخفوا بأداء العبـادات و استهانوا بالصوم و الصلوة –

বিভ্রান্ত তরিকতের সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,–
"অন্তর থেকে শরীয়তের মর্যাদা দূর হয়ে গেছে। তারা দ্বীনের ব্যাপারে বেপরোয়া, একেই তারা উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। ঈবাদত বন্দেগীর আদায়ে তারা কম গুরুত্ব দেয় এবং নামাজ রোজাকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।"
আসল তরিকতের কথা এভাবে বলা হয়েছে;

بناء هذا الامر و ملاكه على حفظ اداب الشريعة –

(এই আদর্শের মূল ও বুনিয়াদ হলো শরীয়তের নিয়মনীতির বাস্তবায়ন।)
হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) তার (فتوح الغيب) কিতাবের সূচনাতেই শিরোনামা দিয়েছেন (اتبعوا ولاتبتدعـــوا) *(সুন্নতের অনুসরণ করো, বিদয়াতের পথে চলো না।)* তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সারা শিক্ষার মূল কথা হলো শরীয়তের অনুসরণ।

মোজাদ্দিদে আলফে সানী (রঃ) তাঁর সারা জীবন ধরে শরীয়তের অনুসরণ ও বিদয়াতের উৎখাতের সংগ্রাম করেছেন।

হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ ও সাইয়েদ আহমেদ শহীদ ও শরীয়তের প্রাধান্যের কথাই বলে গেছেন। ইলমে মারেফতের উপর লিখিত কোন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবে ও শরীয়তের প্রাধান্যের কথা অস্বীকার করা হয়নি।
মোজাদ্দীদ আলফে সানী আরো বেশী স্পষ্ট করে বলেছেন,
"শরীয়তের প্রশ্নে সূফীদের আমল কোন প্রমাণ নয়। তাদের সম্পর্কে এই মনোভাবই যথেষ্ট যে তাদেরকে অপারগ মনে করে তাদের ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করা। শরীয়তের প্রশ্নে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদের কথাই গ্রহণযোগ্য- আবু বকর শীবলী বা আবুল হাসান নূরীর আমল যুক্তি নয়।"

(مكتوب باسم ميان شيخ بديع الدين،)

তিনি আরো লিখেছেন;
"এ ধরনের কথা যারাই বলুন না কেন, হতে পারে তিনি শেখ কবির ইমেনী, কিংবা শেখ আকবর শামী, তার কথায় আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের প্রয়োজন মোহাম্মদ

www.pathagar.com

আরাবীর (সাঃ) কালাম- মহীউদ্দীন বিন আরাবীর নয়। আমাদের জন্যে কোরআন হাদীসের (نص(প্রমাণ)) প্রয়োজন فص (فصوص الحكم) এর প্রয়োজন নেই, (فتوحات مدينة)বা রাসুলের সুন্নাত)) আমাদেরকে (فتوحات مكية(ইবনে আরাবীর কিতাব)) থেকে বেপারোয়া করে দিয়েছে।”

উল্লেখযোগ্য যে ইবনে আরাবী তার কিতাব (فصوص الحكم) ও (فتوحات مكية) এর মধ্যে তার মতবাদ (وحدة الوجود)এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

উপরের মন্তব্যগুলো হতে বোঝা যায় যে ইলমে মারেফতের সূচনা থেকেই এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোক ইলমে মারেফতের নামে দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করার কাজে লিপ্ত ছিলো। বাতেনী ফিরকাহ ও শীয়া মতবাদের প্রভাবাধীন বিভ্রান্ত লোকেরা ইলমে মাফেতকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতো। তাদের ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইলমে মারেফতের কোন সম্পর্ক নেই।

শীয়াদের ভ্রান্ত মতবাদ জানার পর কেউ যদি ঐসব অনৈসলামী ধারণার জন্যে হযরত আলী (রাঃ) বা বিশিষ্ট আওলাদে রাসুলদেরকে দায়ী করে বসে তবে তার চাইতে অবিচার আর কি হতে পারে? তেমনি ইলমে মারেফতের নামে উদ্ভূত ঐসব বিভ্রান্ত ধারনার জন্যে উম্মতের মহান ইমাম তরীকতদের দায়ী করলে অনুরূপ অপরাধই করা হবে। ইলমে মারেফতের এই ব্যাপক অপব্যবহার দেখেই মুসলিম উম্মাহর অনেক পন্ডিত ব্যক্তি সরাসরি ইলমে মারেফতকেই অস্বীকার করে বসেছেন। কিন্তু হকের পথ তা নয়। হককে হক বলে স্বীকার করা ও বাতিলকে বাতিল বলে চিহ্নিত করাই ইনসাফ। ইসলামের এমন কোন ইলম আছে কি যার অপব্যবহার করা হয়নি? উম্মতের বড় বড় আকিদাগত বিভেদ কোরআনের অপব্যবহারের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসে রাসুলের নামেও ফিতনার ইয়ত্তা নেই, বরং বলা যায় উম্মতের সমস্ত গোমরাহী হাদীসের নামেই সৃষ্টি হয়েছে। বিভ্রান্ত লোকদের হাদীস বানানোর ইতিহাস, ইসরাইলী কাহিনী সংযোজনের ইতিহাস সবার জানা কথা। ইলমে ফিকাহর কলহ বিবাদ সর্বজনবিদিত। তাই বলে কি কোরআন, হাদীস বা ফিকাহ ছেড়ে দিতে হবে?

আমাদের নবীর পূর্বে এই ধরনের বিকৃতিই পরবর্তী নবীর আগমণ সূচিত করতো, কিন্তু আমাদের নবী শেষ নবী, তারপর আর কোন নবী আসবেন না। তাই আমাদের উম্মতে আল্লাহ্ এমন ব্যবস্থা রেখেছেন যে ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে এমন সব মর্দে মুমেনের আগমণ ঘটেছে যারা দ্বীন ইসলামের সমস্ত ইলমকে সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং রাসুলেপাকের আদর্শকে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এইধারা অব্যাহত থাকবে।

www.pathagar.com

বিকৃতির বিরূদ্ধে নীরবতা এই উম্মতের চরিত্র নয়। হক পন্থী উলেমারা যখন এই দায়িত্ব পালন করেন না তখন তার পূর্বতন গোমরাহ্ উম্মতদের পদাংক অনুসরণ করেন, ফলে গোমরাহী ব্যাপকতর হওেয়ার সুযোগ পায়।

ইলমে মারেফতের সাথে জড়িত উলেমাদের যথাযোগ্য ভূমিকার অভাবেই এই পবিত্র ইলম নিন্দিত হচ্ছে। এ প্রসংগে আমি ইমামে তরিকত শেখ সেহাবুদ্দীন সহরোয়ার্দীর বাণী দিয়ে উপসংহার করতে চাই। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (عوارف المعارف)এ ইলমে মারেফতের ধারকদেরকে সুন্নতের অনুসরণে তিনটি পর্যায়ের উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে আহবান জানিয়েছেন, যাকে তিনি (قولا فعلا و حالا) বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সুন্নতের অনুসরণে কথায়, কাজে ও হালে সমগুরুত্ব দিতে হবে। এই তিনটি দিকের কোন একটি দিকের প্রতি গুরুত্ব লঘু হয়ে গেলেই ইলমে মারেফত তার মর্যাদা হারাবে। উলেমা সমাজকেই বিচারকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

সোহ্বতের বিকল্প

সাহাবায়ে কেরামদের তরবিয়ত ও তাযকিয়া সরাসরি রাসুলেপাকের একান্ত সান্নিধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিলো। রাসুলের সোহবতই সেই কষ্ঠিপাথর যা তাদেরকে ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলো, তেমনি সাহাবাদের সরাসরি শিক্ষা-দিক্ষায় যাদের তরবিয়ত হয়েছে তাদের মর্যাদা ও অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সোহবতের গুরুত্ব সাধারনভাবে ও মারেফতের ময়দানে বিশেষভাবে অনস্বীকার্য। সাহাবায়ে কেরামদের পর সাধারনতঃ বিশিষ্ট ইমাম ও মোজতাহেদীনগণ তাদের স্ব স্ব তত্ত্বাবধানে অনুসারীদের ঈমান, আকিদা ও আমলের তত্ত্বাবধান করতেন। এই সোহ্বতের প্রভাবেই অনুসারীদের জীবনে কাংখিত পরিবর্তন আসতো। বিশেষ করে ইসলামী খিলাফত বা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার অবনতির ফলে সোহ্বতের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। তরিকতের ইমামগণ এই সোহবতকে ইলমে তাসাউফ অর্জনের জন্য বুনিয়াদী শর্তরূপে তুলে ধরেন। কিন্তু আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বই পুস্তক মুদ্রিত আকারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত সাহচর্যের গুরুত্ব কমে যায়। বিভিন্ন মাদ্রাসা, মকতব ও খানকার পত্তন হয়। যেখানে তাদের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা ও আকিদার লালন হতে থাকে। এ অবস্থায় মুদ্রিত বই পুস্তক অনেকাংশেই সোহবতের বিকল্প বলে চিত্রিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বই পুস্তকের মাধ্যমে সোহবতের সত্যি কোন বিকল্প হয় না।

ইলমে মারেফতের উপর লিখিত যেসব বইগুলোর আলোচনা এখানে করা হয়েছে, সেগুলো এর প্রণেতার নিজস্ব লেখা কিংবা তার কোন সাগরিদের লেখা, যা মূল লেখক দেখে বা শুনে সমর্থন করেছেন। এমনি ধরনের বইকে তার প্রণেতার নিজস্ব মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কোন বাঁধা নেই, পক্ষান্তরে তাসউফের উপর এমন অনেক বই পুস্তক

www.pathagar.com

পাওয়া যায়, যা একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর অনেকপর তার কোন অনুসারীর লেখা। এইসব বইতে তার প্রণেতার কর্মময় জীবনের কিয়দংশ জানা যায় সত্যি, কিনতু বইতে লেখা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার প্রণেতার মতামত বলে মেনে নিতে কোন যুক্তি বাধ্য করেনা। তাই সেসব বইতে যদি কোরআন ও সুন্নাহর প্রতিষ্ঠিত কোন ধারনার পরিপন্থি কোন আকিদা ও আমল পাওয়া যায় তবে উল্লেখিত প্রণেতার প্রতি কুধারণা পোষন না করে ঐসব শরীয়ত বিরোধী মতামতকে তারই মতামত বলে অস্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) প্রমুখ এর নামে যে সমস্ত বই পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলোকে এই কষ্ঠিপাথরে যাচাই করতে হবে।

ইলমে মারেফত ও সমালোচনা

আওলীয়া বা তরিকতের ইমামগণ যেহেতু নিষ্পাপ নন, তাদের মতামতও ওহীর জ্ঞানের মতো নির্ভুল নয়। তাই তাদের সম্পর্কে বেলায়েতের বিশ্বাস রাখা সত্বেও তাদের সমস্ত মতামত মেনে নেয়া অপরিহার্য নয়। তাদের মধ্যে কারো কোন মত যা কোরআন, হাদীস ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংঘাতশীল বলে মনে হয়, তা শুধু এ কারনেই মেনে নিতে হবে বা সে মতকে গ্রহনযোগ্য করার জন্যে বিভিন্ন ওজর গড়তে হবে যে তিনি অত্যন্ত বুজুর্গ ব্যক্তি। হাদীসের ইমাম, ফেকাহর ইমাম বা ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞানের ইমামও পন্ডিতদের সম্পর্কে আমরা যেমন কোরআন হাদীসের আলোকে সমালোচনার পথ উম্মুক্ত রেখেছি, তাদের মতামতের মধ্যে কিছু কিছু গ্রহন করি এবং কিছু বর্জন করি, তাদের গঠনমূখী সমালোচনারকে অবৈধ মনে করি না, তেমনি তরিকতের ইমামদেরও সমালোচনা অপরিহার্য। এটাই আহলুল সুন্নতে অল জামাতের আকিদা। তরিকতের ইমামদেরকে সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করা বাতেনী ফিরকা বা শীয়াদের আকিদা। ইমাম মহীউদ্দিন ইবনে আরাবীর (وحدة الوجود) মতবাদের সমালোচনা করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাইয়েম বা মোজাদ্দিদ আলফে সানী কোন গর্হিত কাজ করেননি। তেমনি মোজাদ্দিদ আলফে সানীর (تصور شيخ) বা মুরশিদের ধ্যান মতবাদের যারা সমালোচনা করেছেন তারাও কোন অপরাধ করেননি। বরং তারা উম্মতে মুহম্মদীর জন্য প্রদত্ত সুন্নতেরই দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্ত হয়েছেন।

হ্যাঁ, এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই সব পুণ্যবান মহান ব্যক্তিদের সমালোচনা করতে গিয়ে যেন ঘৃণা, বিদ্বেষ বা তাদেরকে হীন করার মানসিকতা প্রকাশ না পায়। ইজতিহাদের ভ্রান্তি কখনো কারো মর্যাদাকে খাটো করে না। (وحدة الوجود) এর মত মারাত্মক মতবাদের জনক হযরত ইবনে আরাবীর সমালোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই আদর্শকেই সমুন্নত রেখেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন,

www.pathagar.com

ولكن ابن عربي أقربهم الى الاسلام و أحسن كلاما فى مواضع كثيرة – فانه يفرق بين المظاهر و الظاهر فيقر الامر و النهى و الشرائع على هى عليه و يأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشائخ من الاخلاق و العبادات و لهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك و ان كانوا لايفقهون حقائقه و من فهمها منهم و وافقه فقد تبين قوله –

(ইবনে আরাবী তাদের (সমসাময়িক সূফীদের) মধ্যে ইসলামের নিকটতর। অনেক অনেক ক্ষেত্রে তার কথা উত্তম, তিনি প্রকাশ ও প্রকাশ্যের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেন। সৎকাজের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সহ শরীয়তের বিভিন্ন শিক্ষা কে সমুন্নত রেখেছেন। তিনি আখলাক ও ঈবাদতের বিষয়াদিতে মাশায়েখদের নির্দেশিত পথে চলতে নির্দেশ দিতেন। এজন্যে বিপুল সংখ্যক লোক তার কালাম গ্রহণ করতেন ও উপকৃত হতেন, যদিও তারা তার কালামের অন্তর্নিহিত নিগুঢ় তত্ব বুঝতে অক্ষম। যারা তার কথার মূল মর্ম বুঝতে সক্ষম হতেন তাদের কাছে ইবনে আরাবীর কালামের তাৎপর্য রহস্যাবৃত রইতো না।) ইবনে তাইমিয়া আরো মন্তব্য করেন,

و هذه المعانى كلها هى قول صاحب الفصوص و الله تعالى اعلم بما مات الرجل عليه و الله يغفر لجميع المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات ا لاحياء منهم و الاموات ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا انك رؤف رحيم –

(جلاء العينين)

(এসব অর্থই (فصوص الحكم) এর প্রণেতার কথা । আল্লাহই ভাল জানেন তিনি কোন আকিদার উপর ইন্তেকাল করেছেন। হে আল্লাহ, সমস্ত মুসলিম ও মুমীন নর-নারী, জীবিত কিংবা মৃত সবাইকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ আমাদের মাফ করুন, আমাদের পূর্বতন ভাইদের মাগফেরাত করে দিন যারা আমাদের পুর্বে ঈমান কবুল করেছেন। হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে ঈমানদার ভাইদের ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। আপনি বড় দয়ালু ও ক্ষমাশীল।) তেমনি উম্মতের বিশিষ্ট ইমাম ও মাশায়েখগণও ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে অনুরূপ মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন।

(ملاعلى قارى) বলেছেন;

و من طالع منازل السا ئرين تبين له انهما كانا من اكابر اهل السنة و الجماعة و من اولياء هذه الامة – (مرقاة شرح مشكوة)

(যে ব্যক্তি (منازل السائرين) এর ব্যাখ্যা (مدارج السالكين) পড়েছেন, তারা ভাল করে উপলব্ধি করতে পারবেন যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম ইবনে কাইয়েম আহলুল সুন্নত

www.pathagar.com

অল জামায়াতের শুধু বিশিষ্ট ইমামই নন, বরং এই উম্মতের বিশিষ্ট আউলিয়াদের মধ্যে পরিগণিত।)

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ বলেছেন;

و ليس شئى منها و معه دليله من الكتاب و السنة و آثار السلف فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود فى العالم و من يطيق ان يلحق شاوه فى تحريره و تقريره و الذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ما اتــاه الله تعالى – (جلاء العينين / تفهيمات الهيه)

(ইবনে তাইমিয়ার কথার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যার উপর তার কাছে কোরআন, সুন্নাহ বা প্রথম যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী সমূহ সম্বলিত প্রমাণাদি নেই। এমন জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি যিনি তার বক্তৃতাও লিখনীর মর্যাদায় পৌঁছার যোগ্যতা রাখেন? যারা তাঁকেসমালোচনায় জর্জরিত করেছেন তারা তাঁর কামালীয়াতের ১০ ভাগও অর্জন করতে পারেননি।)

ইমাম যাহাবী বলেছেন;

لم أر مثله فى ابتهاله و استغاثته و كثرة توجهه –

আমি কাঁন্নাকাটি, আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনায়, আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়ায় ও আল্লাহ্র প্রতি এক কেন্দ্রীকতায় তার মতো দ্বিতীয় কাকেও দেখিনি।

এইসব বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয় যে ইমাম তাইমিয়া ও ইমান ইবনে কাইয়েম ইলমে মারেফতের মূলধারার ধারক ও বাহক ছিলেন। তারা অনন্য সাধারন যোগ্যতা সম্পন্ন ইমাম হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্র বিশিষ্ট অলী ছিলেন ইলমে মারেফতের নামে অসংখ্য গোমরাহী সৃষ্টি হয়েছে বলে মূল ইলমকেই অস্বীকার করা ইনসাফ নয়।

ইলমে মারেফতের নামে বিভ্রান্তি

দার্শনিক চিন্তাধারা ও তাত্বিক মতবাদ ইলমে মারেফতে অনুপ্রবেশ করার ফলে অসংখ্য বিভ্রান্তির পথ খুলে যায়। অনৈসলামী চিন্তাধারা ও কলুষিত আকিদায় বিশ্বাসী সুযোগ সন্ধানী লোকেরা ইলমে মারেফতের নাম ব্যবহার করে এই পবিত্র ইলমকে কলূষিত করে ফেলেন এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তার ব্যাপকতা এতো বেড়ে যায় যে আসল ইলমকে খুঁজে বের করাই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং আপামর জনসাধারন ঐ সমস্ত বিভ্রান্ত পথ ও মতগুলোকেই ইলমে মারেফত বলে মনে করতে থাকেন। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভাবশালী কায়েমী স্বার্থবাদী লোকদের তথা সর্বস্তরের অসৎ নেতৃত্বের পৃষ্টপোষকতায় এই সব ভ্রান্ত পথ ও মত ইলমে মারেফতের নামে শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়। যার সামনে হকপন্থী উলেমাদের ভূমিকা নিতান্ত গৌণ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বিভ্রান্তির প্রথম বীজ

উম্মতের জন্যে দূর্ভাগ্যই বলতে হবে যে প্রথম যুগের পর ইলমে মারেফতের ধারক ও বাহকদের মধ্যে ইলমে হাদীসের চর্চা সীমিত হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সূফীগণ ইলমের সাধনায় গুরুত্ব কম দেন। ফলে (موضوع) বা বানানো হাদীস ইলমে মারেফতের জন্যে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। হাদীস ছাটাই বাছাই করে বানানো বা ভিত্তিহীন হাদীস থেকে ইলমে মারেফতকে মুক্ত রাখার জন্যে ব্যাপক প্রয়াসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বরং কিছু কিছু সূফী ফজিলতের বর্ণনায় বা ঈমানী অনুপ্রেরণার উদ্দেশ্যে নকল হাদীসের ব্যবহারকে বৈধ মনে করতেন। তারা মনে করতেন যে নকল বা বানানো হাদীস যদি ঈমানী প্রেরণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে তবে তাকে হাদীস বলে মানতে ক্ষতি কি? এভাবে ইলমে মারেফতের ধারক ও বাহকদের মধ্যে এই সব মিথ্যা হাদীস সম্মানজনক স্থান বানিয়ে নেয়। প্রথম পর্যায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি ঈমান আকিদায় বিকৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম না হলেও এক ফিতনার দরজা খুলে দেয়। প্রথম পর্যায়ে সূফীগণ সীমিত লক্ষ্যে বানানো হাদীসের ব্যবহার বৈধ করেছেন, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এইসব ভিত্তিহীন হাদীস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আজও ইলমে মারেফতের এক শ্রেণীর ধারক ও বাহকগণ এইসব হাদীসের উপরই তাদের নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছেন।

তাসাউফের ইতিহাস সন্ধানে ভ্রান্তি

কিছু কিছু সূফী মনে করেন যে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে আহলে সোফফাহ (اهل صفة) বলে পরিচিত সাহাবারা সর্বপ্রথম সূফী ছিলেন। তাদের নামেই সূফী নামকরণ করা হয়েছে। তাদের মতে আহলে সোফফাহগণ দুনিয়াত্যাগী সাধক ছিলেন। তারা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারাই উম্মতের প্রাথমিক আউলিয়া। অপরাপর সাহাবাদের চাইতে তাদের বেলায়েত সুস্পষ্ট। তারা বাতেনী ইলমে অপরাপর সাহাবাদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। আহলে সোফফাগণ রাসুলেপাকের মিরাজের ঘটনা সাহাবাদের কাছে বলার পূর্বেই জানতেন তাদের বাতেনী ইলমের কল্যাণে।

কোরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের আলোকে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তরীকতের কামেল ব্যক্তিদের বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয় ইসলামের কয়েকশত বছর পর। এই সব ব্যক্তিদের কখনও ওলী, কখনও সূফী বা ফকির বলা হতো। আরো পরবর্তীকালে তাদেরকে কলন্দর বা দরবেশ বলা হতো, আহলে সোফফাহদের নামে কখনও এসব নামকরণ করা হয়নি।

www.pathagar.com

রাসুলেপাকের যুগে আহলে সুফফাহ্ বলা হতো তাদেরকে যারা নিঃসম্বল অবস্থায় মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসতেন এবং মসজিদে নবুবীর উত্তর কোণে সোফফাহ নামক স্থানে আশ্রয় নিতেন। তারা সবাই একাকী ছিলেন। তাদের কোন পরিবার ছিলোনা। মদীনার আনসারগণ হিজরতকারী মুসলমানদের আশ্রয় দিতেন। রাসুলেপাক মোহাজীর ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব করে দিতেন। মোহাজীরদের এই সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে, ফলে কোন কোন মোহাজীরদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা তাৎক্ষনিক হয়ে উঠতো না, তাই তারা বাধ্য হয়ে সোফফাহতে আশ্রয় নিতেন, আবার যখন আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়ে যেতো তারা স্থানান্তরিত হয়ে যেতেন বা বিয়ে করলে অন্যত্র চলে যেতেন। এই ধরণের সাহাবাদের সংখ্যা বিভিন্ন মতানুযায়ী ৪০০ বা তার চাইতে কিছু কম বলা হয়ে থাকে। তারা সবাই রাসুলেপাকের মেহমান ছিলেন। রাসুলেপাক তাদের খাবার পাঠাতেন বা অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতেন। সঙ্গতিশীল সাহাবাগণ ও সাহায্য করতেন। তারা সবাই অত্যন্ত অভাবীলোক ছিলেন। নিজস্ব সম্বলে জিবিকা নির্বাহ করতে পারতেন না। তাদের জন্যে সাদকা জাকাত বৈধ করা হয়েছিলো। তারা অল্পে তুষ্ট দ্বীনের মোজাহীদ ছিলেন। বিভিন্ন জিহাদে শরীক হতেন। তারা কোন অর্থেই ভিক্ষুক ছিলেন না। ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তি কোন দিনই বৈধ করা হয়নি।

রাসুলেপাকের এরসাদ রয়েছে;

لان يأخذ أحدكم حبلة فيذهب فيحتطب خيرله من أن يسئل الناس اعطوه أم منعوه –

(এটাই তোমার জন্যে ভাল যে একটা রশি নাও এবং খড়ি সংগ্রহ করে জিবিকা নির্বাহ করো, এটা তার চাইতে ভাল যে তুমি ভিক্ষা চাও আর মানুষ তোমাকে কিছু দিক বা না দিক।)

বিশিষ্ট সূফী শেখ আবু আব্দুর রহমান সালমী (মৃত্যু হিঃ ৪২১) সর্বপ্রথম আহলে সোফফহাদের উপর বই লিখেন, তার মধ্যে আহলে সোফফাহদের জীবন কাহিনী সংকলন করেন। যার মধ্যে ঐসব পূণ্যবাদ সাহাবীদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে অনেক ভিত্তিহীন বিবরণও সেখানে রয়েছে। বিশেষ করে ইমাম জাফর সাদেকের বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক মনগড়া হাদীস ও লিখিত হয়েছে, যার কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। সব সূফীগণই সাবেত বিন বানানী বা ফোজায়েল বিন আয়াজের মতো ইলমে হাদীসের পন্ডিত ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করে কোন ভ্রান্ত কথা লিখেননি, বরং বানানো হাদীস সম্পর্কে সূফীদের মানসিকতার ভিত্তিতে ভ্রম বশতঃ এসব হাদীসের উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে সূফীগণ বিনা পরীক্ষা-নিরিক্ষায় ঐসব ভিত্তিহীন হাদীসগুলোকে কবুল করে নিয়েছেন ফলে আহলে সোফফাহদের সম্পর্কে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

উম্মতের স্বীকৃত মতামত অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মোবাশ্বিরা, বদরের যুদ্ধের শরীক সাহাবারা ও বাইয়াতে রেদয়ানে শরীক সাহাবাগণ। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন;

و السابقون الاولون من المهاجرون و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه

(মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রগামীরা এবং যারা নেকীর সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাজী রয়েছেন।)

জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০জন সাহাবাদের মধ্যে হযরত সাদ বিন আবিঅক্কাস ছাড়া আর কেউ আহলে সোফফাহ ছিলেন না। এক সময় তিনি আহলে সোফফাহ ছিলেন। তিনি ছাড়া সাহাবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেউ আহলে সুফফাহর মধ্যে ছিলেন না। কাজেই আহলে সোফফহাগণ অন্যান্য সাহবাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা তাদের বেলায়াত অন্যদের তুলনায় সুস্পষ্ট এ দাবীর পেছনে কোন ভিত্তি নেই।

ইলমে তাসাউফের মধ্য যুগ থেকে সূফীদেরকে 'ফকীর'ও বলা হয়ে থাকে। এর ভিত্তি হলো ঐ হাদীস যাতে বলা হয়েছে যে দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির চাইতে অর্ধেক দিন পূর্বে জান্নাতে যাবে। ঐ হাদীসের অর্থ এই যে যেহেতু দরিদ্র ব্যক্তির পার্থিব ধন সম্পদ থাকবে না, তাই তাড়াতাড়ি হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ফিতনার কারণ হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সাধারনভাবে দরিদ্রব্যক্তি ধনীদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর। যদি ধনীব্যক্তি আল্লাহর ও বান্দাদের হক যথাযথভারে আদায় করে তবে নিঃসন্দেহে তাদের মর্যাদা বেশী হবে, কারণ তারা দান খয়রাতের অতিরিক্ত সওয়াবের ভাগি হবে। এ জন্যেই দরিদ্র সাহাবাগণ আক্ষেপ করে বলতেন;

(ذهب أهل الدثور بالاجور)"ধনী ব্যক্তিরা সব সোয়াব নিয়ে গেলো।" এর জবাবে বলা হলো;

(ذلك فضل الله يوتيه من يشاء)"এটা আল্লাহরই দান, যাকে চান দান করেন।" তাই সাধারনভাবে দরিদ্র ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। মূলতঃ এই ধারনা সৃষ্টি হয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে পার্থিব জীবন থেকে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। এই ধারণা ইসলামের ধারণা নয়। ইসলামে কোন বৈরাগ্যের স্থান নেই। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধন সম্পদ যেমন কোন মর্যাদার প্রমাণ নয়, তেমনি দারিদ্রতা ও শ্রেষ্ঠতের চিহ্ন নয়। বরং ইসলামী শরীয়তের অনুসরণই মূল কথা। সর্ব অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের শ্রেষ্ঠতাই আসল শ্রেষ্ঠতা।

(ان اكرمكم عند الله اتقاكم)"তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা বেশী মোত্তাকী।"

সূফীদের শ্রেণী বিন্যাস

সূফীদের মাঝে তরীকতের কামেল ব্যক্তিদেরকে অলী বলার সাথে সাথে গওস, কুতুব, আবদাল, নজীব ও আওতাদ নামে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রথম যুগের ইলমে মারেফত বা তরিকতের ইমামদের মধ্যে এইসব নামকরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না,

www.pathagar.com

বরং মধ্যযুগের সূফীদের মাঝে এইসব নাম শোনা যায়। যার ভিত্তি হলো হযরত আলী থেকে বর্ণিত সনদবিহীন একটি সিরীয় হাদিস, বলা হয়েছে;

ان فيهم (يعني اهل الشام) الابدال اربعين رجلا كلما مات رجل ابدله الله مكانه رجلا –

(সিরিয়াবাসীদের মধ্যে ৪০জন 'আবদাল' আছেন। যাদের মধ্যে কেউ মরে গেলে আল্লাহ অন্য ব্যক্তিকে তার স্থলাভিসিক্ত করেন।)

এখানে শুধু আবদালের কথা বলা হয়েছে, কুতুব, গোওস, আওতাদ বা নজীব সম্পর্কে কোনও রকম হাদীস বা সাহাবাদের কথা পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র সূফীদের মাঝেই কথাগুলো প্রচলিত। এইসব প্রচলিত কথা থেকে জানা যায় যে গওসকে অবশ্যই মক্কায় হতে হবে। যেখানে খোলাফায়ে রাশেদীন সহ বিশিষ্ট সকল সাহাবাদের আবাস মদীনায়, সে ক্ষেত্রে মক্কায় গওস হবার যুক্তি কোথায়? তাই গওসে মক্কা (আরব) ও গওসে আযম (অনারব) এই দুই পদে এই মর্যাদাকে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই মতের পেছনে কোন স্বীকৃত ইমামে তরিকতের মতও পাওয়া যায় না- হাদীস বা সলফ সালেহীনদের মতামত তো দূরের কথা। আরাবী ভাষায় (غــوث) শব্দের অর্থ হলো 'আশ্রয়দাতা' যা একমাত্র আল্লাহরই সিফাত। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গওস বা আশ্রয়দাতা নেই। কোন ফেরেস্তা ও নবীরও এই ক্ষমতা নেই। তরিকতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) কে গওসে আযম (غوث عجم) বলে অভিহিত করা ঐ পুণ্যবাদ ব্যক্তির প্রতি চরম জুলুম।

এখানেই শেষ নয়, বলা হয়ে থাকে পৃথিবীবাসীর সমস্ত দোয়া ও মানত প্রথমতঃ ৩০০ নজীবের কাছে পৌছে, অতঃপর তাদের সুপারিসক্রমে সেই সব দোয়া ও মানত ৭০ জনের কাছে পৌছে, অতঃপর ৪০ জন আবদালের দরবারে পৌছে, তারপর তা ৭ জন কুতুবের কাছে পৌছে, এরপর ৪ জন আওতাদ (পেরেগ) এর কাছে পৌছে, পরিশেষে সে সব দোয়া ও মানত গওসের কাছে পৌছে, তিনি কবুল করেন বা রদ করে দেন। এই মতবাদ কোন মতেই ইসলামী ধারণা হতে পারে না, তা নিঃসন্দেহে মুশরিকানা আকিদা ও চরম গোমরাহী। এমন কথাও ছড়িয়ে আছে যে, বিনা অযুতে গওসে আজমের নাম উচ্চারণ করলে তার শরীর থেকে একটি লোম লোপ পেয়ে যায়। এমনি মূর্খ্যতাপূর্ণ কথাও ইলমে মারেফতের নামে প্রচারিত। শীয়া ও বাতেনী ফেরকার আকিদা সুকৌশলে ইসলামী আকিদায় ঢুকে পড়েছে সন্তর্পণে। উল্লেখিত হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদিসকে হাদিসের কোন ইমামই হাদিস বলে স্বীকার করেননি। ঐ অসমর্থিত হাদিস শীয়া সূফীদের কাছেই মাত্র গ্রহণযোগ্য। তদুপরি সূফীতত্ত্বের ইতিহাসেও এইসব সংখ্যার তত্ত্বভিত্তিক কোন ব্যাখ্যা কোন দিনই দেয়া হয়নি। বস্তুতঃ অলীদের বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীরূপে বিশ্বাস করা থেকেই এইসব চিন্তাধারা জন্ম নিয়েছে। শীয়াগণ যেমন তাদের ইমামদের জন্য এই

www.pathagar.com

ঐশী মর্যাদা নির্ধারিত করে নিয়েছে, তেমনি তাদেরই অনুকরণে বিভ্রান্ত তরীকতের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

মুশরিক, ইহুদী, নাসারাদের অবতারবাদের সাথে এই চিন্তাধারার কোন পার্থক্য নেই। তারা তাদের অবতার সমূহকে আল্লাহর প্রিয়জন মনে করতো এবং তাদের কাছে সাফায়াতের আশা রাখতো। কোরআনের ভাষায় তারা বলতো;

ولا نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى

"তাদেরকে আমরা এই জন্যেই আরাধনা করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেন।"

তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতো;

لبيك لاشريك لك الاّ شريك هو لك تملكه و مالك

(হে রব, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই শুধু এই একজন ছাড়া এবং সেও তো তোমারই, তুমি তার মালিক এবং তার ক্ষমতার ও তুমিই তো মালিক)

আল্লাহপাক মধ্যস্ততার তোয়াককা করেন না, তিনি বলেন,

و اذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى و ليومنوا بى لعلهم يرشدون

(হে নবী, যখন তোমার কাছে আমার কোন বান্দাহ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাদের বলো, আমি নিকটবর্তি, আহবান কারীর ডাক আমি শুনি, অতঃপর তারা যেন আমার নির্দেশ মেনে চলে এবং আমার উপর ঈমান আনে যেন সত্য পথের দিশা পায়।)

আরো এরশাদ হয়েছে,

واذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه

(যখন তোমরা সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পড়ে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক, তখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসেনা)

এমনি অর্থের আয়াত ও হাদিসের কোন ইয়াত্তা নেই, এই ধারনা উম্মতের স্বযত্নে লালিত তৌহিদের আকিদার সরাসরি পরিপন্থি,

শুধু আবদালের মাধ্যামে বান্দার রিজিক বন্টিত হয় বা কুতুব ও গওসের ইংগিতে সমস্ত বিশ্ব চরাচর ও নিখিল জগতের আভ্যান্তরিন প্রশাসন পরিচালিত হয়। এমনি আকিদা সরাসরি ইসলাম পরিপন্থি ও শিরক।

www.pathagar.com

কলন্দর

এমন এক ধরনের লোকদেরকে কলন্দর বলা হয় যারা শরীয়তের ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম বা ভাল ও মন্দের বন্ধন থেকে মুক্ত, তারা কোন বিধি বিধানের অনুগত নয়, বলা হয়, তারা নিজেদের বেলায়েতকে গোপন রাখার জন্যে শরীয়ত বিরোধী চরিত্র প্রকাশ করে বা তারা কামালিয়াতের এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায় যে সেখানে বাহ্যিক ইবাদত বন্দেগীর কোন প্রয়োজন থাকেনা। এই ধরনের লোকদের সাথে ইলমে মারেফতের বা ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, তারা শয়তানের দোসর ও মোনাফিক।

(عوارف المعـــارف) কিতাবে কলন্দরদের ইতিবৃত্ত এভাবে বিবৃত করা হয়েছে যে ইরানে এক ধরনের সূফি ছিলো যারা প্রথমতঃ ফরজ, ওয়াজিব, হালাল হারাম মেনে চলতো, কিন্তু তারা মনের তৃপ্তি পেতোনা এই অভিযোগে ফরজ, ওয়াজিব ও হালাল হারামের বন্ধন ছেড়ে দেয় এবং নেকীর কাজ গোপন করতে থাকে। এভাবে তারা আস্তে আস্তে প্রকাশ্য গোনাহর কাজ করতে থাকে এবং ফরজ ওয়াজিব ছেড়ে দেয় এবং পরে তারা 'মালামিয়া' সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। মালামিয়া শব্দের অর্থ হলো 'ধিকৃত' আসলে তারা ধিককারেরই পাত্র।

কোন উলংগ, অর্ধ উলংগ বা মাতাল ব্যক্তি দেখলেই তাদেরকে কলন্দর বা ফকির মনে করে তাদের পেছনে লেগে পড়ে। এই মানসিকতা মূলতঃ হিন্দুদের যোগীবাদ থেকে এসেছে। ইসলামের সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গির দূরতম সম্পর্কও নেই। আকিদা বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়েই কোন মানুষ মুসলিম উম্মাহর সদস্য হতে পারে। আমল ছাড়া শুধু আকিদার বিশ্বাস কোন ব্যক্তির কল্যাণে আসতে পারেনা, আবার আকিদার পরিশুদ্ধি ছাড়া আমলও তার নাযাতের সহায়ক নয়। উম্মতের খারেজী সমাজ এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ। যাদের সম্পর্কে হাদিসে এসেছে-

(تمرت مارقه على فرقة من المسلمين يقتلهم اولى الطائفتين بـــالحق) (মুসলমানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট দলের উপর তারা হামলা করবে। যারা উভয় দলের মধ্যে শ্রেষ্টতর তারা তাদেরকে হত্যা করবে)

তাদের ইবাদত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم و صيامهم مع صيامهم و قرائته مع قرائته –

(তোমরা তোমাদের নামাজকে তাদের নামাজের সামনে, তোমাদের রোজাকে তাদের রোজার সামনে, তোমাদের তেলায়তকে তাদের তেলায়তের সামনে নিতান্ত হীন মনে করবে।)

কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা ছিলো নিম্নরূপ;

www.pathagar.com

يقرؤن القران و لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق الســــهم مـــن الرميـــة – اينمـــا لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم أ جرعند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ادركهم لاقتلنهم قتل عاد

(তারা কোরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার নিচে যাবেনা, তারা ইসলাম থেকেই এমনি বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়, যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর তাদেরকে হত্যার মধ্যে কিয়ামতের দিনে প্রতিদান আছে, যদি আমি তাদের যামানা পাই তবে আদ কওমের মতোই তাদের হত্যা করবো।)

ঈমামগণ এই হাদিসে উল্লেখিত সম্প্রদায়কে হযরত আলীর যামানায় খারেজী সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন। তারা হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। হযরত আলীই তাদের উৎখাত করেন। হাদিসে বর্নিত চরিত্র তাদের সাথে মিলে যায়। তারা সবাই সিরিয়ার লোক ছিলেন। রাসূলে পাকের ভবিষ্যত বাণী কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অলীদের মাযার নিয়ে বাড়াবাড়ি

অলী বা পীরদের কবর বা মাযার নিয়ে এক শ্রেণীর সূফিদের মাঝে নিম্নরূপ বিশ্বাস রাখা হয়ে থাকে।

১. অলীগণ মৃত্যুর পর তাদের কবরে জীবত রয়েছেন, সেখান থেকে তারা আধ্যাত্বিক ভাবে পৃথিবীতে তৎপর রয়েছেন। আধ্যাত্বিক বা মারেফতের উন্নতীতে সেখান থেকেই তারা ফয়েজ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।
২. তাদের অসীলায় দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান হতে পারে।
৩. নযর নিয়াজ ও দোয়া তারা কবুল করতে পারেন।
৪. মানুষের বালা মসিবত দূর করে মনস্কামনা পূরন করার ক্ষমতা রাখেন।
৫. তাদের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা তাদের জীবদ্দশাতে তাদের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদনের সম পর্যায়ের। বরং মৃত্যুর পর তাদের আধ্যাত্বিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

তাই মাযার সমূহে বনী আদমের ভীড়ের অন্ত নেই। জীবিত পীরের চাইতে মৃত্যু পীরের আকর্ষন বেশী। কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে এই সব বিশ্বাসের কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। রাসুলে পাক সহ সমস্থ সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগন তাদের জীবদ্দসায় তাদের মর্যাদা অনুযায়ী উম্মতের হেদায়তের জন্যে দায়িত্ব আন্জাম দিয়ে গেছেন। তাদের ইন্তেকালের পর পৃথিবীর সাথে তাদের বাস্তব পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

রাসুলদের দেহ মোবারক সম্পর্কে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে মাটি তাদের শরীর মোবারকের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। রাসুলে পাক সহ সমস্ত আম্বিয়া কেরাম তাদের স্বাভাবিক শরীর নিয়ে রওজা মোবারক সমুহে অবস্থান করছেন। কিয়ামতের দিন তাই নবীগণ তাদের স্ব স্ব শরীর নিয়েই কবর থেকে উঠে আসবেন। পক্ষান্তরে সমস্ত মানুষ একই

www.pathagar.com

বয়সের অবয়বে পুনরুত্থিত হবে। রাসুলে পাকের উম্মতগণ তার প্রতি যে দরূদ শরীফ পড়ে তা আল্লাহ নবীর দরবারে পৌঁছে দেন। নবী তার রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে পৃথিবী থেকেই বিদায় নিয়েছেন। তাঁর উম্মতের কোন ব্যাপারে তিনি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কোন ভূমিকা রাখবেন না। এ জন্যে সাহাবায়ে কেরামগণ কোন বিপদ আপদে, জাতির সমূহ দুর্দিনে ও নবীর রওজা মোবারকে হাজির হয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন নিবেদন করেন নি। ফিলিস্তিন এলাকায় হাজার হাজার নবীদের মাজার রয়েছে, তারা কোন ব্যাপারে কখন ও কোন প্রভাব বিস্তার করেননি। নবীদের বিশেষ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পর পৃথিবীর সাথে পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। নবীর প্রেম আমাদের ঈমানের বুনিয়াদ, তার ভালবাসা, তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা, তার প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করা, তাকে মনের মনিকোঠায় সদা সমাসিন রাখা আমাদের ইমানেরই দাবী। তাই বলে এই পৃথিবীর জীবনে তিনি তার ভূমিকা পালন করবেন এমন বিশ্বাস রাখা অনুচিৎ, এমন কোন আভাস তিনি কোন দিনই দিননি। বরং তিনি তার ইন্তেকালের পর তার কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। এরসাদ হয়েছে,

(عن جندب بن عبد الله سمعت رسول الله صلعم قبل ان يموت بخمس وهو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فانى انهاكم عن ذلك – لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا)

(আমি রাসুলে পাককে তাঁর ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে বলতে শুনেছিলাম, তোমাদের পূর্বতন লোকেরা কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিলো। আমি তোমাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করেছি। ইহুদী ও খৃষ্টানদের আল্লাহ লানত দিয়েছেন এ জন্যে যে তারা তাদের নবীদের কবর সমুহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।)

এই হাদিস বা এমনি ধরনের অন্যান্য হাদীস দ্বারা কবর বা মাজার কেন্দ্রিক ইবাদত বন্দেগীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইবাদতের জন্য আল্লাহপাক মসজিদ সমুহকে নির্দিষ্ট করেছেন। এরসাদ হয়েছে।

فى بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال – (النور)

ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا – (الجن)

انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الاخر و اقام الصلوة واتى الزكوة و لم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين – (التوبة)

(আল্লাহ যে সব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা হয়। মসজিদ

www.pathagar.com

সমুহ আল্লাহ্রই, তাই আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডেকো না। আল্লাহ্র মসজিদ তারাই প্রতিষ্টা করে যারা আল্লাহ্র প্রতি, আখেরাতের প্রতি ইমান এনেছে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না, আশা করা যায় তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।)

এমনি অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ ইবাদতের কেন্দ্র হিসাবে মসজিদকে নির্ধারিত করেছেন। মাজার কেন্দ্রীক ইবাদত বন্দেগীকে ইসলামে অবৈধ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্রই জন্যে নিদ্দিষ্ট ইবাদত বন্দেগী মুহুর্তে কবর বাসীর উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এই কারনেই রাসুলেপাক প্রথমতঃ কবর জিয়ারতকেই অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন, অতঃপর করব জিয়ারতের কল্যাণ মূলক দিকগুলোকে সামনে রেখে কবর জিয়ারতকে বৈধ করেছেন, এরসাদ হয়েছে,

– عن بريدة قال قال رسول الله صلعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها فمـن اراد ان يـزور القبور فليزر فانها تذكرنا الاخرة–

(আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে বারন করেছিলাম, অতঃপর তোমরা জিয়ারত করো। অতঃপর যে ব্যক্তি কবর জিয়ারত করতে চায়, সে জিয়ারত করতে পারে , কেননা কবর জিয়ারত আমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।)

এই অনুমতিও শুধু পুরুষদের জন্যে। নারীদের জন্যে পূর্ব নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। রাসুলে পাক হযরত ফাতেমাকে কবর জিয়ারত করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই হয়েছে) নবীদের কবর সম্পর্কে ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আউলিয়াদের মাজার সম্পর্কে ইসলামের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বস্তুতঃ পীরদের সম্পর্কে এই সব বিভ্রান্ত ধারণা সমূহ শীয়া আকিদার ইমামত দর্শনেরই প্রতিফলন। এর সাথে আহলুল সুন্নতে আল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। এই বই এর পাঠকের কাছে এর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। সত্যকার ইলমে মারেফত এ সব বিভ্রান্ত আকিদার অনেক দূরে।

নযর- নিয়াজ ও মানত।

সাধারনভাবেই ইসলামে নযর ও মানত একটি অবাঞ্ছিত কাজ। আল্লাহ্ কোন মানতের মুখাপেক্ষী নন। জায়েজ পর্যায়ের মানত সম্পর্কেই রাসুলে পাক এরসাদ করেছেন।

انه لايأتي بخير و انما يستخرج به من البخيل –

(এর থেকে কোন কল্যাণ হয়না, বরং এর দ্বারা বখিল ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ বের করে নেয়া হয় মাত্র।)

অপর জায়গায় এরসাদ হয়েছে,

www.pathagar.com

(انما يلقى ابن آدم الى القدر) এটা বনী আদমকে ভাগ্যের সামনে রেখে দেয়।

আল্লাহর কোন করুণা হাসিলের জন্যে কোন আমলের নযরানা পেশ করার প্রতিজ্ঞা করাকে নযর বা মানত বলা হয়। আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো চাইলেই আল্লাহ তা প্রদান করেন, তিনি মানতের মুখাপেক্ষী নন।

বালা মসিবত, আপদ বিপদ বা অসুখ বিসুখে মানত করার কোন অভ্যাস সাহাবাদের মধ্যে ছিলো না। তবে শরীয়তে জায়েজ পর্যায়ের মানতকে বৈধ রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুলেপাক এরসাদ করেন,

من نذر ان يطيع الله فليطعه و من نذر ان يعصى الله فلايعصيه –

(যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে মানত করে, তা যেন সে পালন করে, আর যদি আল্লাহর নাফরমানীর কোন মানত করে, তবে (তা পালন করে) যেন আল্লাহর নাফরমানী না করে।)

অর্থাৎ কোন নেক কাজের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে আর যদি কোন গোনাহর কাজের মানত করে তবে মানত পূরণ করার নামে সে গোনাহ করা যাবে না। কোন নেক জাজের মানত যে উদ্দেশ্যে করা হয় সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সাথে যেন সে সেই নেক কাজকে শর্ত যুক্ত না করে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি পুত্র সন্তানের আশায় ১০টি রোজার মানত করলো, কিন্তু তার পুত্র সন্তান হলো না, তবে কি ১০টি রোজা রাখতে হবে না? সত্যিকার মুমেনের কাজ হবে প্রথমেই ১০টি রোজা রেখে আল্লাহর কাছে পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া করা। গোনাহর কাজের মানতের বিধান সম্পর্কে হাদীসে এসেছে;

لا نذر فى معصيته و كفارته يمين –

(নাফরমানীর মানত পুরণ করতে হবে না এবং মানত ভঙ্গের জন্য তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফরা দিতে হবে।)

কোন কোন মতে নাফরমানীর মানত ভঙ্গের কোন কাফফরাও নেই, বরং তওবাই যথেষ্ট। সাতে যে জিনিস প্রদানের সে মানত করবে তা যেন শরীয়ত সম্মত পথে ব্যয় করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি মাযারে মোমবাতি বা চাদর দেয়ার মানত করে তবে সে যেন সে সব জিনিস কোন মসজিদে দিয়ে দেয়। আর যদি নগদ টাকার নিয়ত করে তবে তা যেন কোন গরীর মুসলমানকে দিয়ে দেয়। কোন মাযার বা কবরের উদ্দেশ্যে কোন মানত করা বিরাট গোনাহর কাজ। যদি কোন ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে মানত করে যে মাযারবাসী তার কোন কল্যাণ করে দেবেন। সে কল্যাণ পার্থিবই হোক বা আত্মিক, সে ব্যক্তির মানত নাফরমানীর মানত হবে। এসব মানতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই বা মাযারবাসীরও কোন কাজে আসে না। বরং ঐসব মাজারের ব্যবস্থাপকদেরই ফায়দা হয় মাত্র, কিংবা

www.pathagar.com

আওকাফ মন্ত্রনালয়ের ভান্ডার স্ফীত হয়। সে সব অর্থ কোথায় ব্যয় হয় তার খবর কে রাখে। বিভিন্ন মাযারের নামে মানত, নযর নিয়াজ সংগ্রহের জন্যে ব্যাপক প্রচারণা কাদের স্বার্থে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যে মনস্কামনা পুরন করতে পারেনা বা সুপারেশী হতে পারেনা তা কোরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে নিচের আয়াত দ্বয় প্রনিধান যোগ্য;

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم و لاتحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب و يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا – (الاسراء ٥٦)

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة فى السموات و لافى الارض و ما لهم فيها من شرك و ماله منهم من ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده الاّ لمن اذن له – (سبا ٢٢)

(বলে দাও, আল্লাহ ছাড়া যাদের কে তোমরা উপাস্য মনে করো,তাদেরকে ডাকো, অথচ তারা তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখেনা এবং তা পরিবর্তন ও করতে পারেনা, বরং তারাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের জন্য কোন সত্তার উসিলা তালাস করে যে তার নিকটতম, তারা তার রহমতের আশা রাখে এবং আজাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।)

(বলে দাও, যাকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া উপাস্য মনে করে নিয়েছো তারা আসমানের ও যমিনের এক কণা জিনিষের মালিক ও নয়, না এর মধ্যে তাদের কোন শরীকানা আছে,আর না তাদের কেউ সহায় রয়েছে। আল্লাহর কাছে তার অনুমতি ছাড়া কারো সুপারিশ ও কারো কাজে আসবেনা।)

আল্লাহ শিরক ব্যতিত সকল ধরনের গোনাহ মাফ করতে প্রস্তুত রয়েছেন, কিন্তু বনী আদম তার কাছে ক্ষমা না চেয়ে শিরকের পথ বেছে নেয়।

নযর নিয়াজ ও মানতের যে ছড়াছড়ি তার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। বাগদাদ শরীফের নিয়াজ, আজমীর শরীফের নিয়াজ, কিংবা অন্য কোন পীর মোর্শেদের কবরের নিয়াজ সবই শিরক যুক্ত ও গোনাহর কাজ। বিভিন্ন জায়গায় নিয়াজ গ্রহনের বাক্স দেখা যায় তাতে লিখা থাকে- খাজা গরীব নেওয়াজের নযর- নিয়াজ বা বড় পীর সাহেবের নিয়াজ এ সবই স্বার্থপর, ধোকাবাজ লোকদের কারসাজি। ধোকা দিয়ে মানুষের পয়সা আত্মসাৎ করার ফন্দি। কোন কবরবাসীর জন্যে নযর নিয়াজ বা মানত নিরর্থক। বিভিন্ন মাজারের আশে পাশে মাযাদের খাদেম বলে পরিচিত যে সমস্ত ভন্ড লোকদের অবস্থান, তারা সরলপ্রাণ ইমানদার লোকদের টাকা পয়সা হাতিয়ে নেবার এই সব পন্থা বের করেছে। এর সাথে সে অলী বা পীরের কোন সম্পর্ক নেই। এই সমস্ত ভন্ডলোকেরা কবর বা মাজারের নামে এমন ত্রাস সৃষ্টি করে যে সাধারন মুসলমান মাজারের সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে

www.pathagar.com

সমস্ত সীমা লংঘন করে বসে। আল্লাহর মসজিদে এমন কি কাবা শরীফের জিয়ারতের সময় তেমনি ভীতি সৃষ্টি হয়না। ঐ সব মাজার জিয়ারতে তার চাইতে বেশী ভয় বা শ্রদ্ধার প্রকাশ করে। এটা শীয়াদের মাশহাদ পূজারই অনুকরণ মাত্র।

আজকের অধিকাংশ নকল পীর কোন কবর বা মাজারের কল্যাণে দু'পয়সা রোজগার করে খাচ্ছে। জীবিত পীরের সেখানে কোন গুরুত্ব নেই। খানকাহর সমস্ত আধ্যাত্ববাদ ঐ মাজারকে কেন্দ্র করেই। এমন সব সম্মানসূচক খেতাবে ঐ সব পীরদের নাম উচ্চারিত হয় যার মধ্যে শীরকের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসুলেপাকের নাম মোবারক যেখানে সাদাসিধে ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, সেখানে ঐ সব পীরদের নামের পূর্বে বিরাট প্রশংসা সূচক খেতাবাদী রয়েছে। ঐ সব খেতাব ছাড়া তার নাম উচ্চারণ করলে যেন বেআদবী হয়ে যায়। কবরকে নিয়ে এমনি বাড়াবাড়ি করা থেকেই রাসুলে পাক তার উম্মতকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। জোব্বা কোব্বাধারী ব্যক্তিগন এই সব করব পূজার ধারক ও বাহক নিঃসন্দেহে। কিন্তু জোব্বা পরলেই কোন লোক আলেম বা সূফী হয়ে যায়না। কোন আলেম বা সত্য তরিকতের সালেক এই সব শিরকের প্রশ্রয় দিতে পারেনা।

এই কবরের পাশে আর একটি নব্য রসম সংযোজিত হয়েছে তা হলো বিভিন্ন পীর মোর্শেদের কবরের পাশে বাৎসরিক ওরশের অনুষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ টাকার নজর নিয়াজ ও মানতের পয়সায় ধনী গরিব নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের উদরপুর্তি করানো হচ্ছে। আবার এই সব ওরশের খাদ্যকে বলা হয় তাবারুক। যার মধ্যে বিশেষ বরকত রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ওরস (عرس) আরবী শব্দের অর্থ হলো বিয়ের অলিমা বা খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান। অলী বা পীরদের কবরে এই আনন্দের অনুষ্ঠান ও তাসাউফের নামে প্রচলিত। কিন্তু তাসাউফের ইতিহাসে এই অনুষ্ঠানের কোন প্রমান পাওয়া যায়না । যদি এই সব অনুষ্ঠানে নযর নিয়াজ বা মানতের অর্থ বা পশু খাওয়ানো হয় তা সরাসরি হারাম, যা কোন মুসলমান খেতে পারেনা।

দুনিয়াত্যাগী এই সব পীরদের খানকায় টাকা পয়সায় এই ছড়াছড়ি তাদের কোন চরিত্র তুলে ধরে?

পীরের আস্তানায় বা মাজারে নাচগান

ইলমে মারেফতের নামে কিছু কিছু পীরের আস্তানায় বা মাজারে যে নাচ গানের আসর বসে তা নিঃসন্দেহে শয়তানী কাজ। ইবলিশ তার চেলাদের নিয়ে এ সব মহফিলের রওনোক বৃদ্ধি করে । দ্বীনে ইসলামের সাথে এ গুলো নিতান্তই প্রহসন। এ সব গান বাদ্যের অনুষ্ঠান সেমা (سماع) এর নামেই করা হোক বা কাওয়ালী নামে, সবই এক শয়তানী কাজের বর্হিপ্রকাশ।

রাসুলে পাক এরসাদ করেছেন,

www.pathagar.com

عن عبد الله بن عباس رضى قال قال رسول الله صلعم ان الشيطان قال يارب اجعل لى بيتا قال بيتك الحمام – قال اجعل لى قرانا قال قرانك الشعر قال اجعل لى مؤذنا قال مؤذنك الزمار –

(শয়তান আল্লাহর কাছে আবেদন করলো, হে রব, আমার জন্যে ঘর নির্দিষ্ঠ করে দেন। আল্লাহ বললেন, তোমার ঘর হলো 'হাম্মাম' বা গোসল খানা, শয়তান বললো, আমার জন্যে কোরআন দিন, আল্লাহ বললেন, তোমার কোরান হলো কবিতা বা কাব্য, সে বললো, আমারা জন্যে মোয়াজ্জিন দিন, আল্লাহ বললেন, তোমার মোয়াজ্জিন হলো বাদ্য।)

অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে,

انما نهيت عن صوتين أجمعين فاجرين صوت لهو و لعب و مزامير الشيطان و صوت لطم خدود و شق جيوب و دعا بدعوى الجاهلية ذات المكا و التصدية–

(আমাকে দুই ধরনের মুখতাপূর্ন ও জঘন্য আওয়াজ থেকে বারন করা হয়েছে, অর্থহীন খেলা তামাশার আওয়াজ ও শয়তানী বাদ্য, করতালী, শীষ দেওয়া ও বুক চাপড়ানো। হাততালি ও সিটির এই সব আওয়াজ জাহেলী যুগেরই আওয়াজ।)

ইবলিসের চেলারা এ ভাবে নাচতে গাইতে আত্মভোলা হয়ে পড়ে। একে তারা মারেফতের খেলা বলে থাকে। এই সব ভন্ডলোকদের মুখ থেকে বিভৎস আওয়াজ বের হয়, যা তাদের জঘন্য মন মানসিকতারই বর্হিপ্রকাশ মাত্র। এই সব শয়তানী খেলা মানুষদেরকে ইসলামী শরীয়তের বন্ধন থেকে অনেক দুরে সরিয়ে দেয়।

এই সব কাজ কর্মের ধারকগন অনেক ক্ষেত্রে আত্মিক দিক দিয়ে শক্তিধর বলে মনে হয়। জাহেরী শক্তির সাথে সাথে তাদের বাতেনী শক্তি দেখে তাদেরকে আল্লাহর অলী মনে করার কোন কারন নেই। তপ জপ ও সাধনার মাধ্যামে মানুষ অনেক ধরনের অস্বাভাবিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম। অগ্নী পুজারী, হিন্দুযোগী সন্যাসী বা পাশ্চাত্যের সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনার বলে এই সব শক্তির ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। শয়তান তাদের জ্বীন দোসরদের সহযোগিতায় এই সব লোকদের সাহায্য করে। মুমেনের ইমানী সম্পদ ছিনিয়ে নেবার জন্যে শয়তানের এই সব পন্থা অতীব পুরাতন। যাদু টোনা ও ভবিষ্যত গননার মত কাজে তারা সিদ্ধহস্ত হয়ে থাকে।

অলীগণ আল্লাহর দোস্ত আর এই সমস্ত গোমরাহ লোকেরা শয়তানের দোস্ত। আল্লাহর অলীগণ কখন ও অত্যান্ত দূর্বল হয়ে থাকেন। আবার আল্লাহর সাহায্যে তাদের দূর্বলতা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আল্লাহর দুশমন ও শয়তানের দোস্তরা আপাতঃ খুবই শক্তিশালী বলে মনে হয়, কিন্তু আল্লাহর প্রতিশোধ তাদের শক্তির গর্বকে ধুলিসাৎ করে দেয়। কখন ও আল্লাহর অলীগনের উপর তার দুশমনকে জয়যুক্ত করে দেন, আবার আল্লাহর মদদে তারা বিজয় লাভ করেন। মনে রাখতে হবে সকল শক্তি আল্লাহর নিয়ামত নয়, আবার আপাতঃ দূর্বলতা ও আল্লাহর অভিসম্পাত নয়। শক্তি ও দূর্বলতা, প্রাচুর্য্য ও দারিদ্রতা

www.pathagar.com

আল্লাহর দেয়া প্রার্থিব নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার কখন ও আল্লাহ এই নিয়মের বাইরে আপাতঃ অসম্ভবকে সম্ভব করে দেন। যদি মুমিন কখনো কমজোর বলে মনে হয়। তবে মনে করতে হবে ঐ দূর্বলতা তাদের নিজস্ব অর্জন করা- তাদের গোনাহর পরিণতি। যেমন আল্লাহ বলেছেন।

ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا –

(যুদ্ধে তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চাদপসারন করেছে, বস্তুতঃ শয়তানই তাদের কোন কোন গোনাহর জন্যে পদস্খলিত করেছে।)

কিন্তু চুড়ান্ত বিজয় মুমিনদের জন্যেই নির্ধারিত;

انا لننصر رسلنا و الذين امنوا فى الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد –

(আমি আমার রাসুল ও মুমেনদেরকেই পৃথিবীতে ও আখেরাতে সাহার্য্য করবো।)

হযরত আবদুল কাদের জিলানীরে বলেছেন,

এ পৃথিবীর কোন ক্ষমতা নেই, না উপকার করতে পারে আর না অপকার, যা কিছু করেন তা আল্লাহই করেন, পৃথিবী তার মাধ্যাম মাত্র। তোমরা ও অপরাপর সৃষ্টির মাধ্যে আল্লাহরই শক্তি কার্য্যকরী। তোমার ভাল মন্দ সবই তার ফয়সালা। তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই হতে পারেনা। তৌহিদ পন্থি ও নেক লোকেরা সৃষ্টির উপর আল্লাহর নিদর্শন। কিছু লোক এমন আছে যারা তাদের জাহের ও বাতেনে পৃথিবীর প্রভাব মুক্ত, যদিও তারা পার্থিব সম্পদের মালিক কিন্তু তাদের মনে এর কোন প্রভাব নেই। তাদের দিলই স্বচ্ছ ছিল, যে ব্যক্তি এমনি দীলের অধীকারী সে পৃথিবীর সমাজের মালিক হয়ে গেছে, সে সাহসী যোদ্ধা। সাহসী সেই যে তার মনকে আল্লাহ ছাড়া সব কিছু থেকে মুক্ত করেছে, কলবের দরজায় তাওহীদের তরবারী ও শরীয়তের খড়গ নিয়ে দন্ডায়মান, পৃথিবীর কোন কিছুকেই সেখানে প্রবেশাধিকার দেয়না, নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহরই জন্যে নিয়োজিত করেছে। শরীয়ত তার জাহেরকে পরিছন্ন করে আর তাওহীদ তার বাতেনকে মার্জিত করে তুলে।

(الفتح الربانى)

একেই গ্রন্থে অন্যত্র বলেছেন;

আজ তুমি ভরসা করছো নিজের উপর, সৃষ্টির উপর, টাকা পয়সার উপর, ব্যবসা বানিজ্যের উপর, শাসকের উপর, তুমি যাদের উপর ভরসা করছো তারাই তোমার মাবুদ। যে সমস্ত ব্যক্তি বা স্বত্বার কাছে তুমি কিছু আশা কর বা তাকে ভয় করো, তারাই তোমার মাবুদ।

ইলমে মারেফতের দৃষ্টিতে তাওহীদের স্বরূপ এমনি। মারেফতের বিভ্রান্ত চিন্তা তাওহীদের এই সুদৃঢ় ইমারতকে ধবসীয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীনের যারা অনুসারী, যারা ইলমে মারেফতকে ভালবাসেন তাদেরকে সাহসী হতে হবে। সত্যকে সত্য বলার ও বাতিলকে বাতিল বলার জন্যে অকুতোভয়ে জিহাদ করতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে জবাব দেয়া কঠিন হবে।

সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ফিতনা

বিজাতীয় ইতিহাসবিদদের হাতে ইসলামের ইতিহাস সংকলিত হওয়ার ফলে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলনে সাবির্কভাবে ইউরোপীয় লেখকদের উপর নির্ভর করার ফলে তথাকথিত ইসলামের ইতিহাসে সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং এই চিন্তাধারার মারাত্মক স্বরূপ ও সুদুর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখা হয় না। সেখানে সম্রাট আকবরকে সাধারনভাবে মোঘল সাম্রাজ্যের সফলতম সম্রাট বলে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার আসল চেহারা খুব কমই উম্মোচিত হয়েছে। তার এই মারাত্মক মতবাদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

আদর্শিক অধঃপতন ও আকবরের স্বেচ্ছাচারিতা

সামান্তবাদ, রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মূল দর্শন একই। ক্ষমতার কেন্দ্রকে কোন অবস্থাতেই হাত ছাড়া হতে না দেয়া। যারা প্রার্থিব ক্ষমতার অধিশ্বর তারা জনগনের সর্বেসর্বা হয়ে দাড়ায়, কোথাও প্রার্থিব ক্ষমতাকে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত করে ধর্মীয় স্বৈরাচার বা ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়া হয়। আবার কোথাও ধর্ম বিরোধী সেচ্ছাচার প্রতিষ্টার মাধ্যামে নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে বসে। আদর্শিক সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে ব্যক্তি বা গোষ্টির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এ সব অনাচারের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকৃত ব্যবহারের ফল স্বরূপ পরবর্তি পর্যায়ে ধর্মকেই মানবতা বিরোধী আদর্শ রূপে তুলে ধরা হয়ে থাকে এবং আধুনিক মানসকে ধর্মদ্রোহী করে তুলে। এ ভাবে স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মকে তাদের শোষনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রতিযুগে এবং আজ ও করে যাচ্ছে। ফলে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ইসলাম একটি মজলুম আদর্শে পরিনত হয়েছে।

দীর্ঘ দিনের ধর্মহীন রাজতন্ত্রে ধর্মীয় জ্ঞ্যানের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শিত হবার ফলে আধুনিক মানসে বিজাতীয় চিন্তাধারার বিষক্রিয়া সংক্রমিত হতে থাকে, ফলে ইসলামী চিন্তাধারার লালন ও বিকাশ দারুণভাবে সংকোচিত হয়ে পড়ে। মোঘল সাম্রাজ্যে সম্রাট আকবরের সমসাময়িক যুগের অবস্থা অনুরূপ ছিলো। প্রার্থিব সম্পদ, রাজা-বাদসা বা আমীর উমারাদের নৈকট্যলাভ ও সন্তুষ্ঠি পন্ডিত ব্যক্তিদের মূখ্য লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। জ্ঞান ও পান্ডিত্যের ব্যবহারিক বিকৃতি চরমে পৌছে যায়।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবরের সময়ে পন্ডিত ব্যক্তিদের অভাব ছিলো না। কারো কারো যোগ্যতা ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত, কিন্তু তারা তাদের পান্ডিত্যকে ব্যক্তি স্বার্থের জন্যেই ব্যবহার করতেন। রাজ দরবারের সভাসদ ও পন্ডিত ব্যক্তিগন রাজাকে খোদার অবতার রূপে পেশ করতেন। সরকারী গেজেটে ও নথিপত্রে সম্রাট আকবরকে যে ভাবে উল্লেখ করা হতো, তা হলো নিম্নরূপ;

হযরত সুলতান, কাহাফুল আনাম, আমীরুল মুমেনীন, জেল্লুল্লাহ আলাল আলামীন, আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মোহাম্মদ আকবর, বাদসা গাজী। বাদশাহকে আল্লাহর প্রতিভূ মনে করা হতো। পন্ডিত ব্যক্তিগণ যখন এভাবে বাদশাহকে সম্বোধন করতেন, বাদশাহ ও নিজেকে তাই মনে করতে থাকেন। বাদশাহকে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পুরোধা বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাদশাহ আকবর রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে আধ্যাত্মিক শক্তির সংযোগে নতুন এক এক মতবাদের সৃষ্টি করেন। যাকে ইতিহাসে 'দ্বীন ইলাহী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সম্রাট আকবর তার জীবদ্দশায় দুইটি পরস্পর বিরোধী জীবন যাত্রা পরিচালিত করেছেন। আকবর ছিলেন মানসিক দিক দিয়ে অস্থির প্রকৃতির। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তার প্রথম জীবনে তাকে একজন সূফী ভক্ত বলে দেখা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় মাজার সমূহ জিয়ারত করে বেড়াতেন। আজীবন লাহোর, মুলতান সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রসিদ্ধ জায়গাগুলো জিয়ারত করতে যেতেন। তার মানসিক অস্থিরতা সুস্পষ্ঠ রূপে ধরা পড়তো। তার পরিবর্তনশীল চরিত্র কারো কাছে গোপন থকতো না। তার দরবারে দর্শনের ব্যাপক চর্চা হতো এবং বিশিষ্ট পন্ডিতদের দর্শন চিন্তায় তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।অতঃপর শুরু হয় তার আরেক বিপরিত ধর্মী জীবন, যেখানে ইসলামের ভালবাসার জায়গায় মুসলিম বিদ্বেষ ও হিন্দু প্রীতি লক্ষ্য করা যায়।

আকবর লেখাপড়া না জানলেও রাজনীতিতে কৌশলী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার রাষ্ট্র ক্ষমতার স্থায়ীত্বের জন্যে প্রভাবশালী রাজপুতদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেন। হিন্দু রাজপুতদের সন্তুষ্ট করার জন্যে তিনি অনেক হিন্দু রীতিনীতি সরকারী ভাবে চালু করেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের অনেক বিধিবিধান অবৈধ করে দেন। আকবরের দু'জন হিন্দু স্ত্রীর খবর পাওয়া যায়। তাদের একজন ছিলেন রাজা বিহারীর কন্যা ও রাজা ভগবান দাসের বোন। অন্যজন ছিলেন জোধবাই, যিনি যোধপুরের রানী ও জাহাঙ্গীরের মাতা ছিলেন। এই হিন্দু বেগম ও তাদের আত্মীয় স্বজনের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো অপরিসীম। হিন্দু যোগী, ঋসী, গনক, সন্যাসী ও জ্যোতিষীদের রাজনৈতিক প্রভাবের সামনে সম্রাট আকবর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করেন। হিন্দুদের সাথে সাথে কিছু বিকৃত স্বভাবের মুসলিম নামধারী বুদ্ধি জীবিগণ আকবরের হিন্দু ঘেষা দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে থাকেন। ঐ সব ব্যক্তিগণও ছিলেন ইসলাম বিদ্বেষী।

www.pathagar.com

মোল্লা মোবারক বলে একজন পন্ডিত ব্যক্তির প্রভাব অত্যন্ত বেড়ে যায়। তার দুই ছেলে ফয়জী ও আবুল ফজল তাদের যোগ্যতার বলে শাহী দরবারে বিশেষ স্থান দখন করে নেন এবং সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ট সহচরে পরিনত হন। ফয়জী ছিলেন ফার্সী ভাষার মহাকবি, তাকে কবি সম্রাট খেতাবে ভুষিত করা হয়। অপর দিকে আবুল ফজল ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবি। তার বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম তার পান্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। আবুল ফজল ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাসী। তারা দুই ভাই ইসলাম সম্পর্কে সুষ্ঠ জ্ঞ্যানের অভাবে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃনা পোষন করতেন। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও পৌত্তলিক বিধিবিধানকে পছন্দ করতেন। তাদের এই মনোভাবের মূলে ও ছিলো প্রভাবশালী রাজপুতদের মনোস্তুষ্টি।

ইতিহাসের পর্যালোচনায় যে সব বাস্তবতার সম্মুখিন হতে হয়, তার থেকে প্রতিয়মান হয় যে আবুল ফজল, ফয়জী, মোল্লা মোবারক ও অন্যান্য দরবারী কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিরা যারা নিজেরাও ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন, হিন্দু রাজপুতদের যোগ সাহসে চঞ্চলমতি সম্রাটকে দিয়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন মাত্র। হিন্দুদের ধর্মীয় স্বার্থকে প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হতে থাকে। প্রকাশ্যে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের বিদ্রুপ করা হতো, কিন্তু সরকারী প্রশাসন তাদেরই সমর্থন করতো। সরকারী প্রচার মাধ্যমে এই ইসলাম বিদ্বেষী কর্ম সূচীকে বলা হতো হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রয়াস। কিন্তু বাস্তবে চলছিলো মুসলিম ধর্মের সমাধির উপর হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা, একে তারা বলতেন সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। আকবরের দরবারী পন্ডিতগণ, বিশেষ করে আবুল ফজল তার লিখনীতে তাদের পরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্রাটকে 'ইমামে মাসুম' 'খলিফাতুল্লাহ', 'জাহের ও বাতেনী তত্বের আধার', 'বান্দাদের রিজিক বন্টনকারী' ইত্যাদি অস্বাভাবিক খেতাবে ভূষিত করেন। তারা সম্রাটকে এ ভাবে বুঝাতে থাকেন, যে ইসলামের আগমনের পর থেকে সহস্র বছর পেরিয়ে গেছে, তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে। উম্মী নবী যে ইসলাম এনেছেন, উম্মী বাদসা তার পূর্ণতা দান করবেন। এখন থেকে নতুন ধর্মের নিয়ম নীতি - বিধি বিধান প্রনয়নের এখতিয়ার একমাত্র রাজার। মোল্লা মোবারক সম্রাট আকবরকে ইমামের মর্যাদায় প্রতিষ্টিত করেন। (শীয়াদের আকিদা মতে ইমামের মর্যাদা) এ ভাবে সম্রাট আকবরকে ইসলাম বিরোধী মতবাদে উদ্বুদ্ধ করে তুলেন। সম্রাট আকবর দ্বিতীয় সহস্রের প্রস্তুতিতে উঠে পড়ে লাগেন, নতুন মুদ্রা ছাপানো হয়, নতুন সাল চালু করেন এই লক্ষ্যে।

এভাবে আকবর দ্বীনে ইসলামের জায়গায় 'দ্বীনে ইলাহী' চালু করেন। এই নতুন ধর্মের বুনিয়াদ ছিলো সুর্য পুজা, গ্রহ পূজা ও পুনজন্মবাদ। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের আকিদাকে অস্বীকার করা হয়। সাথে সাথে সুদ, জুয়া, মাদকদ্রব্য, শুকুরের গোস্ত, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি অবৈধ কাজকে বৈধ ঘোষনা করা হয়। খৎনা করা অবৈধ করা হয়।

www.pathagar.com

আবুল ফজলের লিখা 'আইনে আকবরী' গ্রন্থে আকবরের প্রবর্তিত ধর্ম দ্বীনে ইলাহীর যে বিস্তারিত রূপ পাওয়া যায় তাতে এই মতবাদের প্রবোক্তাদের আসল চেহারা ফুটে উঠেছে।

দ্বীনে ইলাহীর ঐতিহাসিক পটভূমি।

আকবরের দ্বীনে ইলাহীর তত্ব ও তথ্য জানার পর স্পষ্ঠ হয়ে যায় যে এই ভ্রান্ত চিন্তা ধারা ইরানের বিভিন্ন অনৈসলামী মতবাদেরই নব্য সংস্করন। বিশেষ করে হিজরী নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে ও দশম শতাব্দীর সূচনাতে 'নকতি' আন্দোলনের চরম বিকাশ ঘটে। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম 'মাহমুদ পাছিখুয়ানী' বলে ইতিহাসে বলা হয়েছে। এই ধারনায় বিশ্বকে প্রাচীন সৃষ্টি বলা হয়েছে, এতে হাশর, নশর, ভালমন্দ, নেকীবদর কোন ধারনা ছিলো না। তাদের মতানুয়াযী জড় সৃষ্টি ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানুষ ও অন্য জীব জন্তুর রূপ নেয়। জড় সৃষ্টি ও গাছ পালার সৃষ্টিতে আল্লাহর কোন হাত নেই, বরং এসব হলো বিভিন্ন গ্রহ ও সৃষ্টি উপাদানের ক্রমবিকাশ মাত্র। কোরআনকে নবীর সৃষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগী, বিশেষ করে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতের বিদ্রূপ করতো। ইসলামের সমস্ত শরীয়তকে তারা অস্বীকার করতো। তারা সমস্ত জ্ঞানের বুনিয়াদ হিসাবে গ্রীক দর্শনকে মেনে নেয়। নকতী মতবাদের বিকাশকে তারা আট হাজার বছরের আরব প্রাধ্যান্যের অবসান ঘটিয়ে অনারবদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা বলে প্রচার করতো। শেষ নবী (সঃ) কে তারা আরব প্রাধান্যের পূর্নতাদান কারী বলে চিত্রিত করে, অতঃপর মাহমুদের সৃষ্টিতে আরব প্রাধান্যের অবসান ঘটে। ইসলামের শিক্ষা পরিতক্ত হয়ে যায় এবং মাহমুদের দ্বীন প্রসার লাভ করে। নকতীদের চরম পন্থি ও সন্ত্রাসী কর্মসূচীর ফলে সর্বত্র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়।

অতঃপর দশম শতাব্দীতেই ইরান আর একটি বিপ্লব দেখতে পায়। শেখ সফিউদ্দীন নামক একজন প্রতিক্রিয়াশীল শীয়া বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টা করেন। তার নামের সাথে সাথে ইরানের নাম 'সাফভী' সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে যায়। দেশে শীয়া মাযহাবকে সরকারী ধর্ম হিসাবে ঘোষনা করা হয়। যে ইরানের মাটিতে শতাব্দী ধরে ইসলামী আদর্শবাদের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে অভূতপূর্ব খিদমত লালিত হয়েছে, যে মাটি অসংখ্য যুগান্তকারী মনিষীর জন্ম দিয়েছে, যাদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী, শেখ ফরিদদ্দীন আত্তার, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী, আবদুর রহমান জামী, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (জিলান এলাকা আজ ইরাকে অবস্থিত কিন্তু তদানিন্তনকালে ঐ এলাকা ইরানী সাম্রাজ্যের অধীন ছিলো) হযরত শেখ সেহাবুদ্দীন সহরোয়াদী, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম ইবনে মাযা, ইমাম নিসায়ী প্রমুখ ইমামদের নাম ইতিহাসের পাতা সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন। সেই ইরানে

www.pathagar.com

সাফাভী সাম্রাজ্যের শীয়াবাদ ইরানের মাটি থেকে ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, ইসলামী ইলমে মারেফতকে সমূলে উৎপাটিত করে। এই শীয়া সাম্রাজ্যের অধীনে ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের ব্যাপক সংহার কার্য পরিচালিত হয়। ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই সংহার কার্যের সাথে সাথে উপরোক্ত 'নকতি' আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষনা করে অসংখ্য 'নকতি'দেরকে হত্যা করা হয়। এ অবস্থায় কিছু কিছু 'নকতি' মতবাদে বিশ্বাসী পন্ডিত ব্যক্তি ইরান থেকে পলায়ন করে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেন। এবং ইসলাম নিরপেক্ষ মোঘল সাম্রাজ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকেন।

(منتخب التواريخ) গ্রন্থের লেখক মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনী তার গ্রন্থে ঐ যুগের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরে বাতিল আদর্শগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ্য করেছেন যে সম্রাট আকবরের নতুন ধর্ম 'দ্বীনে ইলাহীর' দার্শনিক গুরু আবুল ফজল, ফয়জী ও তাদের পিতা শেখ মোবারক আসলে 'নকতি' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কৌশলে নকতিদের দার্শনিক মূলনীতি গুলোকে দ্বীনে ইলাহীর মধ্যে সংযুক্ত করেছেন।

দ্বীনে ইলাহীর আকিদা বিশ্বাস ও মূলনীতি

সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত দ্বীনে ইলাহীর ভিত্তি নিম্নোক্ত পৌত্তলিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যার সাথে মাহমুদের নকতি আন্দোলনের মৌল নীতির সর্বাঙ্গিন অভিন্নতা মূর্ত হয়ে উঠে।

- সুর্য পূজা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। প্রমান স্বরূপ তারা বলতো, যেহেতু কোরআন শরীফে (و الشمس) (সূর্যের শপথ) বলে সূর্যের শপথ নেয়া হয়েছে, তাই সূর্যের পূজা কোন গর্হিত কাজ নয়। এর যুক্তির ধারা থেকে কোরআন সম্পর্কে তাদের চরম মূর্খতা ও তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্যে কোরআনকে ব্যবহার করার হীন মানসিকতাই প্রমান করে। তারা বলতো সূর্য পূজা আসলে আল্লাহ্‌রই ইবাদত।
- অগ্নি পূজা নেক কাজ ও আল্লাহ্‌রই আরাধনা
- গঙ্গাজল অতীব পবিত্র। বাদসা নিয়মিত গঙ্গাজল ব্যবহার করতেন। গঙ্গাজলের স্বল্পতা থাকলে সাধারন পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতেন।
- সূর্যাদয় ও সুর্যাস্তের সময় বিশেষ ইবাদত নির্দিষ্ট ছিলো। ইসলামে এই দুই সময়ে সিজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে সুর্য পূজারীর থেকে মানসিক দুরত্ব সৃষ্টির জন্যে, কিন্তু এই দ্বীনে তা বৈধ হয়ে যায়।
- আকবরের শাহী দরবারের নিয়ম ছিলো, যখন সম্রাট আগমন করতেন তখন একজন ঘোষক বলতো 'আল্লাহ আকবার' অন্যজন বলতো (جل جلاله) যার অর্থ হতো আকবরই আল্লাহ এবং তারই মহত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

- নামাজ, রোজা, অবৈধ ছিলো, যাকাত প্রদান বেআইনী কাজ ছিলো।
- হিজরী সালকে ঘৃণা করা হতো। নতুন সালের প্রবর্তন করা হয়। এই নতুন সালের প্রথম দিনও শেষ দিনকে ঈদ হিসাবে উদযাপন করা হতো।
- হিন্দু ধর্মকে সনাতন ও সার্বজনীন ধর্ম বলা হতো এবং হিন্দুদেরকে তাওহীদ পন্থি বলে উল্লেখ করা হতো।
- শুকুরের গোস্তকে হালাল করা হয়।
- দাড়ী রাখা অবৈধ ঘোষনা করা হয়।
- রাসুলে পাকের মিরাজের ঘটনা নিয়ে বিদ্রুপ ও তামাশা করা হতো।
- রাসুলে পাককে বিদ্রুপ করা হতো। রাসুলে পাকের নাম 'আহম্মদ' (সঃ) ও মুহাম্মদ (সঃ) কে ঘৃণা করা হতো। আকবর তার দরবারে যে সমস্ত লোকদের নাম আহম্মদ বা মোহাম্মদ ছিলো, তা পরিবর্তন করে দেন।
- চিত্রাংকন ও ছবি তোলাকে দ্বীনি কাজ বলা হতো।
- আকবরের দ্বীনে ইলাহীতে কালিমা হিসাবে (لا الـــــه الا الله) এর সাথে (اكبر خليفـــة الله) যোগ করা হতো। এই দ্বীন কবুল করার জন্যে এক শপথ নামা চালু করা হয়, তাতে বলা হতো;

(আমি আন্তরিকভাবে বাপ দাদার কাছ থেকে প্রাপ্ত ইসলাম ত্যাগ করছি, সম্রাট আকবরের দ্বীন ইলাহী কবুল করছি- এই দ্বীনের চার বুনিয়াদ যথা, 'সম্পদ বিসর্জন', 'মর্যদা ত্যাগ', 'দ্বীন ত্যাগ', ও 'জীবন উৎসর্গ করন' কে কবুল করে নিচ্ছি। (منتخب التوريخ) পৃঃ ২৭৩

- মুসলমানদের মসজিদে প্রতিমা রাখা বৈধ করা হয়। হিন্দু পূজারীগন মসজিদে তাদের পূজা পাঠ করতো। রাজার হিন্দু রানীগন এ সব পূজায় শরীক হতেন।

এ ভাবে আকবরের দ্বীনে ইলাহীতে ইসলামের আকিদা বিশ্বাস, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের সার্বিক পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়, পক্ষান্তরে হিন্দুদের পৌত্তলিক চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্যের ধর্মহীনতাকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্টার মাধ্যমে হিন্দু প্রীতির স্বাক্ষর রাখা হয়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্যে মোল্লা আবদুল কাদের বাদায়ুনীর (منتخب التواريخ) গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বীনে ইলাহীর সুদূর প্রসারী ফলাফল।

আকবরের দ্বীনে ইলাহীর পটভূমি ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আদর্শিক এই নৈরাজ্য ও সৈরাচারের পেছনে দ্বিমূখী ষড়যন্ত্র কার্যকরী ছিলো। এক দিকে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে আধুনিক মানস, বিশেষ করে আধুনিক বুদ্ধিজীবি সমাজের মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাব ইসলামের তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মৌলিক বিশ্বাসকে দূর্বল থেকে দূর্বলতর করে দিচ্ছিলো। ফলে তারা হিদায়াতের সরল ও সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় দিকটি ছিলো প্রভাবশালী হিন্দুদের তরফ থেকে। হিন্দু পন্ডিত ও প্রভাব শালী রাজপুতগন ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচার, মানবাধিকার , মানবতা, সমতা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তথা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর সামনে হিন্দু ধর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। পুরা কাহিনী, অবাস্তব ও নৈতিকতা বর্জিত দেবতাদের গল্প ইসলামের সর্বগ্রামী জীবনাদর্শের সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা দূরহ হয়ে দাঁড়াবে। তাই তারা হিন্দু ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে সন্ত্রস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে বিভ্রান্ত আধুনিক মানস ও ইসলামের এই সর্বগ্রামী রূপকেই ভয় করতো, হিন্দু ধর্ম তাদের পথে মোটে ও বাধা ছিলোনা। অন্যদিকে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি স্বার্থের পূজারীরা এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে। অতঃপর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় তারা এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইসলামী ন্যায় বিচার, সামাজিক সাম্য ও অপরাপর সামষ্টিক গুনাবলীর প্রতিফলন থেকে ইসলাম ও মুসলিম জনতাকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রথমতঃ তারা ধর্মীয় সহনশীলতা ও সহ অবস্থানের মূলনীতি তুলে ধরে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলার প্রয়াস পান। অতঃপর তারা শাসক ও প্রসাশকদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলতে পরামর্শ দিতেন। তারা বলতেন, ধর্ম হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যক্তিগত সম্পর্ক, এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্টের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ধারণা ছিলো যে এভাবে ইসলাম যদি তার সামাজিক, নৈতিক ও জাতীয় মূল্যবোধ থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায় তবে হিন্দু ধর্মের জন্যে অস্তিত্বের সংশয় কেটে যাবে। তারা কৌশলে কথাগুলো বলতেন সাধারনভাবে সকল ধর্মের নামে, কিন্তু তারা ভাল করেই জানতেন যে সামাজিক বা রাজনৈতিক মূল্যবোধ একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। তাই রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা একমাত্র ইসলামেরই ক্ষতি করবে এবং যে সমস্ত ধর্মের মধ্যে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্যের কোন বিধান নেই, ধর্ম নিরপেক্ষবাদ তাদের জন্যে কোন রূপ ক্ষতি বয়ে আনতে পারবে না, বরং প্রকারান্তরে তা তাদের জন্যে কল্যাণই টেনে আনবে। সাধারণভাবেই মোঘল সাম্রাজ্যে কোন ধর্মীয় নৈতিকতার বন্ধন ছিলো না, রাজা ও আমীর উমারাগণ বিলাস ব্যসনে ডুবে থাকতেন। দরবারী লোকদের দ্বারা সদা নিয়ন্ত্রিত থাকতেন। স্বার্থের পূজারীরা তোষামদের মাধ্যমে কার্য্য উদ্ধার করতো। যারা

www.pathagar.com

রাজার বা আমীর উমারাদের ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে সকল ধরণের কাজ ও কথাকে সমর্থন করতো বা প্রশংসা করতো, তারাই তাদের প্রিয়পাত্র ছিলো। রাজ দরবারে রাজাকে সিজদা করে সম্মান করা হতো। এমনি অবস্থায় সুযোগ সন্ধানী লোকেরা সম্রাট আকবরকেই ব্যবহার করে।

আকবরের দ্বীন ইলাহী মূলতঃ হিন্দু ধর্মের স্বার্থেই ছিলো এবং ইসলামের ক্ষতি সাধনই এর লক্ষ্য ছিলো। হিন্দু ধর্মের টিকে থাকার জন্যে অনুসরণযোগ্য কোন আদর্শ বা বিধি বিধানের প্রয়োজন কোন দিনই ছিলোনা, বরং তথা কথিত মূল্যবোধ, আধুনিক সংস্কৃতির নামে নাচ-গান ও শিল্পকলার নামে দেবদেবীর মুর্তি ও চিত্রাংকনের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে। তাই সার্বিকভাবে সামাজিক ও জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে উৎখাত করলে বাস্তবে ইসলামের জন্যেই তা ব্যবহৃত হবে। আকবরের দ্বীনে ইলাহীতে ও আমরা তাই দেখতে পাই। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শুধু ইসলামেরই ক্ষতি করা হয়েছে। সাথে সাথে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইসলামের সামগ্রিক নৈতিক ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাকে সীমিত করার যে কোন প্রয়াস তা যে নামেই করা হোক না কেন তা দ্বীনে ইসলামেরই ক্ষতিমাত্র। এই প্রয়াস কখনো শুধু রাজনীতির নামে হয় আবার কখনো বা শুধু ধর্মের নামে হয়। আবার কখনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমন্বিত আকারে হয়। প্রথম দুই পর্যায়ে ইসলামের যে ক্ষতি হয় তার তুলনায় তৃতীয় পর্যায়ের ষড়যন্ত্রের ফলাফল অনেক বেশী মারাত্মক ও সুদুর প্রসারী হয়। আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ষড়যন্ত্র এই তৃতীয় পর্যায়ের। এই ষড়যন্ত্র ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করারই প্রয়াস ছিলো।

শক্তিশালী মোঘল সাম্রাজ্য তার সামরিক শক্তিতে, সরকারী এককেন্দ্রিক প্রশাসনে, শক্তিশালী হিন্দু রাজপুতদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে এক সর্বগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়ানোর বা সম্রাটের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চিন্তা ও কেউ করতে পারতো না। কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হতো। আকবরের দ্বীনে ইলাহী বা তার মুসলিম বৈরী ও হিন্দু প্রীতি কর্মসূচীর বিরুদ্ধে কিছু বলা বা করা আত্মহত্যারই নামান্তর বলে মনে করা হতো। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতার কোন অস্তিত্বই ছিলো না।

এই অবস্থায় ঈমানের দংশনে যারাই প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন, তারা নিহত হয়েছেন বা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বীনে ইলাহীর প্রশ্নে যাদের আনুগত্যের প্রশ্নে সন্দেহ করা হতো, তাদেরকে দরবারে ডেকে পাঠানো হতো। দরবারী নিয়ম অনুযায়ী সিজদা না করলেই তাদেরকে জেলে পাঠানো হতো বা দেশান্তর করা হতো। ইতিহাসে অনেক বিশিষ্ট আলেমের নাম পাওয়া যায় যারা আকবরের দরবারে নিগৃত হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। তাই আকবরের জীবদ্দশায় এই বিভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কোন জনমত গড়ে উঠতে পারেনি।

www.pathagar.com

অবস্থার এতো অবনতি ঘটে যে ইসলামের ভবিষ্যত কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই নাযুক মোড়ে ভারতীয় উপ-মহাদেশ থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছিলো। সন্দেহ ঘনিভূত হতে থাকে যে হয়তোবা এখানে ইউরোপের সেপনের বা রাশিয়ার তুর্কিস্তানের অবস্থা সৃষ্টি হবে। অতঃপর রাষ্ট্রীয় দিক বিজয়ীর চেয়ে ও শক্তিশালী আদর্শিক দিক বিজয়ীর আগমন ঘটলো ও আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের আমলেই এই আদর্শিক দিক বিজয়ের পূর্ণতা লাভ করলো। রাষ্ট্রীয় শক্তির সমস্ত অহমকে ভ্রূকুটি করে দ্বীনে ইলাহীর সর্বগ্রাসী সয়লাব থেমে গেলো, আল্লাহর দ্বীন তার স্বকীয় অবস্থায় সংরক্ষিত হলো। সরহন্দের আদর্শিক যোদ্ধা মোজাদ্দিদ আলফে সানী হলেন সেই অমর সৈনিক।

মোজাদ্দিদ আলফে সানীর রেঁনেসা আন্দোলন

সম্রাট আকবরের জীবদ্দশায় মোজাদ্দিদে আলফে সানী আকবরের ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারিতা ও তার হিন্দুপীতির প্রহসন প্রত্যক্ষ করেন, সাথে সাথে প্রতিবাদকারীদের পরিণতিও অবলোকন করেন। তদানিন্তন সূফীদের সাধারন স্বভাব অনুযায়ী সবকারী প্রশাসন ও সাধারন জন সাধারন থেকে দুরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা দিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে আত্মনিয়োগ করাই তার স্বাভাবিক কর্ম হতে পারতো, কিন্তু ইসলামের এই দূর্গতি দেখে তিনি অস্থিরতার সাথে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে থাকেন। তিনি একাধারে বক্তৃতা, লিখনী, শিক্ষা-দিক্ষা ও তাযকিয়ার পথে ইসলামী রেঁনেসার কাজ শুরু করেন। ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে যে ব্যাপক বিকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছিলো, কোরআন হাদীসের যুক্তির ভিত্তিতে তার সংস্কার সাধনের প্রয়াস পান। কোন সাধারন ব্যক্তিত্বের পক্ষে এই বিরাট কাজ সম্ভব ছিলোনা। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে উপ-মহাদেশের মুসলমানদের সৌভাগ্য যে মোজাদ্দিদ আলফে সানীর মতো ব্যক্তিত্বের দ্বারা এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম পায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে করা স্বাভাবিক যে সেপন বা তুর্কিস্তানে ইসলামের অবক্ষয়ের দিনে মোজাদ্দিদের মতো কোন অসাধারন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটলে সেখানের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। এই দিক দিয়ে উপ-মহাদেশের কোটি কোটি মুসলমান এই মহান ইমামের প্রতি ঋণী।

পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশিষ্ট আমীর উমারাহ ও তার প্রশাসনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে তার স্বভাবসুলভ যুক্তি ও আবেগে ভরা অনেক পত্র লিখেন। এসব পত্রগুলো ইসলামী সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদ। সেসব পত্রগুলোকে সংকলিত করে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাকতুবাত ইমাম রাব্বানী' (مکتوبات امام ربانی) তে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সর্বমোট ৫৩৬ টি পত্র স্থান পেয়েছে। এই সব পত্রগুলোকে ইসলামী রেঁনেসারই বার্তা বহন করে। চিন্তা, পান্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতার গভীরতায় ইসলাম তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে শুরু করে।

www.pathagar.com

এসব পত্র লিখার সাথে সাথে তিনি বিভ্রান্ত শীয়া আকিদা, বিভ্রান্ত মারেফত ও দর্শনের বিষক্রিয়ার জবাবে বই পুস্তক লিখেন। (رد روافض) তার প্রসিদ্ধ বই। ইসলামী রেঁনেসার এই সংগ্রামে তাকে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের কারাবাস ও বরণ করতে হয়। অতঃপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশাতেই পরিস্থিতির ইতিবাচক মোড় নেয়। জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহানের আমলে অবস্থার আনো উন্নতি হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে এই ফিতনার অবসান ঘটে।

ধর্মনিরপেক্ষতার উত্তরাধিকার

আকবরের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটেছে, আলফে সানীর (দ্বিতীয় সহস্র) ধর্ম দ্বীনে ইলাহী আজ অতীতের বেদনা, মোজাদ্দীদ আলফে সানী ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়েছেন, ইসলাম তার মৌলিকত্ব নিয়ে টিকে আছে, কিন্তু আমাদের উপ-মহাদেশে দ্বীনে ইলাহী তার উত্তরাধিকার ছেড়ে গেছে ধর্মনিরপেক্ষতার রূপে। এই উপ-মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজনীতির অংগনে ধর্মনিরপেক্ষতার যে তথাকথিত আদর্শ ব্যবহৃত হয় তা তার স্বরূপে আকবরের দ্বীনে ইলাহীর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদেরই নব্য সংস্কার মাত্র। এই ধর্মনিপেক্ষতার হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় ইসলাম বা মুসলমানদেরই বিরূদ্ধে। এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় সংখ্যা লঘু মুসলমানদের। তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতায় ক্ষতিহয় বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের, সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরূদ্ধে সাম্প্রদায়িতার অভিযুক্ত করা হয় বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরকে। দ্বীনে ইলাহীর হৃপতীগণ যে উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি ব্যবহার করেছিলো, আজও একই উদ্দেশ্যে এই ধারণাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধর্মীয় সহনশীলতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে সকল ধর্মের প্রতি সমভাবে ব্যবহারের মূলনীতির উপর নিরপেক্ষতার সাথে উপ-মহাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার এটাই পার্থক্য। উপ-মহাদেশের শতাব্দীর মুসলিম শাসিত হিন্দুগণ যদি এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই, কিন্তু মুসলমানদের তরফ থেকে যখন এই মতকে আদর্শ বলে উল্লেখ করা হয় তখন আবুল ফজল, ফয়জীর প্রেতাত্মারই আর্তনাদ বলে মনে হয়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুকেই এর জন্যে দায়ী করা যায় না।

বিভেদের আর একটি অধ্যায়: বেরলভী, ওহাবী ও দেওবন্দী

হযরত মোজাদ্দিদ আলফে সানীর ব্যাপক সংস্কার মূলক আন্দোলনের ফলে দ্বীনে ইসলাম দার্শনিক বক্রতা ও হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার ছোবল থেকে অনেকাংশ মুক্তি লাভ করে সত্যি। কিন্তু ইসলামের কোন কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বিভেদের বিজ আবারো অংকুরিত হবার পথ খোলা থেকে যায়।

www.pathagar.com

অতঃপর শেষ যামানার ইমাম হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলামী ইলমের ব্যাপক সংস্কার করেন, তিনি কোরআন হাদীসের আলোকে সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা তুলে ধরেন। তার ব্যাপক খিদমত আজও মুসলিম উম্মাহর পথ প্রদর্শক। তিনি একাধারে বিভ্রান্ত দার্শনিক চিন্তা, শিরক ও পৌত্তলিকতার প্রভাব থেকে উম্মতের সার্বিক চিন্তাধারাকে পরিচ্ছন্ন করার প্রয়াস পান, তার যুগকে শুধু ভারতে নয়, বরং সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলনের এক যুগ বলা হয়ে থাকে।

তারই সমসাময়িক কালে হিযাযে ইমাম মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রঃ) শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেন, তিনি বাদশা বিন সউদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে সরকারী প্রশাসনের সহযোহিতায় ঐ অঞ্চলের ব্যাপকতর শিরক ও বিদয়াতকে কঠোর হস্তে নির্মূল কনে। তিনি তাওহীদের জন্যে ক্ষতিকর সকল রকম রসম রেওয়াজ ও রীতিনীতিকে ও শক্তি প্রয়োগে বন্ধ করে দেন। সাধারন রেঁনেসা আন্দোলনে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে মানুষের মনমগজ ও চিন্তাধারাকে পরিবর্তীত করার কাজে যে প্রচুর সময় ও ব্যাপক দাওয়াত ও তবলিগের প্রয়োজন, তিনি সে পথে না গিয়ে সরকারী প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় সেই কাজ অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করেন, ফলে বিভিন্ন মহলে চাপা ক্ষোভ ও সন্দেহ দানা বেধে উঠে। কিন্তু বিশিষ্ট উলেমা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তরফ থেকে এই সংস্কার কাজকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করা হয়, যা এর সাফল্য সুনিশ্চিত করে এবং সমকালের ইতিহাসে হিযাযের মাটিতে যে ব্যাপক শিরক ও বিদয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়, একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। ইসলামের সত্যিকার তাওহিদ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের রেঁনেসা আন্দোলনের ইতিহাসে অতীতের কয়েক শ'বছরে এমন সাফল্যের আর কোন নজীর পাওয়া যায় না। হিযায বা মধ্যপ্রাচ্যে আজ যে অবিকৃত ইসলামী আকিদার লালন দেখতে পাওয়া যায় তা এই মহান ইমামেরই অবদানের ফসল।

ভারতীয় উপমহাদেশে রেঁনেসা আন্দোলন

ইতিহাসের একই পর্যায়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে তিতুমীরের রেঁনেসা আন্দোলনের সুত্রপাত হয়, যা পরে হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলনের সাথে একত্রিভূত হয়ে যায়। এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যও একই ছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভারতের মাটিতে বৃটিস সাম্রাজ্যের পত্তন হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের রেঁনেসা আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করে। আমীরুল মুমেনীন সাইয়েদ আহমেদ শহীদ (রঃ) শাহ ইসমাইল শহীদ (রঃ) প্রমূখ তাদের রক্তের নজরানা দিয়ে মিল্লাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করে ব্যর্থ হয়ে যান। বৃটিস রাজ জগদল পাথরের মতো মুসলিম উম্মাহর বুকে চেপে বসে।

মিল্লাতের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার মানসে মুসলিম উম্মহার চিন্তাধারার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিতে উপনিবেশিক শাসক চক্র কোন সুযোগ হাত ছাড়া করেনি। ভারতীয়

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে ইমাম মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের রেঁনেসা আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টিতে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই তৌহিদী আন্দোলনকে ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে তুলে ধরা হয়। ইমাম মুহম্মদের পিতা আব্দুল ওহাবের নামের সাথে নামকরণ করে এই আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হয়। কোন আন্দোলন সম্পর্কে খুঁটিনাটি মত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ওহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে হিযাযের এই বিরাট আন্দোলনকে চরমভাবে নিন্দিত করা হয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে উলেমাদের একাংশের কাছে 'ওহাবী' একটি গালী বলে পরিগণিত হয়ে পড়ে। অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগ এই আন্দোলনের সাথে জড়িত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এভাবে তাদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিয়েছে, কিন্তু উম্মতের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী একটি বিভেদের বুনিয়াদ সৃষ্টি করে গেছে।

ইরান ও ভারতের ইসলামী ইতিহাসের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দুইটি ধারা পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামের জীবন ব্যবস্থায় দ্বিমুখী ধারা

একটি ধারায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহর রেঁনেসা আন্দোলনের পথ ধরে সাইয়েদ আহমেদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ মাদ্রাসা কেন্দ্রিক প্রখ্যাত উলামা কেরামগণ সাধারন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন রসম রেওয়াজের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তারা তাসাউফ উদ্ভূত 'কবর প্রদক্ষিণ করা', 'কবরে ওরস কাউয়ালীর মহফিল', 'সেমা', 'কিয়ামসহ মিলাদ', 'মিলাদুন্নবীর উৎসব', যাকে বলা হয় ফাতেহায়ে দোয়াজ দহম, 'ফাতেহায়ে ইয়াজদহম বা ১১ শরীফের ফাতেহা', ইত্যাদি ধর্মীয় রসমের কঠোর সমালোচনা করতেন। এই সংস্কারবাদী ধারার বিরুদ্ধে আর একটি ধারায় উলেমাদের একাংশ ইলমে তাসাউফের নামে এই সমস্ত রসম রেওয়াজের রক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন, তারা প্রথমতঃ এই সব রসম রেওয়াজের শুধুমাত্র সমর্থক ছিলেন এবং এগুলোকে নির্দোষ মনে করতেন, কিন্তু প্রথম ধারার উলেমাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করতে গিয়ে এসব রসম রেওয়াজকে ধর্মীয় জীবনের অবশ্য করণীয় কাজ বলে মনে করতে থাকেন। এভাবে তাদের মাঝে অবিশ্বাস, অনাস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, পরে তা হিংসা প্রতিহিংসা ও পারস্পারিক ঘৃণার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণে যখন হিযাযের মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের রেঁনেসা আন্দোলনের ঝঞ্ঝা ভারতে এসে আঘাত হানে এবং বৃটিস সাম্রাজ্যবাদের উস্কানীতে দুই ধারার উলেমাদের মাঝে বিরোধের ব্যবধান গভীরতর হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ধারার উলেমারা তাদের মতের বিরোধী সকল আলেমদেরকে সাধারনভাবে 'ওহাবী' বলে চিত্রিত

www.pathagar.com

করতে থাকেন। এভাবে হিযাযের এই মহান আন্দোলন এক মজলুম আন্দোলনে পরিণত হয় এবং উপমহাদেশের ধর্মীয় পরিস্থিতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। শতাব্দীর সহ অবস্থান ও সহনশীলতার পরিবেশ ক্ষুন্ন হয়ে পড়ে। এসব রসম রেওয়াজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করেছে, কেউ মানতেন, কেউ মানতেন না, অনমনীয় মনোভাব ছিলোনা, কেউ এগুলোকে দ্বীন ও ঈমানের বুনিয়াদ মনে করতেন না। সাধারনভাবে এগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে কিছু দ্বীনি কাজ হচ্ছে মনে করে এগুলোকে প্রশ্রয় দেয়া হতো। যারা এই রসম রেওয়াজের বিরোধী ছিলেন তারা সর্তকতার সাথে এগুলো এড়িয়ে চলতেন এবং ইসলামী শরিয়তের আলোকে এই সব রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। তবলীগি হিকমতকে তারা ত্যাগ করতেন না। কিন্তু উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক পটভূমিতে উভয় ধারার উলেমারা হঠাৎ করে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তদুপরি উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়ার উপনিবেশ শাসনের প্রযত্নে এই বিরোধ ব্যাপকতর হয়ে পড়ে।

বেরেলী মাদ্রাসার মওলানা আহমদ রেজাখান বেরেলভী এই দ্বিতীয় ধারার উলেমাদের মুখপাত্রে পরিণত হয়ে যান, ফলে এই ধারা 'বেরেলভী' নামেই পরিচিত হয়ে পড়ে।

বিরোধের মূল কারণ

এই বিরোধের মূল কারণ খুঁজে বের করা সুকঠিন, কেননা উপরে বর্ণিত ইতিহাস দীর্ঘদিনের পরম্পরা, এই প্রেক্ষাপট মূল কারণ হতে পারে না, বরং কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হতে পারে। ঐ সময়ই আরেকটি কারণ সংযোজিত হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় সেটি হলো মূখ্য কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রায় দেড়শত বছর পূর্বের ঘটনা। যখন উপমহাদেশে দেওবন্দী উলেমাদের ইলমী প্রভাব সর্বত্র স্বীকৃত ছিলো। মওলানা কাসেম নানাতভী, মওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী, মওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মওলানা ইসমাইল শহীদ প্রমূখ বিশিষ্ট উলেমায়ে কেরামদের ঈমান, আমল ও ইলমী যোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ ছিলো না। উপমহাদেশের প্রাচীনতম বিদ্যাপিঠ দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত উলেমারা উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন এবং মুসলমানদের শিক্ষা দিক্ষা ও তাযকিয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন, সাথে সাথে প্রায় সমস্ত মাদ্রাসাতেই দেওবন্দী আলেমগণ নিয়োজিত হয়ে পড়েন।

দাওয়াত ও তবলীগের উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত উলেমারা কিছু পুস্তক পুস্তিকা লিখেন। মওলানা আহমদ রেজাখান বেরেলভীর নেতৃত্বে তার অনুসারী উলেমারা দেওবন্দী উলেমাদের লিখিত কিছু কিছু পুস্তক পুস্তিকার মধ্যে রাসুলে পাকের মর্যাদাহানীকর মন্তব্য থাকার অভিযোগ করেন। বিশেষ করে তারা মওলানা ইসমাইল শহীদ, মওলানা আশরাফ

www.pathagar.com

আলী থানভী ও মওলানা রশীদ আহমদ গংগুহীর লিখিত কিতাব সমূহের মধ্যে ঐ সব আপত্তিজনক ও ঈমানের পরিপন্থি মন্তব্যগুলো প্রতিবাদ করেন এবং মওলানা আহমদ রেজাখান ও তার সমর্থক উলেমাদের স্বাক্ষরে ফতোয়া জারী করা হয়, যার মধ্যে ঐসব প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য উলেমাদেরকে কাফের ঘোষণা করা হয়। তদানিন্তন সময়ে ঐসব প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেমদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলেন তারা তাদের লিখিত মন্তব্যগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করেন এবং বার বার সুস্পষ্ট করেদেন যে রাসুলেপাকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ঈমানের ভিত্তি, কোন মুসলমান তাঁর মর্যাদাহানীকর কোন মন্তব্য করার কল্পনা ও করতে পারেনা বা তাদের লিখনীতে তেমন কোন কথা তারা লিখেননি যা নবীজির মর্যাদার পরিপন্থি। একথা সন্দেহাতীতভাবে অলংঘনীয় যে রাসুলেপাকের মর্যাদাহানীকর কোন কথা, লিখনী বা মন্তব্য সরাসরি ঈমানের পরিপন্থি, কিন্তু একথা কি চিন্তাও করা যায় যে উম্মতের এইসব আলেমগণ রাসুলেপাকের মর্যাদায় আঘাত হেনেছেন, তদুপরি যখন তারা অভিযোগের প্রতিবাদ করে যুক্তির ভিত্তিতে তা খন্ডন করেছেন, তখন এই ধরনের বিবৃতি ও ফতোয়ার কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু বেরেলীর উলেমারা তাদের ফতোয়ার উপর অবিচল রইলেন এবং সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে হেযাযের উলেমাদের শরণাপন্ন হন। আজও সেই ফতোয়া তাদের কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

উপমহাদেশের আলেম সমাজের মধ্যেই ফতুয়াবাজী, বাহাছ মোবাহাছা বা মোনাযারার মনোবৃত্তি বেশী। যদি ও এপথে কোন সমস্যার সমাধান হয় না, ভারতীয় উলেমারা এপথেই চলতে ভালবাসেন। ঠান্ডামাথায় এই বিরোধের মিমাংসার চেষ্টা কোন দিনই করা হয়নি, বরং বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও অনাস্থা-বিদ্বেষের পরিবেশে এই বিরোধকে আরো গভীরতর করা হয়েছে।

দেওবন্দী উলেমারা ইলমের প্রাধান্যে গরীয়ান এবং ইলমই তাদের স্বাতন্ত্রের বুনিয়াদ, পক্ষান্তরে বেরেলভী গ্রুপ আবেগ প্রবণতায় নির্ভরশীল। তাদের বুনিয়াদ হলো উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত রসম রেওয়াজ। উপমহাদেশের অধিকাংশ মাদ্রাসা ভিত্তিক উলেমারা দেওবন্দের ঐ স্বনামধন্য উলেমাদের পছন্দ করতেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করতেন, কিন্তু গ্রামে গঞ্জের স্বল্প শিক্ষিত মুন্সী, মৌলভী ধরনের লোকেরা ঐসব প্রাচীন রসম রেওয়াজের ধারক ও বাহক ছিলেন। সাধারন মুসলমানগণ সমস্ত ধর্মীয় কাজে তাদের উপরই নির্ভর করতেন। তারা এই সব বিরোধের মৌলিকত্ব না বুঝতে পারলে ও তারা স্বযত্নে এইসব রসম রেওয়াজ মেনে চলতেন, এই প্রেক্ষিতেই বেরেলভী গ্রুপের উলেমারা মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দাবীদার। অর্ধ শিক্ষিত কুশিক্ষিত আলেম নামধারী ব্যক্তিগণ এই বিরোধের ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছেন সর্বত্র। ইসলামী ঐক্যের অনুভূতি একেবারেই অনুপস্থিত ও উপেক্ষিত। উপমহাদেশের সাধারন মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের অসংখ্য রসম রেওয়াজ রাতারাতি পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। এগুলো যুগ

www.pathagar.com

যুগ ধরে আমাদের ধর্মীয় জীবনের অংগ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে, মহল্লা মহল্লায় এগুলোর আমল চলছে, তাই আস্তে আস্তে তবলীগ ও হেদায়াতের মাধ্যমেই এসব রসম দূর হতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে এসব রসম ব্যাপক ছিলো সত্য, কিন্তু এর পেছনে কোন সংগঠিত মত বা পথ ছিলো না। তদুপরি এই সব রসমের পশ্চাতে সুসংযত বাতিল আকিদা ও প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। কিন্তু দেড়শত বছর পূর্বের উল্লেখিত ঘটনা বেরেলভী গ্রুপকে এসব রসম রেওয়াজের পশ্চাতে সুসংবদ্ধ বিভ্রান্ত আকিদার সংগঠক বা মুখপাত্র হতে সাহায্য করেছে এবং আপামর মুসলমান জনসাধারনই এই বিরোধের মূল শিকারে পরিণত হয়েছে। বেরেলভী চিন্তাধারার ধারক ও বাহকগণ এসব রসম রেওয়াজকে তাত্বিকভাবে লালন করছেন বলেই একথা মনে করে নেয়ার কোন কারণ নেই যে এই বিরাট জনগোষ্ঠী বেরেলভী আকিদার ধারক ও বাহক হয়ে পড়েছেন। এইসব সাদাসিধে মুসলমানদের জন্যে দরদী মন নিয়ে সংস্কার প্রয়াসে ব্রতী না হয়ে তাদেরকে বেরেলভী গ্রুপের সমর্থক বলে চিত্রিত করে কঠোর সমালোচনায় জর্জরিত করা কোন ইনসাফ নয় এবং সংশোধনের জন্যে এটা কোন ইসলামী নিয়ম নয়। অজ্ঞতাজনিত অপরাধের কারণে কোটি কোটি মুসলমানদেরকে অবহেলা করে মিল্লাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে না।

একবার দলীয় বিরোধের ভিত্তি পড়ে গেলে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অপমৃত্যু ঘটে। যুক্তির সারবত্তা ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাপ করা হতে থাকে। সাধারন কোন মত পার্থক্য ও গভীরতর বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি যথাসময়ে দলীয় বা গোষ্ঠীর আনুগত্যের উর্দ্ধে উঠে উপরোল্লিখিত বিরোধের নিষ্পত্তি করা হতো তবে আজকের পরিস্থিতি ভিন্নরূপ হতো, এবং উম্মতকে খেসারত দিতো হতো না।

উপরের এই অস্পষ্ট কথাগুলোকে স্পষ্ট করে বলা যায় এভাবে যে দেওবন্দ ও বেরেলীর উলেমাদের মাঝে জানামতে সর্বপ্রথম মত পার্থক্য দেখা দেয় (اثر ابن عباس) বা ইবনে আব্বাসের কথিত বলে একটি মন্তব্য নিয়ে। উক্ত মন্তব্যে বলা হয়েছে,

ان الله خلق سبع ارضين فى كل ارض آدم كادمكم و نوح كنوحكم و عيسى كعيسكم و ابراهيـــم كابراهيمكم و موسى كموسكم و نبى كنبيكم -

(আল্লাহ তায়ালা সাত যমিন সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক যমীনে তোমাদের আদমের মতো আদম আছেন, তোমাদের নূহের মত নূহ আছেন, তোমাদের ইব্রাহিমের মত ইব্রাহিম আছেন, তোমাদের মুসার মতো মুসা আছেন, তোমাদের ঈসার মত ঈসা আছেন এবং তোমাদের নবীর মতো নবী আছেন।)

দেওবন্দের মৌলভী মোহাম্মদ আহসান নানাতভী এই উক্তির স্বপক্ষে পুস্তিকা লিখেন, কিন্তু বেরেলীর ও বাদায়ুনের উলেমারা তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে প্রতিরোধ করেন, সাথে সাথে অপরাপর উলেমারা ও একে খতমে নবুয়তের পরিপন্থি মনে

www.pathagar.com

করে এই মন্তব্যকে অগ্রাহ্য করেন। প্রথমতঃ এমনি একটি বিষয় যার সাথে জনসাধারনের হিদায়াতের কোন দিক জড়িত নেই, আলোচনায় আনাই সমীচিন ছিলো না, বিশেষ করে সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এমনি আলোচনা নিঃসন্দেহে অকল্যাণকর ছিলো। তবুও যদি দেওবন্দের আলেমগণ অবস্থার নাযুকতাকে সামনে রেখে নীরবতা অবলম্বন করতেন তবে বিবাদ দীর্ঘয়িত হতো না। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানাতভী তার পূর্বসুবীর সমর্থনে একটি বই লিখেন (تحذیر الناس)। পরিণতিতে অন্তহীন বিবাদের পথ খুলে যায়, বাদ প্রতিবাদ, বিতর্কে উলেমাদের মজলিশ সরগরম হয়ে পড়ে। মতের পক্ষে বিপক্ষে অনেক বই পুস্তক লিখা হয়। অতঃপর মওলানা ইসমাইল শহীদ তার প্রসিদ্ধ পুস্তক (تقوية الايمان) লিখেন। তাওহীদের গুরুত্ব ও আল্লাহরপাকের সৃষ্টি ক্ষমতার অসীমতা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন;

"ঐ রাজাধিরাজের ক্ষমতা এমনি যে তিনি এক নিমিষে, এক 'হয়ে যাও' বলে কোটি কোটি নবী, ওলী, জ্বীন, ফিরিস্তা, জিব্রাইল এবং মুহম্মদ (সাঃ)-এর মত পয়দা করতে সক্ষম, এক মুহুর্তে সারা সৃষ্টি, পৃথিবী থেকে আরশ পর্যন্ত উলট পালট করে ফেলতে পারেন এবং এই পৃথিবীর জায়গায় অন্য পৃথিবী সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন।"

এই মন্তব্যের মধ্যে বেরেলভী উলেমারা নবীজীর মতো আরো নবী পয়দা হবার সম্ভাবনার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন, এর বিরুদ্ধে বই পুস্তক লিখা হতে থাকে এবং তর্ক বিতর্কের আসর সরগরম হতে থাকে।

এরপর একে একে দেওবন্দী উলেমাদের তরফ থেকে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা প্রমাণ করে এবং একই মনোভাব সম্বলিত আরো কিতাব লিখা হয়, তার মধ্যে, (صراط مستقيم، براهين قاطعة ، حفظ الايمان، فتوى رشيدى ، الجهد المقل) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এভাবে উভয় পক্ষের উলেমারা বাদ প্রতিবাদ, বিতর্ক, আলোচনা, সমালোচনায় এই বিরোধকে তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। যে বিরোধ ছিলো কতিপয় রসম রেওয়াজের আমলকে কেন্দ্র করে তা আজ ব্যাপকতর আকিদাগত, ধর্মীয় ও সামাজিক তথা জাতীয় জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। যে বিরোধ দূর করার সত্যিকার কোন প্রচেষ্টা না অতীতে করা হয়েছে আর না আজ করা হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত বাক বিতন্ডা ও তর্ক-বিতর্ক যে বিষয়টাকে ঘিরে তা কি উপমহাদেশের আপামর মুসলমানদের ইসলাহ ও তরবীয়তের জন্যে অপরিহার্য ছিলো? তাওহীদের রূপতুলে ধরার জন্যে এটাই কি একমাত্র উপায় ছিলো? উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা জাতীয় জীবনের প্রেক্ষিতে এই তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা, সমালোচনার প্রয়োজন ছিলো? অবস্থা দৃষ্টি মনে হয় উভয় পক্ষের আলেমগণ বিরোধের নিষ্পত্তির জন্যে নয়, বরং বিরোধের পরিধি বাড়ানোর জন্যেই

www.pathagar.com

তৎপর ছিলেন বেশী। একথা বললে মোটেই ভুল করা হবে না যে উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর মধ্যে এমন কিছু অসংযত কথা ছিলো যা অসন্তোষ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়। অথচ যথাসময়ে যদি ঐ সমস্ত মন্তব্যগুলো সংশোধন করে নেয়া হতো, কিংবা কম পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করা হতো তা হলে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। দেওবন্দী উলেমাদের মতে হক কথা প্রকাশের জন্যে এসব প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে এই হকের দ্বারা কারা লাভবান হয়েছে? মুসলমান জনগোষ্ঠী এর দ্বারা লাভবান হয়েছে না সার্বিক ক্ষতি টেনে এনেছে? অপর দিকে বেরেলভী আলেমদের মতে নবী প্রেমের দাবী পূরণ করতে গিয়ে তারা এসব করেছেন। কুফুরীর ফতুয়া ও একই লক্ষ্যে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে ও প্রশ্ন করতে হয় যে তারা উম্মতের এই সব বিশিষ্ট উলেমাদের কাফের ফতোয়া দিয়ে কোন প্রেমের প্রমাণ দিয়েছেন? ফতোয়াবাজীতেই কি নবীপ্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়?

উপমহাদেশের আলেম সমাজের বিশেষ দুর্বলতা

উলেমা সমাজই উম্মতের আকিদা ও আমলের রক্ষক ও লালনকারী, তারা মুসলিম জনতার পথ প্রদর্শকের মর্যাদায় সমাসীন। উম্মতে মুহম্মদীর আলেম সমাজের দায়িত্ব পূর্বের উম্মতদের উলেমাদের চাইতে বেশী, কেননা পূর্বের উম্মতদের উলেমাদের পদস্খলনে নতুন নবীর আগমন ত্বরান্বিত হতো, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না তাই ঐসব বিভেদ নিয়েই বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। তাই আলেমদের ভ্রান্তি বা ভুল কর্মপদ্ধতি কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ভ্রান্তি নয়, বরং তা প্রকারান্তরে উম্মতের ভ্রান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তেমনি উলেমাদের বিরোধ বা বিভেদ উম্মতকে বিরোধ ও বিভেদে ঠেলে দেয়। আবার তাদের ঐক্য উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে দেয়। সত্যিকার আলেমগণ যদি ঐক্যের পথে অগ্রসর হন তবে বিভেদপন্থী আলেম নামধারী ব্যক্তিদের ভূমিকা গৌণ হয়ে যেতে বাধ্য। বর্তমানে হক পন্থী আলেমদের ভূমিকা গৌণ হয়ে যাবার ফলে বিভেদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের ভূমিকা মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপমহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, বিশেষ করে উলেমা সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বিচার করে দেখলে উলেমাদের মধ্যে কয়েকটি দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। এইসব দুর্বলতার উল্লেখ তাদের মর্যাদার প্রতি মোটেই কটাক্ষ নয়। তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ রেখেই এগুলোর উল্লেখ করতে চাই এবং আলেম সমাজের প্রতি চিন্তা করে দেখার আহবান জানাই।

০ মত পার্থক্যের ভিত্তিতে কোন আলেমের সার্বিক ঈমান ও আমলের তোয়াক্কা না করে তাকে কাফের আখ্যা দেয়া বা তাকে মুসলমান হিসাবেই স্বীকার না করার প্রবনতা। যেখানে বোখারী ও মোসলেমের হাদীসে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اذا قال الرجل لاخيه يا كـــافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال و الاّ رجعت عليه — (متفق عليه)

(যদি কোন ব্যক্তি তার কোন ভাই (মুসলিম) কে বলে, হে কাফের, তবে সে কথা তাদের দুজনের মধ্যে কারো জন্যে প্রযোজ্য হবে। যদি সে ব্যক্তি সত্যি কাফির হয় তবে সে কাফিরই, অন্যথায় তা তার উপরই ফিরে আসে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফের আখ্যা দেয় সেই কাফির হয়ে যায়।)

কোন ব্যক্তির প্রকাশ্য আমল যদি কুফুরীর প্রমাণ বহন করে তবে বাহ্যিক দিকটার ভিত্তিতে তাকে কাফের বলা সম্ভব, আর যদি তার বাহ্যিক আমল কুফুরী প্রমাণ না করে তবে কি তার ঈমানের অবস্থান সম্পর্কে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে কেউ আসল অবস্থা জানতে পারে? মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং তাদের ঈমানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার প্রতি আল্লাহর রাসুল স্ববিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উলেমারা এসব বিষয়ের হাদীস সমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

কোন মুমিনকে কাফের বললেই সে কাফির হয়ে যায় না। ঈমান ও কুফুরীর ফয়সালা করার মালিক আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর এই ক্ষমতা বা হক কোন মানুষ কি ভাবে ব্যবহার করতে পারে? কাফের ফতোয়া না দিয়ে কি তার ভ্রান্ত ধারনার (তার মতে) শরীয়তের যুক্তি দিয়ে খন্ডন করা যায়না? জনগণকে সে সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া যায়না? আমাদের সলফে সালেহীনরা তো এ ভাবে কোন মুসলমানকে কাফের ফতোয়া দিতেন না। হযরত উসমান (রাঃ) তার উপর হামলাকারীদের বিরূদ্ধে ও কোন শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নেননি তাদের ইসলামকে সম্মান করে। হযরত আলী তার বিরোধীদেরকে কাফের বলেননি। পরবর্তীযুগের ইমামগণ হাদিসের আলোকে তাদেরকে খারেজী বলে ঘোষণা করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে কতো বিভ্রান্ত ব্যক্তি ও গোষ্টির প্রমান পাওয়া যায়, তাদেরকে ও তো কোন ইমাম কাফের বলে চিত্রিত করেননি।

বেরেলভী ও দেওবন্দী উলেমারা যে সমস্ত উলেমাদের কাফের আখ্যা দিয়েছেন তাদের আমল কি সত্য কাফেরের আমল ছিলো? তারা কি সে সব আলেমদের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাদের ঈমানের অবস্থা পরিমাপ করেছেন?

হযরত সাইয়েদ আহাম্মদ শহীদ, মওলানা ইসমাইল শহীদ সারা জীবন ধরে ইসলামের খিদমত করলেন, বক্তৃতা, লিখনী, সংগঠনে ইসলামেরই সার্বিক কল্যাণ সাধন করলেন, এবং কাফেরদের সাথে সম্মুখ জিহাদে জানের নজরানা দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে শহীদ হয়ে গেলেন। এহেন ব্যক্তিদেরকে কাফের বলতে গিয়ে রাসুলেপাকের সব শিক্ষাই কি তারা ভূলে গেলেন? অপরাপর যে সমস্ত উলেমাদেরকে উভয় পক্ষের উলেমারা কাফের আখ্যা দিয়েছেন তাদের ব্যাপারে ও একই কথা প্রযোজ্য নয়

www.pathagar.com

কি? এ প্রসংগে এর চেয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

- দলীয় 'আকাবের' বা বড়দের সীমাতিরিক্ত আনুগত্য। বড় বা বুজুর্গদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্য দেখানো নিঃসন্দেহে ভাল কাজ কিন্তু তারা সমালোচনার উর্দ্ধে নন, তারা মাসুম নন। তাদের সব কিছুই ভালো, তাদের সকল কথা ও কাজকেই যে কোন উপায়ে সমর্থন করতে হবে বা তাদেরকে সমালোচনার উর্দ্ধে রাখতে হবে- এই মানসিকতা ইসলাম বা উম্মাহর জন্যে কল্যানকর নয়। অন্য কথায় কোন ভূল ভ্রান্তি কোন মহান ব্যক্তির মর্যদার পরিপন্থি নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপমহাদেশের বিভিন্ন চিন্তা, মত ও পথের উলেমাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে নিরাশ হতে হয়। এ প্রসংগে ভারতীয় উলেমাদের যে ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে তা কি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেনা? কোন আকাবের বা বুজুর্গের কোন অসংযত মত বা মন্তব্যকে অসংযত মত বলে স্বীকার করে নেয়াকে বেআদবী বলা যায়না, বরং এটাই আমাদের পূর্বসূরীদের পথ। দেওবন্দী, বেরেলভী চিন্তার উলেমাদের যদি এই বিরোধ মিমাংসার জন্যে আহবান করা হয় তবে তাদের জবাব হয় এমনি; আমাদের আকাবের বা বুজুর্গগন যা করেন নি তা আমরা কি ভাবে করতে পারি? আকাবের ভক্তির এমন নজীর বিশ্বের অন্য কোথা ও পাওয়া যায়না। রাজনৈতিক, সামাজিক বা বৈষয়িক সংগঠন সমুহের নেতৃত্বের আনুগত্য ও উলেমাদের আকাবেরদের আনুগত্য এক ধরনের নয়। উম্মাহর ঐক্য ও সংস্কার প্রয়াসই এখানে মুখ্য। পক্ষান্তরে বৈষয়িক সংগঠন গুলোর জন্যে দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থই মুখ্য। যদি উলেমাদের মধ্যে ও দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ সংরক্ষণ মুখ্য হয়ে দাড়ায় তা উম্মাহর জন্যে ভয়াবহ বিভেদ টেনে আনে।

- উলেমাদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর শ্রেষ্টত্বের বড়াই। কথা বার্তায়, আলাপ আলোচনায়, বক্তৃতায়, লিখনীতে এই মানসিকতা প্রকাশ পেয়ে যায়। নিজেদের মাদ্রাসা, নিজেদের কেন্দ্র, নিজেদের খানকাহ অন্য সকল মাদ্রসা, কেন্দ্র সমুহ ও খানকাহ সমুহের চাইতে শ্রেষ্ট এ কথা প্রমাণ করতে যৌক্তিক বা অযৌক্তিক প্রমাণাদী তুলে ধারাকে তারা তাদের দায়িত্ব মনে করেন। এই আনুগত্যের ধারা কখনো পরিবর্তীত হয়না। এই কথা অনস্বীকার্য যে দেওবন্দের দ্বীনি প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশের প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র, এখান থেকে অসংখ্য আলেম বেরিয়ে উপমহাদেশের সর্বত্র দ্বীনি শিক্ষার সম্প্রসারণে নিয়োজিত রয়েছেন, অনেক স্বানামধন্য আলেম এখান থেকেই পয়দা হয়েছেন। এই ইলমী প্রাধাণ্য সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু এই ইলম নিয়ে যখন গর্ব করা হয়, নিজেদেরকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, তখন এই মর্যাদা খাটো হয়ে যায়, অপরাপর উলেমাদের সাথে আবার অন্যান্য মাদ্রাসা সমুহের সাথে অহেতুক বিবাদ শুরু হয়ে যায়। তারা ও তখন তাদের প্রাধান্যের অন্য একটা পথ বেছে নেয়।

www.pathagar.com

বেরেলভী উলেমারা তেমনি তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠের বড়াই করেন। তারা উপমহাদেশের সাধারন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে অবাস্তব ও অযোক্তিক ভাবে তাদেরকে বেরেলভী চিন্তাধারার সমর্থক মনে করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবী করেন এবং তাদের আকিদাকেই তারা একমাত্র আহলুল সুন্নত অন জামাত বলে বড়াই করেন এবং যারা তাদের আকিদা ও আমলে এরমত নয় তাদেরকে তারা সুন্নাত অল জামায়াত ভুক্ত বলে মেনে নিতে রাজী নন, এই সম্পর্কে হাদীসে রাসুলের (السواد الاعظم) এর যুক্তি তুলে ধরেন। হক পন্থি জামাতকে রাসুলে পাক সুয়াদে আজম বা মহান 'জনগোষ্ঠী' বলে অভিহিত করেছেন। তাদের এই যুক্তি মোটেই ঠিক নয়, কারণ এর অর্থ সংখ্যাধিক্য নয়। হাদিসে গুনগত মহত্বের কথাই বলা হয়েছে, সংখ্যাগত আধিক্য নয়। হাদিসের অর্থে হক পন্থি জামাত একটি মহান জামাত- মহান জনগোষ্ঠী। সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের আদর্শ মহান ও ভারী। সংখ্যাধিক্যকে কোন দিনই হকের মানদন্ড করা হয়নি। ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে হক পন্থি লোকগণ কোন দিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন না, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ বাতিল শক্তির বিরূদ্ধে হক পন্থি লোকেরা অকুতোভয়ে মোকাবিলা করে হকের ঝান্ডাকে সমুন্নত রেখেছেন। আজও উম্মতের অধিকাংশ লোকেরা ইসলামী শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলেনা। তাই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হকের মানদন্ড হয়ে যায় তবে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার কোন প্রয়োজনীয়তা থকেনা। কোরআন হাদিসের আলোকে ও সাহাবায়ে কেরামদের মূলনীতির ভিত্তিতে আকিদা ও আমলে বিভিন্ন ফিরকার মধ্যে মধ্যপন্থি মুসলমানদেরকে আহলুল সুন্নত অল জামাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোন বিশেষ ফিকাহকে ও হকের মানদন্ড করা যাবেনা। হানাফী ফিকাহর অনুসারীদের সংখ্যা বেশী বলে শুধু তারাই সুন্নত অল জামায়াত বলে দাবী করা ও মূর্খতার শামিল। শুধু যদি বেরেলভীদের সমর্থকগণই বা হানাফী মযহাবের অনুসরণকারী গনই যদি আহলুল সুন্নত অল জামাত হয়ে থাকেন তবে শুধু উপমহাদেশেরই মধ্যে আহলুল সুন্নতে অল জামায়াত সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং সারা দুনিয়ার সব মুসলমানই হক পন্থি সুন্নী থেকে খারিজ হয়ে যান। কিন্তু এই মূর্খতাপূর্ণ দাবী ও করা হয় গোষ্ঠীগত বা দলীয় শ্রেষ্ঠত্বের বড়াইয়ের জন্যে।

বিভিন্ন চিন্তা, মত, আকিদা ও ফিকাহর ভিত্তিতে স্বতন্ত্র মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। ভারতীয় উলেমাদের মধ্যেই এই দূর্বলতা দেখা যায়। দল-মত ও ফিরকাহর জন্যে নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোন মসজিদকে এ উদ্দেশ্যে দখল করা উপমহাদেশের এক শ্রেণীর উলেমাদের নিয়মে পরিণত হয়েছে। এক গ্রুপের ইমামের পেছনে অন্য গ্রুপের সমর্থকগণ নামাজ আদায় করা ও জায়েজ মনে করেন না। মসজিদে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় যেন অন্য মতের লোকদের পক্ষে সেখানে নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়। মসজিদ আলাদা করার মাধ্যামে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করা হচ্ছে। বিশ্বের অপরাপর দেশ সমুহে এই

www.pathagar.com

মনোভাবের নজীর পাওয়া মুশকিল। সুরায়ে তওবার ১০৬ আয়াতে আল্লাহ পাক যে মসজিদে যেরারের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে এর একটি বলা হয়েছে (و تفريقا بين المؤمنين) মুমীনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভিন্ন মসজিদ করার সমর্থক কোন আলেম কি বলতে পারবেন যে তার লক্ষ্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি নয়? যদি তাই হয় তবে কি সেই ভিন্ন মসজিদটি আল্লাহর ঐ হুকুমের আওতায় আসেনা? অন্ধ আনুগত্যের এই মানসিকতাই এই অনর্থের মুল। বিবাদ নিরপেক্ষ আলেম ও আছেন তবে তারা এই বিবাদের ব্যপকতায় নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেন। নামাজ আদায় করতেই ঐক্য অনুপস্থিত সেখানে ইসলামী ঐক্যের আশা করা সহজ সাধ্য নয়।

বিভেদের মৌলিক কারণগুলো আলোচনা করতে গিয়ে এতক্ষণ যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকেই বুঝা যায় যে বিভেদের এ পর্যায় কোন মৌলিক বিষয় ভিত্তিক নয়, কিন্তু উলেমা সমাজের উপরোক্ত দূর্বলতা গুলোর কারনে এ রিরোধ মিমাংসিত হতে পারেনি। বরং দেড়শত বছরের ব্যবধানে এই বিরোধ মৌলিক বিষয় ভিত্তিক বিরোধে পর্যাবসিত হয়েছে। এই বিরোধ সৃষ্টিতে উলেমাদের অনমনীয় মনোভাব গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আলেম সমাজই সমস্যা সৃষ্টি করেন এবং তাদের দ্বারই সমাধানও সম্ভব। কিন্তু এজন্যে সুমতির প্রয়োজন। মুসলিম উম্মাহ এই সুমতির অপেক্ষায় রয়েছে।

আকিদাগত বিরোধের আর একটি অধ্যায়।

উপমহাদেশে বহুলভাবে প্রচলিত রসম- রেওয়াজকে ইসলামী ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত করন থেকে বেরেলভী আন্দোলনের যাত্রা, অতঃপর এই আন্দোলন কিছু কিছু আকিদা গত বিরোধের পথে ধাবিত হয়। দেওবন্দের আলেমদের বিরুদ্ধে তাদের ফতোয়ার মূল অভিযোগ ছিলো- রাসুলেপাকের মর্যাদাহানী। তাই রাসুলে পাকের মর্যাদা, তার সম্মানও পরিচয় নিরূপন করতে গিয়ে তারা নতুন আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির জম্ম দেন এ সব বিষয়ে আসলে বিতর্ক সৃষ্টির কোন অবকাশই ছিলো না, কেননা এ সব প্রশ্নগুলো এতোই মৌলিক যে এ সম্পর্কে কোরআন হাদিসের সুস্পষ্ট নির্দেশ, সাহাবা কেরামদের আকিদা, বিশ্বাস, তাবেয়ীদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা ইসলামের ইতিহাসের অসংখ্য ইমাম ও মোজতাহীদদের সুস্পষ্ঠ ব্যাখা পাওয়া যায়। এ সব বিষয়ে উম্মতের ইতিহাসে কোন দিনই কোন বিতর্ক ছিলোনা। নবী পাকের মানও মর্যাদা বা তার পরিচিতি ইসলামে একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়, যা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু বেরেলভী উলেমারা এ সব প্রতিষ্ঠিত বিষয় সমুহে তাদের নব্য মতামতের সংযোজন করেছেন, সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. রাসুলে পাক শুধু মহামানব নন, তিনি অতিমানব।

২. তিনি আদম ও বনী আদমের মতো মাটির সৃষ্টি নন, তিনি নূরের সৃষ্টি।

www.pathagar.com

৩. তিনি গায়েবের আলেম।
৪. তিনি হাযের ও নাযের, সর্বকালে ও সর্বস্থানে তিনি হাজীর হতে পারেন বা সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

নবী শুধু মহামানব নন - অতি মানব।

কোরআন হাদিস ও ইসলামী আকায়েদ ও বিশ্বাস সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানের অধিকারী যে কোন ব্যক্তিই এই আকিদার ভ্রান্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইলমের খোলসে এই চরম অতি রনজিত মতবাদের জোরে শোরে চর্চা চলছে। আলেম বলে খ্যাত ব্যক্তিরা এই আকিদা বিশ্বাসের উপর নবী প্রেমের মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা এই জাহেলী আকিদার প্রতিবাদ করেন, তাদের অন্তরে নবী প্রেমের অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করতে ও দ্বিধা করছেন না। এবং এই ভ্রান্ত আকিদাকে তারা আহলুল সুন্নতে আল জামায়াতের সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর নবী রাসুলদের সম্পর্কে এমনি বাড়াবাড়ি কোন নতুন কাজ নয়। অতীতের নবী রাসুলদের সম্পর্কে ও এই ধরনের জাহেলী আকিদার প্রমান পাওয়া যায়। প্রতিযুগেই জাহেলী আকিদার লোকেরা এই কথা মেনে নিতে পারেনি যে তাদের মধ্যে থেকেই একজন রক্ত মাংসের মানুষকে আল্লাহ নবী বা রাসুল হিসাবে নির্বাচন করেছেন। যারা সাধারন মানুষের মতোই চলাফেরা করেন, খাদ্যখান, পানি পান করেন, বিয়ে সাদী করেন, সন্তান সন্ততি নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করেন। তাদের ধারণা মতে নবী কোন অতি মানবীয় সত্বা হবেন ফেরেস্তা কিংবা মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কোন সৃষ্টি হবেন। কিন্তু তাদের ধারনার বিরুদ্ধে যখন নবী মানুষ হিসাবেই নবুয়তী দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যান, তখন তার উম্মতের পরবর্তী পর্যায়ের জাহেলী আকিদার লোকেরা নবী প্রেমের প্রমাণ দিতে গিয়ে দাবী করতে থাকে যে নবী মানুষ ছিলেন না, বা নবী মাটির সৃষ্টি মানুষ নন, বরং ফেরেস্তাদের মত নূরের সৃষ্টি। এমনিভাবে তাকে আল্লাহপাকের সিফাত ও ক্ষমতায় অংশীদার বানিয়ে নেয় ও নবীকে গায়েবের আলেম ও হাজের নাজের হিসাবে বিশ্বাস করতে থাকে। অতীতের অনেক উম্মত তাদের নবীদের সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর সন্তান বা অস্তিত্বের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নবী সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদার ফলে হযরত উযায়েরের উম্মতগণ তাকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতো। হযরত ঈসা (আঃ) এর উম্মতগণ তাকে ও আল্লাহর পুত্র হিসেবেই বিশ্বাস করতো। কোরআনে তাদের সম্পর্কেই এরসাদ হয়েছে।

وقالت اليهود عزير ابن الله– (التوبة)

(ইহুদীরা বলতো উযায়ের আল্লাহর পুত্র)

وقالت النصارى المسيح ابن الله – (التوبة)

www.pathagar.com

(নাসারাগণ বলতো যে মসিহ (ইসা) আল্লাহর পুত্র)
তারা হযরত ঈসা ও হযরত মরিয়মের পর আল্লাহপাককে তৃতীয় নম্বরের খোদা বলে দাবী করতো।

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثة — (المائدة)

(নিশ্চয়ই তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলতো যে আল্লাহ তিন খোদার মধ্যে তৃতীয়)
তাদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করে নবী পাক সঠিক আকিদার শিক্ষা দিয়েছেন। এরসাদ হয়েছে;

لاتطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله – (بخارى)

(আমার সম্পর্কে তোমরা ঐ রকম বাড়াবাড়ি করো না, যেমন নাসারাগণ ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে করেছে, তোমরা আমার সম্পর্কে বলো যে আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।)
ইহুদী নাসারাদের অনুকরণ ও অনুসরণের ভয়াবহতা ও উম্মতে মোহাম্মদীর সাধারন মানসিকতা উল্লেখ করা হয়েছে নিচের হাদীসে;

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا فى جحر ضب لاتبعتموه و قلنا يارسول الله اليهود و النصارى قال فمن ؟– (بخارى)

(তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বতন উম্মতদের অনুসরণ করবে প্রতি পদে পদে (তোমাদের অনুকরণ মানসিকতা এতো ব্যাপক হবে যে) যদি তারা কোন গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করেছিলো, তবে তোমরা তারও অনুসরণ করো। অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী ইহুদী ও নাসারাদের ব্যাপকভাবে অনুকরণ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও নাসারা? জবাব দিলেন, আর কারা? উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস থেকে নবী রাসুলদেরকে অতিমানবীয় স্বত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার ভয়ানক পরিণতির কথা বুঝা যায়।

বান্দা ও খলিফার মর্যাদা

এই ভ্রান্তির মূল কারণ হলো আল্লাহর বান্দা হওয়া, খলিফা হওয়া, মানুষের ইবাদাত বন্দেগীর সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। নূরের সৃষ্টি ফিরিস্তাদের কাজ সম্পর্কে কোরআনে মজিদে বলা হয়েছে;

و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك – قال انى اعلم مالاتعلمون – (البقرة)

(ফিরিস্তারা বললো, আমরাই তো আপনার প্রশংসার সাথে আপনার স্তুতি করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি (তাই বনী আদমকে 'বান্দাহ' বা 'খলিফা' হিসেবে সৃষ্টির প্রয়োজন কি?) আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।)

www.pathagar.com

আনুগত্য প্রদর্শনের ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা থাকা সত্বেও বান্দা যখন তার খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে ইবাদত বন্দেগীর হক আদায় করে, তখন নূরের তৈরী ফিরিস্তাদের চাইতেও তার মর্যাদা বেড়ে যায়। মাটির সৃষ্টি হযরত আদমকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ ফিরিস্তাদের কাছে এই সত্য তুলে ধরলেন। এখানে একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহর প্রশংসার তসবিহ ও তার পবিত্রতা ঘোষণা করাই ইবাদতের সব কিছু নয়। শুধু এগুলোই যদি ইবাদত হতো তবে আর মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো না, ফিরিস্তারাও একাজটি আঞ্জাম দিতে পারতেন। ইবাদতের আসল কাজ হলো আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া। এই দায়িত্বের কারণেই সে নূরের সৃষ্টি ফিরিস্তাদের চাইতেও মহান। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই মাটির সৃষ্টি মানুষের মধ্য থেকেই যখন আল্লাহ্ একজন নবী বা রাসুল নির্বাচন করেন, অতঃপর তিনি মানুষ হওয়া সত্বেও সকল মানবীয় দুর্বলতার উর্দ্ধে উঠে নিস্পাপ জীবন যাপন করেন এবং নৈতিকতার উন্নততম নমুনা প্রতিষ্ঠা করেন যা ফিরিস্তাদের কাছেও ঈর্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তখন মাটির তৈরী ঐ মানুষের মর্যাদা নূরের তৈরী ফিরিস্তাদের চাইতেও মহীয়ান হয়ে যায়। এমনিভাবে আমরা দেখতে পাই যে সারা জাহানের নবীদের সরদার, আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মানবীয় শরীর নিয়ে আরশে মোয়াল্লাহর এমন স্থানে উপনীত হন, যেখানে আল্লাহর নিকটতম কোন ফিরিস্তাদের পক্ষেও পৌঁছা সম্ভব ছিলো না। এর দ্বারা কি নূরের সৃষ্টির চাইতে মাটির সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হয় না? যদি নবীপাক মানুষ না হতেন, নূরের সৃষ্টি অতিমানব সত্তা হতেন, আর তিনি মানুষের সমাজে অতি মানবীয় চরিত্রের স্বাক্ষর রেখে যেতেন, তবে কি তাঁর এই মহীয়ান রূপ দেখতে পাওয়া যেতো?

এজন্যেই রাসুলে আযম তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, "তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল বলো," অসংখ্য আয়াতেও হাদীসে নবীজীর পরিচয় এভাবেই তুলে ধরা হয়েছেঅ নিচের কয়েকঠি আয়াত উদাহরণ হিসাবে যথেষ্ট।

سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى— (بنى اسرائيل)

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا — (الكهف)

و ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله — (البقرة)

ان كنتم آمنتم بالله و ماانزلنا على عبدنا يوم الفرقان — (الانفال)

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি রাসুলে আযমকে আল্লাহর বান্দা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসুলে পাক নবী পরিবারের সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ সদস্য। পৃথিবীর সমস্ত নবী ও রাসুলগণ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ মাটি দিয়ে বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন। নবী পাক নবী পরিবারের সদস্য হিসাবে মানুষ ছিলেন।

www.pathagar.com

রাসুলেপাক যে মানুষ ছিলেন, কোরআনে মজিদ তা স্পষ্ট করে দিয়েছে এভাবে;

قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد - (الكهف)

(হে নবী বলে দিন, আমি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছু নই (কিন্তু) আমার উপর অহী নাযিল করা হয়, তোমাদের মাবুদ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়।)

মানুষের সমাজে একমাত্র অহীই নবীর মর্যাদা চিহ্নিত করে। আর অহী এমন একটি মর্যাদা, যার সাথে আল্লাহর আর কোন নেয়ামতের তুলনা হয় না। মানব জাতির জন্যে অহীর চাইতে বড় বা মহান কোন তোহফা হতেই পারে না। আর যার উপর এই অহী নাযিল হয় তিনি মানুষ হওয়া সত্বে ও আল্লাহর নবী বা রাসুল হয়ে যান। পূর্বের নবী রাসুলগন তাদের কওমের প্রতি রাসুল হিসাবে প্রেরীত হতেন, পক্ষান্তরে শেষ নবী রাসুলে আযম সারা বিশ্ববাসীর নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। তাই তার কাছে যে অহী নাযিল হয়েছে, তার মর্যদা ও স্বাতন্ত্রতা গভীর উপলব্ধির বিষয়। এই উপলব্ধি ছিলো বলেই রাসুলে পাকের তিরোধান সাহাবাদের কাছে সব চেয়ে বড় বিপদ ছিলো। হযরত উম্মে সালমার ভাষায় নবী পাকের তিরোধান এতো বড় বিপদ যে তা মনে পড়লে অপরাপর সকল বিপদ সহজ বলে মনে হয়। মদীনার অলীতে গলীতে মুসলমানদের মধ্যে শোকের বন্যা বয়ে যায়, ইতিহাসে যার নজীর নেই। হযরত উমর ফারুকের মতো বলিষ্ঠ মানুষ ও রাসুলে পাকের ইন্তেকালের খবর স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেন নি। সহাবাদের শোকের বহিঃপ্রকাশ ও তার মূল কারন হযরত উম্মে আইমানের (রাঃ) মন্তব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাসুলের ইন্তেকালের প্রায় এক মাস পরে ও তাকে রোদনরতা দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কারণ সম্পর্কে, তিনি জবাব দিলেন, আমি অবশ্যি জানতাম যে নবী পাক এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন, কিন্তু আমি এজন্যে কাঁদছি যে তাঁর ইন্তেকালে পৃথিবীর সাথে অহীর সম্পর্ক চিরদিনের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। (سيرة النبوية لابن كثير) তাই অহীর মর্যদার চাইতে উন্নততর কোন মর্যাদার কল্পনা ও করা যায়না। অহীর ধারক হওয়াই এমন একটি মর্যাদা যা তাকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে প্রমাণ করে।

নবীগণ যে মানুষ ছিলেন, তারা যে অতিমানব ছিলেন না বা তারা নূরের তৈরী ফিরিস্তা নন বা গায়েবের আলেম নন, এ সম্পর্কে কোনআনে মজিদে কোন অস্পষ্টতা রাখা হয়নি একটুকুও। নিচের আয়াতগুলো প্রনিধানযোগ্য;

و اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين - فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين - (ص)

(যখন তোমার রব ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ তৈরি করতে যাচ্ছি, অতঃপর যখন আমি তাকে তৈরী করে ফেলি এবং আমার রুহ থেকে ফুৎকার করি, তখন সবাই তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে গেলো।)

www.pathagar.com

এর থেকে প্রমাণ হয় যে ইসলামের প্রথম নবী মানুষ ছিলেন এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
এখানে আরো কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি, এরসাদ হয়েছে;

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم – يريد ان يتفضل عليكم و لوشاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى أبائنا الاولين – (المومنون)

(হযরত নূহকে অস্বীকার কারী সরদারগণ বললো, এই ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কেউ নয়, সে তোমাদের মধ্যে প্রাধাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যদি আল্লাহ তার রাসুল পাঠাতে চাইতেন তবে নিশ্চয়ই ফিরিস্তাকে (নবী বানিয়ে) পাঠাতেন। (মানুষ নবী হতে পারে এমন কথা তো) আমরা আমাদের বাপ দাদার আমল থেকে কখনো শুনিনি।)

و قال الملأ من قومه الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخرة و اترفنهم فى الحيواة الدنيا ، ما هذا الا بشر فى مثلكم يأكل مما تأكلون منه و يشرب مما تشربون ، و لئن أطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون – (المومنون)

(হযরত হুদকে ঐ সমস্ত সরদারগণ যারা কুফুরী করেছিলো, আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করেছিলো, যাদেরকে পৃথিবীর জীবনে আরাম আয়াশ দিয়েছিলাম, বললো, এই ব্যক্তি একজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নয়, সে তোমাদের মতোই মানুষ, তোমরা যেমন খাদ্য গ্রহন করো, সেও তা গ্রহণ করে, তোমরা যা পান করো সেও তাই পান করে। (এমতোবস্থায়) যদি তোমাদের মতো একজন মানুষকে আনুগাত্য করো তবে তোমরাই ক্ষতিগস্থ হবে।)

قالو انما انت من المسحرين ، و ما انت الا بشر مثلنا و ان نظنك لمن الكاذبين – (الشعرأ)

(সামুদ কওমের লোকেরা হযরত সালেহকে বললো, তুমি তো যাদু গ্রস্থ মানুষ, তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কেউ নও, তাই আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।)

فقالوا أنومن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون – (المومنون)

(হযরত মুসা ও হারুনের কওমগণ তাদেরকে বললো, আমরা কি তোমাদের মতো দুইজন মানুষের উপর ইমান আনবো, যাদের কওম (বনি ইসরাইল) আমাদেরই দাসত্ব করে।)

قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم و لكن الله يمن على من يشاء من عباده – (ابراهيم)

(পৃথিবীর সমস্ত নবী রাসুলগণ বললেন, আমরা তোমাদের মতোই মানুষ বই কিছু নই, কিন্তু আল্লাহপাক তার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান মর্যাদা দান করেন।)

و ما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و ما جعلنهم جسدا لايأكلون الطعام و ما كانوا خالدين – (الانبيأ)

www.pathagar.com

(হে নবী আপনার পূর্বে ও আমি মানুষদেরকেই নবী বানিয়েছি, যাদের উপর আমি ওহি নাযিল করেছি, যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে আহলে জিকর (আসমানী কিতাবের ধারক) দের কাছে জিজ্ঞাসা করো, তারা ভাল করেই জানে যে তাদের নবীদের জন্য আমি এমন দেহ সৃষ্টি করিনি যে তাদের খাবার খেতে হবেনা, কিংবা তাদেরকে আমি চিরঞ্জীবি করে সৃষ্টি করিনি।)

অর্থাৎ আহলে কিতাবগণও ভাল করে জানে যে অতীতের সকল নবী ও রাসুলগণ মানুষই ছিলেন।

قل لو كان فى الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا- (بنى اسرائيل)

(হে নবী, আপনি বলে দিন, যদি পৃথিবীতে ফিরিস্তাগণ নির্বিবাদে চলাফেরা করতো, তবে তাদের কাছে ফিরিস্তাদেরকেই নবী বানিয়ে পাঠাতাম।)

অর্থাৎ এই পৃথিবী যদি ফিরিস্তাদের আবাসস্থল হতো, তবে ফিরিস্তাই নবী হতেন, কিন্তু পৃথিবী মানুষের জন্য, তাই তাদের হেদায়াতের জন্য মানুষই নবী হবেন।

ولقد ارسلنا رسولا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية - (الرعد)

(হে নবী, আপনার পূর্বে ও আমি অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, তাদেরকে আমি স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি ও দিয়েছি।)

অর্থাৎ তারা মানুষ ছিলেন, পরিবার পরিজন সহ জীবন যাপন করতেন। তারা অতি মানব ছিলেন না।

و لااقول لكم عندى خزائن الله و لااعلم الغيب و لااقول انى ملك و لا اقول للذين تزدرى اعينكم لن يوتيهم الله خيرا - الله اعلم بما فى انفسهم انى اذا لمن الظالمين - (هود)

(হযরত নুহ বললেন, আমি তোমাদেরকে বলিনা যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে, আমি এ কথা বলিনা যে আমি গায়েবের ইলম রাখি, এটা ও বলিনা যে আমি ফিরিস্তা, আমি এ কথা ও বলিনা যে তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত (দরিদ্র ঈমানদার লোকেরা) আল্লাহ তাদের কোন কল্যান দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললেই আমি হবো জুলুম কারী।)

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله و لااعلم الغيب ولا اقول لكم انى ملك - ان اتبع الا ما يوحى الىّ قل هل يستوى الاعمى و البصير أ فلا تذكرون - (الانعام)

(হে নবী, আপনি বলে দিন, (হযরত মুহাম্মদ (সঃ)) আমি তোমাদেরকে বলিনা যে আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে, না আমি বলি যে আমি গায়েবের আলেম, আমি এ ও বলিনা

www.pathagar.com

যে আমি ফিরিস্তা, আমি তো শুধু অহীর আনুগত্যে করি, যা আমার উপর নাযিল করা হয়, অন্ধ ও চক্ষুস্মান লোক কি সম পর্যায়ের হতে পারে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবেনা?)

و قالو مال هذا الرسول يأكل الطعام و يمشي فى الاسواق ، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيـــرا

– (الفرقان)

(লোকেরা বলতো, এ কেমন নবী (শেষ নবী) যিনি খাদ্য খান, বাজারে চলাফেরা করেন, (রুজী রোজগারের চেষ্ঠা করেন) তার কাছে কেন ফেরেস্তা পাঠানো হলোনা যে তার সাথে থাকতো ও অমান্য কারীদের শাসন করতো।)

و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الاّ انهم ليأكلون الطعام و يمشون فى الاسواق و جعلنا بعضكم لبعض

فتنة أتصبرون – و كان ربك بصيرا – (الفرقان)

(হে নবী আপনার পূর্বে আমি যতো রাসুলই পাঠিয়েছি তারা সবাই খাবার খেতেন, বাজারে চলাফেরা করতেন। আসলে আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করেছি, দেখি তোমরা সবর কর কিনা, আপনার রব সব কিছু দেখেন, (ধনী, দরিদ্র, সবল দূর্বল সৃষ্টি করে পরীক্ষা করেছেন।)

মৌলিকত্বের অধিকারী এই বিষয়ের উপরে কোনআনে মজিদে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ সব আয়াত থেকে সুস্পষ্ঠ ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে পৃথিবীর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তথা সরোয়ারে আলম হযরত মুহম্মদ রাসুলুল্লাহ (সঃ) মানুষই ছিলেন। প্রতি যুগেই জাহেল ব্যক্তিরা এই সত্যকে অস্বীকার করতো। এতে নবীদের মর্যাদা বাড়ানো হতো না, বরং তাদের স্বকীয় মর্যাদায় তাদেরকে অস্বীকার করা হতো প্রকারান্তরে। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে প্রতি যুগে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষের সমাজে কোন বাহকের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয় নি। যদি তিনি পৌঁছে দেয়াই যথেষ্ট মনে করতেন তবে কোন ফিরিস্তার দ্বারা তার বিধান পাঠিয়ে দিতেন, তখন হয়তো মানুষ বলতো যে ফিরেস্তাদের দ্বারাই এই বিধান মেনে চলা সম্ভব, যারা খাদ্য খায়না, ঘুমায় না, তাদের রুটি রুজীর চিন্তা করতে হয় না, মানবীয় কোন দূর্বলতা তাদের নেই, আমরা মানুষ কি এই বিধান মেনে চলতে পারি? কিন্তু আল্লাহপাক প্রতি যুগে মানুষের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়ে বাস্তবে আনুগত্যের আদর্শ তুলে ধরেছেন। যারা ছিলেন মানুষ, মানুষের সকল বৈশিষ্ট তাদের ছিলো, তারা মানবীয় দূর্বলতার উর্দ্ধে ছিলেন না। কিন্তু অহীর মযার্দায় সমাসীন হবার পর তারা একাধারে মানুষ ও নবীর সমন্বিত সত্বায় পরিণত হয়ে যান, যাকে বাস্তবে অনুসরণ করা যায়। তাই মানুষের সমাজে মানুষের জন্যে মানুষ নবী হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। মানুষের পক্ষে নবী হওয়া যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি নবীর জন্যে মানুষ হওয়া কোন মর্যাদা হানীকর নয়। নবী হচ্ছেন মানবীয় বৈশিষ্ট ও নবুয়তী মর্যাদার সমাহার। মানব সমাজকে হেদায়েতের পথ দেখানোর এটাই খোদায়ী ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে নবী ও রাসুলদের তিরোধানের পরবর্তী পর্যায়ে তাদের অতিমানব বলে আখ্যায়িত করা হয় প্রথমতঃ নিছক নবী প্রেমের আতিশয্যে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বিশ্বাস এসে যায় যে নবী অতিমানব ছিলেন, তখনই শুরু হয় ঈমানের বিপর্যয়। কোরআনের যে সমস্ত আয়াত সমূহে ও হাদীসে নবীকে মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। শব্দের বাহ্যিক অর্থের বর্হিভূত, সাহাবায়ে কেরাম বা উম্মতের প্রথম যুগের মুফাসসীরদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার বাইরে নতুন অর্থ বের করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। একেই বলা হয় কেরাআনের আর্থিক বিকৃতি। পরিণতিতে নবী রাসুলগণ বাস্তবে অনুরণীয় আদর্শ থাকেন না, তাদের জীবনের সমস্ত কাজকে অতিমানবের কাজ বলে ভক্তি অর্ঘই পেশ করা হতে থাকে। এভাবে তার ছেড়ে যাওয়া আদর্শ শুধু আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়, উম্মতের বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন মোটেই থাকে না। নবী প্রেম কথায় ও কাগজে প্রকাশ পায় মাত্র। অন্তরের প্রেম কাজে প্রকাশ পায় না। আর যখন নবীপ্রেম অন্তর থেকে বিদায় নেয়, তখন এসে যায় মুখে আর কাগজে। পূর্ববর্তী উম্মতদের ইতিহাস আমাদের সামনে এই সত্যই তুলে ধরে। আজ যারা নবী প্রেমের নামে এই মতবাদের প্রচার করছেন, তারা এই কাজের পরবর্তী ফলাফলের কথা চিন্তা করে দেখেছেন কি?

নবুয়তী নূরের তাৎপর্য

হযরত আদম ও মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। সমস্ত নবীগণ মানুষ ছিলেন তাই তারাও সৃষ্টি হয়েছেন মাটি থেকেই। পক্ষান্তরে আল্লাহপাক জ্বীন সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে। ইবলিস ও মূলতঃ জ্বীন ছিলো তাই সেও আগুনের সৃষ্টি। আল্লাহ তাঁর আজ্ঞাবহ ফিরিস্তাদের সৃষ্টি করেছেন 'নূর' থেকে। মাটি স্থুল ও জড় পদার্থ তাই মাটি থেকে সৃষ্টি দৃশ্যমান হয়ে থাকে। 'ইনস' (মানুষ) শব্দের অর্থ সমূহের মাঝে একটা অর্থও তাই, অর্থাৎ দৃশ্যমান সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আগুন ও নূরের সৃষ্টি হয়ে থাকে অদৃশ্যমান, জ্বীনের শাব্দিক অর্থও তাই। জ্বীন ও ফিরিস্তাগণ আসলে অদৃশ্যমান। যা দৃষ্টিগোচর হয় তা পরিবর্তনশীল রূপগুলোর মধ্যে একটা রূপমাত্র। রাসুলেপাক একজন মানুষ হিসাবে তার স্বীয় অবয়বে দৃশ্যমান ছিলেন, নূরের তৈরী সৃষ্টির ব্যতিক্রমধর্মী। তাই দৈহিকভাবে তাকে নূরের সৃষ্টি বলে দাবী করা শুধু অযৌক্তিকই নয় বরং চরম মূর্খতা। নবুয়তী নূরের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই এই বিভ্রান্তির কারণ। কোরআনে মজিদের অনেক আয়াতে দ্বীনে ইসলামকে 'নূর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতকে 'জুলুমাত' বা অন্ধকার বলা হয়েছে। এমনিভাবে কোন কোন আয়াতে কোরআনে মজিদকে নূর বলা হযেছে, তেমনি কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ তৌরাত ও ইঞ্জিলকেও নূর বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কোথাও একই ভঙ্গিতে রাসুলে আযমকে ও 'নূর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূর'

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ হলো আলোক বা 'রশ্মি', এই নূরের দুই ধরনের তাৎপর্য রয়েছে। একটি হলো অনুভবযোগ্য নূর বা নূরের বস্তুগত তাৎপর্য। আর অপরটি হলো নূরের মানগত তাৎপর্য। অর্থাৎ যার অর্থ হলো হিদায়াতের নূর, নূরানী ফলাফল বা নূরানী তাৎপর্য। একদিকে জাহেলীয়াত বা গোমরাহীকে অন্ধকার বলা হয়েছে, অপরদিকে হিদায়াতকে নূর বলা হয়েছে, কোরআন, তৌরাত ও ইঞ্জিলের হেদোয়াতের বাণীকে নূর বলা হয়েছে। রাসুলেপাকের অবদান ও হেদায়েতী অস্তিত্বকে নূর বলা হয়েছে, যার অর্থ অনুভবযোগ্য বা বস্তুগত নূর বা আলো নয়।

এ সম্পর্কে কোরআনে মজিদের নিচের আয়াতগুলো প্রনিধানযোগ্য;

الله و لى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون – (البقرة)

(আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের অলী যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে (কুফুরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোর (নূর) দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে তাদের অলী হলো শয়তান, শয়তানগণ তাদেরকে আলো (নূর) থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। তারাই জাহান্নামী এবং চীরদিন সেখানেই থাকবে।)

الر ،كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد – (ابراهيم)

(এটা একটি কিতাব, যা আপনার প্রতি এ জন্যে অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন তাদের রবের নির্দেশে বিজয়ী ও প্রশংসীতের পথে।)

يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لوكره الكافرون – (الصف)

(কাফেরগণ তাদের এক ফুৎকারে আল্লাহর নূর (ইসলাম) কে নিভিয়ে দিতে চায় (কিন্তু) আল্লাহ তার (দ্বীনের) নূরকে পূর্ণ করবেনই, যদি ও কাফেরগণ তা অপছন্দ করে।)

يا ايها الناس قدجاءكم برهان من ربكم و انزلنا اليكم نورا مبينا – (النساء)

(হে লোকেরা, নিশ্চয়ই তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জল আলোক রশ্মি অবতরণ করেছি।)

فالذين امنوا به وعزروه و نصروه و اتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون – (الاعراف)

(অতঃপর যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং নূরের (কোরআনের) অনুসরণ করেছে, যা তার কাছে অবতরণ করা হয়েছে, তারা সফল কাম হবে।)

www.pathagar.com

انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور - (المائدة)

(নিশ্চয় আমি তৌরাত নাযিল করেছি, যার মধ্যে হিদায়াত ও নূর রয়েছে।)

و اتيناه الانجيل فيه هدى و نور- (المائدة)

(আমি ঈসাকে ইঞ্জিল (কিতাব) দিয়েছি, যার মধ্যে হিদায়াত ও নূর রয়েছে।)

قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس - (الانعام)

(হে নবী বলুন, কে সেই কিতাব নাযিল করেছেন যা মুসাকে দেয়া হয়েছে, যা মানুষের জন্যে হেদায়াত ও নূর ছিলো।)

قد جاء كم من الله نور و كتاب مبين (المائدة)

(নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ এক নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।)

আয়াতে উল্লেখিত নূর থেকে কোন কোন মোফাসসীর হেদায়েতের নূর হিসাবে নবী পাক কে মনে করেছেন আবার কেউ কেউ নূর ও কিতাব একই অর্থবোধক মনে করেছেন। নবীকে নূর সে অর্থেই বলা হয়েছে যে অর্থে কিতাব ও দ্বীনে ইসলামকে নূর বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাসুলেপাক নূরে হিদায়াত ছিলেন। যার হিদায়াতে সারা বিশ্বে হিদায়াতের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলোতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আল্লাহপাক একাধারে একই তাৎপর্যে দ্বীনে ইসলাম, তৌরাত, ইনজিল, কোরআন ও নবীপাককে নূর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এর মধ্যে যেমন দীনে ইসলাম, তৌরাত, ইঞ্জিল বা কোরআনকে অনুভবযোগ্য বা বস্তুগত নূর হিসেবে মনে করা যায় না। তেমনি রাসুলে আজমকে ও নূরের সৃষ্টি বলে মেনে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। কোরআন সম্পর্কে সাধারন ধারণা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি ও এর তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

গায়েবী ইলম ও নবীপাক

ঈমানের বুনিয়াদ হলো না দেখে বা গায়েবে বিশ্বাস করা, যা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না বা মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা অনুভব করতে পারে না, তা রাসুলেপাকের কথা মতো মেনে নেয়াকে গায়েবী ঈমান বলা হয়। আল্লাহর অস্তিত্ব, বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, আখেরাত, আরশ, কুরসী, লৌহে মাহফুজ, বাইতুল মামুর তথা আল্লাহপাকের অসীম কুদরতের প্রতি বিশ্বাস রাখা, যদিও বা মানুষ এসব কিছু দর্শন করতে পারে না বা তার ধরা-ছোয়া বা অনুভবের বাইরে। দৃশ্যমান বা অনুভবযোগ্য কোন কিছুকে মেনে নেয়ার মধ্যে কোন আনুগত্য নেই মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে, কবরে ও আখেরাতের জীবনে মানুষ যখন স্পষ্টতই সব কিছু দেখতে পাবে বা অনুভব করতে পারবে, তখন তার ঈমান অর্থবহ হবে না। সৃষ্টিলোকের নিদর্শনাবলী ও আত্মার আবেদনের সাড়া দিতে গিয়ে এসব গায়েবের

www.pathagar.com

প্রতি ইমান হলো মৌলিক শর্ত। এই অর্থে শুধুমাত্র অদৃশ্যমান বা ধরা-ছোয়া বা অনুভবের বাইরের জিনিষগুলোকেই গায়েব বলা হয়েছে। কোন এমন কিছু যা বর্তমানে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু আসলে দৃশ্যমান, তাকে গায়েব বলা যাবে না। যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে এমনি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে গায়েবী ঈমান বলা হয় না।

আল্লাহপাককে যে অর্থে (عالم الغيب) বা গায়েবের আলেম বলা হয় তা হলো এই যে তিনি সব কিছুই জানেন। যার অস্তিত্ব ঘটেছে বা ঘটেনি, যা দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান, দূর অতীতে ঘটেছে বা বর্তমানে, লোকচক্ষের অন্তরালে বা প্রকাশ্যে। মানুষের ধরা-ছোঁয়া বা অনুভূতির পরিধির বাইরে বা অভ্যন্তরে, আগামীতে যা ঘটবে, তা বস্তুগত হোক বা আধ্যাত্মিক, তা ব্যক্তিগত হোক বা সামাজিক কিংবা সামগ্রিক, এই পৃথিবীর পরিধির মধ্যে কিংবা বাইরে, এক কথায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাধা ডিঙ্গিয়ে তিনি সব কিছুই জানেন। এই যোগ্যতা লাভের জন্যে তাকে এমন সত্তা হতে হয়েছে, যার লয় নেই, ক্ষয় নেই, আদি নেই, অন্ত নেই, জীবন মৃত্যুর সীমারেখার উর্দ্ধে। ইসলামের পরিভাষায় এমন সত্তাকেই গায়েবের আলেম বলা হয়। সীমাহীন, সার্বিক আদি জ্ঞানের অধিকারীকেই গায়েবের আলেম বলা হয। তিনি তার জ্ঞানের জন্য কারো প্রতি নির্ভর করেন না। তিনি উৎসের বা কার্যকারণের মুখাপেক্ষী নন, বরং সার্বিক জ্ঞানের জন্যে অপরাপর সৃষ্টি কুল তার মুখাপেক্ষী। জ্বীন, মানুষ, ফিরিস্তা তথা নবী রাসূলগণ ও জ্ঞানের বা ইলমের জন্য তারই মুখাপেক্ষী। এজন্যে তাদের মধ্যে কেউ গায়েবের আলেম নন। একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আলেমুল গায়েব।

এ সম্পর্কে কোরআনে মজিদের বেশ কয়েকটি আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে আরো কয়েকটি আয়াত তুলে ধরছি, যার দ্বারা প্রমান হয় যে কোরআন একমাত্র আল্লাহকেই আলেমুল গায়েব বলে উল্লেখ করে;

قل لا يعلم من فى السموات والارض الغيب الاّ الله (النمل)

(হে নবী বলে দিন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই যিনি গায়েবের ইলম রাখেন।)

এই আয়াতে (الاّ) দ্বারা একমাত্র আল্লাকেই গায়েবের আলেম বলা হয়েছে, যেমন কালেমায়ে তাইয়েবার মধ্যে মাবুদ হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মাবুদ নেই, তেমনি তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েবী আলেম নন।

علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم – (الحشر)

(আল্লাহই সমস্ত প্রকাশ্য ও গায়েবের ইলম রাখেন, যিনি অনুগ্রহশীল ও দয়াবান।)

إن الله عالم غيب السموات والارض انه عليم بذات الصدور – (فاطر)

www.pathagar.com

(নিশ্চয়ই আল্লাহপাক আসমান যমিনের সকল গায়েবের ইলম রাখেন, তিনি অন্তরের গোপন কথা ও জানেন।)

ثم تردون الى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون – (الجمعة)

(অতঃপর তোমাদেরকে প্রকাশ্য ও গায়েবের আলেমের (আল্লাহর) দিকে ফেরানো হবে, যিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা তোমরা করে এসেছো।)

যেহেতু একমাত্র আল্লাহই আলেমুল গায়েব এবং গায়েবের প্রতি ইমানের দাওয়াত দেবার জন্যেই নবী রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, তাই নবীদের দায়িত্ব ও মিশনের সাথে সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় গায়েবী ইলম তাদেরকে প্রদান করা হতো, যেনো তারা স্বীয় চোখে দেখার মতো প্রত্যয় নিয়ে নবুয়তী দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

افتمرونه على ما يرى (النجم)

(তোমরা নবীকে এমন বিষয়ে সন্দেহ করছো যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।)

যেমন হযরত ইব্রাহিম (সাঃ) কে আসমান যমিনের অভ্যন্তরীন সৃষ্টি রহস্য (মালাকুত) দেখানো হয়েছিলো। পাখিকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন পাহাড়ে নিক্ষিপ্ত করে এক ডাক দিয়ে জীবিত করে জীবন-মৃত্যুর চাক্ষুস ইলম প্রদান করা হয়েছিলো। বিভিন্ন নবী রাসূলদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মোজেজা দেয়া হয়েছে। নবী মোস্তফাকে স্বশরীরে আরশে মোয়াল্লায় উত্তরণ করানো হয়েছিলো। সেই সফরে আল্লাহর গায়েবী অজানা অনেক সৃষ্টি রহস্যই তার সামনে উম্মোচিত করা হয়েছিলো। তদুপরি অহীর মারফতে তাকে বহু গায়েবী ইলম প্রদান করা হয়েছিলো। নবী বা রাসূলদেরকে ইলমে গায়েবের প্রয়োজনীয় অংশ প্রদান সংক্রান্ত খোদায়ী বিধানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

و ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبى من رسله من يشاء – (ال عمران)

আল্লাহর এটা নিয়ম নয় যে তিনি তোমাদেরকে ইলমুল গায়েব সম্পর্কে অবহিত করবেন, বরং তিনি তার রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। (অর্থাৎ ঐ নির্বাচিত রাসূলদেরকে প্রয়োজনীয় গায়েবী ইলম প্রদান করেন।

عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الاّ من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا – (الجن)

(আল্লাহই গায়েবের আলেম, তিনি তার গায়েবী বিষয়াদী কারো উপর প্রকাশ করেন না একমাত্র তার পছন্দ করা রাসূল ব্যতিরেকে, অতঃপর তিনি তার অগ্র পশ্চাত প্রহরায় রাখেন। (সদা নিয়ন্ত্রনাধীন রেখেই তাদের উপর গায়েবী ইলম প্রকাশ করেন।)

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك – (ال عمران)

(এগুলো গায়েবী বিষয়াদীর অংশ বিশেষ, যা অহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়।)

www.pathagar.com

এসব আয়াতের অর্থ এই যে আল্লাহর সীমাহীন গায়েবী রহস্যের কিয়দংশই নবীদের কাছে উম্মোচিত করেন এবং গায়েবের কিয়দংশ জানার পর নবী রাসুলগণ (عــالم الغيــب) হয়ে যেতেন না। তারা এই বাস্তবতা ভাল করে জানতেন। তারা অকপটে স্বীকার করতেন যে তারা গায়েবের আলেম নন। এ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের নবীপাকের ভাষায় কোরআনে মজিদে উল্লেখ করা হয়েছে;

ولو كنت اعلم الغيب لأستكثرت من الخير – ومامسنى السؤ ان انا الاّ نذير و بشير لقوم يومنـــون – (الاعراف)

(যদি আমি গায়েবের আলেম হতাম, তবে আমি বেশী করে ভালই অর্জন করতাম, আমাকে কোন কষ্ট স্পর্শও করতে পারতো না, কিন্তু আমি মুমিন লোকদের জন্যে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।)

এখানে কোরআনের ভাষায় কোন অস্পষ্টতা নেই। সকলের জন্যে বোধগম্য ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে নবীপাক গায়েবের আলেম ছিলেন না।

যদি নবী রাসুলগণ বা নবী মোস্তফা (সাঃ) গায়েবেরে আলেম হতেন তবে আল্লাহপাক তা স্পষ্ট করে ঘোষণা করতেন এবং নবী পাকও তা সুস্পষ্ট করে দিতেন। এ কারণেই এই বিষয়টি কোন দিনই বিতর্কিত ছিলো না। ইসলামী ইতিহাসের কোন পর্যায়ের কোন ইমামই রাসুলে পাককে আলেমুল গায়ের মনে করেন নি। রাসুলে পাকের জীবনেতিহাস ও আমাদের কাছে এই সত্যই তুলে ধরে। অহীর ইলমের মাধ্যমে যা তিনি জানতেন তাই বলতেন, অন্যান্য বিষয়ের ইলম আল্লাহর উপর সোপর্দ করতেন। হাদীসে জিব্রাইলে তিনি কিয়ামতের সময় সম্পৃক্ত প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিলেন, (ما المسئول عنها باعلم من الســـائل) প্রশ্নকৃত ব্যক্তি কি প্রশ্নকারীর চাইতে বেশী জানেন? অর্থাৎ এ সম্পর্কে তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। নবুয়তী দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাকে প্রয়োজনীয় গায়েবী ইলম দান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি গায়েবের আলেম হয়ে যান নি।

তাই নবী রাসুলদেরকে বা নবী মোস্তফা (সাঃ) কে গায়েবের আলেম বলে আখ্যায়িত করে তাদের মর্যাদা বাড়ানো হয় না, বরং তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা ও তাদের মতামতকে অস্বীকার করে অবাধ্যতার অপরাধই করা হয় মাত্র।

রাসুলেপাককে হাজের নাজের মনে করার আকিদা

حــاضر ও ناظر (সর্বত্র বিদ্যমান থাকা ও সব কিছুকে দৃষ্টি গোচরে রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন) একমাত্র আল্লাহরই সিফাত। এভাবে যখন আমরা (ياحاضر يانــــاظر) বলে ডাকি তখন

www.pathagar.com

আল্লাহপাককেই ডাকি। শাব্দিক অর্থ থেকেই পরিস্কার হয়ে যায় যে এই দুইটি গুণ বা সিফাত আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতে পারে না। তাওহীদের যে আকিদা কোরআনে মজিদে বিবৃত হয়েছে এবং রাসুলে পাকের যে পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে রাসুলেপাককে হাজের নাজের বলে বিশ্বাস করার কোন অবকাশই নেই। এই ভ্রান্ত আকিদাকে নবী প্রেমের সাথে মিলিয়ে রাসুলকে আল্লাহর সিফাতের অংশীদার বানানো হয়েছে। ইতিপূর্বে রাসুলের পরিচয় দিতে গিয়ে যে আলোচনা রাখা হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে নবী মানুষ ছিলেন, অহীর মারফতে তাকে নবুয়তী মর্যাদায় সমাসীন করা হয়েছে। রাসুল সর্বাবস্থায় আমাদের পাশে রয়েছেন ও আমাদের অবলোকন করছেন, এই বিশ্বাস কি করে ইসলামের তৌহিদের আকিদার সাথে সংগতিশীল হতে পারে? এই আকিদা শিয়াদের ইমামতের আকিদারই নতুন প্রয়োগমাত্র। আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই শিরক থেকে রক্ষা করুন।

ইসলামে রাসুলে আযমের মর্যাদা ও আনুগত্য।

রাসুলে আযমের পরিচিতি ও তার মর্যাদা ও সম্মান প্রসংগে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও আকিদা সমূহের আলোচনার পর কোরআনের আলোকে এই সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা উচিৎ।

সমস্ত সৃষ্টিজগতের রহমত রাসুলে আযম (সাঃ) আল্লাহপাকের মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয়। সারা সৃষ্টিকূলে তার চাইতে প্রিয় আর কেউ নেই। তিনি আল্লাহর ঘনিষ্টতম বান্দা ও প্রিয়তম রাসুল, তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রাসুলে আযমকে সর্বাধিক গায়েবী ইলম দান করেছেন। কোন নবী, জ্বীন বা ফেরেস্তা, তাদের কেউ রাসুলে আযমের চাইতে বেশী গায়েবী ইলম পান নি। তাঁর ইলমের পরিধি সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে ব্যাপকতর। কিন্তু রাসুলে আযমের ইলম মহান আল্লাহর ইলমের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আল্লাহর ইলমের কোন আদি নেই- অন্ত নেই, তা পরিমাপ করার কোন উপায় নেই। আল্লাহপাকের অসীম কায়েনাতের অনন্ত অসীম অজানা অদেখা সৃষ্টি রহস্যে অগণিত দরজা খুলে দিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবীর সামনে, আল্লাহপাক সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে স্বচ্ছ করে দিয়েছেন তিনি। আমরা তার কাছে চির ঋণী। আমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি তাঁর প্রতি নিবেদিত করলেও এই ঋণের বোঝা এতটুকুও হালকা হবে না। তাই আল্লাহপাকের অগণিত নেয়ামত ও অনুগ্রহের ভারে অবনত মানুষ আল্লাহর পরেই রাসুলে আযমের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আমাদেরকে শিখিয়েছেন নবীজীর মাধ্যমে। কোরআনে মজিদে ও হাদিসে আমরা এর বিস্তারিত তথ্য পাই; নিচে তার একটা সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরছি:-

www.pathagar.com

(ক) আল্লাহপাকই রাসুল মনোনীত করেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট ফিরিস্তা ও মানুষদের মধ্যে থেকেই রাসুল মনোনীত করেছেন। অবশ্য ফিরিস্তাদের রেসালাতের ধরণ ভিন্নতর। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষদের মধ্য থেকে নবীর মনোনয়ন। আবার জ্বীনদের মধ্য থেকে কখনও রাসুল পাঠানো হয়নি। তাই রেসালাতের ময়দানে জ্বীন সমাজ মানুষের অধীন। কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس – (الحج ٧٥)

আল্লাহতায়ালা মানুষ ও ফিরিস্তাদের মধ্য থেকে রাসুল বেছে নেন। কাকে নবী বা রাসুল মনোনীত করবেন তা একান্তই আল্লাহর এখতিয়ার ভূক্ত। যেমন মানুষের রিজিক বন্টনে তিনি স্বাধীন। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم – (الزخرف)

তারা কি আপনার রহমত (নবুয়তের রহমত) কে বন্টন করতে চায়? (অর্থাৎ বলতে চায় কাকে রাসুল হওয়া উচিৎ) পক্ষান্তরে আমিই তো তাদের রিজিক বন্টন করি।

নবুয়ত একটি দান যা আল্লাহপাক তারই মর্জি মতো কাকেও দান করেন, তা সাধনার বলে অর্জন করা যায় না। আল্লাহপাকই এই দানের একমাত্র দাতা। আল্লাহপাক স্পষ্ট করে বলেছেন;

(الله اعلم حيث يجعل رسالته) আল্লাহপাক ভাল করেই জানেন, কাকে রাসুল বানাতে হবে।

অতঃপর আল্লাহপাক যাকেই রাসুল হিসাবে নির্বাচিত করেন, তাকে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতা দান করেন। শেষ নবী রাসুলে আযমকে ফিরিস্তা, জ্বীন ও মানুষের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠতা দান করলেন যে তিনি সারা সৃষ্টিলোকের জন্য রহমত হয়ে গেলেন।

(খ) যেহেতু আল্লাহপাকই রাসুলের মনোনয়ন করেন, তাই তার শিক্ষা দিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ও তিনিই পালন করেন। তিনি তার ঐশী নিয়ন্ত্রনে তাকে সকল প্রয়োজনীয় ইলম দান করেন। সব কথা শিখিয়ে দেন ও স্মরণ করিয়ে দেন। তার সার্বিক নৈতিকতার এমন উন্নতমান সৃষ্টিকরান যে যার চাইতে শ্রেষ্ঠতর কোন নৈতিকতার কল্পনাও করা যায় না। এর সাথে সাথে তার শারীরিক ও আত্মিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের দায়িত্বও গ্রহণ করেন, এমন কি আল্লাহপাক রাসুলের মনস্তত্ব ও মানসিক চিন্তার ও নিয়ন্ত্রণ করেন যেন নবী সর্বতোভাবে নিস্পাপ ও সুরক্ষিত চরিত্রের অধিকারী হতে পারেন। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

(سنقرئك فلاتنسى الا ماشاء الله) আমি আপনাকে পড়াবো, অতঃপর আপনি ভুলে যাবেন না- আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া।

www.pathagar.com

(و الله يعصمك من الناس) - (ان علينا بيانه) - (ان علينا جمعه و قرانــه) (কোরআনের সংরক্ষণ ও পঠন আমারই দায়িত্ব) - (তার উপস্থাপন ও আমারই দায়িত্ব) - (আল্লাহপাক আপনাকে লোকদের থেকে রক্ষা করবেন।)

হাদিসে পাওয়া যায় যে এই শেষোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাত্রে রাসুলেপাকের বাসস্থানের বাইরে সাহাবায়ে কেরামগণ প্রহরা দিতেন। এই আয়াতটি নাযিল হলে তিনি তার ঘর থেকে বাইরে মুখ বের করে বললেন, 'আল্লাহ' আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন- তোমাদের প্রহরার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহপাক তাঁর নিজ দায়িত্বে রাসুলে পাকের মন-মানসিকতা, কথাবার্তা, চিন্তা, অনুভূতি, এক কথায় তার দৈহিক, আত্মিক, মানসিক, মনস্তাত্মিক ও সকল ভাব প্রবনতার ও রক্ষণাবেক্ষন করেন। ফলে রাসুল এমন এক অবস্থায় উপনিত হন যে তার সমগ্র অস্তিত্বই আল্লাহর অনুগত হয়ে যায়। আল্লাহ যা চান, তাই চিন্তা করেন, আল্লাহর মর্জি মোতাবিক কাজ করেন। তার সব কিছুই কল্যাণময় ও নেকীতে পরিণত হয়ে যায়, কোন গোনাহ বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা তাকে স্পর্শও করতে পারে না। তাই সারা উম্মতের জন্যে শ্রেষ্ঠতম আদর্শে পরিণত হয়ে যান। এরসাদ হয়েছে;

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة – (احزاب)

(নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এই রাসুলের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ দেয়া প্রশিক্ষণ কোন দিককেই অনিয়ন্ত্রিত ছেড়ে দিতো না।) বলা হয়েছে;

و لاتصعّر خدك للناس و لا تمشى فى الارض مرحا –

(মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলাফেরা করবেন না।)
সর্বপ্রকার মানবীয় আচরনকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে, এরসাদ হয়েছে;

و اخفض جناحك للمؤمنين و لاتمدن الى ما متعنابه ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا – (الشعرأ)

(মুমেনীনদের জন্য উদারতার হাত প্রশস্ত করুন। পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের ব্যবহারের জন্য যে জৌলুসময় সম্পদ দিয়েছি, সে দিকে আপনি দৃষ্টি দেবেন না।)

لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لاتبسطها كل البسط – (بنى اسرائيل)

(আপনি নিজের হাত ঘাড়ের সাথে লটকিয়ে রাখবেন না (কৃপনতা করবেন না) না আপনার হাতকে একেবারে খুলে দেবেন অপচয় করবেন না।)

এই আয়াতে আল্লাহপাক কৃপণতা ও অপচয়ের মাঝামাঝি মধ্যম পথ অবলম্বন করার আহবান জানিয়েছেন। এভাবে রাসুলকে তার আর্থিক আচরনে ও সংযত হতে বলা হয়েছে। এমনি ধরনের আয়াতগুলোকে একত্রিত করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এক কথায় সার্বক্ষনিক প্রশিক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষনের ফল স্বরূপ রাসুলের আধ্যাত্মিক জীবন অপরাপর মানুষের থেকে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছিলো। এ কারনেই সাধারন মানুষ যা দেখতে পেতো না, রাসুল তাই দেখতে পেতো, সাধারন মানুষের কান যা শুনতে পেতো না নবীর কান তা

www.pathagar.com

শুনতে পেতো। সাধারন মানুষ যা জানতে পারতো না তিনি তা জানতে পারতেন। নবীপাকের ভাষায় একথা প্রকাশ পেয়েছে;

(انى أرى مالاترون و اسمع مالاتسمعون) আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আমি যা শুনি তোমরা তা শুন না। আরো এরসাদ হয়েছে;

و الله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا و ماتلذذتم بالنساء على الفرشات و لخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله –

(আল্লাহর শপথ, যদি তোমরা জানতে পারতে যা আমি জানি তবে হাসতে কম ও কাঁদতে বেশী এবং পালংকে স্ত্রী সহচর্য্য উপভোগ করতে পারতে না এবং পাহাড়ের উচ্চতার পথে বেরিয়ে পড়তে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য চাইতে।)

নবী পাকের এইরূপ হলো বান্দা ও রাসুলের সমন্বিত রূপ।

(গ) রাসুলেপাকের চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলীর মাঝে আল্লাহপাক একটি বিশেষ গুণ সৃষ্টি করেছেন, তা হলো মুমেনদের জন্যে অপরিসীম ভালবাসা ও আন্তরিকতা। কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

النبى اولى بالمومنين من أنفسهم (الاحزاب) لعلك باخع نفسك ان لايكونوا مؤمنين – (شورى)

নবী মুমেনদের কাছে তাদের আপন জীবনের চাইতে ও নিকটতম। (নবীর গভীর ভালবাসার কারণে) আপনি যেন এই চিন্তায় জীবন দিয়ে দেবেন যে কেন তারা ঈমান আনে না। অর্থাৎ মানুষের প্রতি সুকামনার কোন অন্ত ছিলো না। অন্যত্র বলা হয়েছে;

لقد جاءكم رسل من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم– (التوبة)

তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল এসেছেন। তিনি এতোই মেহেরবান যে তোমাদের কোন কষ্ট হলে তাঁর মনোকষ্টের কারণ হয়, তিনি তোমাদের কল্যাণ প্রয়াসী, মুমেনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল ও প্রীতিময়। আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে;

النبى اولى بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم – (احزاب)

(নবী মুমেনদের কাছে তাদের আপন জীবনের চাইতে বেশী নিকটতর। নবী পত্নীগণ মুমেনদের মাতা) নবীর তিরোধানের পর তার উম্মত নবী পত্নীদের সাথে মায়ের মতই আচরন করবে।

(ঘ) রাসুলেপাকের এই বিশেষ মর্যাদার জন্যে তার জন্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধরন ও ভিন্নতর। কোন বোজর্গ বা কোন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নবীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এক কথা নয়। নবীর প্রতি সামান্যতম অমর্যাদা ও অসম্মানও ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

يايها الذين أمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى و لاتجهروا له بالقول كجهربعضكم لبعـــض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون - (حجرات)

(হে ঈমানদারগণ, তোমাদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের চাইতে উঁচু করো না। তার সামনে তোমাদের পরস্পরের সুউচ্চু আওয়াজে কথা বলার মতো জোরে বলো না। তাতে তোমাদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে আর তোমরা জানতেও পারবে না।)

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا - (النور)

(তোমাদের মাঝে রাসুলকে এমনভাবে ডেকো না, যেমন তোমরা একে অপরকে ডাকো।)

এসব নির্দেশগুলো শুধু শিষ্টাচারের নসিহত নয়, বরং ঈমানের শর্ত। নবীর সাথে আচরনে এতটুকু বাড়াবাড়ি মুমেনের ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

সাহাবায়ে কেরাম নবীপাকের সাথে কথাবার্তা বলতে গিয়ে সম্মানের উদ্দেশ্যই (راعنا) (আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন) শব্দটি ব্যবহার করতেন। কিন্তু ইহুদীরা যখন এই শব্দটির মধ্যে সামান্য অবমাননার অর্থ মনে রেখে ব্যবহার করলো, তখন নবী মর্যাদার প্রশ্নটিকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে কোরআনে নির্দেশ দেয়া হলো;

(لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا (البقـــرة) (তোমরা (راعنا) শব্দটি ব্যবহার না করে (সমার্থক অর্থ বাহক শব্দ) (انظرنا) ব্যবহার করো।)

রাসুলেপাকের মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কতো সতর্কতা।

(ঙ) রাসুলের এই মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই তার আনুগত্য ও ব্যাপকতর- সর্বগ্রাসী। নবীর কোন আদর্শই আনুগত্যের বাইরে নয়। তার আনুগত্য আল্লাহরই আনুগত্য। এরসাদ হয়েছে;

من يطع الرسول فقد اطاع الله (النساء) فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله - (البقرة)

যে রাসুলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো, (তোমরা রাসুলের আনুগত্যে বাকী সুদ ছেড়ে না দিয়ে) যদি রাসুলের আনুগত্য না করো তবে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যাও।) রাসুলের আনুগত্য না করার কি ভয়াবহ পরিণতি। রাসুলের আনুগত্যের বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে;

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم- (الفتح)

(যারা আপনার হাতে বাইয়াত করে তারা (আসলে) আল্লাহর হাতে বাইয়াত করে। আল্লাহর হাত তার হাতের উপর।)

www.pathagar.com

(চ) নবী প্রেম হলো ঈমানের বুনিয়াদ। নবী প্রেমের প্রকাশ ঘটতে হবে তারই অনুসরণের মাধ্যমে। অনুসরণের কষ্ঠিপাথরেই নবী প্রেমকে যাচাই করতে হবে। সত্যিকার অনুসরণ ছাড়া নবী প্রেমের স্বরব দাবী অর্থহীন বাগাড়াম্বর মাত্র।
কোরআন মজিদে এরসাদ হয়েছে;

ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله – (ال عمران)

(যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো তবে আমার (নবীর) আনুগত্য কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।) আল্লাহর ভালবাসা প্রাপ্তিই হলো বেলায়াতের মর্যাদা। যার ভিত্তি হলো নবীর আনুগত্য।

(ছ) নবীব আনুগত্যের প্রশ্নে কোন ওজর আপত্তি না করে বিনা বাক্য ব্যয়ে আত্মসমর্পন করাই ঈমানের পূর্বশর্ত। রাসুলের কোন নির্দেশ বা তার কোন হাদীস জানার পর কোন রূপ আপত্তি-টালবাহানা বা হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা ঈমানের পরিপন্থি। কথায়, কাজে, ব্যবহারে ও আচরনে রাসুলেপাকের মর্যাদা হানীকর কিছু করা তো দূরের কথা, তার মর্যাদায় এতটুকু আঘাত লাগলে ও বা আঘাত লাগার অবকাশ থাকলেও ঈমান চলে যাবে। এ সম্পর্কে উম্মতের হক পন্থী উলেমাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। আহলূল সুন্নতে অল জামায়েতের এটাই আকিদা।

রাসুলেপাকের এই মর্যাদার বাইরে কোন অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ির ধারণা ইসলামী আকিদা নয়।

বেরেলভী চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আহমদ রেজাখান (রঃ) বলেছেন, "তোমাদের দ্বীন হলো (اشهد أن محمد عبده ورسوله)এর মধ্যে (عبده) এসেছে প্রথমে, তার পর (رسوله) তাই বান্দার মর্যাদা থেকে তাকে উপরে স্থান দিয়ো না। হাদীসে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা থেকে কঠোর ভাবে বারন করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে- আল্লাহ ছাড়া অপরাপর সবার প্রতি সিজদা হারাম, কোথাও বলা হয়েছে- সিজদা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে। কাবা ছাড়া আর কোথাও তোয়াফ করা হারাম।" (ملفوظات / احكام شريعت)

মওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রঃ) বলেছেন;
"নবীদের মর্যাদাহানী কুফুরী, তা মর্যাদাহানীর উদ্দেশ্যেই করা হোক বা না হোক।"

(الحق المبين)

মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) বলেন;

www.pathagar.com

"রাসুলে পাকের মর্যাদা হানীকর কোন কথা কুফুরী, প্রকাশ্য অবমান না তো দূরের কথা, যদি কোন ব্যক্তি এমন কথা বলে যা অবমাননার অবকাশ সৃষ্টি করে, তবুও তা কুফুরীর কাজ হবে।" (مكتوبات شيخ الاسلام)

কয়েকটি পরিত্যক্ত মূলনীতি

শিরকের আকিদা ও আমল থেকে বেঁচে থাকা, হারাম ও গোনাহর কাজ থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছে। তা হলো, যে সমস্ত চিন্তা ও কাজ আপাতঃ দৃষ্টিতে শিরক ও হারাম কাজ বলে মনে হয় না, কিন্তু সে পথের দরজা খুলে দেয়, সে সব চিন্তা ও কাজকে পরিহার করতে হবে। যেমন কোরআনে মজিদে বলা হয়েছে, (لا تقربوا الزنـا) তোমরা জ্বিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এর অর্থ হলো- এমন সব চিন্তা ও কাজ থেকে দূরে সরে থাক যা জ্বিনার পথে উদ্বুদ্ধ করে বা সে পথের ইন্ধন যোগায়। এর ব্যাপকতর ব্যাখ্যায় চোখ, হাত, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের জ্বিনা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহপাক এই আয়াতের মাধ্যমে মুমেনদেরকে ব্যাপকতর ব্যাখ্যায় জ্বিনা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনি সন্দেহজনক কাজ থেকেও দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে রাসুলে এরসাদ হয়েছে;

عن ابى محمد الحسن رض قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم : دع ما يريبك الى مـالا يريبك – (رواه الترمذى)

হযরত আবু মোহম্মদ হাসান বলেছেন, আমি রাসুলেপাকের এই বাণীটি স্মরণ রেখেছি, (তিনি বলেছেন) 'যা সন্দেহযুক্ত তা ত্যাগ কর এমন কিছুর জন্যে যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে না।'

শিরক, হারাম ও গোনাহর চিন্তা ও কাজ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনে এযাম ও উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই নীতি কঠোর ভাবে পালন করতেন। তারা শিরক, হারাম ও গোনাহর কাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। ঈমানকে হেফাজত ও সংরক্ষন করতে হলে সকল প্রকার সন্দেহযুক্ত চিন্তা ও কাজের চোরা-ছিদ্র পথ বন্ধ করে দিতে হবে। নেকীর উদ্দেশ্যে এমন সন্দেহজনক আকিদা পোষণ করা বা আমলের প্রয়োজন কি যা তার ঈমানকে ধ্বংস করে দিতে পারে বা তাকে হারামের পথে নিয়ে যেতে পারে। সন্দেহমুক্ত নেকীর কাজের কি অভাব রয়েছে যে খুঁজে খুঁজে সন্দেহজনক কাজগুলোই করতে হবে। আল্লাহপাক আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বিষয়ের সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত আনুগত্য চেয়েছেন। যাকে কোরআনের ভাষায় (طاعة معروفة) বা

www.pathagar.com

নিয়ম-মাফিক মারুফের আনুগত্য বলা হয়েছে। কোন সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের আনুগত্য আল্লাহর কাম্য নয়।

সন্দেহমুক্ত আমলের সীমা কোরআনের আদেশ-নিষেধে ও রাসুলের সুন্নতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এই সীমার বাইরে গেলেই সন্দেহের দরজা খুলে যায়। যা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় ও নিরাপদ। আকিদা-বিশ্বাস ও হালাল হারামের প্রশ্নে নমনিয়তার কোন অবকাশ নেই। কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? কোরআন-হাদীস এগুলোর জবাব স্পষ্টভাবে শিখিয়েছে, সেখানে কোন অষ্টপষ্টতা রাখা হয়নি। বান্দাকে কি জিজ্ঞাসা করা হবে, বলো- নবী মানুষ ছিলেন না অতি মানব? তাঁকে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে না নূর থেকে? তিনি গায়েবের আলেম ছিলেন কিনা? কোরআন হাদীস কি আমাদের নাযাতের জন্যে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া অপরিহার্য করেছে? এসব প্রশ্নের দ্বারাই কি মুমেনের ঈমান পরীক্ষা করা হবে?

উম্মতের মন ও মানসকে অসমাধান যোগ্য সন্দেহের আবর্তে নিক্ষেপ করা ছাড়া এসব প্রশ্ন উত্থাপন করায় আর কোন ফায়দা আছে কি?

এখানে আর একটি বিস্তৃত মূলনীতির কথা ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। ইসলাম যেহেতু একটি সামাজিক ব্যবস্থা-সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের আদর্শ। এই আদর্শ একাধারে আল্লাহর খাস বান্দাদের বা সত্যিকার মর্দে মুমেনের জন্যে আবার সেই সব সাধারন লোকদের জন্যে ও যারা মুসলিম সমাজের আনুগত্য স্বীকার করে মুসলমান নামে পরিচিত। তাই শরীয়তের ইমামগণ বৈধ কাজের সর্বশেষ সীমারেখা নির্ধারিন করে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'জায়েজ' বলে ঘোষনা করেছেন। এইসব নিম্ন পর্যায়ের জায়েজ কাজকে বৈধ করা হয়েছে সমাজের প্রয়োজনে। তাই বলে এইসব সর্বনিম্ন পর্যায়ের জায়েজ কাজকে উত্তম কাজ মনে করার কোন কারন নেই। উত্তম ও জায়েজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

শরীয়তের আমলে দুইটা পর্যায় লক্ষ্য করা যায়,যার একটি হলো (عزيمة) বা অবিচলতার পথ আর অপরটি হলো (رخصة) বা ছুটের পথ।

প্রথম পর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে শরীয়ত যে কাজটিকে শ্রেষ্ঠতর মনে করেছে তাই করা। এই পর্যায়ের আমলে শরীয়তের ছুট বিষয়গুলোকে পরিহার করে চলা অপরিহার্য। ছুট খুঁজে খুঁজে আমল করার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, ইমাম, উলেমা ও খাঁটি মুমেনগণ এই পথেরই অনুসারী। তারা শরীয়তের ছুটের পথ পরিহার করে শ্রেষ্ঠতর কাজ করার ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন যুগে যুগে। ঈমানী শক্তির মান এই পর্যায়ের আমলেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। অবিচলতার এই পথ ধরেই ইসলামের মহান সৈনিকগণ দ্বীন ইসলামের ঝান্ডাকে সমুন্নত রেখেছেন। তারা শুধু বৈধতাই দেখতেন না, দেখতেন উৎকৃষ্টতা। বলা বাহুল্য এটাই হলো কাম্য। দ্বিতীয়টি হলো প্রশ্রয় বা ছুটের পথ। অর্থাৎ অবস্থার প্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

বৈধতার সর্বনিম্ন স্তরের আমল। কিন্তু কোন কাজ জায়েজ হয়ে গেলেই তা উত্তম কাজ হয়ে যায় না। উম্মতের নিষ্ঠাবান লোকেরা এপথ এড়িয়ে চলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের উলেমারা সাধারনভাবে এই অবিচলাতর পথ ত্যাগ করেছেন বলে মনে হয়। উম্মতের বিশেষ প্রয়োজনে যাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জায়েজ কাজ বলে চিত্রিত করা হয়েছে, সেটাই যেন উত্তম পর্যায়ের কাজে পরিণত হয়েছে। উন্নত পর্যায়ের অবিচলতার পথ প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। বস্তুতঃ এই অবিচলতার পথই ছিলো মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, যা আজ বিস্মৃতির পথে।

প্রসঙ্গে নিচের উদাহরণগুলো তুলে ধরা যেতে পারে।

(ক) কোরআন হাদীসের শিক্ষানুযায়ী কোন দ্বীনি কাজের পার্থিব প্রতিদান কাম্য নয়। মানব সমাজের হিদায়াতের জন্যে যে কাজই করা হবে না কেন, তা হতে হবে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। তার বিনিময়ে কোন পার্থিব প্রতিদান কামনা করা অবৈধ। নবী রাসুলদের ভূমিকা সম্পর্কে কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

اتبعوا من لايسئلكم اجرا و هم مهتدون - (يس)

(তোমরা তাদেরই অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছ থেকে মজুরী বা প্রতিদান চান না, এবং তারা নিজেরাও হেদায়াতপ্রাপ্ত।)

কোরআনের এই আয়াতটি যদিও নবীদের জন্য নির্দিষ্ট, কিন্তু এর শিক্ষা সার্বজনীন। অর্থাৎ মানুষের হেদায়াতের জন্য যারা যে কাজই করবেন, তার ভিতরে দুইটা গুণ থাকতে হবে (১) কাজের পার্থিব প্রতিদান না চাওয়া (২) তারা যা বলেন তা তাদের জীবনের আমলে বাস্তবায়িত হওয়া। এমনটি হতে পারেনা যে তারা অন্যদেরকে হেয়াদাতের পথে ডাকবেন, আর নিজেরা সে পথে চলবেন না। ইসলামের সকল পর্য্যায়ে আলেম সমাজ এই অবিচলতার পথ কখন ও পরিহার করেননি। আমাদের সমসাময়িক কালের বিশেষ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট আলেমগন এ প্রসংগে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। যেহেতু সমাজের অধিকাংশ আলেমগণ দারিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করেন, তারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত, তাই যদি দাবী না করে তাদের খেদমতের প্রতিদানে তোহফা হিসাবে কিছু গ্রহণ করেন তবে তা বৈধতার সীমা লংঘনকারী কাজ বলে পরিগণিত হবে না। কিন্তু এই নমনিয়তার বাস্তব ফল আমরা যা দেখতে পাই, তা কি এই মানসিকতার পরিচয় বহন করে? মানসিকতার এই পরিবর্তনের ফলেই আজ হেদায়াতের এই মহান কাজে বরকতের নিদারুন অভাব। প্রতিদানের বিনিময়ে দ্বীনি কাজের অভাব নেই, কিন্তু কাংখিত ফল অর্জিত হচ্ছে না। হাঁ জীবনের পেশা হিসাবে এমন কাজ গ্রহণ করা যার মাধ্যমে দ্বীনি খিদমতের সুযোগ পাওয়া যায়- তা অবশ্যি প্রশংসাযোগ্য, সেটা অবিচলতার এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি নয়। এর অর্থ হলো দ্বীনি খেদমত কোন পেশা নয়, বরং পেশার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত।

www.pathagar.com

(খ) ইমামতের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা ও বিশেষ সামাজিক অবস্থায় প্রয়োজনীয় একটি ছুট। কিন্তু আজ আর এটা সেই সীমার মধ্যে নেই। ফলে ইমাম শব্দের মাঝে যে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান নিহিত রয়েছে তা আজ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের নিয়ন্ত্রানাধীন মসজিদ সমুহের ইমামদের বেলায় খুঁজে পাবার কোন উপায় নেই। ইমামগণ অপরাপর বেতনভূক্ত লোকদের মতোই পেশাজীবি হিসেবে চিত্রিত। সংগতিশীল আলেম বা সমাজের শিক্ষিত দ্বীনদার লোকেরা বিনা বেতনে ইমামতের দায়িত্ব পালনের সুন্নত ত্যাগ করেছেন বলেই মনে হয় বা আমাদের সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিলুপ্ত হয়েছে। ইমামদেরকে বেতনভূক্ত কর্মচারী হিসাবে চিত্রিত করার জন্যে এই নমনীয়তা দেখান হয়নি। কিন্তু আজ পরম মর্যাদা সম্পন্ন এই কাজের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে সর্বত্র। নামাজের বরকত কমে যাওয়ার জন্যে এটা কি একটি বড় কারণ নয়? আলেম সমাজই আবার সলফে সালেহীনদের বিস্মৃত অবিচলতার দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্জীবিত করতে পারেন।

(গ)ইসলামী শরীয়তে তালাককে জায়েজ কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এই ঘৃণিত কাজটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ব্যবস্থাটি হলো এই যে স্ত্রীর তোহর (পবিত্র) অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করবে। অতঃপর তিন মাস পর্যন্ত স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে আবার বৈবাহিক জীবনে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু যদি স্বামী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না আনে তবে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শরীয়ত নির্ধারিত উপরোক্ত উপায়ে তালাক দিলে সেই স্বামী-স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্ পাক আর একটি সুযোগ রেখেছেন, শরীয়ত নির্ধারিত পন্থা অবলম্বনের কল্যাণে। সে সুযোগটি হলো এই যে যদি বিছিন্ন স্বামী-স্ত্রী পরবর্তী সময়ে আবার একত্রিত হতে মনস্থ করে তবে নতুন ভাবে বিবাহের মাধ্যমে তারা আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফিরে আসতে পারে। সেখানে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ের ও নতুন স্বামীর তরফ থেকে তালাক প্রাপ্তির কোন বাধ্য বাধকতা নেই। যদি কোন স্বামী শরীয়তের এই বিধান লংঘন করে একই সাথে তিন তালাক প্রদান করে তবে তা শরীয়তের দৃষ্ঠিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ইমাম আযমের মতে তালাক হয়ে যাবে এবং বৈবাহিক জীবন বিছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি ইদ্দতের পর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অন্য কোন পুরুষের সাথে আবার বিয়ে হয় এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর সেই স্বামী মারা যায় বা তালাক প্রদান করে তবে ইদ্দতের পর আবার প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তালাক প্রদান করার শরীয়তের নির্ধারিত পদ্বতি লংঘন করার জন্য এটা শাস্তি স্বরূপ। এক সাথে তিন তালাক দেয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর তরফ থেকে তালাক দেয়ার শর্তে যদি তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর বিয়ে দেয়া হয় এবং নতুন স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার শর্ত মোতাবিক যদি তালাক প্রদান করে এবং ইদ্দতের পর আবার প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে হয়

www.pathagar.com

তবে এই ব্যবস্থাকে হালালা বলা হয়ে থাকে। এই হালালাকে ইসলামী শরীয়তে জঘন্য অপরাধ বলা হয়েছে। রাসূলেপাক এরশাদ করেছেন,

لعن الله المحلل و المحلل له - "আল্লাহ হালালাকারী ও যার জন্য হালালা করা হয়, উভয়ের উপর লানত করেছেন।"

ঐ হাদীসেই অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন,

الا اخبركم بـــالتيس المســتعار -"আমি কি তোমাদেরকে বলবোনা যে কারা ভাড়া করা ষাঁড়? তারা হলো হালালাকারী"

হালালার এই কার্যক্রম জঘন্য অপরাধ হওয়া সত্বেও অবস্থার নাযুকতার পরিপ্রেক্ষিতে তা ইমাম আযমের মতে জায়েজ হবে। তার মতে যদি হালালাকে অবৈধ ঘোষনা করা হয় তবে জেনার এক বিচিত্র রূপ দেখা দেবে, যা সমাজের জন্য বিষময় হবে। মুসলিম সমাজের কোথাও এমন জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার যুক্তি সংঘত সমাধানের জন্যই ইমামে আজম এই মত দিয়েছেন-এই অপরাধ প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়।

কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাই যেন 'হালালা' একটি শরীয়তের বিধান। আলেম বলে পরিচিত ব্যক্তিরাই এই গর্হিত কাজের পরিকল্পনা পেশ করছেন ও তদারকী করেছেন। যুক্তি ভিত্তিক জায়েজ ফতোয়ার কি বিচিত্র প্রয়োগ। অবিচলতার মূলনীতি ত্যাগ করার ফলেই উলেমা সমাজের মাঝে এসব রোগ সৃষ্টি হয়েছে। আলেম সমাজ হলেন মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক তারাই যদি রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন তবে হেদায়েতের এই মহান দায়িত্ব পালন করবেন কারা? রাসূলে আযম এরশাদ করেছেন

الا أخبركم بافضل من درجة الصيام و الصدقة و الصلوة ؟ اصلاح ذات البين و افساد ذات البين هى الحالقة -

(আমি কি তোমাদেরকে নামাজ, রোজা ও সদকার চাইতে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার আমলের কথা বলবো না? তা হলো, তোমাদের পারস্পরিক সমঝোতা (সংশোধনী) প্রয়াস, এবং পরস্পরের বিবাদ হলো ধবংসাত্মক কাজ।)

আলেমদের পারস্পরিক সমঝোতা ও সংশোধনী প্রয়াসের চাইতে অপরিহার্য্য কাজ আর কি হতে পারে?

বাতেল শীয়া আকিদার উপর তাদের আলেম সমাজের ঐক্য আজকের শীয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। অন্য দিকে সুন্নী আলেমদের অনৈক্যের ফলে সাধারন সুন্নী মুসলমানগণ শতধাবিচ্ছিন্ন। আবার তাদের অনেকে শীয়া রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে মানতে চাইছেন। সুন্নী আলেমদের ঐক্য থাকলে কি এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারতো? বাতিল আদর্শ ঐক্যের জোরে প্রতিষ্টিত আর দ্বীনে হক উলেমাদের অনৈক্যের ফলে বিভ্রান্তির শিকার। এই দায় দায়িত্ব কি উলেমা সমাজকে বহন করতে হবেনা?

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

ইসলামী ঐক্য ও ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন।

বিরোধ ও বিভেদের এই উপাখ্যান পীড়াদায়ক সত্যি, কিন্তু ভীতিকর নয়। মুসলিম উম্মাহ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন জাতি নয়। কেননা জাতি গড়ে উঠে একটি জনগোষ্ঠীর সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে উম্মাহ গড়ে উঠে একটি আদর্শের ভিত্তিতে। একটি আদর্শবাদী দল বা গোষ্ঠীর আপোষহীন সংগ্রামের পরিণতিতে উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসুলগণ ও আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারাই একাকীভাবে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে তুলেননি, বরং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এক লোক গড়ে তুলেন এবং তাদের সাহায্যে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। সংঘবদ্ধ জীবনের জন্যে অপরিহার্য উপাদানগুলোর অবিকৃত উপস্থিতি উম্মাহর স্থায়ীত্ব সুনিশ্চিত করে। অকৃত্রিম ঐসব উপাদানগুলোর বিকৃতি উম্মাহকে রোগাক্রান্ত করে দেয়। উম্মাহর জীবনে সৃষ্ট রোগ বা দূর্বলতা দূর করার সঠিক প্রচেষ্টার বা প্রয়াসের মাধ্যমেই এর যাত্রা পথ সুগম হয়। আদর্শিক বিরোধ বা বিভেদ আমাদের উম্মতকে রোগাগ্রস্থ বা দূর্বল করে ফেলেছে। ইসলামী আদর্শের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ ইসলামী উম্মাহর জীবনে এই আর্দশের বহির্প্রকাশ ঘটে। আদর্শের আংশিক আমল ব্যক্তিগত পর্যায়ে করা যায় সত্যি, কিন্তু তারও কাংখিত প্রতিফলন ঘটে সংঘবদ্ধ সমাজে। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ের আমলের ভিত্তিতে ইসলামী উম্মাহর চরিত্র বজায় রাখা সম্ভব নয়। দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে তেমনি একটি ইসলামী উম্মাহর মডেল সৃষ্টি করে রাসুলে আযম তিরোধান করেন। রাসুলে আযমের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ পঠিত অহীর মাধ্যমে কোরআনে ঘোষিত হলো;

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا –

(আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আজ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে পূর্ণতা দান করলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপরই আমি সন্তুষ্টি হয়েছি।)

অর্থাৎ ২৩ বছরের নবীয়তী জীবনে রাসুলে পাক যে আকিদা বিশ্বাস তুলে ধরেছেন, তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের যে জ্ঞান দিয়েছেন, ইবাদাত - বন্দেগীর যে সব নিয়ম-নীতি নিজের আমলের আদর্শে প্রমাণ করেছেন। মুসলমানদের সামাজিক জীবনের জন্য যে সব মূলনীতি প্রনয়ন করেছেন ও কার্য্যকরী করেছেন। জিহাদ পরিচালনা করেছেন, সম্পদের ব্যবহার বন্টন, লেনদেন-ব্যবসা বানিজ্যের বিধি বিধান সমুহ, হালাল হারামের শ্রেনী বিন্যাস করেছেন, প্রসাশনিক ব্যবস্থা চালু করেছেন, ফৌজদারী ও নাগরিক অধিকারের আইন দিয়েছেন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করেছেন,এক কথায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অমুসলিম জনগনের সাথে সম্পর্ক নির্ধারন করেছেন, আন্তর্জাতিক ভাবে বিশ্ব সমাজের সাথে সম্পর্কের স্বরূপ শিখেয়েছেন, সব কিছুকেই

www.pathagar.com

কোরআনের ভাষায় 'দ্বীন' বলা হয়েছে। এই দ্বীনের সার্বিক প্রতিষ্ঠাই হলো তার নিয়ামতের পূর্ণতা। রাসুলের জীবনেই ইকামতে দ্বীনের সাফল্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এই আয়াত। রাসূলে পাক ইকামতে দ্বীনের মাধ্যামে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে কোরান ও হাদিসের ভাষায় উম্মাহ বা মিল্লাত বলা হয়েছে এবং সংঘবদ্ধ মুসলমানদের অভিহিত করা হয়েছে 'আল জামায়াত' বলে। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞ্যানের পরিভাষায় জাতির চাইতে এর পরিধি অনেক ব্যাপক, ঐক্যের ধারনা এখানে অনেক গভীরতর ও ফলাফল ব্যাপকতর অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ।

রাসুলেপাকের শিক্ষা ও তরবীয়তের ফলে সাহাবায়ে কেরামদের মনে ইকামতে দ্বীনের উপাদান সমুহের রূপ রেখা ও তাৎপর্য সম্পর্কে কোন রূপ সংশয় বা ভ্রান্তি ছিলোনা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অপরিহার্যতা, আল-জামায়াতের ঐক্য ও সংহতির অগ্রাধিকার, আদর্শের অগ্রাধিকার ও অবিকৃত প্রয়োগ সম্পর্কে তারা সজাগ প্রহরী ছিলেন। তাই আল জামায়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থেই সাহাবায়ে কেরামগন রাসুলে পাকের ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহাবায়ে কেরামগন রাসুল পাককে তাদের সন্তান সন্ততি তথা আপন জীবনের চাইতে ও ভাল ভাসতেন, তার এতটুকু ইঙ্গিতে হাসী মুখে জীবন উৎসর্গ করতেন। সেই সাহাবাগন তাদের প্রাণ প্রিয় রাসুলে আযমের দাফন-কাফনের চাইতে উম্মাহর নেতৃত্ব বা খিলাফত নির্বাচনকে প্রাধান্য দেন। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অস্তিত্ব ইকামতে দ্বীনের জন্য অপরিহার্য শর্ত, একথাটি সাহাবায়ে কেরামগণ কতো গভীর ভাবে উপলব্ধি করতেন তা প্রমাণিত হয়না কি?

দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য বা আল জামাতের উপস্থিতি অপরিহার্য মৌলিক শর্ত। এমনকি আল জামায়াতের অনুগত্য ছাড়া কোন ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য ও থাকতে পারেনা।

নিচের কয়েকটি হাদিস থেকে আল জামাতের আনুগত্যের অপরিহার্যতা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। রাসুলে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন,

من خرج من الجماعة قيد شبر خلع ربقة الاسلام من عنقه الاّ ان يراجع – (الترمذى)

(যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান (সামান্য পরিমানে) আল জামাত থেকে বেরিয়ে যায় সে ইসলামের রশিকে তার গলা থেকে খুলে ফেলে। হ্যাঁ যদি আবার ফিরে আসে তবে আবার আল জামাতের সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।)

من مات و هو مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية – (رواه مسلم)

(যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর মৃত্যু বরন করে সে জাহেলীয়াতের পথে মৃত্যু বরন করে।)

অর্থাৎ তার ইসলাম গ্রহণ যোগ্য নয়।

من اراد ان يفرق أمر هذه الامة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان – (رواه مسلم)

www.pathagar.com

(যে ব্যক্তি এই উম্মাহর ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির বাসনা করে, যে উম্মাহ ছিলো ঐক্যবদ্ধ, তবে সেই ব্যক্তিকে তরবারী দ্বারা হত্যা করো, সেই ব্যক্তি যেই হোক না কেন?)

مثل المومن و مثل الايمان كمثل الفرس فى اخيته يجول ثم يرجع الى أخيته –

(মুমিন ও ইমানের উপমা হলো ঐ ঘোড়াটির মতো যেটি খুটির সাথে বাঁধা রয়েছে, ঘোড়াটি ঘোরা ফেরা করে অতঃপর আবার খুটির কাছে ফিরে আসে।)

আল জামাতের আনুগত্যের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

আল জামায়াতের সংহতি ও ঐক্যের উপর উম্মাহর অস্তিত্ব নির্ভর করে। যেখানে জামাত নেই সেখানে উম্মাহ নেই, আর উম্মাহর অস্তিত্ব না থাকলে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রশ্নই উঠেনা। দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা বা প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামী সরকার বা সরকার সমুহের অনুপুস্থিতিতে আজ পৃথিবীর কোথাও আল জামাতের অস্তিত্ব নেই। আজকের মুসলিম সমাজ ঐক্যের এই অপরিহার্য্য উপাদানের অভাবে নিতান্ত অসহায়ত্বের জীবন যাপন করেছে।

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহর নবী আগমন করেছিলেন, এরসাদ করেছেন,

ان الدين عند الله الاسلام –

(আল্লাহর নিকট ইসলামই হলো তার একমাত্র মনোনীত দ্বীন)

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون –

(আল্লাহ পাকই তার রাসুলকে 'হিদায়াত ' ও 'দ্বীনে হক' দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি সমস্ত দ্বীন সমুহের উপর দ্বীনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদি ও তা মোশরিকগণ পছন্দ করে না।)

ঐক্যের সমস্ত রাস্তা যখন বন্ধ হয়ে যায়, বিভেদ ও বিরোধের ব্যাপকতায় যখন ঐক্যের পথ নাগালের বাইরে বলে অনুভূত হয়, তখন ও ঐক্যের এই পথ উন্মুক্ত থাকে। কেননা এই ঐক্য হলো নুন্যতম অপরিহার্য উপাদান সমুহের ঐক্য। আল কোরআন বা রাসুলে আযম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে বিরোধ বা বিভেদের উপাদান সমুহের ঐক্য সম্ভব না হলে প্রাথমিক পর্যায়ে নূনতম অপরিহার্য উপাদান সমুহের ভিত্তিতে ঐক্যের ফরমুলা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী আদর্শবাদকে গ্রহনযোগ্য করে তোলার লক্ষে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে আহবান করা হয়েছে,

تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لانشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابـــا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون – (ال عمران)

(হে আহলে কিতাব, এমন কথার প্রতি একত্রিত হও যা আমাদের মাঝে অভিন্ন, (তা হলো) এসো আমরা (মিলে) একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগী করি, তার প্রতি কাকে ও অংশীদার না

www.pathagar.com

বানাই, একে অপরকে আল্লাহ ছাড়া প্রতিভূ না বানাই। অতঃপর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, সাক্ষী থেকো যে আমরা মুসলমান।)

আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের অনেক মৌলিক বিষয়ে বিরোধ রয়েছে বা ছিলো, কিন্তু কোরআন তাদের প্রতি ঐ সমস্ত ঐক্যের উপাদান গুলোর ভিত্তিতে ঐক্যের আহবান জানিয়েছে। রাসুলে পাক যখন আহলে কিতাবদের সাথে কূটনৈতিক ভাবে সমঝোতার করার চেষ্টা করেন তখন এই আয়াতের ভিত্তিতে আলোচনা করতেন। নবীজী যখন রোম সম্রাটের কাছে চিঠি লিখেন, চিঠির সমাপ্তিতে এই আয়াতকে তুলে ধরেন।

কোরআন ও নবীপাক যে কূটনীতির অনুসরণ করেন, তা আজ ও আমাদের পথ নিদের্শ করতে পারে। ইসলামী উম্মাহর অসংখ্য বিরোধের পিছনে না পড়ে ঐক্যের মূল সূত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ খোলা রয়েছে, এই ঐক্যের উপাদান বা বাহনকে আল্লাহর রশি বলা হয়েছে। কোরআনে মজীদে এরশাদ হয়েছে,

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا – (آل عمران)

(হে মুমিন গণ, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিত ভাবে শক্তভাবে ধারন করে রাখ এবং বিচ্ছিন্ন হয়োনা,)

এই আল্লাহর রজ্জু বলতে দ্বীনে হকের আনুগত্যের রজ্জুই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইকামতে দ্বীনের পথে ঐক্যে বদ্ধ হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই ইকামতে দ্বীন হলো উম্মাহর সর্বাধিক গুরূত্ব পূর্ন মূল ফরজ। এই ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে যে ঐক্য তাও হলো ঈমানের মূল দাবী। ইসলামী উম্মাহর সদস্য হিসেবে পরিচিত প্রতিটি মুসলমানকে তাদের সমস্ত বিভেদ ও বিরোধের উদ্ধে উঠে এই ঐক্য ফরমূলায় একত্রিত হতে হবে। এই ভাবেই বিভেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কোন ব্যক্তির পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌছা মোটেই কষ্ট সাধ্য নয় যে ইকামতে দ্বীন বা দ্বীনের প্রতিষ্ঠার কাজই হলো রাসুলে আযমের নবুয়তী জীবনের উদ্দেশ্য। এবং মুমিন জীবনে ও এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। ইকামতে দ্বীনের এই স্বাভাবিক অর্থ নিয়ে ও ভিন্ন মতের অভাব নেই। 'ইকামতে দ্বীন' এর বাংলা অর্থে একে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নেজামে মোস্তফার প্রতিষ্ঠা বা নেজামে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন একটি বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেকেই কথাটিই শুনলেই মন্তব্য করেন, এটি তো একটি রাজনৈতিক কর্মকান্ড, যা দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক কাজ গুলোর মধ্যে শামিল নয়। আবার কেউ কেউ এটিকে দ্বীনের অনেক গুলো মৌলিক কাজের মধ্যে একটি মনে করেন, বস্তুতঃ উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ঠতই এ সব ধারনার ভ্রান্তি প্রমানিত হয়ে যায়। শেষ যুগের ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী তার কিতাব (ازالة الخفا) এর ইকামতে দ্বীন পরিচ্ছদে ইকামতে দ্বীনের অর্থ লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

"যদি বিষয়টিকে সার্বিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে আমরা দেখি যে আদর্শের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে বিভিন্ন মূলনীতিতে পৌছে, আবার বিভিন্ন মুলনীতি থেকে একটি মাত্র ব্যাপকতর মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তখন আমরা এই সিদান্তে পৌঁছি যে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ও বিভিন্ন মূলনীতি সমুহ একটি মাত্র মূলনীতিতে পৌছে গেলে তাকে মূলনীতি সমুহের মূলনীতি বলা হয়। যার নাম হলো 'ইকামতে দ্বীন' যার মধ্যে সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে" ইকামতে দ্বীনের এই পরিচিত এর স্বরূপ ও অপরিহার্যতাকে স্পষ্ঠ করে তুলে ধরেছে। মূলনীতি সমুহের মূলনীতি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইমানের মূল দাবী। এই কেন্দ্রীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে অপরাপর মূলনীতি সমুহ ও শাখা প্রশাখার মত প্রর্থক্য দূর করে সার্বিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়ে যায়।

ইসলামের ইতিহাসের কোন পর্যায়েই কোন ইমাম, মোহাদ্দীস ও ফকীহগনই ইকামতে দ্বীনের অর্থে কোন দ্বীমত পোষন করেননি।

ইকামতে দ্বীনের কাজকে একটি ইমারত নির্মানের কাজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, একটি ইমারত নির্মানে যেমন বিভিন্ন নির্মান সাজ সরঞ্জাম, ইট, বালু, সিমেন্ট, রড ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে অপরিহার্য পরিকল্পনা, ম্যাপ ও প্রকৌশলী কর্মসূচীর। সাথে সাথে উপযুক্ত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মশক্তি ও অপরিহার্য। এ সব অপরিহার্য উপাদান গুলোর কোন একটিকে বাদ দিয়ে ইমারতের নির্মান চিন্তা ও করা যায় না। ইমারতের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার মাল মশল্লার ব্যবহারে একদল নির্ভর যোগ্য জনশক্তির নিরলস ও অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিনতিতে তথা প্রকৌশলীর তত্বাবধানে ইমারতটি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রকৌশলীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও জ্ঞ্যানের মান অনুযায়ী ইমারতের মান ও বাড়ে, আবার তাদের অযোগ্যতার ফলে ইমারতটি প্রতিষ্ঠিত হলে ও অনেক দোষ ক্রটি থেকে যায় ও কাঙ্খিত স্থায়িত্ব পায়না। এমনকি যদি ইমারতের জন্য প্রয়োজনীয় মাল মসল্লা গুলো উন্নতমানেরও হয়, প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও প্রকৌশলী মওজুদ থাকে, কিন্তু তাদের মাঝে যদি লক্ষ্য পথের ঐক্য অনুপস্থিত থাকে। নিয়ম, শিংখলা বা সংগঠনিক পদ্বতির ক্রটি বা অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে সে ইমারতটির অবস্থা শোচনীয় হতে বাধ্য। ইমারত নির্মানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মাল মসল্লা জোগান দেয়ার কাজ, ম্যাপ তৈরীর কাজ, কঠোর পরিশ্রমে বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ আঞ্জাম দেয়া অবশ্যি ইমারত নির্মানের কাজের মধ্যে শামিল থাকবে। কিন্তু ইমারত বানানোর লক্ষ্য ছাড়া শুধু ইট, বালু, রড তৈরী বা সরবরাহ কাজ বা ইমারত বানানোর অন্য কোন একটি কাজ বা একাধিক কাজ যতো যোগ্যতার সাথে আঞ্জাম দেয়া হোক না কেন তাকে ইমারত বানানোর কাজ বলা যায় না। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে ইমারত নির্মানের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের সাথে লোকদের মধ্যে লক্ষ্যের ঐক্য এর নির্মানের পূর্বশর্ত। ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে মৌল উপাদানের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বলতে আমি এ কথাটিই বুঝাতে চেষ্ঠা করেছি। তাই বিপুল সংখ্যক মুসলমান

www.pathagar.com

বিদ্যামান থাকা, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনের কাজ গুলোর বাস্তবায়ন করা বা দ্বীনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন ও অবদান রাখাকে ও অবশ্যি ইকামতে দ্বীনের কাজ বলে পরিগনিত করতে হবে, যদি সে সবের সামগ্রিক লক্ষ্যে হয় ইকমতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করা। ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে সক্রিয় অনুভূতি পরিকল্পনা ছাড়া এ সব কাজকে আর যাই বলা হোক না কেন, ইকামতে দ্বীনের কাজ বলা যায় না। অথচ ইকামতে দ্বীনের পথে ভূমিকা না রেখে কোন মুসলমানই পরিত্রাণ পেতে পারে না।

রাসুলে পাকের ইন্তেকালের পর ইকামতে দ্বীনের বা দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করা বা রাখার জন্যে কোরান ও সুন্নাহ যে ব্যবস্থা দিয়েছে, তাকে খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় ইসলামী নেতৃত্বের বরকতে দ্বীনে হক তার সমস্ত শাখা প্রশাখায় সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় ইমলামী নেতৃত্বের কল্যানেই ইকামতে দ্বীন কার্যকরী হয়। কেন্দ্রীয় ভাবে ইসলামী নেতৃত্বের অবস্থানই ইকামতে দ্বীনের মূল চাবিকাঠি ছিলো। যতদিন পর্যন্ত এই নেতৃত্ব বিদ্যামান ছিলো ইকামত দ্বীন বাস্তবায়িত ছিলো। খিলাফতে রাশেদার অবসান ও রাজতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ইকামতে দ্বীনের পথে ব্যতিক্রম ঘটে।পরবর্তীযুগে হযরত উমর বিন আবদুল আযিমের মাধ্যমে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন স্বল্প সময়ের জন্যে আবার ইকামতে দ্বীনের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এ জন্যে হযরত উমর বিন আবদুল আযিযকে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গন্য করা হয়।

কোরআনে মজীদে খোলাফায়ের রাশেদীনের এই যুগকে চিত্রায়িত করা হয়েছে এ ভাবে;

و عد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا ، يعبدوننى و لايشركون بى شيئا — و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون - (النور)

(হে সাহবায়ে রাসুলগণ) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে তাদেরকে তিনি তেমনি খলিফা বানাবেন যেমন অতীতের উম্মতদের বেলায় করেছেন, তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন, যে দ্বীন আল্লাহ তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, তাদের ভীতিকর অবস্থানকে শান্তিতে পরিবর্তন করবেন, তারা যেন আমারই বন্দেগী করে ও কাউকে আমার শরীক না করে, এর পরে যারা অস্বীকার করবে তারা হবে ফাসেক।)

এই আয়াত ইসলামের খলিফা রাশেদীনদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি আগাম সুসংবাদ, যার মধ্যে এক দিকে যেমন খিলাফতের দায়িত্ব ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ইসলামের প্রথম চার খলিফার সত্যতা ও প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ফলাফল হিসাবে দুইটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে;

১. দ্বীন ইসলাম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলামের সকল দিক ও বিভাগ তাদের অবিকৃত স্বরূপে প্রকাশ ভাবে, কোন কিছুই গোপন বা আমলের বাইরে থাকবেনা, ইসলাম সার্বিক ভাবে শিকড় গেড়ে বসবে। সমাজে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে তা হবে আল্লাহর পছন্দনীয় দ্বীন। এক কথায় তখন যে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাই হবে অবিকৃত দ্বীনে হক। ইকামতে দ্বীন বলতে আল্লাহ ও তার রাসুল যা মনে করেন, তা বাস্তবে রূপায়িত হবে।

২. ভীতি ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে পরম শান্তির পরিবেশ সৃষ্ঠি হবে, মানুষের জান মালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে আবার সঠিক দ্বীনের পথে চলতে কোন প্রকার ভয় ভীতির অবকাশ থাকবেনা। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার তথা ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সার্বিক ভাবে নিরাপত্তা হীনতার অবসান ঘটবে।

সূরা নূরের এই আয়তটি নাযিল হওয়ার সময় মওজুদ নিবেদিত প্রাণ মোখলেস সাহাবায়ে কেরামদের সম্বোধন করেই এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। পরবর্তি যুগের ইতিহাস আমাদের সামনে যে তথ্য তুলে ধরে তার দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে আয়াতে উল্লেখিত শর্তাদ্বয় খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানাতেই পূর্নতা লাভ করে। একদিকে আল্লাহর দ্বীন নবীর অবর্তমানে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাসূলে পাকের শিক্ষানুযায়ী সঠিক ও উপযুক্ত প্রয়োগ পদ্বতি ব্যবহার করে সর্বযুগের মুসলমানদের জন্যে বাস্তব নমুনা তুলে ধরা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রয়োগ পদ্ধতি পরবর্তীযুগের ইমাম ও পন্ডিতদের জন্য দিক নির্দেশনার কাজ করেছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে ইকামতের দ্বীনের সঠিক চিত্র ফুটে উঠে। দ্বীনের কোন দিকই আমলের বাইরে বা গোপন থাকেনি। এভাবে প্রথম শর্তটি সাফল্যজনক ভাবে পূরণ হয়। অপর দিকে শান্তি ও নিরাপত্তার এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়। ইয়ামেন থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূগন্ডে মানুষের ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনে সকল প্রকার ভয়ভীতি বা নিরাপত্তাহীনতার অবসান ঘটে এবং শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষের ব্যক্তি অধিকার এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে সাধারন মুসলমানগণ ও শাসক ও প্রশাসকদের সকল কাজের তদারকী করতেন এবং প্রয়োজনে কঠোর সমালোচনা করতেন। সরকারী প্রসাশনের সমালোচনার তীব্রতায় অনেক সময় বিশিষ্ট সাহাবাগণ বিব্রতবোধ করতেন। তেমনি এক পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন;

دعه لاخير فيهم ان لم يقولوها لنا و لاخير فينا ان لم نقبل – (كتاب المزاج)

www.pathagar.com

(তাকে বলতে দাও, যদি তারা এ সব কথা (সমালোচনা) আমাদেরকে না বলে তবে মনে করতে হবে) তাদের মধ্যে কোন কল্যান নেই, আর যদি আমরা তাদের সমালোচনা কবুল না করি তবে আমদের মধ্যে কোন কল্যান নেই)

মানুষের চিন্তা ও মতামতের স্বাধীনতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাই এ কথা দ্বীধাহীন ভাবে বলা যায় যে খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে যে সর্বাঙ্গিন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার তুলনা নেই।

এই আয়াত থেকেই দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয়, তার একটি হলো এই যে ইকামতে দ্বীনের জন্যে খেলাফত ব্যবস্থা বা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য শর্ত। ইসলামী রাষ্ট ব্যবস্থা ছাড়া ইকামতে দ্বীনের বাস্তবায়ন অসম্ভব। সার্বিকভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইসলামের সামগ্রীক আমলের নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম ইসলামী খেলাফত রাখা হোক বা অন্য কিছু তা মোটেই মূখ্য বিষয় নয়, আসল কথা হলো ইসলামের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা। বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন।

দ্বীনের পরিধি নির্ধারনে ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ কেউ ভ্রান্তি বশতঃ দ্বীন ও শরীয়তের মধ্যে সীমানা নির্ধারন করেছেন, তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মৌলিক বিষয় গুলোকে দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেন এবং বিভিন্ন নবী রাসুলদের দ্বারা বাস্তবায়িত বিস্তারিত জীবন ব্যবস্থাকে শরীয়ত বলে অভিহিত করেন। তারা কোনআনের এই আয়াতকে যুক্তি হিসাবে তুলে ধরেন,

কোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে;

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا – (المائدة ٤٨)

(তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আমি স্বতন্ত্র পদ্বতি ও শরীয়ত নির্ধারন করেছি।)

আল্লাহপাক যুগ ও অবস্থার পরিপেক্ষিতে প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু স্বাতন্ত্রের অধিকারী শরীয়ত দিয়েছেন, প্রত্যেক নবীকে একই শরীয়ত দেননি। কিন্তু এর দ্বারা দ্বীন ও শরীয়তের বিভিন্নতা প্রমানিত হয়না, বরং ঐ বিভিন্ন শরীয়তকেই সেই উম্মতের জন্য দ্বীন বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উপর আকিদা, বিশ্বাস ও আমলের যে বিস্তারিত ব্যবস্থা নাযিল করা হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে দ্বীন। সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েই নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শরীয়ত দ্বীন বর্হিভূত বিষয় নয় আবার দ্বীন ও শরীয়ত ছাড়া নয়। বরং প্রত্যেক নবীর বিস্তারিত শরীয়তই হলো দ্বীন। কোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذي اوحينا اليك و ما وصينا بــه ابراهيــم و موســى و عيسى ان اقيموا الدين - (شورى)

(হে ইমানদারগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকে নির্ধারন করেছেন, যা তিনি নূহের জন্যে নিদির্ষ্ঠ করে দিয়েছিলেন, এবং হে নবী, তোমার প্রতি ও যা নাযিল করেছি (একই বিষয়ে) এবং আমি ইবরাহিম, মূসা ও ইসাকে ও নির্দেশ দিয়েছিলাম যে এই দ্বীনকে কায়েম করো।)

এই আয়াতে শরীয়ত ও দ্বীনকে প্রত্যেক নবীর জন্যে সমার্থক বানিয়েছেন।

ইকামতে দ্বীন ও ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

আরবী শব্দ ইকামতের অর্থ হলো 'প্রতিষ্ঠা করা' ও 'প্রতিষ্ঠা রাখা'। আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথে যখন ইকামত শব্দটিকে মিলানো হয়। তার অর্থ দাড়ায় 'আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা' ও 'আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা'

আবার 'ইকামাহ' শব্দটি যখন কোন বস্তুর জন্যে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় খাড়া করা, যেমন সূরা তাহাতে খেজেরের কিসসায় বলা হয়েছে, ((يريد ان ينقض فاقامه (كهف)) (দেয়ালটি) পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো (তখন হযরত খেজের) তাকে খাড়া করে দিলেন।) কিন্তু যখন ইকামাহ্ শব্দটি কোন কাজ বা আমলের জন্যে ব্যবহৃত হয়, তার অর্থ হয় কাজটি তার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যেনো প্রতিষ্ঠিত রূপটি দেখে কাজটির পূর্ণ চিত্র ফুঠে উঠে। তাই কোরআনে যখন বলা হয়েছে (اقيموا الصلوة) (নামাজ কায়েম করো) তার অর্থ দাড়ায় নামাজকে তার সমস্ত নিয়ম নীতি সহ বাস্তবায়িত করা, গোসল, অজু সহ পবিত্রতা লাভ, স্থানের পবিত্রতা, মনের পবিত্রতা, কিরাতের পরিশুদ্ধতা, সঠিক ভাবে উঠা, বসা, রুকু সিজদা, ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি নিয়মাদীর পরিপুরন করে নামাজ আদায় করা, তথা মসজিদের প্রতিষ্ঠা, জামায়াতের ব্যবস্থা, জামাতের নিয়ম শিংখলা, ইমামের উপস্থিতি, নির্ধারিত সময় সীমার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহ সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন নিয়ম কানুন ও শৃংখলাকে মেনে নামাজ আদায় করাকে নামাজ কায়েম করা বলা হয়। এভাবে ইকামতে দ্বীনের অর্থ হলো দ্বীনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল শর্তাবলী, নিয়ম কানুন, শৃংখলা তথা দ্বীনের সকল শাখা প্রশাখা সহ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা যেন তার প্রতিষ্ঠিত রূপকে দেখলে দ্বীনের পরিপূর্ণ চিত্র অবলোকন করা যায়।

ইসলামী প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি প্রনয়নের নিমিত্তে গঠিত আইন বিভাগের বিন্যাস, মানুষের ব্যক্তি অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা, আইনের শাসন কায়েম, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সন্ধীর ব্যবস্থাপনা,

www.pathagar.com

আদর্শ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন, বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানুষের নৈতিক ধর্মীয়, আর্থিক ও শিক্ষার উন্নয়ন তথা নামাজ কায়েম করা, যাকাত ব্যবস্থা চালু করা, অপরাপর ইবাদাত বন্দেগীর কাজ মিলে সবই ইকামতে দ্বীনের অংশ। তেমনি নেক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা ও উৎসাহ প্রদান, অন্যায়, অশ্লিল ও চরিত্রহীনতার উচ্ছেদ করাও ইকামতে দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনে আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো ইকামতে দ্বীনেরই কাজ। কেননা দ্বীনের মধ্যে সকল আনুগত্য ও আনুগত্যের বিধান সমুহ শামিল রয়েছে।

কোরআন মজিদে এরশাদ হয়েছে,

ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الاّ اياه ذلك الدين القيم – (يوسف)

(আল্লাহ ছাড়া কারো শাসন করার ক্ষমতা নেই, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে তাকে ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবেনা, এটাই আনুগত্যের সরল পথ।)

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

الا له الخلق و الامر– (الاعراف)

(মনে রেখো, সৃষ্টি যেমন তার, শাসন করার অধিকার ও তারই)

এখানে কোরআনে মজিদের আরো কিছু আয়াত তুলে ধরেছি, যার মধ্যে আল্লাহর শাসন বা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথাই ফুটে উঠেছে।

এরসাদ হয়েছে,

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون – (المائدة)

(এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ নির্দেশ মোতাবেক ফয়সালা না করে তারা কাফের।)

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون – (المائده ٤٥)

(এবং যে আল্লাহর নাযিল কৃত হুকুম মোতাবিক ফয়সালা না দেয় সে জালেম।)

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون – (المائده)

(এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ আদর্শ মোতাবিক হুকুম না দেয় সে ফাসিক।)

الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ماانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قدأمروا ان يكفروا به ويريدالشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا – (النساء)

(হে নবী তুমি কি দেখো নাই যে যারা দাবী করে যে তারা ইমান এনেছে ঐ বিষয়ের উপর যা আমি তোমার উপর নাযিল করেছি এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করেছি, অতঃপর তারা ইচ্ছা পোষণ করে যে তাদের প্রয়োজনের বিষয়ে ফয়সালার জন্যে খোদা দ্রোহীর কাছ নিয়ে যাবে। যে সম্পর্কে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, এবং শয়তান চায় যে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।)

www.pathagar.com

و لقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدا الله و اجتنبوا الطاغوت – (النحل٣٦)

(আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি যেনো তোমরা আল্লাহরই বন্দেগী করো এবং তাগুতের অনুসরণ থেকে দূরে থাকো।)

এমন কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শক্তি যা খোদাদ্রোহিতার পথে চলে এবং আল্লাহর বন্দেগীর পরিবর্তে অন্য কারো বন্দেগীর আহবান জানায়, তাদেরকেই কোরআনের পরিভাষায় 'তাগুত' বলা হয়েছে। ইসলামী সরকার বা আল জামাতের অনুসরণ ছাড়া তাগুত থেকে দূরে থাকার কোন উপায় নেই।

افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون – (المائدة ٥٠)

(তারা কি জাহিলী ফয়সালা চায়? কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যয়শীল জাতির জন্যে আল্লাহর চাইতে ভালো ফয়সালা কারী আর কে হতে পারে?)

و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل – (النساء ٥٨)

(যখন জনগণের মধ্যে ফয়সালা করো তবে ইনসাফের সাথে করবে।)

এই ইনসাফ কি সরকার ছাড়া সম্ভব?

ياداؤد انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله – (ص ٢٦)

(হে দাউদ আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, তাই তুমি হকের সাথে জনগণের মধ্যে ফয়সালা করো এবং মনোবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।)

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس – (الحديد ٢٥)

(আমি আমার রাসুলদেরকে প্রকাশ্য হিদায়াত সহ পাঠিয়েছি, তাদের সাথে আমি ইনসাফের মানদন্ড ও কিতাব নাযিল করেছি যেনো জনগন ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং আমি লোহা নাযিল করেছি, যার মধ্যে পচন্ড শক্তি এবং মানুষের কল্যান নিহিত রয়েছে।)

এই আয়াতে 'মিযান' বলতে ইনসাফের মানদন্ড বলা হয়েছে, যার দ্বারা সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যায়। আবার লোহার কথা বলা হয়েছে, বিশিষ্ঠ মোফাসসিরদের মতে এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রচন্ড শক্তির কথা বলা হয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্র শক্তির ব্যবহার রাষ্ট্রীয় শক্তিরই বাহন। লোহা হলো সমস্ত অস্ত্রের মূল উপাদান, যার মধ্যে মানুষের সার্বিক কল্যান নিহিত রয়েছে। আয়াতে হাদীদ বা লোহা নাযিল করার কথা বলা হয়েছে, যদি এর অর্থ পর্দাথ হিসাবে লোহা হতো, তবে তার জন্যে সৃষ্ঠির কথা বলা হতো। পদার্থ আল্লাহ সৃষ্ঠি করেছেন। ইনসাফের মানদন্ডের সাথে হাদীদ নাযিল করার মাধ্যে রাষ্ট্রিয় শক্তির

www.pathagar.com

অর্থই বহন করে। ইনসাফের লক্ষ্যে এই লোহার মধ্যে মানুষের জন্যে কল্যাণ রয়েছে, এর মধ্যেও এই তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

ولا يجرمنكم شنأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى - (المائدة ٨)

(কোন কওমের শত্রুতা তোমাদেরকে যেনো প্রতিশোধ পরায়ন করে না তুলে যে তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করো। তোমরা ইনসাফ করবে, এটাই খোদা ভীতির নিকটতম।)

قل يا اهل الكتاب لستم على شئى حتى تقيموا التوراة و الانجيل و ماانزل اليكـــم مـــن ربكـــم - (المائدة ٦٨)

(হে নবী তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব, তোমাদের কোন স্থীতিই নেই, যদি তোমরা তৌরাত ও ইনযিলকে প্রতিষ্ঠিত না করো এবং ঐ সমস্থ বিধান প্রতিষ্ঠিত না করো যা তোমাদের রবের তরফ থেকে অবর্তিন হয়েছে।)

এখানে তৌরাত ও ইঞ্জিলকে কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। যার অর্থ হলো দ্বীন কায়েম করা। দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ছাড়া মিল্লাতের কোন অস্তিত্ব নেই।

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لاتكن للخائنين خصيما - (النساء)

(আমি হকের সাথে কিতাব নাযিল করেছি, যেনো তুমি মানুষের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছা মতো ফয়সালা করবে, তুমি বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষে বিতর্ক করবে না।)

ইকামতে দ্বীনের মৌলিক কাজ সমুহের উল্লেখ করে নিচের আয়াতে বলা হয়েছে;

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و أتوا الزكوة و امروا بالمعروف و فهو عـــن المنكـــر - (الحج ٤١)

(হক পন্থী লোক তারাই যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে নেতৃত্ব প্রদান করি তবে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।)

ভাল কাজের নির্দেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ নিছক উপদেশ প্রদান নয়, বরং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজের নিশ্চয়তা বিধান করাই হলো ইকামতে দ্বীনের ভূমিকা।

ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো ইসলামের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা; ইসলামের কিয়দংশের প্রতিষ্ঠা ও অন্য অংশকে ছেড়া দেয়া ইকামতের দ্বীনের লক্ষ্যকেই নস্যাৎ করে দেয়, কালামে মজিদে এরশাদ হয়েছে,

أ فتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فماجزاء من يفعل ذلك منكم الاّ خزى فى الحياة الدنيـــا و يوم القيامة يردون الى اشد العذاب - (البقرة ٧٠)

www.pathagar.com

(তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিয়োদংশে বিশ্বাস করো আর কিয়দাংশে অবিশ্বাস করো? যারা এ রূপ করে তাদের শাস্তি এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কাঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।)

ইসলামের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা ছাড়া বা আল জামাতের প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলিম উম্মাহর যে অবস্থা, উক্ত আয়াতটি কি তারই চিত্র তুলে ধরে না? কোন ঈমানদার ব্যক্তি কি এই অবস্থা মেনে নিতে পারে?

فاحكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهوأهم – (المائدة٤٨)

(তাদের মাঝে আল্লার অবতীর্ণ আইন মোতাবিক ফয়সালা করো, তাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করোনা,)

و لاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله – (ص٢٦)

(নিজের মনোবৃত্তির অনুসরণ করো না, যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে।)

و امرت لاعدل بينكم – (الشورى ١٥)

(আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে আমি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করি । উম্মতের জন্য এই কাজটি সরকারী শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।)

ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের উৎসের মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে নিচের আয়াতে।

يا ايها الذين أمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فـــردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الاخر – (النساء ٥٩)

(হে ইমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের এবং ঐ সমস্ত লোকদের যারা তোমাদের দায়িত্বশীল হয়, অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত প্রার্থক্য দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ইমান রাখো,)

এই আয়াতটি ইসলামের আইনের উৎসের মূলনীতি পেশ করেছে, ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

রাসুলের মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এ ভাবে;

و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا، و اتقوا الله ان الله شديد العقاب (الحشر ٧)

(রাসুল যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো, এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান কারী।)

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে যে মুসলিম উম্মাহ জন্ম লাভ করে, তারই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে নিচের আয়াতে -

www.pathagar.com

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا – (البقرة ١٤٣)

(এবং এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মাধ্যম পন্থী জাতী বানিয়ে দিলাম, যেনো তোমরা জনগনের উপর সাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের উপর সাক্ষী হন।)

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله – (آل عمران)

(তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে জনগণের পথ নির্দেশের জন্য বের করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।)

জনগণকে সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার কাজটি হাদীসে আরো সুস্পষ্ঠ করে তুলে ধরা হয়েছে এ ভাবে

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه و ان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان – (رواه الترمذى)

(তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখবে সে যেন হাত দিয়ে তা বদলিয়ে দেয়, যদি এমন করতে না পারে তবে যেনো কথার দ্বারা বাধা দেয়, আর যদি তাও করতে না পারে তবে অন্তর দিয়ে ঘৃনা করে এবং এটা হলো ইমানের দূর্বলতম অবস্থা।)

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে;

ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالايفعلون و يفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن و ليس وراء ذلك حبة خردل من الايمان – (رواه مسلم)

(অতঃপর তাদের পর এমন লোকেরা আসবে যারা এমন কথা বলবে যা তারা করবেনা, এবং এমন কাজ করবে, যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি, তাই যারা তাদের বিরূদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন, এবং যারা তাদের বিরূদ্ধে কথার দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন এবং যারা অন্তর দিয়ে জিহাদ করে তারাও মুমিন। এর নিচে ঈমানের কোন স্থান নেই।)

سيكون عليكم ائمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم ويعملون فيسيئون العمل لايرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم و تصدقوا كذبهم فاعطوهم الحق مارضوبه فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد – (كنزالعمال)

(শিঘ্রই তোমাদের উপর এমন লোকেরা শাসক হবেন, যাদের হাতে তোমাদের রিজিক থাকবে, তারা তোমাদের সাথে কথা বলার সময় মিথ্যা বলবে এবং যা করবে তা মন্দ কাজ

www.pathagar.com

করবে। তারা ঐ সময় পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ঠ হবে না যতোক্ষন না তোমরা তাদের বদ কাজের প্রশংসা ও মিথ্যা কথাকে সত্য না বলো, তোমরা তাদের সামনে ততোক্ষন পর্যন্ত হক কথা বলো যতোক্ষন পর্যন্ত তারা তা গ্রাহ্য করে। অতঃপর যদি তারা সীমা অতিক্রম করে এবং যে ব্যক্তি এর উপর নিহত হয় সে হবে শহীদ।)

এই কথাটিকেই অন্য হাদীসে বলা হয়েছে এ ভাবে,

لا طاعة فى معصية الخالق

(স্রষ্টার অবাধ্যতার মাধ্যমে (কোন সৃষ্টির) আনুগত্য নেই।)

ইসলামী নেতৃত্ব বা খেলাফতের নৈতিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের এই খোতবার মাধ্যামে, তিনি বলেছিলেন,

ايها الناس انى قد وليت عليكم و لست بخيركم فان أحسنت فاعينونى و ان اسأت فقومونى — الصدق امانة و الكذب خيانة و الضعيف فيكم قوى عندى حتى أخذله حقه القوى ضغيف عندى حتى أخذ الحق منه — اطيعونى ماطعت الله و رسوله فان عصيت الله و رسوله فلاطاعة لى عليكم

(হে জনগণ, আমাকে তোমাদের উপর নেতৃত্বে সমাসীন করা হয়েছে, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নই, যদি আমি ভাল কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবে, আর যদি অন্যায় করি তবে আমাকে সংশোধন করবে। সত্যবাদীতা হলো সততা, আর মিথ্যা হলো বিশ্বাস ঘাতকতা, তোমাদের দুর্বলগণ আমার কাছে সবল যতোক্ষণ না তাদের হক আদায় করে না দেই, এবং তোমাদের মধ্যে সবলগণ আমার কাছে দুর্বল যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে হক আদায় করি। যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করি ততোক্ষণ পর্যন্ত আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতা করি, তবে তোমাদের জন্য কোন আনুগত্য নেই।)

মুসলমানদের সমাজকে অপরাধমুক্ত আর্দশ সমাজ কায়েম করার লক্ষে বড় বড় অপরাধের জন্যে ফৌজদারী দন্ডবিধির ব্যবস্থা রয়েছে। কোরআনে মজিদের যে সমস্ত আয়াতে এই সব বিধান রয়েছে, তা ইসলামী সরকারের দ্বারাই বাস্তবায়ন সম্ভব। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতে এ সব দন্ডবিধি সম্বলিত আয়াত গুলোর আমল বাস্তবে অসম্ভব।

কোরআনে এরশাদ হয়েছে;

و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيزحكيم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم — الم تعلم ان الله له ملك السموات و الارض — (المائده ٣٨)

(চোর পুরুষ হোক বা নারী তাদের দুই হাতই কেটে দাও, এটা তাদের অর্জিত অপরাধের শাস্তি, আল্লাহর তরফ থেকে এই শাস্তি, এবং তিনি বিচক্ষণ ও অপ্রতিদ্বন্দী, যে ব্যক্তি জুলুম

www.pathagar.com

করার পর তওবা করেছে ও সংশোধন করেছে,আল্লাহ তাদের তওবা কুবুল করেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল, তোমরা কি জাননা যে আসমান ও যমিনের সাম্রাজ্য আল্লাহরই জন্যে।)

الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة و لاتأخذكم بهما رافة فى ديـــن الله ، ان كنتـــم تؤمون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين – (النور ٢)

(ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী, উভয়কে একে একে একশটি বেত্রাঘাত করো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেনো করুণার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান এনে থকো, এবং মুমিনদের এক দল যেনো এই শাস্তি অবলোকন করে।)

انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الارض فسادا ان يقتلـــوا أو يصلبـــوا أوتقطـــع ايديهم و ارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا و لهم فى الاخرة عـــذاب عظيم – (المائدة ٣٢)

(যারা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে তাদের হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদ বিপরিত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটা হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্চনা, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।)

و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابـــدا و اولئك هم الفاسقون – (النور٣)

(এবং যারা সতী-সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর প্রমাণ হিসাবে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবেনা, এরা হলো ফাসেক।)

يا ايها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ؛ الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بـــالانثى – (البقرة ١٧٨)

(হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায়, নারী নারীর বদলায়।)

يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر والانصاب و الازلام رجس من عمـــل الشـــيطان فـــاجتنبوه لعلكم تفلحون – (المائدة)

www.pathagar.com

(হে মুমিনগণ মনে রেখো মদ যুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য গণনার ফলক সুমহ সবই শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছু নয়, অতত্রব এগুলো পরিত্যাগ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।)

احل الله البيع و حرم الربوا – (البقرة ٢٧٥)

(আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।)

ان الله و رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير و الاصنام – (رواه البخارى)

(আল্লাহ পাক মাদক দ্রব্য, মুরদা শুকুর ও প্রতিমা বিক্রয় করা হারাম করেছেন।)

এ সমস্ত সাজা ও নিষেধাজ্ঞা সামাজিক ভাবেই কার্যকরী করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া যার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।ব্যাভিচারের শাস্তিকে আল্লাহ পাক দ্বীন বলে উল্লেখ করেছেন,যার অর্থ হলো এই সব শাস্তি প্রয়োগ ও দ্বীনের অংগ। রাসুলে আযমএই সব শাস্তি কঠোর ভাবে কার্যকরী করেছেন। কোরআনের আয়াতে এই শাস্তি প্রয়োগে অনুকম্পা প্রর্দশনে নিষেধ করেছেন। কিসাস সম্পর্কে বলা হয়েছে এর মধ্যেই জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে। এই আইন কার্যকরী ছিলো বলেই খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় অপরাধ প্রবনতার অবসান ঘটেছিলো।

ইসলামী শরীয়তে দন্ডাবিধি চালু করার জন্যে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর স্ববিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অপরাধের সমস্ত উৎস গুলোকে উৎপাটিত করার পরই দন্ডবিধি কার্যকরী করতে হবে। অপরাধের সমস্ত উৎস গুলোকে বজায় রেখে শাস্তি দেয়া ইসলামী ইনসাফ নয়। চুরির সকল সম্ভাবনা নিমূল করেই শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর্থিক ও নৈতিক দিক দিয়ে সমাজকে উন্নতর পর্যায়ে পৌঁছানোর পরেই শাস্তি প্রয়োগের নৈতিক অধিকার সৃষ্টি হয়। সামাজিক অবস্থাকে সকল অপরাধের লালন ক্ষেত্র রূপে বহাল রেখে দন্ড বিধি চালু করাকে ইসলামী আইনের সাথে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। আবার সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা না করে শুধু ফৌজদারী দন্ডবিধি কার্যকরী করলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যায় না।

রাসুলেপাকের এই হাদীসটি এখানে প্রনিধানযোগ্য,

انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع و يتركون الشريف و الـــذي نفـــس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها – (رواه البخارى)

(তোমাদের পূর্বে যে সমস্ত উম্মত ছিলো তারা এ জন্যে ধবংস প্রাপ্ত হয়েছে যে তারা নিম্ন মানের অপরাধীকে দন্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতো এবং উচু মানের লোকদেরকে ছেড়ে দিতো। সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহম্মদের জান রয়েছে, যদি স্বীয় কন্যা ফাতেমা ও যদি চুরি করতো, নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দিতাম।)

www.pathagar.com

শাস্তি প্রয়োগে ইসলামী রাষ্ট্রের নৈতিকতার একটা রূপ এখানে দেখা যায়। এ ভাবে কোরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায় অসংখ্যা আয়াত ও হাদীস পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব বা অন্য কথায় সে সব আয়াত ও হাদীস দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য, ইকামতে দ্বীনের বিষয় বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা বা তথ্য তুলে ধরা এখানে আমার লক্ষ্য নয়, বরং বিষয় বস্তুর পরিপেক্ষিতে কোরআন হাদিসের আলোকে ইকামতে দ্বীনের মৌলিকত্ব তুলে ধরা বা ইসলামের ফরজ সমুহের মধ্যে এই ইকামতে দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরজিয়াত প্রমান করাই লক্ষ্য। এই জন্য বিস্তারিত ব্যাখায় না গিয়ে শুধু মাত্র কোরানের কতিপয় আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ঠ মনে করেছি।

এখানে আমি শেষ যামানার ইমাম হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) এর এই উক্তিটি তুলে ধরতে চাই, এখানে তিনি ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী প্রতিনিধিত্ব শীল সরকারের মৌলিক কার্যক্রম গুলোর উল্লেখ করেছেন।

الخلافة هى الرياسة العامة فى التصدى لاقامة الدين باحياء علوم الدين و اقامة اركـــان الاســـلام و القيام بالجهاد و ما يتعلق به من ترتيب الجيوش و الغرض للمقاتلة و عطائهم مـــن الفـــى و القيـــام بالقضأ و اقامة الحدود و رفع المظالم و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر نيابة عن النبى صلـــى الله عليه و سلم – (ازالة الخفاء)

(খিলাফত একটি সাধারন রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা ইকামতে দ্বীনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইকামতে দ্বীনের মধ্যে রয়েছে ইলমে দ্বীনের পূনর্জীবন, ইসলামের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত নীতিমালার বাস্তবায়ন, জিহাদ পরিচালনা এবং জিহাদ সম্পৃক্ত বিষযাদির ব্যবস্থাপনা, যেমন সেনা বাহিনী গঠন, অংশ গ্রহণকারী সৈনিকদের হক দান, বিচার প্রতিষ্ঠা, দন্ডবিধির প্রতিষ্ঠা, অবিচার ও অন্যায়ের মুলোৎপাঠন, ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। রাসুলে পাকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই সব কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা।)

এখানে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে এই ব্যবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো 'ইকামতে দ্বীন' আর ইকমতে দ্বীনের মধ্যে ইসলামের সমস্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত।

এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম খেলাফত রাখা হোক বা ইমারত, আধুনিক পরিভাষায় প্রজাতন্ত্র বা অন্যকিছু, আসল কথা হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপরেখা যে সব বৈশিষ্টতায় অপরাপর রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমূহ থেকে স্বতন্ত্রের অধিকারী তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এর মূল লক্ষ্য এবং রাসুলের আনুগত্যের পথে এর বাস্তবায়ন। এখানে রাজতন্ত্র বা একনায়কত্বের মতো সার্বভৌমত্ব কোন ব্যক্তির হাতে থাকেনা, কিংবা আধুনিক গনতন্ত্রের মতো জনগণের হাতে চলে যায় না, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে যা সাব্যস্ত হয় তা আইন হয়ে যায়, যদিও তা নৈতিকতার বা সাধারনভাবে স্বীকৃত মানবীয় মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়।
- এটি একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার। শাসক একাধারে প্রতিনিধিত্ব করবেন আল্লাহর রাসুলের এবং জনগণের। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে যার নির্বাচন হবে। তাই জবাব দিহি করতে হবে আল্লাহর কাছে, রাসুলের কাছে ও জনগনের কাছে। পক্ষান্তরে জনগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে আল্লাহ ও রাসুলের, এই যোগ্যতার বলেই তারা সরকারী প্রশাসনের সমালোচনা করবে। এই দিক দিয়ে এই সরকার রাজতন্ত্র, একনায়কত্ব ও গনতন্ত্র থেকে আলাদা হয়ে যায়।
- এটি একটি আদর্শিক রাষ্ট্র, যেখানে আদর্শের ভিত্তিতেই নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। ইসলামের জ্ঞান, আমল, রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা ও নেতৃত্বের লিপ্সা না থাকার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করা হয়। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে উপরোক্ত মানদন্ডের ভিত্তিতেই জনশক্তি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তারা দেশের সকল পর্যায়ে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটান। নামাজ কায়েম করেন, যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামের অপরাপর ইবাদতের পথ সুগম করে দেন।কোরআন হাদীস তথা ইসলামী ইলমের সকল দিক ও বিভাগের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং সেই ইলম সমূহকে প্রতিষ্টিত করেন। নাগরিকদের নৈতিক মানোন্নয়নের বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র শাসন নয় ইসলামী প্রশিক্ষণ প্রদান তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে।
- ইসলামী বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠিত হবে। সরকারী সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ব্যক্তি স্বার্থ, স্বজন প্রীতি, দল প্রীতি উচ্ছেদ করে ইসলামী ইনসাফের ভিত্তিতে সরকারী ফান্ড ব্যবহৃত হবে। পরিকল্পনার ভিত্তিতে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য দূরীকরনের চেষ্টা করবে। মানুষের নূন্যতম প্রয়োজনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে। জাকাত ব্যবস্থার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে সহায়ক হবে। সুদহীন অর্থ ব্যবস্থা চালু করা হবে। সুদ ঘুষ সহ সকল অসৎ প্রবণতাকে উৎখাত করা হবে।
- শরীয়ত নির্ধারিত ইসলামী দন্ডবিধি চালু করা হবে। এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ধনী দরিদ্র বা দূর্বল-সবলের মধ্যে কোন বৈষম্য করা হবেনা। সমাজ থেকে অপরাধ প্রবনতা রহিত করার লক্ষ্যেই এই সব শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।
- শাসন প্রশাসন যন্ত্রকে সকল প্রকার দূর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

www.pathagar.com

- দেশের আইন পরিষদে এমন লোকদের সমাবেশ ঘটতে হবে যারা ইসলামী আইনকে তার আসল লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রয়োগের পদ্ধতি নির্নয় করার যোগ্যতা রাখবেন। দেশের সমস্ত উলেমাদেরকে আইন প্রণয়নে অংশীদার বানাতে হবে।
- বিচার বিভাগকে শাসন-প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখতে হবে। শাসন প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিগন ও বিচারের সম্মুখীন হবেন। বিচারকগণ সকল প্রকার সরকারী প্রভাব থেকে দূরে থাকবেন।
- মানুষের ব্যক্তি অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে, এর মধ্যে বাক স্বাধীনতা, সমালোচনার অধিকার,ধর্মের স্বাধীনতা, নারীদের অধিকার ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বর্ন,গোত্র, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।
- সরকারী চাকুরী ও অপরাপর সুযোগ সুবিধার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- এই সমস্ত বিধি বিধানের যথার্থ প্রয়োগ বা বাস্তবায়নকেই 'ইকামতে দ্বীন' এর বাস্তব প্রতিষ্ঠা বলে পরিগণিত হবে।

ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন ও উম্মাহর ইতিহাস।

- খেলাফতে রাশেদার যুগে আল্লাহর দ্বীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। খেলাফতে রাশেদার পতনের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পরিবর্তে রাজতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। শাসন ক্ষমতা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার নিমিত্তে ইসলামী মূলনীতি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। বাইতুল মালকে ক্ষমতার মসনদকে টিকে রাখার জন্যে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হতে থাকে। জনগণের সম্পদ ব্যক্তি ও পারিবারিক সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের সমস্ত পথ রূদ্ধ করে দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যক সাহাবাদের উপস্থিতি ও সত্যিকার ঈমানদার মুসলমানদের বিশালত্ব ও শক্তিহীন হয়ে যায়। তারা অসহায়ের জীবন যাপন করতে থাকেন। রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের মতো মুসলিম উম্মাহর বুকে চেপে বসে। ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শতকে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্যে বার বার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং রাজতন্ত্রী শক্তি প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই কঠোরভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন সাধনের কোন পথ খোলা না থাকায় স্বশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিলো না। হযরত হোসাইন (রাঃ) সর্বপ্রথম এ পথে এগিয়ে আসেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবা, তাবেয়ী উলামা ও ঈমামদের মধ্যে কেউ এর বিরূদ্ধে মতামত দেননি। যারাই এ স্বশস্ত্র বিপ্লবের বিরূদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং এই বলে বারণ করেছিলেন যে ইরাকবাসীগণ তাদের দাওয়াতে বিশ্বস্ত নয়। তাদের সম্ভাব্য বিশ্বাস ঘাতকতায় মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে

www.pathagar.com

কেউ এর বিরোধিতা করেন নি, তারা মনে করতেন হযরত হোসাইনের পূর্বে তারা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হাসান (রাঃ) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই তাদের কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। এর পর যা ঘটেছে তা আমরা সবাই জানি। খেলাফতে রাশেদার পর ইকামতে দ্বীনের এই প্রথম প্রয়াশ ব্যর্থ হয়ে যায়, শুধু ব্যর্থ হয়ে যায় বললে ভুল হবে বরং এই মর্মান্তদ ঘটনা ইকামতে দ্বীনের সম্ভাবনা দীর্ঘদিনের জন্যে নাকস করে দেয়। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে এই প্রচেষ্টার আরো কয়েক বার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

- হযরত হোসাইনের পৌত্র হযরত যায়িদ বিল আলী, যিনি সেই যুগের বিশিষ্ট আলেম ও ইমাম ছিলেন, এই পথে এগিয়ে আসেন। কুফাবাসীগণ তার হাতে বায়াত করে বিপ্লব সফল করার শপথ নেয়। এইভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন চলছিলো, উমাইয়া শাসকগণ খবর পেয়ে যান, এমতাবস্থায় চুড়ান্ত প্রস্তুতির পূর্বেই হযরত যায়িদ বিন আলী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। কুফাবাসীরা আবারো বিশ্বাস ঘাতকতা করলো। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে এই সংঘর্ষে যায়িদ বিন আলীর সাথে মাত্র দুই শত আঠারো জন সঙ্গী ছিলেন। অতঃপর তার বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ঘটনা সংগঠিত হয় হিজরী ১২২ সালে।

অতঃপর হিজরী ১৪৫ সালে হযরত মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, যাকে নফসে যাকি্কযা বলে অভিহিত করা হয়, এবং তার ভাই ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ, যারা হযরত হাসানের (রাঃ) বংশভুত ছিলেন। আব্বাসী খলিফা মনসুর ও উমাইয়া শাসনের উৎখাতের জন্যে এই দুই ভাইয়ের হাতে বায়াত করে ছিলেন। পরে আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইকামতে দ্বীনের এই আন্দোলন গোপনীয়তার সাথে সংগঠিত হতে থাকে। ইমাম নফসে যাকি্কযা হিযাযে তার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, পক্ষান্তরে তার ভাই ইব্রাহিম কুফায় তার কেন্দ্র কায়েম করেন। আব্বাসী খেলাফতের পক্ষে যে গোপন আন্দোলন চলছিলো, ইকামতে দ্বীনের এই আন্দোলন তার চেয়ে কম ছিলো না। মনসুর এই আন্দোলন কে নস্যাৎ করার জন্যে সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। কিন্তু সারা দেশেই দুই ভাইয়ের আন্দোলন দানা বেধে উঠে। একের পর এক সাফল্যের খবরে মনসুর খুবই পেরেশান ছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসী সাম্রাজ্য মুমুর্ষ অবস্থায় যে কোন সময়ে পতনের অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু ইমাম নফসে যাকি্কয়া ও ইব্রাহিমের পরিচালিত আন্দোলনের ভাগ্য পূর্বতন আন্দোলন থেকে ভিন্ন ছিলো না। ইমাম আযম আবু হানিফা (রাঃ) এই দুইটি আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন। তার মতে অনৈসলামী সরকারের বিরূদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের পথ খোলা না থাকলে বিপ্লবের মাধ্যমেও সরকার পরিবর্তন করা বৈধ। তিনি মুসলিম সমাজে অনৈসলামী সরকারকে অবৈধ সরকার হিসেবে চিত্রিত করেন। তবে বিপ্লব তখনই বৈধ যখন বিপ্লবের সাফল্যে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ব্যর্থ অভ্যূত্থান দ্বারা জীবন ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। বরং সার্বিক প্রস্তুতি ছাড়া যে বিপ্লব করা হয় তার দ্বারা আত্মঘাতী কার্য্যক্রমে সাহায্য করার নামান্তর হবে, এবং তেমনি ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আপামর

www.pathagar.com

জনসাধারনের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়, যা ভবিষ্যতে সফল আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর। মৌখিক সমর্থন ও আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনের জন্যে সমর্থন দেন। হযরত যায়েদের আন্দোলনকে তিনি রাসুলে পাকের বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন। অর্থাৎ তার কাছে যায়েদের বিপ্লবী আন্দোলন সন্দেহাতীতভাবে হকপন্থী ছিলো। নফসে যাকিকয়ার আন্দোলনের পক্ষে তিনি প্রকাশ্যে জনমত গঠন করতেন। তিনি এই আন্দোলনের কাজকে নফল উমরা বা হজ্বের চাইতে ৫০ গুণ সোয়াবের কাজ বলে ফতোয়া দিতেন। তিনি ঘরোয়াভাবে এমনও বলতেন যে কাফেরদের সাথে জিহাদের চাইতেও এই বিপ্লবে অংশ নেয়া বেশী নেকীর কাজ। অনৈসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটের প্রশ্নে ইমাম আজম শুধু একা সমর্থন করেন নি, বরং তৎকালীন ফকীহদের মধ্যে ইমাম মালেক (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও বিপ্লবের স্বপক্ষে মত দেন।

হাযযাজ বিন ইউসুফের যামানায় আব্দুর রহমান আশয়াস বিদ্রোহ করেন এবং হাযযাজের শক্তির কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের সমস্ত উলেমা ও ফোকাহা জনমত গড়ে তুলেন। জানা মতে বিশিষ্ট ফকিহ সাঈদ বিন যোবাইর, আল শায়াবী, ইবনে আবি লাইলা, আবুল বাখতারী প্রমুখ প্রকাশ্যে আব্দুর রহমান আল আশয়াসের পক্ষে ও হাজ্জাজের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। যামানার বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী ও অনুরূপ ফতোয়া জারী করেন।

এইসব বিপ্লবের বা ইকামতে দ্বীনের লক্ষে পরিচালিত বিদ্রোহের পক্ষে মতামত দেবার পথে তারা শর্ত আরোপ করেন। ইমাম আবু হানিফার এবং অপরাপর সমকালীন ইমামদের দৃষ্টিতে যখন বিপ্লবের সাফল্যে কোন রূপ সন্দেহ না থাকে বা বিপ্লবের পরিণতিতে যদি ইসলামী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় তবেই তা সমীচিন, অন্যথায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়

ইসলামের প্রথম শতকের উলেমা ও ইমামদের মতামত বিপ্লবের পক্ষে সুস্পষ্ঠ ছিলো, কিন্তু প্রতিটি অভ্যুত্থান প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার এবং রাজতান্ত্রিক এক-নায়কত্ব আরো সুদৃঢ় হয়ে যাবার ফলে এবং অপরাপর অন্যান্য পরিবেশগত কারনে হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে উলামায়ে কেরামদের মতামতে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইসলামী শরীয়তের কোন প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজে স্বসস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অতঃপর মুসলিম দেশে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার প্রায় ইতি হয়ে যায়। গনতান্ত্রিক উপায়ে জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন অসম্ভব ছিলো এবং অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা অবৈধ ঘোষিত হবার পর ইসলামের ইতিহাসে দীর্ঘদিন যাবত কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি।

উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতেমী সম্রাজের মূল চরিত্রে কোন পার্থক্য ছিলো না, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিপন্থি কোন প্রকার চিন্তা ও কর্মকে কঠোর ভাবে দমন করা হতো; সরকারী শক্তি

www.pathagar.com

ছিলো অপরিমিত, পক্ষান্তরে জনগণের বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে নিমূল করে দেয়া হয়েছিলো। তাতার ও মোঘলেরা মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের শেষ চিহ্নও মিটিয়ে দিয়েছিলো। হাজার হাজার মুসলিম জনতার রক্ত স্রোতে মুসলিম সামাজ্যের সমাপ্তি টেনেছিলো। সেই তাতারী ও মোঘলেরা ও পরবর্তীকালে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় এবং তাতারী ও মোঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করে। এই সাম্রাজের নৈতিকতা ও পূর্বসূচীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলোনা। সেখানে ও ব্যক্তি অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গনতান্ত্রিক অধিকারের কোন চিহ্ন ছিলোনা, বরং ভারতের মোঘল সাম্রাজ্যে ইসলামের সামষ্ঠিক জীবনের অবস্থা পূর্বতন সাম্রাজ্যগগুলোর চাইতে ও অধঃপতিত ছিলো। এমতো অবস্থায় ব্যাপক ভাবে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন গড়ে উঠার কোন পথই উম্মুক্ত ছিলো না। রাজতন্ত্রী সামন্তবাদী এক-নায়ক সরকারের অধীনে জনমত সংগঠন বাস্তবে সম্ভব ছিলোনা, জনমত সমৃদ্ধ ব্যাপক প্রস্তুতি ছাড়া কোন অভ্যুথান প্রচেষ্টা আত্মহত্যারই নামান্তর ছিলো। হযরত উমরের মন্তব্যটি এখানে উলেখ যোগ্য। তিনি বলেছিলেন,

من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلايبايع هو ولاالذى بايعة تغرة ان يقتلا – (بخارى)

(যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির বাইয়াত করে, তবে যে বাইয়াত করে এবং যার হাতে বাইয়াত করে, সে নিজেকে এবং তাকে ও ধোকা দেয় এবং নিজেকে হত্যার জন্যে পেশ করে।)

এর দ্বারা জনমত ছাড়া অভ্যুথান প্রয়াস অবৈধ হয়ে যায়। এই কারণে ইতিহাসের এই পর্যায়ে কোন উল্লেখ যোগ্য আন্দোলন গড়ে উঠেনি। ভারতে বৃটিশ রাজের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল ছিলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একাধিক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রমান পাওয়া যায়। সাইদ আহমেদ বেরলভীর জিহাদ ও হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র খিলাফত আন্দোলন সেগুলোর মধ্যে সর্ব বৃহৎ। কিন্তু বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে এই সব আন্দোলন সফল হতে পারেনি।

অতঃপর এই শতাব্দীর মধ্যভাগে একে একে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। জনমত গঠনের হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম সমাজে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের পথ সুগম হয়ে যায়,

সরকার পরিবর্তনের সরাসরি আন্দোলনের মধ্যেই ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সমাজতাত্মিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্ভব্য সকল দ্বীনী প্রচেষ্টাই ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের পর্যায়ভূক্ত। এই দৃষ্টিকোন থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের ইসলামের সুসন্তান গন ইসলামী রেঁনেসার পথে যে সব অবদান রেখেছেন তাও ইকামতে দ্বীনেরই আন্দোলন। ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন ছাড়া ইমানের দাবী পূরন হওয়া সম্ভব নয়। তাই ইমাম আজম আবু হানিফা যে ভূমিকা রেখেছেন, ইমাম মালেক, ইমাম হাসান বসরী যা করেছেন তাও ইকামতে দ্বীনেরই আন্দোলন। ইমাম আহমদ

www.pathagar.com

বিন হাম্বল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ ইমামগন যে অবদান রেখেছেন তাও ইকামতে দ্বীনেরই আন্দোলন। মোজাদ্দিদে আলদে সানী (রাঃ) ভূমিকা বা অপরাপর উলেমাদের মৌলিক অবদান গুলোকে ও ব্যাপক অর্থে ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন বলে পরিগনিত।কিন্তু মুসলিম দেশ সমুহের স্বাধীনতা লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ছাড়া ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন সম্ভব নয়। ইসলামী ইতিহাসের দীর্ঘ পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী সম্বলিত ব্যাপক আন্দোলনের অনুপস্থিতে যারা এ হেন আন্দোলন সমুহ থেকে পাশ কাটানোর অজুহাত হিসাবে তুলে ধরেন, তারা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচয় দেন মাত্র। যে সমাজতাত্বিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক পরিস্থিতিতে মোজাদ্দীদে আলফে সানী, শাহ্ উয়ালী বা অতীতের উলেমা ও ইমামগন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সরাসরি আন্দোলন গড়ে তুলেননি, সেই পরিস্থিতি আজ আর নেই, অবস্থার বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটেছে সর্বত্র। গনতান্ত্রিক উপায়ে জনমত গড়ে তুলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে আজ কোন বাধা নেই।

বিজাতীয় উপনিবেশ শাসন থেকে স্বাধীনতা পেলেও মুসলিম দেশগুলো একটি আদর্শিক দেশ হিসাবে আদর্শিক স্বাধীনতা পায়নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার জীবন দর্শন মুসলিম মানসকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। রাজনৈতিক জীবনে ইসলাম বিরোধী ধর্ম নিরপেক্ষবাদের উত্তরাধিকার পেয়েছে। পাশ্চাত্য গনতন্ত্রের খোলসেএই ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামকে আমাদের জাতীয় জীবন থেকে খারিজ করে দিয়েছে। ইসলাম তার সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। উপনিবেশিক শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যানে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ আদর্শিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে।এমনি ধরনের লোকেরাই জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নেতৃত্বে সমাসীন রয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বীনি মাদ্রাসাগুলো থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে দ্বীনের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমল যোগ্য কাজ গুলোই শুধু অবশিষ্ঠ রয়েছে। ইসলামী জ্ঞানের লালন ও চর্চা নিদারুন ভাবে সংকোচিত হয়ে পড়েছে। উলেমা সমাজের অপরিহার্য ঐক্যের অভাবে তাদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়েছে। ইকামতে দ্বীনের মূল ভিত্তির উপরই এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যারা ইকামতে দ্বীনের আন্দোলন করা ফরজ মনে করেন না তারা ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রতিষ্ঠিত উলেমাদের ঐ মতামতকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেন। যাকে আহলুল সুন্নতে আল জামাতের সংখ্যা গরিষ্ঠ রায় বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু উলেমাদের ঐ মতামত ছিলো মুসলিম সমাজে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা অভ্যুথানের বিরুদ্ধে, তাও এমনি এক দূর্বিসহ, অসহায় অবস্থায় যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের কোন উপায় ছিলো না, একের পর এক অভ্যুথান প্রয়াসের ঘটনায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির প্রমাণ তাদের সম্মুখে ছিলো, তাই বাতিল ব্যবস্থার সাথে সহ অবস্থানের জন্যে সেটি ছিলো অস্থায়ী একটি কৌশল মাত্র। সেই মতামত কোন স্থায়ী আত্ম-সমর্পন ছিলোনা। সেই

www.pathagar.com

মতামত ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলোনা। তদুপরি গনতান্ত্রিক উপায়ে জনমত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিলো না। আজকের পরিবেশে সেই মতামতের আশ্রয় নেয়া সত্যের বিকৃতি বই কিছু নয়,বরং দ্বীনের এই চরম ও পরম দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটি খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

আর যারা ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের অপরিহার্য্যতাকে আদৌ স্বীকার করেন না, তাদের মতে কোরআনে বা হাদীসে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই সমস্ত উলেমাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই, যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন নির্দেশ না থেকে থাকে, তবে ইসলামের ইনসাফ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কি ভাবে হবে? ইসলামের দন্ডবিধি বা হোদুদ কে প্রতিষ্ঠা করবে? যে সমস্ত আয়াতে এ সব নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে সব আয়াত কি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে? বা সেগুলো কি শুধু রাসুলের যামানার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো বলে মেনে নিতে হবে। খোলাফায়ে রাশেদীনগণ সেগুলো প্রতিষ্ঠা করে কি ভুল করেছিলেন? কে বা কারা যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে? সরকারীভাবে যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন বিধান না থাকলে কি যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও সাহাবায়ে কেরামগণ ভুল করেছিলেন? যাকাত যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আদায় যোগ্য ফরজ হয় এবং তা দিতে অস্বীকার করলে যদি তাদের বিরূদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা ফরজ হয়ে থাকে, তবে নামাজ রোজা সহ অপরাপর ফরজকে অস্বীকার করলেও তাদের বিরূদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায় কি? সেক্ষেত্রে এসব জিহাদ কে পরিচালনা করবেন? এসব প্রশ্নের জবাব কি তারা দিতে পারবেন?

আসলে আত্ম-সমর্পনের এ এক জঘন্য পর্যায়। বাতিলের ভয় ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংরক্ষণই এই মানসিকতার মূল কারণ।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি ফরজ কাজ, বরং এটি হলো ইসলামের বিশিষ্ট স্তম্ভগুলোর একটি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলনীতিগুলো কোরআন মজিদে উল্লেখিত হয়েছে আর রাসুলেপাকের আমলের মাধ্যমে এর বিস্তারিত রূপরেখা উৎসারিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের দ্বারা এটা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে কোরআন আল্লাহর কালাম, মানুষের হিদায়াতের জন্য নাজিল হয়েছে। মানুষের হিদায়াতই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হুকুমতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠা এর মূল লক্ষ্য নয় বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপস্থাপনাই এর উদ্দেশ্য নয়। যারা হুকুমতে ইলাহীয়ার প্রতিষ্ঠাই কোরআনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে দাবী করে কোরআন থেকে যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করেন এবং রাসুলের নবুয়তী মিশনের ও মূল লক্ষ্য হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করতে চান তারা কোরআন ও রাসুলের মর্যাদাকে খাটো করে দেখেন। কোরআনী হিদায়াতের পরিধি অনেক ব্যাপকতর। কোরআনে উপস্থাপিত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সার্বভৌমত্বের সামর্থক নয়। আল্লাহর যাত ও সিফাতের প্রতি আকিদা বিশ্বাস ও

www.pathagar.com

আত্মসমর্পন, রাষ্ট্র ব্যবস্থার আনুগত্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণে সর্বগ্রাসী। আল্লাহর প্রতিপালন ক্ষমতার স্বরূপ, আল্লাহর ইলাহীয়াতের মহিমা, আল্লাহর হাকেমীয়াতের তাৎপর্য, পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যবহৃত অনুরূপ ক্ষমতা সমূহ হতে সার্বিকভাবে মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ। এমনিভাবে নবীপাকের নবুয়তী মর্যাদাকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদার সাথে তুলনা করা সমিচীন নয়। নবীর নবুয়তী মর্যাদার কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হওয়া, রাষ্ট্র ব্যবস্থার শাসন, বিচার ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমুহের সাথে তুলনা করা যায় না। আমরা যে অর্থে নেতা শব্দটি ব্যবহার করি, নবী তেমনি কোন নেতা ছিলেন না, আমরা যে অর্থে রাষ্ট্র প্রধান শব্দটি প্রয়োগ করি সে অর্থে নবী রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন না, আমরা যে অর্থে কাউকে কাজী বা বিচারক বলে অভিহিত করি নবী সে অর্থে কোন বিচারক ছিলেন না। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকূলে নবীকে 'নেতা' 'রাষ্ট্র প্রধান' 'বিচারক' বা সেনাপ্রতি বলে অভিহিত করা কোন শ্রেয় কাজ নয়। নবীর একমাত্র পরিচয় এই যে তিনি নবী, তিনি যা কিছু করেছেন সবই করেছেন নবী হিসেবে। এই মর্যাদার কোন সমার্থক প্রতিশব্দ নেই।

ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা প্রমাণের স্বরূপ ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। আবেগের আতিশয্যে যুক্তি প্রমাণের যথার্থ প্রয়োগ না হলে বা সাধারণ মানুষের জন্য সহজভাবে বোধগম্য করণের লক্ষ্যে অসমিচীন পন্থায় যুক্তির উপস্থাপনা ও বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, অপরিহার্যতা ও দায়িত্ব প্রমাণ করার লক্ষ্যে যুক্তি প্রমাণের ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরাপদ পদ্ধতি প্রয়োগ অপরিহার্য।

কোরআনে মজিদে যে সমস্ত নবী রাসুলদের উল্লেখ এসেছে, তাদের বাস্তব জীবনে দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত বিবরণ এখানে পাওয়া যায় না। কোরআনে মজিদে কিছু কিছু মৌলিক ভূমিকার কথাই তুলে ধরা হয়েছে। আকিদা বিশ্বাস ও শরীয়তের বিস্তারিত প্রয়োগের পুর্ণাংগ দস্তাবেজ শুধুমাত্র আমাদের নবীর জীবনেই পাওয়া যায়। রাসুলে আজম তার নবুয়তী মর্যাদায় ও অবস্থানে দ্বীনে হককে পুর্ণাংগ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নবী একজন মানুষ হিসাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন তাই মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি আদর্শও ছেড়ে গেছেন। রাসুলেপাকের অবর্তমানে দ্বীনে হকের প্রতিষ্ঠা করা বা প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে রাসুলের অনুসরণ অপরিহার্য। দ্বীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে রাসুলের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিলো মূল উৎস। রাসুলের পর নেতৃত্বের এই কেন্দ্রীকতা ছাড়া ইকামতে দ্বীন সম্ভব নয়। তাই কোরআন মজিদে ও রাসুলের সুন্নাহয় খিলাফতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোরআনে মজিদে এই খিলাফতের মূলনীতি ও রাসুলের সুন্নাহয় এর বিস্তারিত আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলেপাকের তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরামগণ খেলাফত বা ইসলামী প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করে আবহমানকালের জন্যে প্রমাণ করে গেছেন যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

ছাড়া দ্বীনে হকের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপালন ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এই দায়িত্ব পালন প্রতিটি মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজবদ্ধ জীবনে সামষ্টিকভাবে ফরজ।

কোরআনে মজিদে বর্ণিত খেলাফতের মর্ম ও স্বরূপ নির্ণয়ে ও মতের পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

খেলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য

আল্লাহপাক হযরত আদম ও তার সন্তান সন্ততিদেরকে বিশ্বে খেলাফত প্রদান করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই খিলাফতের বিভিন্ন মর্ম ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ এসবগুলো মর্ম ও তাৎপর্যই এখানে প্রনিধানযোগ্য। নিচের আয়াতগুলোতে এসব মর্ম ও তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে।

এরসাদ হয়েছে;

و اذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة (البقرة – ٢٩)

(স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফিরিস্তাদের উদ্দেশে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বানাতে যাচ্ছি।)

আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে বনি আদমের দায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছে সুরা বাকারায় বর্ণিত আদম সৃষ্টির ও তাদেরকে বেহেশত থেকে বহিস্কার করার ঘটনার শেষের আয়াতে এভাবে,

فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هدى فلاخوف عليهم و لاهم يحزنون و الذين كفروا و كذبوا بايتنا

اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون – (البقرة – ٢٩)

(অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার তরফ থেকে হিদায়াত আসবে, অতঃপর যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য ভীতও হবেনা বা অতীতের জন্য অনুশোচিতও হবে না। এবং যারা কুফুরী করবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তারা দোজখের অধিবাসী হবে এবং সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।)

ثم جعلنكم خلائف فى الارض من بعد هم لننظر كيف تعملون –(يونس – ١٣)

(অতঃপর আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি যেনো দেখি তোমরা কি ভাবে আমল করো, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ কি ভাবে করো, তাই দেখার জন্যেই তোমাদেরকে খলিফা বানানো হয়েছে।)

هوالذى جعلكم خلائف فى الارض فمن كفر فعليه كفره – (فاطر – ٣٨)

(সেই আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন, যারা এই নিয়ামতকে অস্বীকার করবে তাদেরকে তার পরিনতি ভোগ করতে হবে।)

www.pathagar.com

(এবং আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জিবিকা তৈরী রেখেছি।)

و لقد مكناكم فى الارض و جعلناكم فيها معايش – (الاعراف – ١٠)

অর্থাৎ- পৃথিবীর যাবতীয় উপকরণাদি তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়েছি। এসব উপকরণাদি ব্যবহারে তোমাদের প্রতিনিধিত্ব পরীক্ষা করা হবে। তোমরা এসব আল্লাহর আমানত হিসাবে ব্যবহার করো, কিংবা নিজেদের মালিকানা হিসেবে।)

امنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه – (الحديد – ٦)

(আল্লাহর উপর ঈমান আনো এবং তার রাসুলের উপর এবং আল্লাহ যে নেয়ামতের উত্তরাধিকার দিয়েছেন তার থেকে খরচ করো।)

অর্থাৎ যে সব সম্পদ ও উপকরণ তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তার সঠিক ব্যয়ের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিনিধিত্বের পরীক্ষা করা হবে। সম্পদের ব্যবহারে তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করবে।

এই খিলাফতের দায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا – (الاحزاب-٧٢)

(আমি এই আমানত কে আসমান যমিন ও পাহাড়ের উপর অর্পণ করার প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তারা এই দায়িত্বের বোঝা উঠাতে অস্বীকার করেছিলো এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং মানুষ তা বহন করলো (কেননা) তারা ছিলো জালেম ও জাহেল।)

আয়াতের উল্লেখিত আমানতের মধ্যে খিলাফতের দায়িত্বসহ সকল প্রকার দায়িত্বই এসে যায়। আসমান যমিন বা পাহাড় এই দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা রাখেনা। তাদের অস্বীকৃতি ও ভীত হবার এটাই কারণ। খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষ এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি এবং দায়িত্বকে সঠিকভাবে বুঝে না নেয়ায় তাদেরকে আল্লাহ জালেম ও জাহেল বলেছেন। এই তিরস্কার দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে সঠিক দায়িত্বের অনুভূতি সৃষ্টি ও দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই অনুভূতি ও জ্ঞান তাকে দ্বীনের সার্বিক দায়িত্ব পালনে তৎপর করে দেয়।

هو الذى جعلكم خلائف فى الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما اتاكم – (الانعام –١٦٤)

(সেই আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন এবং একে অপরের উপর মানে উন্নত করেছেন যেনো তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন (তার ব্যবহারে) তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন।)

www.pathagar.com

মানুষের সমাজে ধনী দরিদ্র, দূর্বল সবল ইত্যকার শ্রেণী বিন্যাসকেও পরীক্ষার সামগ্রী বানিয়েছেন, অনাচার অবিচার উৎখাত করে মানবীয় সাম্য প্রতিষ্ঠা করাও খিলাফতের দায়িত্বের মধ্যে শামিল।
অতীতের ইতিহাসেও এই খিলাফতের মর্মতুলে ধরা হয়েছে।

عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الارض فينظر كيف تعملون - (الاعراف - ١٢٩)

(হে বনী ইসরাইল, শিঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রু (ফেরাউন) কে নিধন করবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানাবেন যেনো দেখেন তোমরা কেমন কাজ করো।)
অতঃপর নেতৃত্বে সমাসীন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে;

و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض و نجعلهم الائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم فى الارض - (القصص - ٥)

(এবং আমি ঐ সমস্ত লোকদের উপর অনুগ্রহ করতে চাই, (যাদেরকে দ্বীনের পথে চলার কারণে) দূর্বল করে রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে আমি নেতৃত্বে সমাসীন করি এবং তাদেরকে নেতৃত্বের অধিকারী বানিয়ে দেই এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে দেই।)

দ্বীনে হকের পথে চলার কারণে যাদেরকে পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, তাদের নেতৃত্ব প্রদান করার খোদায়ী অমোঘ ব্যবস্থার সুসংবাদই এখানে দেয়া হয়েছে। তারাই যে পরিণামে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, এই আয়াতে সেই ওয়াদা দেয়া হয়েছে।

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين - (الاعراف - ١٢٨)

(নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহরই, তিনি তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করেন (এই নেতৃত্বের প্রশ্নে ও আখেরাতের কল্যাণে) মুত্তাকীদের জন্যে ভাল পরিণতি।)

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে চান নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর যদি নেতৃত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নাও হয় তবে পরিণতিতে মুত্তাকীদের জন্যেই কল্যাণ রয়েছে।
এই নেতৃত্ব প্রাপ্তির পর মুমিনদের করণীয় কাজ তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে,

يا داؤد انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع الهوى فيضلك عن سواء السبيل - (ص - ٢٠)

(হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদান করেছি, তাই মানুষের মধ্যে হকের সাথে ফয়সালা করো এবং মনোবৃত্তির আনগত্য করো না, যা তোমাকে সহজ সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবে।)

www.pathagar.com

অর্থাৎ মুমিনদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, নিজেদের মর্জি মতো শাসন ও ফয়সালা করা যাবে না। আল্লাহর আইন চালু করতে হবে। হযরত ইব্রাহিমকেও একই কথা বলা হয়েছে;

انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين - (البقرة - ١٢٤)

(আমি তোমাকে জনগণের নেতা বানাতে যাচ্ছি, ইব্রাহিম বললেন, আমার সন্তান সন্ততিদের জন্যেও কি এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে? আল্লাহ বললেন, জালেমদের কাছে আমার এই ওয়াদা পৌঁছুবে না।)

অর্থাৎ পরবর্তীযুগে জনগণের মধ্যে যারা সত্যাশ্রয়ী তারাই শুধু নেতৃত্বের হকদার হবে। যারা সত্যাশ্রয়ী নয় বা যারা জুলুম করবে তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভূক্ত নয়।

و عد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم فى الارض كمااستخلف الذين من قبلهم -

এই আয়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আল্লাহর এই ওয়াদা খোলাফায়ে রাশেদীনদের যামানায় অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে, এবং কোরআনের ব্যাপক প্রয়োগ পদ্ধতিতে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও এই ওয়াদা বহাল রয়েছে।

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و أمروا با لمعروف و نهوا عن المنكر - (الحج - ٤١)

(এই সমস্ত লোক তারাই যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব প্রদান করি তবে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সুকৃতির নির্দেশ দেবে এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।)

এই আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় দায়ীত্ব ও কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। নামাজের প্রতিষ্ঠা, যাকাতের প্রচলন এবং সুকৃতির নির্দেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের আয়াতগুলোতে মুসলমানদের খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দায়ীত্বের কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

খিলাফত ও ইমামতের অর্থ

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে তাকে 'খিলাফত' বা 'ইমামত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, শরীয়তের পরিভাষায় দুইটি সমার্থক শব্দ হলেও মর্মে ও তাৎপর্যে ভিন্নতর। নামাজের ইমামতিকে ইমামত ও রাষ্ট্রের ইমামতিকেও ইমামতই বলা হয়। ইসলামের পন্ডিতেরা এই দু'য়ের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে নামাজের ইমামতকে 'ইমামতে ছোগরা' (ছোট ইমামতি) ও

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের ইমামতকে 'ইমামতে কোবরা' (বড় ইমামতি) বলে অভিহিত করেছেন। ইমামতির অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্যে সার্বিকভাবে সামঞ্জস্য রয়েছে।
পক্ষান্তরে খিলাফতের মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাপকতর,
খিলাফতের শাব্দিক অর্থে বলা হয়েছে;

مصدر خلف يخلف خلافة : بقى بعده أو قام مقامه و كل من يخلف شخصا أخر يسمى خليفـــة . لذلك سمى من يخلف الرسول فى اجراء الاحكام الشرعية و رئاسة المسلمين فى امور الدين و الدنيـا خليفة و يسمى المنصب خلافة وامامة – (محيط المحيط)

(মূল শব্দ (خلـف) এর উৎস, এর অর্থ হলো যা পরে আসে (স্থলাভিষিক্ত হওয়া) কিংবা কারো প্রতিনিধিত্ব করা, যে ব্যক্তি কারো স্থলাভিষিক্ত হয় তাকে বলা হয় খলিফা, এ জন্যেই যিনি রাসুলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন শরীয়তের বিধান চালু করার জন্য এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে মুসলমানদের নেতৃত্বে দিতে গিয়ে, এই পদকে বলা হয়েছে খিলাফত বা ইমামত।) এই খিলাফতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনে খলদুন বলেছেন;

هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الاخروية و الدنيويـة الراجعـة اليـها – (مقدمة)

(জনসাধারনের পার্থিব ও আখেরাতের স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয় সমুহকে শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত করা।)
এ কথার ব্যাখা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين و الدنيا –(مقدمة ابن خلـدون ص – ١٩١)

(খিলাফত আসলে দুনিয়া ও আখেরাতের সংরক্ষণে রাসুলে আজমের প্রতিনিধিত্ব।)
এমনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সর্বকালের ও সর্বযুগের জন্যেই ফরজ। ইসলামের ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে এর অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।
ইমাম তাহতাভী বলেছেন,

أجمعت الامة على وجوب عقد الامامة و على أن الامة يجب عليها الانقياد لامام عادل ، يقيم فيـهم احكام الله و يسوسهم باحكام الشريعة التى اتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ولم يخرج عـن هذا الاجماع من يعتد بخلافة – (حاشية الصحطاوى على الدر ١ / ٢٣٨)

(মুসলিম উম্মাহ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার প্রশ্নে এক মত, এটা ফরজ যে মুসলমানগণ একজন নিষ্ঠাবান নেতার আনুগত্য করবে, যিনি তাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসুলের বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সর্বসম্মত মতের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন মত নেই।

www.pathagar.com

هذه الاية أصل فى نصب أمام و خليفة يسمع له و يطاع لتجمع الكلمة و تنفذبة احكام الخليفة و لاخلاف فى وجوب ذلك بين الائمة – (تفسير قرطبى)

(হযরত আদমকে খলিফা বানানোর প্রসংগে অবতীর্ণ আয়াতের তফসীরে একথাটি বলা হয়েছে) আসলে এই আয়াতটি ইমামত বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ, যার আনুগত্য অপরিহার্য, যার দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খিলাফতের বিধান সমুহ কার্যকরী করা হবে। এই ব্যবস্থা ফরজ হওয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন দ্বিমত নেই, আর না ইমামদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য রয়েছে।) অতঃপর ইমাম কুরতুবী ইমামদের মধ্যে একটি মাত্র মত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মোটেই উল্লেখ যোগ্য নয়।

এ প্রসংগে আলোচনার উপসংহারে তিনি লিখেছেন;

ثم ان الصديق لما حضرته الوفاة عهد الى عمر فى الامامة و لم يقل احد هذا امر غير واجب علينا و لاعليك مدل على وجوبها و انها ركن من اركان الدين الذى به قوام المسلمين – (تفسير القرطبى)

(অতঃপর যখন হযরত আবুবকরের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো তিনি হযরত উমরের কাছে পরবর্তী নেতৃত্বের শপথ নিলেন, সে সময় কেউ বলেননি যে এটা আমাদের (উম্মাহর) উপর বা আপনার (আবুবকর রাঃ) উপর ফরজ নয়। এটা এর ফরজিয়াত প্রমাণ করে। এই ব্যবস্থা হলো দ্বীনের ঐ সমস্ত স্তম্ভগুলোর একটি যার উপর মুসলিম উম্মাহ প্রতিষ্ঠিত।)

ইমামগণ, উলেমাসমাজ, মোফাসেসরীনদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ব্যবস্থার ফরজীয়াতের পক্ষে মতামত দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু রাখা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরজ।

এখানে অপরাপর ইমামদের আরও মতামত উল্লেখ করা যেতো কিন্তু একই ধরনের কথারই পুনরাবৃত্তি হতো। যারা এ প্রসংগে বিস্তারিত জানতে চান, তাদেরকে নিচের বইগুলো দেখার অনুরোধ করি।

الاحكام السلطانية للماوردى ص۳ حاشية ابن عابدين ۱–۳٦۸ الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ٤–۹۰ السياية الشرعية لابن تيمية مقدمة ابن خلدون – الاحكام السلطانية لابى يعلى ص ٤

(এই সমস্ত গ্রন্থগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ভূমিকা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে ও মধ্য যুগে এই বিষয়ের উপর লিখিত বইয়ের কোন অন্ত নেই। কোন গ্রন্থেই এ কথা বলা হয়নি যে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অপরিহার্যতা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দিক ও বিভাগের উপর তথ্যবহুল জ্ঞানের কোন অভাব নেই, প্রয়োজন হলো বাস্তবায়নের।)

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখিত কোরআনে মজীদের আয়াত সমূহ ও বিভিন্ন ইমামদের মন্তব্যাদী থেকে স্পষ্ঠ হয়ে গেছে যে 'খিলাফত' শব্দের শাব্দিক অর্থে পার্থক্য থাকলেও ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থে কোন মত পার্থক্য নেই।

আবার শাব্দিকভাবে যে দু'টি অর্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যেও মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। বরং এই দুইটি অর্থই সমভাবে প্রযোজ্য।

এই দুইটি অর্থ হলো,

(১) পূর্বতন কোন সৃষ্টির স্থলাভিষিক্ত হওয়া, কোন গোষ্ঠী, জাতি সম্প্রদায় বা শ্রেণীর ক্ষমতা বা মর্যদার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার এই ধারা মানবেতিহাসের এক অকাট্য সত্য। উপরের কোন কোন আয়াতে খেলাফতের এই অর্থটি প্রকাশ পেয়েছে। এই অর্থে আদমকে খলিফা বানানোর অর্থ হলো, পূর্বতন সৃষ্টি জ্বীনদের স্থলে বনী আদমকে আবাদ করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের স্থলে অন্য জাতি ও সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করার এই পরম্পরাকে খিলাফত বলা হয়েছে। কোরআনের ভাষা অনুযায়ী এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও আমলের পরীক্ষা। স্থলাভিষিক্ত জাতি বা সম্প্রদায় পূর্বের জাতি বা সম্প্রদায় হতে শ্রেয় কিনা তা দেখার উদ্দেশ্যেই এই পরিবর্তন। এই অর্থটি এর দ্বিতীয় অর্থটির পরিপন্থি নয়। বরং পরিপূরক।

(২) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করা। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ দেয়া সমস্ত ক্ষমতা ও নিয়ামতের ব্যবহার করা। খেলাফতের এই দায়িত্ব পালনের কয়েকটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে।

প্রথমতঃ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বা শক্তির প্রয়োগ করবে, নিজস্ব ক্ষমতা হিসাবে নয়। বরং আল্লাহর আমানত হিসেবে। আল্লাহপাক পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের নিয়ন্ত্রনে দিয়েছেন। তাই এই সব সৃষ্টির ব্যবহারে তাকে আল্লাহর আইন মেনে চলতে হবে। আল্লাহর বিধানকে তার ব্যক্তি স্বত্তার উপর সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাক মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন, ধনী-দরিদ্র, সবল-দূর্বল বা বড় ছোটর পার্থক্য সর্বত্র বিরজিত, ধনীরা দরিদ্রদের, সবলরা দূর্বলদের বা বড়রা ছোটদের প্রতি সদয় হতে হবে। এই সম্পর্ক নির্ণয়ে আল্লাহর আইন মেনে নিতে হবে। সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এই দায়িত্ব থেকে কেউ মুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যখন মুমিনদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক আল্লাহ ও রাসুলের শিক্ষানুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এই সম্পর্ক সমাজের সর্বস্তরে একই নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। খেলাফতের এই মর্ম ও তাৎপর্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতাই প্রমাণ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ছাড়া খেলাফতের এই মহান দায়িত্ব পালনের কোন উপায় নেই।

www.pathagar.com

উপরের আলোচনা থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, মুসলিম সমাজে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোর একটি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে ইসলামের বিরাট অংশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে এবং এই বিরাট গোনাহ থেকে নিস্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বত্রভাবে প্রচেষ্টা চালানো।

ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার প্রশ্নটি কোন প্রচ্ছন্ন বিষয় নয়। কিংবা এই ফরজিয়াতকে এড়িয়ে চলা কোন নগন্য অপরাধ নয়। ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির ফলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাটি সাধারনভাবে প্রচ্ছন্ন ধারণায় পরিণত হয়ে পড়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া খন্ডিত ইসলামী অনুশাসন মেনে চলাই স্বাভাবিক জীবন ধারায় পরিণত হয়েছে। এই স্বাভাবিক জীবন ধারা আমাদের সামগ্রীক জীবনকে গ্রাস করে নিয়েছে। ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে চরম অপ্রতিকুল পরিবেশে যে অস্বাভাবিক জীবন ধারার পত্তন হয়েছিলো, হকপন্থি উলেমারা সেই পরিবেশের সাথে আপোষ না করা সত্বেও ঐ অস্বাভাবিক জীবন ধারাকে পরিবর্তন করার সুযোগ পান নি। আজ সেই অস্বাভাবিক জীবন ধারাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবন ধারা বলে কবুল করে নেয়া হয়েছে। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারনাকে সাধারণ মুসলমান জনসাধারণের সাথে সাথে উলেমারা ও নিতান্ত অজানা অচেনা আগন্তুক মনে করে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন।

জনশক্তির মূল্যায়ন এবং উলেমাদের ভুমিকা ও দায়িত্ব

দেশের জনশক্তি হলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান, তাই জনশক্তির বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন যে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। আদর্শ প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুসলমান জনশক্তিকে মুটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম শ্রেণীটি হলো সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল সমুহ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত শ্রেণী, যারা সককারের শাসন-প্রসাশনের প্রতিষ্ঠান সমূহে, দেশের সামরিক আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর পরিচালনায়, বিচার বিভাগের সর্বত্র এবং জাতীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নিয়োজিত রয়েছেন। এক কথাই তারাই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের সকল পর্যায়ে সার্বিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যানে ইসলামী আদর্শবাদ সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে যান, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ তাদের চিন্তা জগতকে আবচ্ছন্ন করে ফেলে, ফলে তারা পাশ্চাত্যের জীবনধারাকেই আজকের গ্রহণযোগ্য জীবনধারা রূপে গ্রহন করে নেয়। তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্মহীন গনতন্ত্র তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বলে স্বীকৃতি পায়। বিদেশী উপনিবেশবাদীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের মানসপুত্র তৈরীরই এটা মাধ্যম মাত্র। এই শিক্ষা ব্যবস্থা, পারিবারিক বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে একজন মুসলিম মানসকে দ্বীন সম্পর্কে অবশ্যি

www.pathagar.com

বিদ্রোহী করে তুলে, কমপক্ষে সন্দেহ পরায়ন করে দেয়। আজকের মুসলিম সমাজের চাবিকাঠি সাধারনভাবে এ ধরনের লোকদেরই হাতে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হলো দ্বীনি মাদ্রাসা সমুহ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত লোকেরা, যারা আলেম বলে পরিচিত। তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ সরকার অনুমোদীত আলীয়া মাদ্রাসা সমূহ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত আর অন্য ভাগটি হলো বেসরকারী কওমী বা নেজামী মাদ্রাশ সমুহ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। এসব আলেম বা উলেমারা মাদ্রাসা, মকতব ও মসজিদ কেন্দ্রিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। রাজনৈতিক, সামাজিক আর্থিক ও অপরাপর বৈষয়িক বিষয়াদীতে তারা প্রথম শ্রেনীর বা অপরাপর প্রভাবশালী লোকদের অধীন। এ সমস্ত উলেমারা দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাত বন্দেগী সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ওয়কিফহাল হলে ও বৈষয়িক ও ব্যবহারিক বিষয়াদী সম্পর্কে কোন জ্ঞান পান না। তাই ইসলামী আদর্শবাদকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ব্যাপারে তারা কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হন। আধুনিক মানসের জিজ্ঞাসাবাদ তাদের চিন্তার বাইরে থেকে যায়। মুসলিম সমাজে ইসলামী জীবনবোধকে জীবিত রাখার জন্যে দ্বীনে ইলমের চর্চা ও সংরক্ষশ অপরিহার্য শর্ত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চরম অপ্রতিকূল অবস্থায় ইসলামকে তার মৌলিকত্বে টিকিয়ে রাখার জন্যেই হকপন্থি আলেমগণ দ্বীনে ইলমকে জীবিত ও সংরক্ষিত রাখার তাকিদেই এই দ্বিতীয় শ্রেণীটির জন্ম দিয়েছিলেন, যেন তারা সর্ব অবস্থায় ইসলামী ইলমের চর্চা ও সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকেন এবং পরিস্থিতির অপ্রতিকুলতা সরে গেলেই যেন তারা ইসলামকে তার স্বকীয় মর্যাদায় সমাজের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাফ্যল্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি যে সমাজের একটি শ্রেণী দ্বীনি ইলমের ঝান্ডা বহন করে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং আজও এই শ্রেণীটির কল্যাণেই ইসলাম তার খন্ডিতরূপে হলেও সমাজে টিকে রয়েছে। এই শ্রেণীটির অস্বিত্ব না থাকলে এই সমাজের কি পরিণতি হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই শ্রেণীটিই হলো উম্মতের আদর্শিক চিকিৎসক, মুসলিম সমাজের সকল আদর্শিক রোগ তারাই নিরাময় করবেন। কিন্তু তারা নিজেরাই আজ রোগাক্রান্ত ও মুমূর্ষ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। তারাই উম্মাহর চিকিৎসক, কিন্তু তারাই যখন রোগী, তাদের চিকিৎসা কে করবেন? এ পথে উলেমাদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ডাক্তার রোগাক্রান্ত হলে ডাক্তারই তার চিকিৎসা করেন।

সত্যিকার আলেমগণ হলেন নবীর ওয়ারিস, (উত্তরাধীকারী) নবীরা ধন সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে যান না, তারা ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। এই ইলমের উত্তরাধিকারের চাইতে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। আদর্শের ইলম সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার যার দ্বারা আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা সম্ভব। ইসলামে প্রয়োজনীয় দ্বীনে ইলমকে প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর উপর ফরজ করা হয়েছে। ইসলামের ইলমের পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে এই বইয়ের প্রথম দিকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইলম বলতে শুধু দ্বীনি ইলম

www.pathagar.com

বুঝায় না, পৃথিবীর এই কর্মক্ষেত্রের জ্ঞান না থাকলে দ্বীনি ইলমকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। দ্বীনে ইলমের সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান অর্জন করলে উলেমা সমাজ এই উম্মাহর সফল চিকিৎসক হতে পারেন। ইলমের এই গুরুত্বের কারণেই কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

وما كان المومنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون – (التوبة ١٢٢)

(মুমিনদের সবাইকে (জিহাদের পথে) বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। কেন এমন হবে না যে প্রত্যেক গোষ্ঠীর থেকে এক এক দল বেরিয়ে পড়বে যেন তারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বুৎপত্তি লাভ করবে এবং যখন তাদের গোষ্ঠীর কাছে ফিরে যাবে তাদের জনসাধারনকে (শয়তানের পথকে এড়িয়ে আল্লাহর পথে চলার জন্যে) ভীতি প্রদর্শন করবেন, যেনো তারা (বিভ্রান্তি থেকে) বেঁচে থাকতে পারে।)

একই বিষয়ে বোখারী ও মোসলেমের হাদীসে বলা হয়েছে;

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين – (متفق عليه)

(আল্লাহ পাক যখন কারো কল্যাণ করতে চান, তাকে দ্বীনের বুৎপত্তি দান করেন) এখানে ইলম অর্জনের কথা না বলে 'তাফাককুহ' (تفقه) অর্জনের কথা বলা হয়েছে। (تفقه) শব্দটি তার মূল (فقه) 'ফিকাহ' শব্দ থেকে উৎসারিত। এর অর্থ হলো প্রজ্ঞা বা বুৎপত্তি অর্জন করা। প্রচলিত ফিকাহ শব্দের বা বিষয়ের ও মূল বক্তব্য এটাই ছিলো। ঈমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) সর্ব প্রথম ফিকাহ সংকলন করেন, তিনি ফিকাহর যে অর্থ করেছেন তা হলো, এমনি প্রজ্ঞা যা একজন মানুষকে ইসলামের মর্ম ও তত্ব সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম করে তুলে। সে বুঝতে পারে যে কোন কোন কাজ তাকে করতে হবে, আর কোন কোন কাজ বর্জন করতে হবে, এটা ইসলামী শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে পরিব্যপ্ত। সে যুগে ফিকাহ বলতে সেই প্রজ্ঞাকে বুঝানো হতো, অর্থাৎ ইলমের দুইটা পর্যায়, একটা হলো ইসলামের মৌলিক জ্ঞান যা অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ। আরেকটা পর্যায় হলো ইসলামের দ্বীনের (تفقه) বা প্রজ্ঞা, যা সমাজের কতিপয় উলেমারাই অর্জন করতে পারেন, সবার জন্যে ফরজ নয়। কোরআন হাদিসের মৌলিক জ্ঞান, যাকে ফরজ করা হয়েছে, যা একজন ব্যক্তিকে দ্বীনের পথে থাকতে বা আমল করতে সাহায্য করে। কিন্তু ইলম শুধু সেটুকুই নয়, ইলমের প্রজ্ঞা এমন একটি যোগ্যতা যা দুনিয়া ও আখেরাতের জ্ঞানের সমাহার, মানুষের জীবনের সার্বিক সমস্যাগুলোর উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্যে করে। এই প্রজ্ঞা ছাড়া সমাজ জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়না। ইসলামের সামাজিক প্রয়োগ পদ্বতি নির্ধারনে এই প্রজ্ঞার প্রয়োজন। উপরের আয়াতে সকল গোষ্ঠীর কিছু কিছু লোককে এমনি প্রজ্ঞা অর্জনের আহবান জানানো হয়েছে। রাসুলেপাকের জীবদ্দশায় তারা তারই সান্নিধ্যে

www.pathagar.com

দ্বীনের প্রজ্ঞা হাসিল করতেন এবং স্ব-স্ব-এলাকায় ফিরে গিয়ে জনসাধারনকে ইসলামের শিক্ষা দিতেন। আজকের যুগে হক পন্থি আলেমদেরকে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। হক পন্থি আলেমগন এই দায়িত্ব আঞ্জান না দিলে বাতিল পন্থি আলেম রূপী লোকেরা এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জনগনকে বিভ্রান্ত করবে।

মায়ারূফ ও মনকার

উলেমাদের এই মর্যাদার কারণে তাদের দায়িত্ব ও বেশী। যেহেতু দ্বীন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বেশী তাই তাদের দায়িত্বও বেশী। ভাল কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার কাজটি যদি ও সমস্ত মুসলমান নরনারীর জন্যে প্রযোজ্য, কিন্তু যেহেতু ইসলামের 'ভাল ও মন্দ' (منكر و معروف) কাকে বলে তা উলেমারাই ভাল করে জানেন, তাই এই কাজের দায়িত্ব ও কার্য্যতঃ উলেমাদের উপর এসে বর্তায়। ইসলামের দৃষ্টিতে যে সমস্ত কাজ ভাল বলে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত বা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে যে সমস্ত কাজ ভাল কাজ বলে সাধারনভাবে পরিচিত, সেগুলোই শরীয়তের দৃষ্টিতে সুকৃতি বা মারুফ, এর বিপরিতে যে সমস্ত কাজ নিঃ সন্দেহে গর্হিত বা মন্দ কাজ বা যা সাধারন ভাবে শরীয়তের দৃষ্ঠিতে মন্দ কাজ বলে পরিচিত, তাকেই মন্দ বা মোনকার বলা হয়।

ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার কাজটি ইসলামী সমাজের জন্য মৌলিক কাজগুলোর মধ্যে পরিগণিত। যে সমাজে এই দায়িত্বটি পালন করা হয় না সেটি ইসলামী সমাজের চরিত্র হারিয়ে ফেলে। সৎকাজের লালন ও অসৎকাজকে ঘৃণা করার পরিবেশ সৃষ্টি না হলে সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোরআনে মজিদে এই মহান দায়িত্বটিকে যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা একটু গভীর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে ইলমের যেমন দুইটা পর্যায় রয়েছে, যার একটি হলো সাধারন ভাবে সকল মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ আর অন্য পর্য্যায়টি হলো ইলমের সংরক্ষণ যা উলেমাদের দায়িত্ব। দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলম সবার প্রতি ফরজ নয় ও বাস্তবে সম্ভব ও নয়। তেমনি সুকৃতির নির্দেশ ও দুষ্কৃতির নিষেধের ও দুইটি পর্যায় রয়েছে। একটি হলো সাধারনভাবে প্রতিটি মুসলমানদের প্রতি ফরজ। প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। এই দায়িত্বের প্রকৃতি ও ধরন ভিন্নতর। যাকে হাদীসে বলা হয়েছে এ ভাবে,

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع و هو مسئول عن رعيته ، و المرأة راعية فى بيت زوجها و هى مسئولة عن رعيتها و الولد راع فى مال ابيه ، و هو مسئول عن رعيته ، و العبد راع فى مال سيده ، و هو مسئول عن رعيته ، الآ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته- (متفق عليه)

www.pathagar.com

(তোমাদের প্রত্যেকই শাসক (রক্ষক) এবং তোমাদের সবাই তার শাসিতদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল, জনগণের শাসক তার প্রজাদের উপর দায়িত্বশীল, স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর উপর দায়িত্বশীলা, সে তার রক্ষক, সন্তান তার পিতার অর্থের উপরে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাস তার প্রভূর সম্পদের রক্ষক, সে এর দায়িত্বশীল। অতঃপর তোমরা সবাই শাসক (রক্ষক) এবং তোমাদের সবাইকে তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।) - বোখারী ও মুসলিম।

দায়িত্বের এই প্রাকারভেদে সুকৃতির নির্দেশ ও দুষ্কৃতির নিষেধ কার্যকরী। জ্ঞান, যোগ্যতা, ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে এই দায়িত্বের শ্রেণী বিন্যাস করা হবে। উপরের হাদিসে এই দায়িত্বের প্রকারভেদ সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে প্রতিটি মানুষের যোগ্যতা সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। আল্লাহ পাকের এই নীতি এখানে প্রযোজ্য;

لايكلف الله نفسا الا وسعها - (البقرة)

(আল্লাহপাক কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়ী করবেন না)

সম্পর্কের মৌলিকত্বের ভিত্তিতে এই দায়িত্বের সূচনা হয় এবং পর্যায়ক্রমে এর পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী অনুযায়ী এই দায়িত্বের সুদৃঢ় বন্ধন গোটা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। কোরআন মজিদে এরসাদ হয়েছে;

و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم - (التوبة ٧١)

(সকল মুমিন নর নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সুকৃতির নির্দেশ দেয়, দুষ্কৃতি থেকে নিষেধ করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে। তারাই এমন যাদের উপর আল্লাহ অচিরেই অনুগ্রহ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।)

এখানে সাধারণ জনসাধারণের দায়িত্বের কথাই বলা হয়েছে। সমাজের কেউ এই দায়িত্বের বাইরে থাকেনা। মুমিনদের এই চরিত্রই অপর একটি আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে;

الامرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود الله و بشر المومنين (التوبه١١٢)

(মুমিন নর-নারী হলো সুকৃতির নির্দেশদাতা, দুষ্কৃতির নিষেধকারী, আল্লাহর (আদেশ নিষেধের) সীমার রক্ষাকারী, (হে নবী আপনি) তাদেরকে সুসংবাদ দিন।)

মুমিনদের এই সম্পর্ক তাদেরকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করে। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি সমাজকে পঙ্কিলতা মুক্ত, পুত পবিত্র করে তুলে। সুকৃতির লালন ও দুষ্কৃতির বিরূদ্ধে প্রতিরোধ বুহ্য গড়ে উঠে। এই দায়িত্বের অনুভূতি তাদেরকে সজাগ করে রাখে। যদি এই অবস্থায় মুমিন সমাজ এই দায়িত্ব পালন না করে তবে সমাজের সবাই আল্লাহর রোষানলের শিকার হয়।

হাদিসে এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

عن ابى بكر الصديق رض قال انى سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقـــول – ان النـــاس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه او شك ان يعمهم الله بعقاب منه (رواه ابو داود و الترمذى والنسائى)

(হযরত আবুবকর সিদ্দিক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলেপাকের কাছে শুনেছি তিনি এরসাদ করেছেন, জনগণ যখন কোন অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখে অতঃপর তাকে বাধা না দেয়, তখন আল্লাহর তরফ থেকে তাদের সবার প্রতি আজাব আসা নিকটতর হয়ে যায়।)

এই বিষয়টিই কোরআনের আয়াতে এরসাদ হয়েছে এ ভাবে,

واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة و اعلموا ان الله شديد العقاب (الانفال ٢٥)

(তোমরা সেই বিপদ থেকে সাবধান হয়ে যাও, যা তোমাদের মধ্যে শুধু তাদেরকেই গ্রেফতার করবেন যারা তোমাদের মধ্যে জুলুম করেছে। জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।)

এ কথাটি নিচের হাদীসে আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে;

ان الله لايعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا و المنكر بين ظهرانيهم و هم قادرون على ان ينكـــروه فلاينكروه فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة و العامة –

(আল্লাহপাক কিছু লোকের অপরাধে সাধারন ভাবে সকলকে শাস্তি দেন না, যতক্ষন পর্যন্ত সাধারন জনগণের অবস্থা এমন হয়ে না যায় যে তারা তাদের সামনে অসৎ কাজ হতে দেখে, এবং তারা সেই অসৎ কাজের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু প্রতিবাদ করেনা। অতঃপর সাধারন লোকদের অবস্থা এমনতর হয়ে যায়, তখন আল্লাহ বিশেষ ও সাধারন লোকদেরকে সমভাবে শাস্তি দেন।)

সুকৃতির নির্দেশ ও অন্যায় কাজ হতে বারণ করার এটা সাধারন নিয়ম। এই দায়িত্ব পালন না করার সাধারন পরিণতি ও এই হাদিসে তুলে ধরা হয়েছে। এই দায়িত্ব থেকে সমাজের কেই অব্যহতি পেতে পারেনা।

الامر بالمعروف و النهى عن المنكر –

বা সুকৃতির আদেশ ও দুস্কৃতির নিষেধের দায়িত্বের এই সাধারন পর্যায় ছাড়া আর একটি বিশেষ পর্যায় রয়েছে, সে পর্যায়ের দায়িত্ব উম্মতের আলেম সমাজের উপর এসে বর্তায়। যে সমস্ত বিষয় গুলো সমাজের সাধারন লোকদের সামর্থের আওতায় আসেনা বা তাদের চিন্তা ও ক্ষমতার গন্ডির বাইরের, সে সব বিষয়ে এই দায়িত্ব পালন উলেমাদের জন্যে অপরিহার্য। উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে যে শাসন ক্ষমতায় বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমালোচনা বা সমাজের প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থের বিরূদ্ধে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনমত গড়ে তোলার কাজ উলেমাদেরই আঞ্জাম দিতে হবে। এই বিষয়ের উপর কোরআনের আয়াত সমুহের বিন্যাসে ও যার প্রমান পাওয়া যায়। কোরআনে এরসাদ হয়েছে,

www.pathagar.com

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر واولئك هم المفلحـــون – (ال عمران ١٠٤)

(হে মুমিন সমাজ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী থাকতে হবে যারা কল্যাণের পথে ডাকবে, সুকৃতির নির্দেশ দেবে এবং দুস্কৃতির নিষেধ করবে, তারাই সাফল্য লাভ করবে।)

এই আয়াতের মধ্যে (امـــة) শব্দটির অর্থ হলো একটি গোষ্ঠী বা দল, যার অর্থ হলো সমাজের উলেমা শ্রেণী, তাদের দায়িত্বই মুখ্য। সমাজে এই কাজের চেতনা সৃষ্টির দায়িত্ব ও তাদেরই। এই কাজের অনুপস্থিতিতে সমাজের কি মারাত্বক পরিণতি হতে পারে তা উলেমারা ভাল করেই জানেন।

আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بـــالله – (ال عمـــران ١١٠)

(তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠী, তোমাদেরকে মানুষের জন্যে গড়ে তোলা হয়েছে যেনো তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দান করো ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করো।)

শ্রেষ্ঠ উম্মত তখনই হয় যখন তারা জ্ঞান ও আমলে বলীয়ান হয়, তাই এর অর্থ উলেমা সমাজই।

বনী ইসরাইল উলেমাদের ব্যর্থতা ও পরিণতির নিরিখে উম্মতে মোহাম্মদীর উলেমাদের সর্তক করে দেয়া হয়েছে এভাবে,

اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلاتعقلون – (البقرة ٤٤)

(হে আলেম সমাজ) তোমরা কি মানুষদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা তা আমল করোনা, কিন্তু তোমরাই কিতাব পড়ছো (এই বৈপরিত্য কেন?) তোমরা কি তা বুঝ না?)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

يايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون – (الصف٢)

(হে মুমিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো যার উপর আমল করো না। আল্লাহর কাছে এটা বিরাট অপরাধ যে তোমরা এমন কথা বলবে যা আমল করবে না।)

এসব সমালোচনা ও সতর্কবাণী নিঃসন্দেহে আলেমদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

عن حذيفة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال و الذىنفسى بيده لتـــأمرون النـــاس بالمعروف و تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ان يعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلايستجاب لكـــم – (رواه الترمذى)

www.pathagar.com

(ঐ আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার জীবন, তোমরা লোকদেরকে সুকৃতির নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে, অন্যথায় সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে যে আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।)

এই দায়িত্ব পালন না করার এর চেয়ে মারাত্মক পরিনতি আর কি হতে পারে? এই দায়িত্ব নিঃসন্দেহে উলেমাদেরই দায়িত্ব। উলেমারাই এই দায়িত্বের গুরুত্ব সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

হাদীসে এরসাদ হয়েছে;

عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال : افضل الجهاد کلمة عـدل عند سلطان جائر – (رواه ابو داود و الترمذی)

(সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে ইনসাফের আওয়াজ উঠানো ।)

এ কাজের দায়িত্ব আলেম সমাজ ছাড়া আর কাকে দেয়া হয়েছে?

নিচের হাদীস থেকে বিষয়টি আরো সম্পষ্ট হয়ে যায় যে এটা আলেমদেরই মূখ্য দায়িত্ব। আলেমদের কল্যাণেই এই দায়িত্বের বাস্তবায়ন সম্ভব।

এরসাদ হয়েছে,

عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی الله علیه و سلم قال مثل القائم فی حدود الله و الواقـع فیـها کمثل قوم استهموا علی سفینة فصار بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها و کان الذین فی اسـفلها اذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالو: لو انا خرقنا فی نصبنا خرقا و لم نوذ مـن فوقنـا فـان ترکوهم و ما ارادوا هلکو جمیعا و ان اخذوا علی ایدیهم نجو و نجو جمیعا – (رواه البخاری)

(আল্লাহর আদেশ নিষেদের সীমা সংরক্ষনে ও সীমা লংঘনের উপমা সেই লোকদের মতো যারা একটি জাহাজে সমুদ্র সফর করেছিলো, তাদের এক শ্রেণী জাহাজের উপর তলায় এবং আরেক শ্রেণী নিচের তলায় অবস্থান নিয়েছিলো। নিচের তলায় অবস্থানরত লোকদেরকে (প্রয়োজনীয়) পানি সংগ্রহে উপর তলায় লোকদের সামনে দিয়ে যেতে হতো (এতে উপর তলার লোকেরা বিরক্ত হতো) তখন তারা বললো, যদি আমরা আমাদের অংশে সিদ্র করে নেই এবং উপরের লোকদের কষ্ঠ না দেই (এতে তারা নিচে থেকেই পানির ব্যবস্থা করতে পারবে) অতঃপর যদি তারা তাদেরকে এই কাজের জন্যে ছেড়ে দেয় এবং তাদেরকে বাধা না দেয় তবে সবাই ধবংস হয়ে যাবে, এবং যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় তবে তারা বেঁচে যাবে, সবাই বেঁচে যাবে।)

আল্লাহর নির্ধারিত সীমা সমুহের লংঘনে যখন আল্লাহর গজব দ্বার প্রান্তে পৌছে যায়। এবং অবশ্যম্ভাবী গজবে যখন সবারই অস্তিত্ব সংকটাবর্তে এসে যায়। তখন ও যদি বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরা বা উলেমা সমাজ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের

www.pathagar.com

নিষেধের দায়িত্ব আঞ্জাম না দেয়, তবে সবার ধবংস অনিবার্য হয়ে যায়। এখানে আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ ও নিষেধ ও আল্লাহ নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞ্যানের অভাবে বা এই সীমা লংঘনের মারাত্মক পরিনতি সম্পর্কে অজ্ঞতার শিকারে নিমজ্জিত সমাজের সাধারন মানুষদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব আলেমদের উপর দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে উলেমাদের সর্তক করে দেয়া হয়েছে যে মারাত্মক পরিনতির এই জ্ঞান থাকা সত্বে ও যদি আলেমগন দায়িত্ব পালন না করেন তবে কেউ নিস্তার পাবে না, তারা ও নিস্তার পাবে না।
নিচের আয়াতে বনি ইসরাইলের উদাহরন তুলে ধরা হয়েছে;
এরসাদ হয়েছে;

و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذهم عذابا شديدا ، قالوا معذرة الى ربكـــم و لعلهم يتقون – فلما نسوا ما ذكروابه انجينا الذين ينهون عن السو ۶ و اخذنا الذين ظلموا بعـــذاب بئيس بما كانوا يفسقون – فلما عتوا عن ما نهـــوا عنـــه قلنـــا لهـــم كونـــوا قـــردة خســئين –

(الاعراف١٦٥)

(যখন তাদের একদল অন্য দলকে বলেছিলো , তোমরা কেন এমন লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছো, যাদেরকে আল্লাহ ধবংস করে দেবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন? আরা বললো, আমরা এ কাজ তোমাদের রবের সামনে নিজেদের সাফাই হিসাবে করছি (যে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্ঠা করেছি) এবং এই আশাবাদে করেছি যে তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হবে। (অসৎ পথ থেকে ফিরে আসবে) অতঃপর যখন তারা ঐ সমস্ত উপদেশ একেবারেই ভূলে গেলো, তখন আমি তাদের মধ্যে থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকেই রক্ষা করলাম যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্ঠি করতো এবং জালেমদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারনে কঠোর শাস্তির মধ্যে পাকড়াও করলাম। এর পর ও যখন তারা অবাধ্যতার পথে বিদ্রোহ করতেই থাকলো, তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট ও লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও।)

আয়াতের মধ্যে স্পষ্টতঃ সেই সমাজে তিনটি শ্রেণীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (১) সীমা লংঘন কারী ও বিদ্রোহী শ্রেণী (২) আল্লাহর আদেশ নিষেধের অনুসরন কারী কিন্তু অপরাধীদের বিরুদ্ধে নীরব ও তাদের প্রতি আল্লাহর গজবের প্রত্যাশী (৩) অপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার মুমেনদের শ্রেণী। উপরোক্ত আয়াতে শুধু তৃতীয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আজাব থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নীরব ইমানদারদেরকে এই আজাব থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়নি। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আজাবে গ্রেফতারের কথা বুঝা যায়। তবে কোন কোন তফসীরের ব্যাখানুযায়ী আজাব শুধু প্রথম শ্রেণীর জন্যে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ নীরব রয়েছেন।

www.pathagar.com

মত-পার্থক্য যাই থাকুক না কেন। আয়াতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে আজাব থেকে রক্ষা করা হয়েছে শুধু মাত্র সুকৃতির নির্দেশ দাতা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কারীদেরকে। অন্যায়ের বিরূদ্ধে নীরব মুমেনদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে কিনা তা বলা হয়নি। আজ ও ইসলামের এই শিক্ষা বলবৎ। এই দায়িত্ব পালন না করার এই দুর্বিসহ অবস্থা কোন মুমিন মেনে নিতে পারেনা। আলেমগণ যদি এই দায়িত্ব পালন না করেন তবে সমাজের এই ভয়াবহ পরিনাম থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। উপরের আলোচনা থেকে এই কথাটি আর ব্যাখার প্রয়োজন রাখেনা যে মারুফের নির্দেশ ও মুনকারের প্রতিরোধ বলতে শুধু ইসলামের কতিপয় মৌলিক ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াত দেয়াই বোঝায় না। উপরে উল্লেখিত সুরা তওবা ও সুরা হজ্বের আয়াত দুটিতে 'নামাজ কায়েম করা' 'যাকাত প্রদান করা' ও 'শরীয়ত নির্ধারিত সীমা সংরক্ষনের' দায়ীত্বের সাথে সাথে মায়ারুফের নির্দেশ ও মুনকারের প্রতিরোধের কথাটিকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর অর্থ ইসলামের মৌলিক ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াতই শুধু নয়। বরং দ্বীনের সার্বিক বিষয়গুলোর সামগ্রিকতায় সমাজে ন্যায়ের পালন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এর মূল লক্ষ্য। এই সামগ্রিক দৃষ্ঠিকোণ থেকে সমগ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। যারা কতিপয় ইবাদাত বন্দেগীর দাওয়াত কেই এই দায়িত্বের প্রতিপালন মনে করেন তারা আত্ম প্রবঞ্চনা করেন মাত্র। ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে এই দায়িত্ব পালন না করলে এই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাবার কোন উপায় নেই।

সমাজের তৃতীয় শ্রেণীটি হলো দেশের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত আপামর জনসাধারন। তারা পার্থিব বিষয়গুলোতে প্রথম শ্রেণীর লোকদের উপর এবং ধর্মীয় বিষয়গুলোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা উলেমাদের উপর নির্ভরশীল।

জনশক্তির এই মূল্যায়নে প্রতিভাত হয় যে দেশে ইসলামী আর্দশবাদের প্রতিষ্ঠা ও লালনের জন্যে উলেমা শ্রেণীর ভূমিকাই চাবিকাঠি। উলেমাদের কারণেই আজকের অবস্থা এবং তারাই এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারেন।

ইকামতে দ্বীন তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্ম পদ্ধতি।

ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে মিল্লাতের সবাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত আল জামায়াতের সদস্য থাকেন। কেউ রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে যেতে পারেন না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তোলা ইমানের দাবী। এ লক্ষ্যে কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচীর বিভিন্নতায় একাধিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সাংগঠনিক ঐক্য ছাড়া এ পথে এতটুকু ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কোরআন মজিদে এই সাংগঠনিক ঐক্যের ডাক দেয়া হয়েছে বারে বারে। এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا (البقرة ١٠١)

(তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুত করে ধরো এবং বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।)

অর্থাৎ তোমরা সুশৃংখলও মজবুত সংগঠন গড়ে তোল। সাংগঠনিক ঐক্য ছাড়া পৃথিবীর কোন সামষ্ঠিক কাজই আঞ্জাম দেয়া যায় না। লক্ষ্যের বিভিন্নতায় সংগঠনের ধরণ ও নিয়মনীতি ভিন্নতর হয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তথা ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের স্বরূপ অপরাপর সংগঠন থেকে ভিন্নরূপ হবে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, বৈষয়িক অপরাপর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন সমূহ থেকে এই সংগঠনের ধরণ ভিন্নতর। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা আল্লাহর হুকুমেরই বাস্তবায়ন, এখানে নেতৃত্বের লিপ্সা নেই, নেতৃত্ব কোন মর্যাদা নয়, বরং এটি হলো বিরাট দায়িত্ব। দ্বীনি দায়ীত্বের অনুভূতি নেতা ও কর্মীকে এক অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। নেতৃত্বের সমালোচনা এখানে শুধু বৈধই নয়, নিতান্ত কাম্য। পারস্পরিক পরামর্শ এখানের প্রাণ, এমনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হলো ঈমানের দাবী। হাদীসে এরসাদ হয়েছে,

اذا كان ثلاثة فى سفر فيومروا احدهم (اخرجه ابو داود)

(যদি তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয় তবে তারা যেনো তাদের একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়।)

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে;

لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة فى الارض الا امرو عليهم احدهم

(তিন ব্যক্তি যারা জংগলে থাকে, তাদের জন্যেও তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নেতা না বানিয়ে বসবাস করা বৈধ নয়।)

অর্থাৎ তিন জন মানুষ যদি সফরে থাকে বা জংগলে থাকে, তাদেরকে ও একজনকে নেতা বানাতে হবে। সফরে বা জঙ্গলে যতি নেতা বানানো অপরিহার্য হয় তবে সমাজের মুসলমানদের জন্যে সংগঠন ছাড়া জীবন যাত্রা কি ভাবে বৈধ হতে পারে? সংগঠনহীন জীবনে ঈমান অনিরাপদ থাকে। যেমন এরসাদ হয়েছে;

ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاذه القاصية و الناحية و اياكم و الشعاب فعليكم

بالجماعة و العامة (اخرجه مسند أحمد

(শয়তান মানুষের জন্যে নেকড়ের মতো, যেমন ছাগলের জন্যে। নেকড়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে সহজেই শিকার করতে পারে। তাই তোমরা কখনো একাকিভাবে না থেকে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করবে এবং সাধারন মানুষের সাথে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করবে।)

অন্যত্র বলা হয়েছে, (يد الله على الجماعة) (জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে) অর্থাৎ জামাত বদ্ধ জীবনের উপর আল্লাহর সাহায্য আসে।

www.pathagar.com

তাই যদি কোন ব্যক্তি ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে চায় তবে তাকে সাংগঠনিক জীবন যাপন করতে হবে। এ কাজের জন্যে তাকে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন এক সংগঠনে যোগ দিতে হবে, কোন এক সংগঠনকে বেছে নিতে হবে, কিংবা তাকে নতুন কোন দল গড়ে তুলতে হবে। এর একমাত্র লক্ষ্য হবে ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, অন্য কথায় 'আল জামাত' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা অপরিহার্য। এই পর্যায়েএকাধিক ইসলামী সংগঠনের অস্তিত্ব ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণকর, আজকের ধর্ম নিরপেক্ষ পরিবেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কোন সহজ আন্দোলন নয়। সংগঠনের বা আন্দোলনের মূলনীতি ও মুল লক্ষ্যে কোন মতপার্থক্য নেই, বা এর অবকাশও নেই, কিন্তু এই আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচীতে মত পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। সমস্ত ইসলাম প্রিয় জনতাকে একই প্লাট ফরমে একই কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই একাধিক দল গড়ে তোলা বা বিভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্লাট ফরমের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনা করা কোন ক্ষতিকর বিষয় নয়। কর্মসূচীর পার্থক্য থাকলে ও মূল লক্ষ্য অভিন্ন। এই সব সংগঠনগুলো যদি সত্যিকার ইসলামী সংগঠন হয় তবে হিংসা-বিদ্বেষ বা দলাদলী বা রেষারেষির কোন ভয় থাকে না। মূল লক্ষ্যের ঐক্য তাদেরকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। কোন একটি দলের অবনতি বা বিপর্যয় ইসলামী আন্দোলনের যাত্রা ব্যাহত করে না। ঐ বিপর্যস্ত বা বিলুপ্ত দলটির কর্মীগণ সহজেই অন্য একটি দলে স্থান করে নিতে পারে। কোন এক দলের বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও কর্মসূচীতে অতৃপ্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন দলে তার ভূমিকা রাখতে পারে। মূল লক্ষ্যে এক মত হওয়া সত্বেও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিষ্ক্রিয়তার সাম্ভাব্য গোনাহ থেকে সে বা তারা রক্ষা পেতে পারে। আল জামায়াতের উপস্থিতি ও আল জামায়াতের অনুপস্থিতির পরিস্থিতি দ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য না বোঝার ফলে এমনি ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে একাধিক দলের সংগঠন যেনো ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ক্ষতিকর। এই দুই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক আনুগত্যের স্বরূপ ভিন্নতর তা ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ণয়ে রাসুলেপাকের সুন্নাহই হলো মূল দিশারী। রাসুলে পাকের কর্মপদ্ধতিই আমাদের কর্ম পদ্ধতি। রাসুলে পাকের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি গুলো চিরন্তন, কিন্তু মূলনীতি বাস্তবায়নের ধারা বিভিন্ন হতে বাধ্য। এমনি করে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা ও রাসুলের সুন্নাহ থেকেই নিতে হবে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন ও বিস্তারিত কর্মসূচীর প্রণয়ন চিন্তা ও গবেষণার উপর নির্ভর করে। তাই বিভিন্ন মতামত অপরিহার্য। তদুপরি বর্তমানের পরিবর্তিত জটিল রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সমস্যাগুলোর নিরিখে এ সব মূলনীতি সমুহের বাস্তবায়ন এবং বর্তমান বিশ্বে এসব বিষয়ের প্রয়োগ প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতা কর্মীদের বিচার বিবেচনাকে নাড়া দেবে। এক কথায় এখানে মত পার্থক্য থাকবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

রাসুলেপাকের উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামগণ রাসুলে পাকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে তৎপর ছিলেন। ইকামতে দ্বীনের পূর্ণতার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক নির্ধারিত সময় সূচী অনুযায়ী রাসুলে পাক সাহাবায়ে কেরামদের সহযোগিতায় দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের সব কিছুই রাসুলের জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। ধন-সম্পদ, পরিবার, মান-মর্যদা, সন্তান-সন্তুতি, জীবন তথা তাদের গোটা অস্তিত্বই রাসুলের জন্যে পেশ করেছিলেন। কুফর ও জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় ছিলো অবশ্যম্ভাবী। স্বল্পমেয়াদী এই কর্মসূচীতে জান ও মালের পরীক্ষা নেয়াটাই ছিলো মূখ্য। সাহাবায়ে কেরামগণ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ পথে কামিয়াব হয়েছেন। যথা সর্বস্ব ত্যাগ করে আল্লাহর নবীর পদতলে আশ্রয় নেয়াটা ছিলো সবচেয়ে বড় পাওয়া। নবীর দরবারের চাওয়া পাওয়ার ধরনই আলাদা ছিলো। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। মুসলমানদের সমাজে ইকামতে দ্বীন তথা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে যে বা যে সব সংগঠন গড়ে উঠবে সেগুলোকে সহ অবস্থানের মূলনীতির ভিত্তিতে সমাজ বিপ্লবের জন্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মনীতি তৈরী করতে হবে যেনো মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার অহেতুক বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। কুফুরের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা বা অস্তিত্ব বজায় রাখার আমরণ সংগ্রাম কিংবা মুসলিম সমাজে হিকমতের সাথে সমাজ বিপ্লব সংগঠনের মধ্যে পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। হিকমত বা কৌশল এসব সংগঠনের মূল হাতিয়ার হতে হবে। কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধের আন্দোলনে হিকমত বা কৌশল সাফল্যের পথ খুলে দেয়। আল্লাহ এই সম্পদ যাদেরকে দান করেন তারাই সাফল্য লাভ করতে পারে। সংগঠন কায়েমের লক্ষ্যে নিস্কলূষ সততা, নেতৃত্বের সত্যিকার ইসলামী ইলম ও সংগঠনের পরিচালকদের আমল, তাকওয়া ও ইখলাস সে সংগঠনকে এই হিকমতের হকদার বানিয়ে দেয়। এই হিকমত মুমিনদেরকে এমন সজাগ বানিয়ে দেয় যে তারা তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করেনা, অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মসূচীকে উত্তরোত্তর ফলপ্রসু ও বাস্তব বানিয়ে দেয়।

আল্লাহ পাক এই হিকমতের মহিমা এ ভাবে উল্লেখ করেছেন,

يوتى الحكمة من يشاء و من يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا و مايذكر الا اولوا الالباب –

(البقرة ٢٦٩)

(তিনি যাকে চান তাকে এই হিকমত দান করেন, যাকে হিকমত প্রদান করা হলো,তাকে বিরাট সম্পদ দেয়া হলো, এ কথা থেকে শুধু তারাই শিক্ষা নেয় যারা বুদ্ধিমান।)

মুমিনদের এই যোগ্যতার কথা একটি হাদীসে এ ভাবে বলা হয়েছে;

المومن كيّس فطن – (اخرجه القضائى فى المسند)

(মোমেনগণ কৌশলী ও পারদর্শী) মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ এই দুইটি গুণ সৃষ্টি করেন, একটি হলো সাবধানী কৌশলগত যোগ্যতা, যার দ্বারা তারা ক্ষতিকর বিষয় গুলোর মধ্যে থেকে কল্যাণকর পথ বেছে নিতে পারে। কল্যাণের পথ বেছে নেবার এই যোগ্যতা

www.pathagar.com

মুমিনদেরকে সজাগ ও সন্ধানী বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে অপর গুণটি তাদের যোগ্যতার গুণ। এই গুণের কারণে তারা অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভুলের পূর্নরাবৃত্তি করে না। তাই ইসলামী আন্দোলন আপোষহীন কৌশলী সংগ্রামের পথ। বর্তমানের পরিবর্তিত মুসলিম সমাজে ইসলামী আন্দোলনের অর্থ সংঘর্ষ ও লড়াই নয়। মুসলমানদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে চলা মুমিনদের দায়িত্ব। প্রয়োজনে মুমিন সব কিছু ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তা হতে হবে তখনি যখন ইসলামের স্বার্থে অপরিহার্য হয়ে দাড়াবে। দলের মর্যাদায় জন্যে নয়, বরং ইসলামের মর্যাদার জন্যে এমনি ত্যাগ অপরিহার্য হয়ে দাড়াবে।

ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো জনগণকে আল্লাহ ও রাসুলের পথে চলতে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহর বান্দাহদেরকে তারই পথে ডাকার চাইতে বড় কাজ আর কিছু হতে পারে না। কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال انى من المسلمين – (فصلت ٣٣)

(ঐ ব্যক্তির চাইতে ভাল কথা আর কার হতে পারে যে (আল্লাহর বান্দাহদেরকে) আল্লাহর পথে ডাকে এবং ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন কারী (মুসলিম।)

আল্লাহর পথে ডাকার জন্যে সবার্ধিক নিখুত পথ হলো মানুষকে কোরআনের দিকে ডাক দেয়া।

মানুষের হিদায়াত সব চাইতে গুরুত্ব পূর্ন কাজ। কোরআনে এরসাদ হয়েছে;

ياايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته و لاتموتن الا و انتم مسلمون – واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا و اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ۚ (ال عمران ١٠١)

(হে মুমিনগণ, তোমরা সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে ভয় করো (তাকমরা লাভ করো) এবং মুসলমান হয়ে যাবার পূর্বে মৃত্যুবরন করোনা, এবং (সত্যিকার মুসলমান হওয়ার লক্ষ্যে) আল্লাহর রশিকে সম্মিলিত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিভেদের পথে চলোনা। তোমরা ঐ সময়কে মনে করো যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহর ঐ নিয়ামতের ভিত্তেতে ভাই ভাই হয়ে গেলে।)

এখানে সত্যিকার মুসলিম জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাকমরার গুন অর্জনের আহবান জানান হয়েছে এবং সাংগঠনিক জীবনকে আল্লাহ নিয়ামত বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহর এই নিয়ামতের জন্যে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। অর্থাৎ এই সংগঠনের শক্তি তাদের অর্জিত নয়, বরং তা আল্লাহরই নিয়ামত, তাই বিনয়ের সাথে হিদায়াতের পথে মানুষকে ডাকতে হবে।

মানুষের হিদায়াতের চাইতে বড় কোন সাফল্যের কল্পনা করা যায় না।

হাদীস শরীফে এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

لان يهدى الله هداك رجلا واحدا خيرلك من حمر النعم –

(رواه البخارى و المسلم و ابوداود)

(তোমার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত পায়, তবে তোমার জন্যে তা সারা পৃথিবীর সম্পদের চাইতে ও শ্রেয়।)

তাই মানুষের হিদায়াতই ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। মানুষের হিদায়াত না হলে কাদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে?

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীদের যোগ্যতা,

পূর্ণাংগ ইসলাম বা দ্বীনে হকের দিকে দাওয়াত দেয়ার লক্ষেই সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। লক্ষ্যের সুস্পষ্ট জ্ঞান সংগঠনের প্রকৃতি ও রূপরেখা নির্ধারন করবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সংগঠন গড়ে উঠবে তা প্রকৃত পক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিয় সংগঠনের বা আল জামায়াতের ছায়া সংগঠন হিসাবে প্রতিফলিত হতে হবে। এই সংগঠনের আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক চরিত্র এমন হতে হবে যা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আল জামায়াতের রূপ নিতে পারে। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে এ ভাবে যে এই দলের বা দল সমুহের আদর্শ ও লক্ষ্য এমন ভাবে তুলে ধরতে হবে বা ব্যাখা করতে হবে যা সার্বজনীন বা পুর্ণাংগ দ্বীনে হকের প্রতিনিধিত্ব করে, এই আর্দশ ও লক্ষের ব্যাখায় কোন অষ্টপষ্টতা কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ কোন রহস্যাবৃত্ত ইংগীত থাকা অনুচিত যা সেই দলকে সাধারনভাবে পরিচিত ইসলামী আর্দশবাদ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে পরিচিত করে তোলে। ফলে সে দল সাধারন মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। তেমনিভাবে সংগঠন বা সংগঠনসমুহের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসুচী ও এমন হতে হবে যা সুস্পষ্ট ও সাধারনভাবে বোধগম্য, যা কোন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখার অবকাশ রাখেনা। অর্থাৎ কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির প্রণয়নে, পুনঃবিন্যাসে, প্রকাশে ও প্রচারণায় মুসলিম জনমতের অনুভুতির প্রতি সজাগ থাকতে হবে। কেননা, মজবুত সংগঠন গড়ে তোলাই আসল লক্ষ্য নয়, বরং মুল লক্ষ্য হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে জনমত সংগঠিত করা, বেশী বেশী লোককে সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বা অনুগত করে তোলা, যেনো তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত নাগরিক হতে পারে এবং প্রয়োজনে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সংগঠনের রূপরেখা, কর্মী ও নেতৃত্বের শ্রেনীবিন্যাস এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যা পরবর্তীকালে আল জামায়াতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান এবং ইসলামী সংগঠন সমুহের প্রধানদের মৌলিক যোগ্যতা ও গুণাবলী মূলতঃ অভিন্ন তবে ব্যবহারিক ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতাশীল এবং ইসলামী

www.pathagar.com

সংগঠন সমূহের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের মৌলিক যোগ্যতা ও গুণাবলীতে কোন পার্থক্য না থাকলে ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য বিদ্যমান।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও ক্ষমতাশীল এবং ইসলামী সংগঠন সমূহের পরিচালক ও দায়িত্বশীলদের অভিন্ন যোগ্যতা ও গুণাবলী নিম্নরূপঃ

কোরআনে মজিদে নেতৃত্বের জন্যে দুইটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, এরসাদ হয়েছে,

ان خير من استأجرت القوى الامين (القصص ٢٦)

(কর্মচারী হিসেবে সেই উৎকৃষ্ট যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত) ইসলামী সমাজের সকল পর্যায়ের নেতৃত্ব আল্লাহরই কর্মচারী। (تجريد اسماء الصحابة) গ্রন্থে এই ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে;

আবু মোসলেম আল খাওলানী একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম ছিলেন, একদা তিনি হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের (রাঃ) খেলাফতের দরবারে হাজীর হয়ে সম্বোধন করলেন, হে কর্মচারী, দরবারের লোকেরা তাকে হে আমীরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করতে বললেন, কিন্তু তিনি আবারো বললেন, হে কর্মচারী, দরবারের লোকেরা আবারো তাকে একই কথা বললেন, কিন্তু তিনি এবারেও একইভাবে সম্বোধন করলেন, তখন হযরত মুয়াবিয়া দরবারের লোকদের বললেন, তোমরা আবু মোসলেমকে বলতে দাও। কেননা তিনি যা বলছেন চিন্তা করেই বলছেন, অতঃপর ইমাম আবু মোসলেম বললেন;

انما انت أجير استأجرك ربى هذه النعيم لرعايتها

فان انت هنأت جرباها ، و داويت مرضاها وحبست اولها على اخرها ، وفاك سيدها اجـرك ، وان انت لم تهنأ جرباها ، و لم تداو مرضاها و لم تحبس اولها على اخرها عــاقبك سـيدها - (ص٢١٥ ٢٢٠)

(নিশ্চয়ই আপনি একজন কর্মচারী (চাকর) এই মেষদলের (জনগণের) মালিক তাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে আপনাকে কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন, যদি আপনি তাদের জখমে প্রলেপ দেন, তাদের অসুখ বিসুখে ঔষধ দেন, তাদের সবাইকে রক্ষণাবেক্ষন করেন, তবে তাদের মালিক আপনাকে মজুরী দেবেন, আর যদি আপনি তাদের জখমে প্রলেপ না দেন, তাদের অসুখে চিকিৎসা না করান এবং সবার সমভাবে হেফাজত না করেন, তবে তাদের মালিক আপনাকে শাস্তি দেবেন।) নেতৃত্বের এই দুইটি গুণকে কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে;

انك اليوم لدينا مكين أمين (يوسف)

(মিসরের রাজা হযরত ইনসুফ (সঃ) কে বললেন, আজ থেকে আপনি আমাদের কাছে বিশ্বস্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন।) এখানে নেতৃত্বের জন্যে বিশ্বস্থতা ও শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্য এই দুইটা গুণে শ্রেষ্ঠতম বা শ্রেষ্ঠতর

www.pathagar.com

হতে হবে। কিন্তু এই দুইটি গুণের মিলন খুবই বিরল, তাই কাজ বা দায়িত্বের পরিপেক্ষিতে যোগ্যতার ফয়সালা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূল কথা হলো আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বের অনুভূতি ও তার প্রতিপালন। নির্বাচনকারী ও নির্বাচিত ব্যক্তি, উভয়কেই এই দায়িত্বের তীব্র অনুভূতি থাকতে হবে। কোরআনে মজিদে এরসাদ হয়েছে;

ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها (النساء)

(আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেনো তোমরা আমানত গুলোকে তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও।)

এই আমানত বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন ধরনের, আমানতের গুরুত্ব ও প্রকৃতির কারণে দায়ীত্বের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ও নিরূপিত হয়। সর্ব প্রকারের আমানতে কোন প্রকার খেয়ানত করা থেকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে;

يايهاالذين امنوا لاتخونوا الله والرسول و تخونوا أماناتكم و انتم تعلمون (الانفال٢٧)

(হে ইমানদার লোকেরা তোমরা (আমানত আদায় করতে গিয়ে) আল্লাহ রাসুলের প্রতি খেয়ানত করো না, এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানত আদায়ে, এ অবস্থায় যে তোমরা জেনে শুনে খেয়ানত করছো।)

আমানত বা বিশ্বস্থতার বিপরিত হলো খেয়ানতা বা বিশ্বাস ঘাতকতা। পৃথিবীর কোন আমানতে খেয়ানত করা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও রাসুলেরই খেয়ানত।

হাদীস শরীফে এরসাদ হয়েছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلّى عليه وسلم قال " اذا ضيعت الامانة انتظر الساعة" قيل يا رسول الله ، و ما اضاعتها ؟ قال اذا وسد الامر الى غيراهله فانتظر الساعة (رواه البخارى)

(যখন বিশ্বস্থতা বিলুপ্ত হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। প্রশ্ন হলো, হে আল্লাহর রাসুল, কিভাবে বিশ্বস্থতা হারিয়ে যাবে? জবাব দিলেন, যখন কোন বিষয়কে এমন লোকের দায়িত্বে দেয়া হবে, যে কাজের সে যোগ্য নয়, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে।)

অন্য একটি হাদীসে হযরত আবুযর (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে রাসুলুল্লাহ এরসাদ করেছেন,

انها امانة و انها يوم القيامة خزى و ندامة ، الامن اخذها بحقها وادّى الذى عليه فيها – (رواه مسلم)

(নেতৃত্ব হলো আমানত (বিশ্বাস) এবং এই আমানত কেয়ামতের দিনে লাঞ্চনা ও অনুতাপের কারণ হবে, তারাই শুধু এই লজ্জা ও অনুতাপ থেকে বেঁচে থাকবে যারা সেই আমানতের হক আদায় করবে যথাযথ ভাবে।)

হাদীস শরীফে এরসাদ হয়েছে,

www.pathagar.com

* من ولى من أمر المسلمين شيئا فولىّ رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه فقد خــان الله و رسوله-

*من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد فى تلك العصابة أرضى منه ، فقد خان الله و خان رســوله و خان المومنين (رواه الحاكم فى صحيحه)

(যে মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়ীত্ব পেলো, অতঃপর কোন ব্যক্তিকে দায়ীত্বশীল বানালো, কিন্তু তার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তির চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি মওজুদ ছিলো, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জন্যে অধিকতর উপকারে আসতে পারতো, সেক্ষেত্রে সে আল্লাহ ও রাসূলের খেয়ানত করলো।)

(যে ব্যক্তি একদল লোকের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিকে একটি কাজের দায়িত্ব দিলো, কিন্তু তার দৃষ্টিতে সে দলের মধ্যে সে ব্যক্তির চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি মওজুদ ছিলো, তেমনি অবস্থায় ঐ ব্যক্তি আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমেনদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করলো।)

হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন,

من ولّى من امر المسلمين سيئا فولّى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله و المسلمين

(যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের নেতৃত্বে সমাসীন হলো, অতঃপর কোন এক ব্যক্তিকে বন্ধুত্বের কারণে বা আত্মীয়তার কারণে কোন পদ প্রদান করলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের ও মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করলো।)

আল্লাহ্র ও তার বান্দাদের আমানতে মানুষ খেয়ানত করে দুইটি কারণে,

প্রথমঃ- পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও মর্যদার মোহে,

দ্বিতীয়ঃ সন্তান-সন্ততি ও আপন জনদের স্বার্থ রক্ষার্থে যাকে স্বজন-প্রীতি বলা হয়। তাই উপরে উল্লেখিত আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে;

و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم –

(الانفال٢٨)

(জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার সামগ্রি, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা প্রতিদান।)

(কোরআনে মজিদের অপর একটি আয়াতে তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো এই আমানত আদায়ে অপরিহার্য গুণ, এরসাদ হয়েছে;

www.pathagar.com

فلاتخشو الناس و اخشون و لاتشتروا باياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم بمـا انـزل الله فـأولئك هـم الكافرون (المائدة٤٤)

(তোমরা মানুষের ভয়ে ভীত হবে না (বরং) একমাত্র আমাকেই ভয় করবে এবং আমার আয়াতকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করবেনা।)

আল্লাহর ভয়ে ভীত না হওয়া ও পার্থিব স্বার্থে মানুষের ভয়ে ভীত হওয়া এবং পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর হককে বিসর্জন দেয়া এমনি রোগ যা আমানতে খেয়ানত করতে উৎসাহ জোগায়। ইমান ও আমলের যোগ্যতা হলো মূল যোগ্যতা যা নেতৃত্বের জন্যে অপরিহার্য শর্ত। কোরআন ও হাদীসে নামাজের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই জন্যেই, এরসাদ হয়েছে,

يايها الذين امنوا استعينوا بالصبر و الصلاه و انها لكبيرة الا على الخاشعين (البقرة ٤٥)

(হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও, এটা কষ্ট সাধ্য কাজ, হ্যাঁ তাদের জন্যেই সহজ যারা আল্লাহকে ভয় করে।)

হাদীসে এরসাদ হয়েছে, (الصلاة عماد الدين) (নামাজ হলো দ্বীনের স্তম্ভ)

এ জন্যে হযরত উমর (রাঃ) তার সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিতেন এভাবে,

ان اهم اموركم عندى الصلاة ، فمن حافظ عليها و حفظها حفظ دينه، و من ضيعـها كـان لمـا سواها من عمله اشد اضاعة

(আমার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 'নামাজ' যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করলো সে দ্বীনের হেফাজত করে, আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করেনা তার অপরাপর কাজগুলো আরও বেশী পরিত্যক্ত হয়।)

হযরত মুয়াজ (রাঃ) কে যখন ইয়েমেনে পাঠান, তাকে তিনি বলেন;

يا معاذ، ان اهم امرك عندى الصلاة

(হে মুয়াজ, আমার কাছে তোমার সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ন কাজ হলো 'নামাজ'),

জন সাধারন ও সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সার্কুলার জারী করতেন এ ভাবে;

انما بعثت عمالى اليكم ، ليعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم و يقيموا بينكم دينكم

(আমি তোমাদের কাছে আমার কর্মচারীদের পাঠিয়েছি এ জন্যে যে তারা তোমরদেরকে তোমাদের রবের কিতাব শিক্ষা দেবে, তোমাদের নবীর সুন্নাত শেখাবে এবং তোমাদের মধ্যে তোমাদের দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করবে।)

আল্লাহর নবী যাদেরকে দায়িত্বশীল করে কোথাও পাঠাতেন তারা মুসলমানদের নামাজের জামায়াতের ইমামতী করতেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে তার স্থলে ইমাম

www.pathagar.com

বানালেন, তাই মুসলমানেরা তাকে শাসক বানিয়ে নিলেন। পরবর্তীকালে খলিফারা ও যাদেরকেই কোথাও পাঠাতেন, তারা নামাজের ইমামতি করতেন।

তাই নেতা বা দায়িত্বশীল হবার জন্যে মুসলমানদের জামাতে ইমামতীর যোগ্যতা হলো অপরিহার্য শর্ত। তার মধ্যে কোরআনের শুদ্ধ তেলায়ত ও শরীয়তের মৌলিক ইলমে এমন যোগ্যতা অবশ্যি থাকতে হবে যেনো সকল শ্রেণীর মুসলিম জনগণ তার ইমামতীতে তৃপ্তি সহকারে নামাজ আদায় করতে পারে। এই মৌলিক গুণ ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন দায়িত্বে সমাসীন হতে পারেনা।

ইসলামী নেতৃত্বের জন্যে আরেকটি গুণের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হলো, ক্ষমতা ও পদের জন্যে লিপ্সা না থাকা। যারা পদের বাসনা রাখে তারা এই পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। হাদীসে এরসাদ হয়েছে,

عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، ان قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية ، فقال : انا لانولى امرنا هـــذا من طلبه و قال لعبد الرحمن بن سمره ، يا عبد الرحمن لاتسال الامارة فانك ان اعطيتها مـــن غـــير مسئله اعنت عليها و ان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها (اخرجه الصحيحين)

(একদল লোক রাসূলেপাকের কাছে এসে নেতৃত্বের আবেদন জানালো, রাসূলেপাক বললেন, আমরা আমাদের এই দায়িত্বকে এমন লোকদেরকে প্রদান করি না যারা এর বাসনা রাখে, এবং তিনি আবদুর রহমান বিন সামুরাহকে বললেন, হে আবদুর রহমান, নেতৃত্ব চেয়ে নিও না, যদি তোমাকে বিনা চাওয়ায় নেতৃত্বে দেয়া হয় তবে তোমাকে নিযুক্ত করা হলো (যাকে সাহায্য করা হয়) আর যদি চাওয়ার পর নেতৃত্ব দেয়া হয় তবে তোমার উপর ঐ কাজ সোপর্দ করা হলো, অর্থাৎ সে দায়িত্বকে নিজের ক্ষমতায় আঞ্জাম দেবার জন্যে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।)

من طلب القضأو استعان عليه وكل اليه ، و من لم يطلب القضأ و لم يستعن عليه ، انـــزل الله اليـــه ملكا يسدده

(যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থনা করলো, তাকে সে দায়িত্ব সোপর্দ করা হলো, আর যদি সে না চেয়ে বিচারক নিযুক্ত হয়, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করার জন্যে একজন ফিরিস্তা পাঠিয়ে দেন, যিনি তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন।)

কাজেই এই সমস্যাটি কোন আইন শৃংখলার বিষয়ই নয়, বরং আল্লাহর তৌফিক পাওয়ার মাধ্যম মাত্র। আল্লাহর তৌফিক না হলে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। বিনয়ী ও খোদাভীরু লোকেরাই এ দায়িত্বের হকদার।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে দায়িত্বের শ্রেণীবিন্যাসে যোগ্যতার পার্থক্য থাকবে। শাসন বিভাগে শাসন ক্ষমতার যোগ্যতা, আইন প্রণয়নে আইনের জ্ঞান ও বুৎপত্তি, বিচার বিভাগে ন্যায় পরায়নতা ও আইন প্রয়োগে প্রজ্ঞার

www.pathagar.com

প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শুধু সাংগঠনিক যোগ্যতা ও আনুগত্য তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়োগে সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। জন চরিত্রের সংশোধন ও বিন্যাসের এই পর্যায়ে সর্ব পর্যায়ের নেতৃত্বের যোগ্যতা ও বিশ্বস্থতার উপরই আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। নেতৃত্বের যোগ্যতার অভাবে সঠিক কর্মসুচী ও মজবুত সংগঠন ও ব্যর্থ হয়ে যায়। সংগঠনের সর্ব পর্যায়ে সুদৃঢ় ঐক্যের পেছনে নেতৃত্বের অবদানই সর্বাধিক। সাংগঠনিক আইন শৃংখলার শক্তিতে কর্মীদের আনুগত্য লাভ করাকে সাংগঠনিক আনুগত্য বলা যায় না। আসল আনুগত্য হলো স্বতস্ফুর্ত আন্তরিকতার আনুগত্য।

অমায়িক ব্যবহার ও ইসলামী চরিত্রই এমনি আনুগত্যের চাবিকাঠি। রাসুলে আজম তার চারিত্রিক মাধুর্য্যে শীষে ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার সাহাবাদের চরিত্র ও অনুরূপ ছিলো। নেতৃত্বের অসদাচরন সব চাইতে বড় অপরাধ। সাংগঠনিক নিয়ম শৃংখলার মত পার্থক্যের কারণে কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, বা নেতৃত্বের প্রতি কারো আনুগত্যকে সন্দেহের চোখে দেখে তাকে সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া এমনি ধরনের অপরাধ। আল্লাহর নবী এরসাদ করেছেন,

بعثت لاتمم مكارم ا لاخلاق

নৈতিকতার উন্নততর মানদন্ডের পূর্নতার জন্যেই আমি প্রেরীত হয়েছি, এই চরিত্রের মাধুয্যেই সাহাবায়ে কেরামগন তাকে ঘিরে থাকতেন,
কোরআনে মজিদে এরশাদ হয়েছে;

فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فى الامر _ (ال عمران ١٠٩)

(আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি নম্র হয়েছেন, এবং যদি আপনি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো তাই আপনি তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন এবং তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করুন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করুন।)

সাথীদের সাথে কোমল হৃদয়ে তাদেরকে পরামর্শে শরীক করেই তাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। সত্যিকার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক একেই বলে। সাংগঠনিক প্রাধান্য ও আর্থিক সংগতি নেতা ও কর্মীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনা। পারস্পরিক সম্পর্কের এই ধরনই ইসলামী সংগঠনকে অপরাপর সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে ভাস্কর করে তুলে। সম্পর্কের এই মাধুর্যতা সমস্ত মুসলমানদের সাথে সমভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পক্ষের সমস্ত কর্মী ও সাথীদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। হিংসা, আত্ম প্রশংসা, অহম, বড়াই, পরশ্রীকাতরতা, আত্ম তুষ্টি একজন ব্যক্তিকে এই দায়িত্বের অযোগ্য বানিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

মুমিন ভাইদের সাথে তাদেরকে সদা প্রফুল্ল চিত্ত ও সহজ হতে হবে, ভয় ভীতি, কাঠিন্য, হতাশা, সমস্যার আবর্তে মুমিনদেরকে হতোদ্দম করা তাদের কাজ নয়।
হাদীসে এরসাদ হয়েছে;

بشروا ولاتنفروا ويسروا ولاتعسروا

(তাদেরকে সুসংবাদ দাও, ঘৃণার পথে ডেকো না, প্রতিটি বিষয়ে সহজ পথ দেখাও, জটিলতা থেকে দূরে রাখ।)

সর্বতোভাবে মুমিনদের বা কর্মীদের মন জয় করা তাদের বুনিয়াদী কাজ।
হাদীসে এরসাদ হয়েছে,

عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول : خيار أئمتكم الذين تحبونهم و يحبونكم تصلون عليهم و يصلون عليكم و شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم – (رواه مسلم)

(তোমাদের উত্তম নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাসো এবং তারা তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করো, তারা ও তোমাদের জন্যে দোয়া করে, এবং তোমাদের জঘন্য নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারা ও তোমাদেরকে ঘৃনা করে, তোমরা তাদেরকে ভৎসনা করো, তারাও তোমাদেরকে ভর্ৎসনা করে।)

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকেই এই পরিবেশের প্রশ্রবন বইবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ তারই হাতে। তাকে তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচিক্ষণতা দিয়ে সংগঠনকে নিষকলুষ ও অনাবিল রাখতে হবে। ইসলামী সংগঠনে না জেনে বশতঃ ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ক্ষমাযোগ্য নয়। ইলম বা জ্ঞানের অভাব তার জন্যে অপরাধ। হাদীসে এরসাদ হয়েছে;

القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار و قاض فى الجنة ، فرجل علم الحق و قضى بخلافة فهو فى النار ، و رجل قضى بين الناس على جهل فهو فى النار ، و رجل علم الحق و قضى به فهو فى الجنة (رواه أهل السنن)

(কাজী বা ফয়সালাকারী তিন শ্রেণীর, দুই শ্রেণীর ফয়সালাকারীরা জাহান্নামে যাবে এবং এক শ্রেণীর ফয়সালাকারীরা জান্নাতে যাবে, যে ব্যক্তি সত্য জানার পর তার বিরুদ্ধে ফয়সালা দেবে, সে জাহান্নামে যাবে, এবং যে ব্যক্তি না জেনে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে, সেও জাহান্নামে যাবে, এবং যে ব্যক্তি সত্য জানার পর সেই মোতাবিক ফয়সালা করবে, সেই জান্নাতে যাবে।)

এই জন্যে নেতৃত্বের জন্যে ইলমকে অপরিহার্য শর্ত করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান কে ইসলামী ইলমের সাথে সাথে শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞানে বিজ্ঞ হতে হবে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জন্যে জ্ঞানের

www.pathagar.com

গুরুত্ব অধিকতর। কেননা, ইলমই সর্ব পর্য্যায়ের কর্মীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। ইসলামের ইতিহাস আমাদের সামনে এই সত্য তুলে ধরে যে জ্ঞানের প্রাধান্যেই ব্যক্তি ও সাংগঠনিক অবদান সুরক্ষিত হয়েছে।

সম্প্রতিক-কালের ইসলামী সংগঠন সমুহের পর্যালোচনা।

পর্যালোচনা বা সমালোচনা কোন অবৈধ বা নেতিবাচক কাজ নয়। বরং সাফল্যের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজ। অবশ্য নৈতিবাচক সমালোচনা কোন মঙ্গল জনক কাজ নয়। এসব সংগঠনগুলো মানুষের গড়া সংগঠন, তারা কেউ অতি মানব ছিলেন না। তাদের চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তিতে স্থান-কাল ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা কর্মসূচী ও কর্মনীতি তৈরী করেছেন। সমাজের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তনে ও পরিবর্ধনে এ সব কর্মনীতি ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা ও পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন গতিশীল আন্দোলনের জন্যে অপরিহার্য। সাংগঠনিক পর্যায়ের পর্যালোচনাই যথেষ্ঠ নয়। পর্যালোচনা ও সমালোচনার দ্বার উম্মুক্ত রাখা আন্দোলনের সাফল্যের চাবিকাঠি। ইতিবাচক ও গঠনমুলক সমালোচনার ধারা অব্যাহত না থাকলে বা এমনি সমালোচনাকে সন্দেহের চোখে দেখা হতে থাকলে নেতিবাচক সমালোচনার পথ খুলে যায়, যা আন্দোলনের পরিবেশকে বিষাক্ত করে দেয়। পর্যালোচনা ও সমালোচনা আন্দোলনের গতিকে বাড়িয়ে দেয়। জরাগ্রস্থ চিন্তাকে সচল করে দেয়। এই দৃষ্ঠিভঙ্গিই বক্ষ্যমান আলোচনার লক্ষ্য। সমালোচনা কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের মর্যাদাকে খাটো করেনা, বড় ব্যক্তিদেরই সমালোচনা হয়, সেক্ষেত্রে গঠনমূলক ইতিবাচক সমালোচনা ব্যক্তি বা সংগঠনের মর্যাদাকে বাস্তবতার নিরিখে সুরক্ষিত করে।

পূর্বসূরীদের সকল কথা ও ভূমিকাকে ভুল ক্রটির উর্দ্ধে মনে করা ও অহেতুক সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব অনেক ক্ষেত্রে অনেক অনর্থের কারণ হয়েছে। এই বইতে উলেমাদের বিরোধ আলোচনা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের ইজতিহাদ বা গবেষণা প্রসুত মতবিরোধের সমালোচনা ইজতিহাদ ও গবেষণার ধারাতেই করা উচিৎ। ইসলামের ইতিহাসে এমনি সমালোচনার অভাব নেই। মোহাদ্দেসীনেরা ইমাম আজম আবু হানিফার কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম বোখারীর সমালোচনার ভাষা অত্যন্ত কঠোর ছিল। এতে ইমাম আবু হানিফার সম্মানে বা মর্যাদায় আঁচ লাগেনি। কিন্তু ইজতিহাদী বিষয় বস্তুর সমালোচনা যদি রাজনৈতিক ভাবে বা কায়েমী স্বার্থের রক্ষায়, বিরোধিতার জন্যে করা হয়, তাতে ইসলামী ঐক্যের ক্ষতি হয়। এমনি অবস্থা এড়ানোর জন্যে অনেক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী কোন ব্যক্তিত্বের জন্যে ইজতিহাদের ময়দানে কোন মন্তব্য করতে গিয়ে এমন কথা লিখা বা বলা উচিত নয়, যা মৌলিক মতবিরোধের কারণ হতে পারে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এমনি মতবিরোধ থেকে স্বযত্নে দুরে থাকার চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ একজন মুজতাহিদ বা আলেমের সমালোচনা একজন

www.pathagar.com

ব্যক্তির সমালোচনা, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নেতার সমালোচনা ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টার ক্ষতি সাধন করে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ইজতিহাদী মন্তব্যের সমালোচনা যখন রাজনৈতিক ভাবে বা কায়েমী স্বার্থের লক্ষ্যে বিরোধের জন্যে করা হয়। তখন সংগঠন থেকেও একইভাবে জবাব দেয়া হতে থাকে এবং এক সীমাহীন বিবাদ সৃষ্টি হয়। এ জন্যেই আমি বলেছি যে সংগঠনিক পর্য্যায়ের পর্য্যালোচনাই যথেষ্ট নয়। কারণ সাংগঠনিক পর্য্যালোচনা মূলতঃ সংগঠনের কর্মসূচী বা ভূমিকার পক্ষে যুক্তি প্রনয়ন করারই নামান্তর। সে সব যুক্তি গুলো সংগঠনের কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে ও সংগঠন বর্হিভূত ইসলাম প্রিয় জনগণের কাছে গ্রহন যোগ্য না ও হতে পারে। এ জন্যে গঠন মূলক ইতিবাচক সমালোচনাকে সন্দেহের চোখে না দেখে সে সব সমালোচনার ভিত্তিতে কর্মসূচীর মূল্যায়ন করা সংগঠনকে সাফল্যের পথে নিয়ে যায়।

আজ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে সমস্ত ইসলামী সংগঠন গুলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৎপর রয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই দুইটা ইসলামী আন্দোলন থেকে উৎসারিত। তাদের একটি হলো মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমুন আর অপরটি হলো পাকিস্তান কেন্দ্রীক জামায়াতে ইসলামী। এই দুইটা আন্দোলনই এই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও অপরাপর অমর ব্যক্তিদের কল্যাণে ইখওয়ানুল মুসলেমীনের আন্দোলনটি মিসরের শিক্ষিত, চিন্তাশীল ও শিক্ষিত লোকদের মনে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে, কিন্তু অচিরেই রাজনৈতিক স্বৈরাচারের শিকারে পরিনত হয়। এই দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাজনৈতিকভাবে উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু এটি একটি আন্দোলন ধারার সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন আরব দেশে সীমিত পর্যায়ে তৎপর রয়েছে। যারা নিঃসন্দেহে একটি আদর্শিক শক্তি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। অধিকৃত ফিলিস্তিনে তাদের স্বসস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন সহ অপরাপর কিছু কিছু দেশে স্বশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যে গুলো ইখওয়ানের মূল সংগঠন কতৃক নিয়ন্ত্রিত নয় বলে দাবী করা হয়।

অপরদিকে অবিভক্ত ভারতে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী একজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ। ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে তার লিখনীতে। আজ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে স্বক্রিয়। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতে জামায়াত দাওয়াত, তরবিয়াত ও সমাজসেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে আন্দোলনের কেন্দ্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই দলটি দাওয়াত, ও তরবিয়াতের সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর রয়েছে। এই দুইটি দেশে এই দলটি শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে এবং একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়ন এখনও স্বপ্নই রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এই দুইটি সংগঠন ছাড়া ও বিভিন্ন মুসলিম দেশে আরো অনেক দল বা সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আরো বেশ কয়েকটি দল এই লক্ষ্যে কাজ করছে। জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলেমুন মূলতঃ সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই বিশেষভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। দেশের উলেমা সমাজ সাধারনভাবে এই দুইটি আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকেন। জামাতের প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস সম্পর্কে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে এই আন্দোলনের স্থপতী বা স্থপতীগণ এ উপমহাদেশের উলেমা সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। উলেমারা এই দলে তেমন ভূমিকা পালন করেন নি বা আজও করছেন না। বরং এই জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই উলেমাদের তরফ থেকে সমালোচনার পর সমালোচনার তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আজও এর সমাপ্তি হয়নি।

উলেমাদের সংগঠন হিসেবে খেলাফত আন্দোলন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু আজ এই দলটি সুশৃংখল সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া নেজামে ইসলাম, ঐক্য আন্দোলন ইত্যকার অনেক ছোট ছোট দল ও ময়দানে কাজ করছে।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছাড়া নিছক দাওয়াতী কর্ম কান্ডের দল হিসাবে 'তবলীগে জামায়াত' একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। যারা ঈমান, আকিদা, কালেমা বা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতের প্রতি দাওয়াত দেয়াকেই মায়ারুফের নির্দেশ দেবার দায়িত্ব পালন মনে করেন, তেমনি গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার আহবানকেই 'মুনকার' থেকে নিষেধ করার দায়ীত্বের পালন মনে করেন। তারা শয়তানের পথ থেকে সরিয়ে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার দাওয়াতের মাধ্যমে পবিত্র দায়ীত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন এবং অগনিত জনতা উপকৃত হচ্ছেন। বিশেষ ভাবে অমুসলিম দেশ সমুহে সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যে তাদের ভূমিকা সত্যিই প্রসংশনীয়। ভারতের মাটিতে তেমনি পরিবেশেই এই দলটির যাত্রা শুরু হয়েছিলো, স্বাধীন মুসলিম দেশে তাদের কর্মসূচী মারুফের নির্দেশ ও মুনকারের প্রতিরোধের দায়ীত্বের একটা অংশের পালন করা হলে ও ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতো মৌলিক দায়ীত্ব পালনের লক্ষ্যে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা এই মৌলিক দায়িত্বকে একেবারেই এড়িয়ে যান, এর সুস্পষ্ট জবাব না দিলেও তাদের কথায় প্রমাণ হয় যে তারা এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে একটি অসম্ভব কাজ বলে মনে করেন। কোন ফরজকে এড়িয়ে গেলেই বা শরীয়তের কোন বিধান ছাড়া কেউ একে অসম্ভব মনে করলেই এর ফরজিয়াত মাফ হয়ে যায় না। ইকামতে দ্বীনের জন্যে গৃহিত কর্মসূচী বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এই ফরজিয়াতকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশের অধিকাংশ পীর মাশায়েখদের খানকা সমুহে ও এই দায়িত্ব চরম ভাবে উপেক্ষিত।

www.pathagar.com

যে সমস্ত দল গুলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে ঘোষনা করেছে, এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর রয়েছে, তাদের এই সব কর্মকান্ডের স্বরূপ ও ধরন সম্পর্কে চিন্তাশীল মহলে মত পার্থক্য রয়েছে। রাজনৈতিক বিষয়দির আলোচনা আমাদের লক্ষ্যে নয়। বরং আদর্শের আলোকে এ সব কর্মকান্ডের মূলনীতি গুলো তুলে ধরাই আমাদের আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত।

মুসলিম বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান শতকে অর্ধশতকের ও অধিককাল ধরে ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান ধারাগুলো অব্যাহত থাকা সত্বে ও মূল লক্ষ্যের হাতছানী সুদুরেই রয়ে গেছে। কোন কোন দেশে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। এ সব অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামী সংগঠন সমুহের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধরন নির্ধারনে পূর্নবিবেচনা করে দেখতে হবে। বর্তমানে গৃহীত কার্য্যসূচী ও কর্মনীতির যে অবশ্যম্ভাবী ফলাফল পাওয়া গেছে, তা হলো নিম্নরূপঃ

সমাজতাত্বিক কারণেই দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুগত। সমাজের সর্বস্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠিরা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত । রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব বলয়ের বাইরে অবস্থানরত প্রভাবশালী লোকদের সংখ্যা খুবই নগন্য। ছাত্র শিক্ষক, মিল মজদুর, কৃষক, দোকানদার, ব্যবসায়ীসহ সকল পর্যায়ের লোকেরা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে। সমাজের দূর্বল শ্রেণী সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রভাবে কোন দলের সমর্থন করে। পত্র পত্রিকার কল্যাণে ও বিভিন্ন পর্যায়ের সাংগঠনিক সুত্রে বিভিন্ন দলের প্রচারণী যুক্তি প্রমাণাদি সকল পর্যায়ের সমর্থকদের হাতে হাতে পৌছে যেতে মোটেই দেরী হয় না।

একে গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনৈতিক স্বচেতনতা বলে আখ্যায়িত করে এই পরিস্থিতির উম্মেষ ঘটানো হয়েছে। গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে, শহর, বন্দর, বস্তি ও জনবসতির রেস্তোরা ও অপরাপর মিলন কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক সংলাপ, আলোচনা-সমালোচনা একটি মুখরোচক বিষয় হিসাবে পরিগণিত। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের সমাজতাত্বিক অবস্থা উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক কারণেই জনগণ ইসলাম বলতে সাধারনভাবে পরিচিত কতিপয় ইবাদাত বন্দেগী সর্বস্ব কার্য্যক্রমকেই গ্রহণ করে নিয়েছে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত। গ্রামে গঞ্জের ও শহরে বন্দরের মসজিদে কেন্দ্রিক ইমাম, আলেম, মৌলভী, মুন্সী তাদের ধর্মীয় আদর্শ।

এমনি পরিস্থিতিতে ইসলামী সংগঠন বা সংগঠন সমূহের প্রচেষ্টায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুটি কতেক ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠনের শাখা খোলা হয়েছে, তাদের দ্বারা সংগঠনের দাওয়াত জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়, সভাসমিতির ব্যবস্থা করা হয়।

যেহেতু ইসলামী সংগঠনসমূহ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের নির্বাচনসমূহে অংশগ্রহণকারী দল। তাই জনগণের দৃষ্টিতে তারা একটি রাজনৈতিক দল, যারা তাদের স্বীয়

www.pathagar.com

দলের প্রতিপক্ষ। ইসলামী দলের দাওয়াত ও কর্মসূচীকে সাধারন জনগণ সাধারনভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী বলে মনে করে। স্বীয় দলের আনুগত্য, দলের বৈরী প্রচার প্রপাগান্ডা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষতার মনোভাবে নিরপেক্ষতার মনোভাব নিয়ে ইসলামী আদর্শবাদকে অনুধাবন করার কোন পরিবেশই তারা পায়না। রাজনৈতিক কারণেই রাজনৈতিক বিরোধের পথ বেছে নেয়। ব্যক্তিগত চরিত্র, পারিবারিক ও সামাজিক কারণে সামান্য গুটি কতক লোকদেরই আদর্শিক সমর্থন লাভ সম্ভব হয়। রাজনৈতিক তৎপরতার আধিক্যে কোথাও অধিকতর সমর্থন পাওয়া গেলে তা মূলতঃ রাজনৈতিক সমর্থনই হয়ে থাকে। অবস্থার পরিবর্তনে ঐ রাজনৈতিক সমর্থন আবার লোপ পেয়ে যায়। এমনিভাবে রাজনৈতিক ময়দানের উষ্ণতা বজায় রাখার জন্যে অন্যান্য আদর্শ নিরপেক্ষ দলসমুহের মতই রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হয়। ধর্মঘট, হরতাল, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের এক সীমাহীন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সংগঠনকে এগুতে হয়। এসব কর্মসূচীতে ইসলামী সংগঠনের স্বকীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়ে উঠেনা। রাজনৈতিক উত্তেজনায় সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণহানী হয়। ইসলামী আদর্শবাদ সম্পর্কে অজ্ঞাত সাধারন মুসলমান জনসাধারন বিরোধী শিবিরের সমর্থন দিতে থাকে। এভাবে তারা ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতার অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়।

আবার রাজনৈতিক কারণে আদর্শ নিরপেক্ষ দলসমূহের সাথে দৃষ্টিকটু আঁতাত ও করতে হয়। এ সব কিছুই সাধারন জনগণের দৃষ্টিতে ইসলামী সংগঠনকে অপরাপর আদর্শ নিরপেক্ষ দলগুলোর সম-কাতারে খাড়া করে দেয়। ফলে ঐ সমস্ত লোকদের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পবিত্র দায়িত্ব কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনা। তারা ইসলামের দাবী পূরণ করতে গিয়ে আংশিক ইসলামের দাওয়াতদান কারী দলগুলোর ডাকে সাড়া দেয় আর রাজনৈতিক ময়দানে আদর্শ নিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে একাত্নতা প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জনমত সৃষ্ঠিতে ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে দলের নেতৃত্ব দেশের রাজনৈতিক গতিধারায় সংগঠনকে গতিশীল রাখার লক্ষ্যে পরিস্থিতির মূল্যায়ন, পর্য্যালোচনা ,রাজনৈতিক নীতি নির্ধারনে তথা উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সর্বক্ষণিক ব্যস্ততায় নিমজ্জিত থাকেন। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশাল অর্থ যোগান দিতে হিমশিম খান। ফলে অর্থকরী কর্মকান্ডের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এবং আন্দোলনের মূল কাজের দিকে অপরিহার্য শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করতে অপারগ হয়ে যান। নেতৃত্বের আদর্শিক মানোন্নয়নে তথা ইসলামী আদর্শের জ্ঞান ও আমলে উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ কমে যায়। কর্মী ও সমর্থকদের সঠিক তরবিয়ত ব্যাহত হয়।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট দাতাদের ভোটে নির্বাচিত হওয়াই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যথেষ্ঠ নয়। প্রয়োজন হলো প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির। এই প্রতিরক্ষা শক্তির অভাবে কোন কোন দেশে ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর ও ইসলামী দল

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ হয়েছে বললে ভুল হবে, বরং এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যাতে ইসলামী আন্দোলন তার সংগঠন ও কর্মী বাহিনী হারিয়েছে, মুসলিম জনগণের জাতীয় জীবনে দুর্বিসহ দুর্যোগ নেমে এসেছে।

প্রতিরক্ষা শক্তির অর্থ হলো জাতীয় জীবনের সকল শক্তিকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিবেদিত প্রাণ সমর্থক বাহিনী তৈরী হওয়া যারা উদ্ভুত যে কোন পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা করবে। যারা জনমতের শক্তিতে যে কোন বৈরী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবে। এই শক্তির আধার ইসলামী জনশক্তির সবাইকে সংগঠন ভূক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়, বা তা বাস্তবে সম্ভব ও নয়। তারা সংগঠনের পরিকল্পনা ভিত্তিক অবিরাম ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি স্বরূপ মানসিক পর্যায়ে এমন এক স্তরে উপনিত হবে যে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তাদের মধ্যে কেউ বা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত থাকবেন, কেউ স্বাধীন পেশা জীবি, কেউ বুদ্ধি-জীবি, সাহিত্যিক কবি, বিত্তশালী, ধনী, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, উলেমা বা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে, কিন্তু সংগঠনের বাইরে থেকে মূল লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হবে। একে বাইরের সমর্থন বা (OUTSIDE SUPPORT) বলে চিত্রিত করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য এই লক্ষ্যে পৌছার জন্যে দাওয়াতী ও তরবিয়াতি কাজের যে পরিবেশ প্রয়োজন, উপরে চিত্রিত পরিবেশ তার সহায়ক নয়। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের এই ঝঞ্ঝাপূর্ণ আবর্তে এই লক্ষ্য অর্জন করার চিন্তাও করা যায় না। আদর্শ নিরপেক্ষ রাজনীতির চরিত্রহীন কর্মকান্ডের সাথে একাত্ব হয়ে ইসলামী আদর্শের পবিত্র লক্ষ্যে পৌছা অনেকটা আসাধ্যের সাধন বলে মনে হয়। তাই মানুষ তৈরীর দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী হলো সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ন ও মৌলিক কর্মসূচী এবং মানুষের মন মগজের বিজয় হলো আসল বিজয়। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে এ লক্ষ্যে পৌছার প্রভাবশালী মাধ্যম বলে মনে করেন। তাদেরকে অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের ভূমিকার পুনর্মূর্ল্যায়ন করতে হবে।

এখানে আমি পুর্ব আলোচিত ইমাম আজম সহ অপরাপর ইমামদের মতামতের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাদের মতে আদর্শ নিরপেক্ষ মুসলিম সরকারের বিরদ্ধে তখনই মাত্র বিদ্রোহ করা বৈধ যখন ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত বলে প্রতিয়মান হয় যেন ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত সংকটাপন্ন না হয়ে পড়ে। বিনা কারণে জানমালের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকা যায়। গনতান্ত্রিক পরিবেশে বিপ্লবের কোন বৈধতা নেই। গনতান্ত্রিক উপায়ে যেখানে জনমত সংগঠনের মাধ্যমে পরিবর্তনের পথ উম্মুক্ত রয়েছে। সেখানে বিপ্লবের পথে যেতে হবে কেন? জনমত সংগঠিত না হলে তেমনি বিপ্লবে সরকারের পরিবর্তন হয় সত্যি কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। তাই আধুনিক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইমামদের উক্ত মতামতের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়। তবে কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে গনতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নটিকে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনে বিপ্লব ঘটানোর সাথে তুলনা করতে হবে। বিশেষ

www.pathagar.com

করে যে সব দেশে গণতন্ত্রের নির্বাচনকে অস্তিত্বের ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে, গনতান্ত্রিক মূল্যাবোধ গড়ে উঠেনি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার জাতীয় জীবনকে কুলষিত করে রেখেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কি সেই পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব করেনা? এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা ইসলামী সংগঠনগুলোর মূল কর্মসূচী হওয়া উচিৎ।

এই পর্যায়ে সংগঠনকে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনে পরিণত করতে হবে। সংগঠনকে বেসরকারী 'আল জামায়াত' হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। শাসন ব্যবস্থার পরিচালনে, আইন প্রণয়নে, বিচার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করনে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। যেন বাস্তবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুহুর্তে দেশের শাসন ব্যবস্থায়, আইন পরিষদে ও বিচার বিভাগে এমনি লোকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। ইসলামী সংগঠন গুলো এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তৈরী করবেন। এলক্ষ্যে পৌছার জন্যে ইসলামী সংগঠন গুলো নূন্যতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়াস পাবেন। পারস্পরিক সমালোচনার নেতিবাচক পথ পরিহার করে সবাই ইতিবাচক ভাবে কর্মসূচীর বাস্তবায়নে স্বচেষ্ট থাকবেন। বর্তমান পরিবেশে নির্বাচনে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে ইসলামী সংগঠন গুলো যা কিছু অর্জন করেছে, তার চাইতে অনেক বেশী হারিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। পাকিস্তানের ইসলামী দলগুলো এর বাস্তব প্রমাণ। সেখানের রাজনৈতিক ময়দানে তারা শক্তিধর হলে ও নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত। এই পরিস্থিতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন অনুকুল পরিবেশের বার্তা বহন করে না। সাধারনভাবে জনগণের কাছ থেকে আস্থা ও সম্মান অর্জন করার পরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত বলে তারা মনে করেন।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের আদর্শ ও আদর্শিক মূলনীতিগুলো অপরিবর্তনীয়, সেখানে কোন আপোষের অবকাশ নেই। কিন্তু এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার উপায় ও কর্মসূচী ও কর্মনীতির প্রণয়নে মত প্রার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কর্মসূচী ও কর্মনীতি কোন স্থায়ী ফর্মূলা নয়। সমাজতাত্বিক পরিবর্তন বা বিকাশের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অপরিহার্য। গোঁড়া রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকারান্তরে আন্দোলনের ক্ষতিসাধন করে। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইকামতে দ্বীন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জন্যে কর্মনীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে উদার নীতি প্রণয়ন সহায়ক হবে।

অতঃপর ঐক্যের পথে

উলেমাদের ঐক্য ও ইকামতে দ্বীনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্নমূখী আন্দোলনের ঐক্য হলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পথে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ। এই পরম বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছার জন্যে যা অপরিহার্য তা হলো সকল পর্যায়ের নেতৃত্বের ও

www.pathagar.com

কর্মীদের মধ্যে মনস্তাত্বিক বিপ্লব ঘটানো। নিজেকে বা নিজের দলকে অন্যের বা অন্যদলের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করার অহম ত্যাগ করতে হবে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা দলীয় বিনয় অনেক অবাঞ্ছিত বিরোধ থেকে মুক্তি দিতে পারে। এখানে কিছু দেয়ার প্রয়োজন নেই, কোন বস্তুগত স্বার্থ ত্যাগ করারও দরকার নেই, প্রয়োজন হলো মনের সংকীর্ণতা থেকে দূরে থেকে উদার মনের পরিচয় দেয়া। এই আত্মত্যাগের ফলে সে ব্যক্তি বা সে দল অন্যের কাছে মহান হয়ে যায়। পূর্বের শত্রুতা বা ঘৃণা আস্তে আস্তে চরম ও পরম আপনজনে পরিণত করে দেয়। কোরআনে মজিদের এই আয়াতের তাৎপর্য এটাই,

ادفع بالتى هى أحسن . فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم .

"সুন্দরতম আচরণ দিয়ে মন্দ বা অশালীন আচরণকে প্রতিহত করো, তার পরিণামে হটাৎ করেই পুঞ্জিভূত শত্রুতা চরম বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে যাবে।" বিশ্বের অপরাপর ধর্ম, আদর্শ ও মতবাদ সমূহের সাথে ইসলামের স্বাতন্ত্রই এখানে যে এই আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ সত্যিকার অর্থে ভাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি মোড়ে আমরা এর নিদর্শন দেখতে পাবো। মুসলমান বলে পরিচিত হবার জন্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্বতা ঘোষণা করা অপরিহার্য শর্ত। মুসলিম বলে পরিচিত হবার সাথে সাথেই ভাতৃত্বের এই মৌলিকগুণ তার পরম দায়িত্ব এ অধিকারে পরিণত হয়ে যায়। সে কোন অবস্থাতেই এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যেতে পারে না এবং তার এই অধিকার থেকেও তাকে কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত করা যাবে না। হাদীস শরীফে এরসাদ হয়েছে;

عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الا الله و ان محمد رسول الله فاذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا و اكلوا ذبحتنا و صلوا صلواتنا فقد حرمت علينا دمائهم و اموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم (رواه النسائى)

(আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে মানুষদের সাথে আমি লড়তে থাকবো যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল। অতঃপর যখন তারা এই সাক্ষ্য দেবে, এবং আমাদের কিবলাহকে কিবলা মেনে নেবে, এবং আমাদের জবাই করা পশু খাবে এবং আমাদের মতো নামাজ পড়বে, তবে তাদের জান ও মাল আমাদের উপর হারাম হয়ে যাবে, অবশ্য কোন নির্ধারিত হক এর থেকে স্বতন্ত্র (কিসাম ইত্যাদি) তার জন্যে সেই অধিকার যা অপরাপর মুসলমানদের অধিকার, তার দায়িত্ব ও তাই যা অপরাপর মুসলমানদের দায়িত্ব।)

একজন মুসলামানের মান-মর্যাদা, আত্মসম্মান তার নিজস্ব মান-মর্যাদা বা আত্মসম্মানেই শুধু পরিনত হয়ে যায়না, বরং নিজের মর্যাদার চাইতে ও তার ভায়ের মর্য্যাদা তার কাছে অগ্রাধিকার পায়। এই অধিকার দল মত ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের জন্যে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলাবাহুল্য, এই কর্তব্য-দায়িত্ব ও অধিকারের প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের হাতে রেখেছেন।

www.pathagar.com

হাদিস শরীফে এরশাদ হয়েছে;

عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما من أمرئ يخذل امرامسلما فى موضع تنتهك فيه و ينتقص فيه من عرضه الا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته و ما من امرى ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه و ينتهك من حرمته الاّ نصره الله فى مواطن يحب فيه نصرته (رواه ابو داؤد)

যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন অবস্থানে সমর্থন করে না, যেখানে তাকে হেয় করা হচ্ছিল এবং তার সম্মানের উপর আঘাত করা হচ্ছিল, তবে আল্লাহ পাক ও তাকে এমন অবস্থানে সাহায্য করবেন না। যেখানে সে তাঁর সাহায্য একান্ত ভাবে কামনা করে। যদি কোন মুসলমান এমন অবস্থায় কোন মুসলমানকে সাহায্য করবে যেখনে তার সম্মাে আঘাত করা হচ্ছিলো এবং তার মর্যাদাহানী করা হচ্ছিলো, তবে আল্লাহ তাকে এমন অবস্থানে সাহায্য করবেন যেখানে তার নিতান্ত আকাংখা হবে যে আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন।

কোন ব্যক্তির মান-মর্যাদার চাইতে মূল্যবান কোন সম্পদ নেই। পরিস্থিতি ও অবস্থার নাজুকতাকে ব্যবহার করে, কারো ক্ষণিকের দূর্বলতা ব্যবহার করে কারো মান-মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিরাট অপরাধ।

রাজনৈতিকভাবে ও মুসলমানের এই হক হরণ করা যাবে না। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা এক দলের সাথে অন্যদলের সম্পর্কের অবনতির জন্যে এটাই মুল কারণ। মুসলমানদের এই মৌলিক অধিকারকে হরণ করা বা মুসলমানদের এই মৌলিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা কোন সাধারণ অপরাধ নয়। প্রকারান্তরে এর অর্থ হলো ইমানের পথ ছেড়ে কুফরীর পথে চলা।

এরসাদ হয়েছে:

الا فلاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض - (متفق عليه)

(সাবধান হয়ে যাও, আমার পর কাফিরদের মতো হয়ে যেওনা যে একে অপরের গলা কাটতে থাকো।)

অন্য একটি হাদীসে এরসাদ হয়েছে:

عن عبد الله عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: المومن تكافاء دمائهم و هم يد على من سواهم (مسند ابو داود)

(মুমেনের রক্ত সমমর্য্যাদার অধিকারী এবং মুমেনগণ অন্যদের মোকাবিলায় একটি হাতের মত (ঐক্যবদ্ধ)

আর একটি হাদিসে বলা হয়েছে:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

www.pathagar.com

المسلم اخو المسلم لايظلمه و لايسلمه و من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة – (رواه البخارى والمسلم)

(একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানের ভাই, না সে তার উপর জুলুম করে আর না তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে। যে ব্যক্তি তার ভায়ের সাহায্যে লিপ্ত হলো আল্লাহ তার সাহায্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে,আল্লাহ তাকে কিয়ামতের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তার দোষ-এটি গোপন করবেন।)

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده – (رواه البخارى)

(মুসলমান সেই ব্যক্তি যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে।)

عن ابى موسى الاشعرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: المومن للمومن كاالبنيان يشد بعضه بعضا – (متفق عليه)

(মুমেন অন্য মুমেনের জন্য ঐ প্রাচীরের মতো যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।)

عن نعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه و سلم قال:

مثل المومنين فى توادهم و يراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى. (رواه البخارى و المسلم)

(মুমেনদের উপমা পারস্পরিক আন্তরিকতা,করুনা ও সহযোগিতায় একটি দেহের মতো, যার একটি অঙ্গ যদি ব্যাথা পায় তবে সারা শরীর ঐ ব্যাথার কারণে বিনিদ্র ও জ্বরাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।)

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل ان كان مظلوما ننصر و ان كان ظالما كيف ننصره فقال تحجره أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره (رواه البخارى)

(আল্লাহর নবী বললেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক বা মজলুম, তখন একজন বললো, যখন সে মজলুম তাকে আমরা সাহায্যে করি, কিন্তু যদি জালেম হয়, তাকে কি ভাবে সাহায্যে করবো? আল্লাহর নবী জবাবে বললেন, তাকে জুলুম করা থেকে প্রতিহত করো, বাঁধা দাও, এটাই তাকে সাহায্য করা।)

কোরআনে মজিদ মুমেনদের এই বিশেষ সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, এরসাদ হয়েছে:

www.pathagar.com

انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم – اتقوا الله لعلكم ترحمون (الحجرات ٩)

(মুমেন একে অন্যের ভাই, এই জন্যে ভাইদের মাঝে সম্পর্ককে ঠিক করে নাও, আল্লাহকে ভয় করো- তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত হবে।)

এই বিষয়ের উপর কোরআনের আয়াত ও হাদীস সমুহের কোন সীমা নেই। এই বই এর প্রথম দিকে ও এ সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা কে না জানি যে ঐক্যেই শক্তি, বিরোধে শক্তির অপচয় হয়, সব চেয়ে বেশী ক্ষতি এই যে বিরোধের মাঝে আল্লাহ্র রহমত পাওয়া যায়না, অনেক সময় তাঁর অভিসম্পাত নাযিল হয়। যদি প্রত্যেকই চিন্তা করেন যে বিরোধ এড়িয়ে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্ঠি করা আমারই দায়িত্ব। অন্যের ভুমিকার উপর এটা নির্ভর করেনা, এটা নিতান্ত আমার দায়িত্ব। তবে বিরোধের আগুন ধীরে ধীরে নিভে যায়।

কোরআনে মজিদে এই দর্শনই তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে;

اطيعوا الله ورسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و أصـــبروا ا ن الله مـــع الصـــابرين –

(الانفال)

(আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার রাসুলের। কলহে লিপ্ত হয়ো না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ চলে যাবে এবং তোমরা এ পথে ধৈর্য্য ধারণ করবে। আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।)

অর্থাৎ সবরের সাথে কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। ফলে ঐক্যের পথ সহজ হয়ে যায়।

অহম ত্যাগ করা খুবই কঠিন কাজ। প্রত্যেক মানুষের মনেই নিজেকে বড় মনে করার অদম্য আগ্রহ রয়েছে। কেউ এর বাইরে নয়। কিন্তু এই মনোস্তাত্বিক বাধা অতিক্রম করে অহম ত্যাগ করতে পারলে যে সম্পদ অর্জিত হয় তার নাম ঐক্য। এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। আত্মত্যাগের মাধ্যমে ঐক্য অর্জিত হয় - অতঃপর হারানোর চাইতে পাওয়াই মহত্তর হয়ে উঠে। ঐক্যের পূর্বে সে একজন মাত্র, কিন্তু ঐক্যের পর সে একটি জাতি বা উম্মাহ। এই উম্মাহই আল্লাহর কাম্য।

ঐক্যের জন্যে নিচের দুইটি কথা মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিতে হবে।

প্রথমতঃ- আমার নিজের কর্মনীতি-কর্মপদ্ধতি বা আমার দলের কর্ম পদ্ধতি কোন ঐশী বাণী নয়। এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তম তাই সেই মোতাবিক কাজ করি। ভুলের সম্ভাবনা আছে বলে বাড়াবাড়ি করি না। সবিনয় কাজ করে যাই মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ- অন্য ব্যক্তি বা অন্য দলের কর্মসূচীর চাইতে আমার বা আমাদের কর্মসূচী উততম, তাই বলে অন্য ব্যক্তি বা দলের কর্মসূচীকে ঘৃণা করি না, কারো বিরূদ্ধে বিদ্বেষ রাখি না। তাদের কর্মসূচী হয়তো বা উত্তম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com